মনসাসংস্কৃতি : লোকাচার ও প্রতিগ্রহণ (একটি আঞ্চলিক পর্যালোচনা)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে

পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

তনুশ্রী বিশ্বাস

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. অনন্যা বড়ুয়া

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২২

Certified that the Thesis entitled

"মনসাসংস্কৃতি : লোকাচার ও প্রতিগ্রহণ (একটি আঞ্চলিক পর্যালোচনা)"

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of professor Dr. Ananya Baruya and neither this thesis or nor any part of it has been submitted before any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Ananya Baruya

supervisor :

Dated : 02.09.2022

Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Candidate : Tanusree Biswas

Dated : 02.09.2022

কৃতজ্ঞতা

প্রথমাবধি যার সার্বিক নির্দেশনা তথা সহায়তায় বর্তমান গবেষণা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে, তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা, আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. অনন্যা বড়ুয়া। তিনি গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে এগিয়ে চলার পথ দেখিয়েছেন। আমার যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতি বহু সময় নিয়ে যত্ন সহকারে সংশোধন করেছেন। একটা সময় করোনা মহামারীর প্রকোপে যখন প্রায় সব কাজকর্ম বন্ধ, ম্যামের উৎসাহ, মূল্যবান পরামর্শ ও সাহচর্যে আমার গবেষণার কাজ নিজ গতিতে চলেছে। ম্যামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। তাঁর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি।

এ গবেষণার ক্ষেত্রে বহির্বিভাগীয় নির্দেশক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপিকা ঈপ্সিতা হালদার এবং অন্তর্বিভাগীয় নির্দেশক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিনহা ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা শম্পা চৌধুরী প্রায় সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে গবেষণা সম্পাদনে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। স্যার ও ম্যামদের প্রতি আমার প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এছাড়া বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সনৎ কুমার নস্কর মহাশয়। তিনি মিঠুন দত্ত সম্পাদিত ঐকিক পত্রিকার মনসামঙ্গল কাব্য সংখ্যা ও সুচেতনা পত্রিকার বিষহরী মনসা সংখ্যা পত্রিকা দুটির সন্ধান দেন এবং সুচেতনা পত্রিকার সম্পাদক গৌতম মণ্ডলের সঙ্গে পরিচয় করান। স্যারকে প্রণাম। পরবর্তীকালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভেলা ভাসানো উৎসবের ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজে তথ্য সংগ্রহে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন শ্রী গৌতম মণ্ডল মহাশয়। স্যার ও গৌতম বাবুর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশিষ্ট নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় তার রচিত *মনসামঙ্গল* নাটক প্রসঙ্গে নিজ অনুভবের কথা জানিয়েছেন। পুরাণ গবেষক শিবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায় *মনসা* ধারাবাহিকের কাহিনি,

উপস্থাপন রীতির নানাদিক সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। উভয়ের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সুন্দরবন জনকল্যাণ সংঘ বিদ্যানিকেতনের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রী মলয় মাইতি সাগর ব্লকের মনসা সংস্কৃতির ক্ষেত্রসমীক্ষায় সাহায্য করেন। সমীক্ষার কাজে সাগরে গিয়ে মলয়বাবুর বাড়িতে একাধিকবার থেকেছি। তাঁর আন্তরিক আপ্যায়ন তথা ওই অঞ্চল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে সার্বিক সহযোগিতার কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে আজীবন মনে রাখব। মলয়বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করানোর জন্য আমার সহকর্মী তৃণা মান্নার প্রতিও অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তৃণা দি'র সাহায্য ছাড়া সাগর ব্লকের ক্ষেত্র সমীক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হত।

বাঁকুড়ার অযোধ্যা গ্রামের লোকসংস্কৃতি গবেষক অংশুমান কর্মকার ও সন্তু কর বাঁকুড়ার অযোধ্যা গ্রামের দশহরা পরব সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য দিয়েছেন। অংশুমান কর্মকার এ অঞ্চলের সমীক্ষার কাজে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। ভরতপুর ও নয়ার পটুয়ারা, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মনসার পালাগান ও রয়ানী দলের সদস্যরা, লোকসংস্কৃতির বিদগ্ধ গবেষক তথা পালাগানের সংগ্রাহক পরিমল চক্রবর্তী মহাশয়, নদিয়া জেলার ফুলিয়ার কবিগান শিল্পী শান্তিলতা বিশ্বাস মহাশয়া বিষয়ভিত্তিক তথ্য দিয়ে উপকৃত করেছেন। আমার কর্মস্থল হাওড়া জেলার বাঁকড়া বাদামতলা গার্লস হাই স্কুলের সহকর্মী মধুমিতা রায়, পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় সরকার ও চিকুর ভক্ত হুগলি ও হাওড়া জেলায় প্রচলিত মনসাকেন্দ্রিক বিবিধ লোকাচার বিশেষত অরন্ধন সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে উপকৃত করেছেন। আমার বোন অনুশ্রী বিশ্বাস প্রতিটি ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজে আমার সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় গিয়ে থেকেছে এবং ছবি, ভিডিও ইত্যাদি সংগ্রহে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার ও বিভাগীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীদের সহায়ক ভূমিকা এক্ষেত্রে অবশ্য স্মরণীয়। উল্লিখিত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সূচীপত্র

ভূমিকা **১-৩**

প্রথম অধ্যায় – মনসাকেন্দ্রিক পূজা, উৎসব, লোকাচারের নানা দিক **৪-৭৯**

- অরন্ধন
- হালাবিয়া / জালাবিয়া
- ভেলা ভাসানো উৎসব
- সাগর দ্বীপের মনসা পূজা
- সামতা গ্রামের মনসা পূজা
- মানশ্রী গ্রামে ঈশানকুমারী পূজা, মেলা ও অন্নকূট উৎসব
- মনসা ও দুর্গার সম্মিলিত রূপ - ওয়াদিপুর ও নারকেলডাঙা
- অযোধ্যার দশহরা উৎসব তথা বাঁকুড়ার মনসা সংস্কৃতি
- ঝাঁকলাই পূজা
- কমলা বিমলা ও বেহুলা পূজা

দ্বিতীয় অধ্যায় – মনসাকেন্দ্রিক অভিকরণমূলক লোকসংস্কৃতি **৮০-১৫২**

- রয়ানী
- মনসাযাত্রা
- পটশিল্পে মনসামঙ্গল
- মনসা পালার কবিগান

তৃতীয় অধ্যায় - বাংলা নাটকে মনসা কাহিনির ব্যবহার **১৫৩-১৯০**

- বেহুলা - হরনাথ বসু (১৯১০)
- চাঁদ সদাগর (বেহুলা) - পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩০)
- চাঁদ সদাগর - মন্মথ রায় (১৯৩০)
- মনসা মঙ্গল - তারাশঙ্কর মুখার্জী (১৯৫৯)
- সওদাগরের নৌকা - অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৯)
- মনসাকথা - শেখর দেবরায় (২০০২)
- মনসামঙ্গল - উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় (২০১৮)

চতুর্থ অধ্যায় - মনসামঙ্গল প্রভাবিত বাংলা চলচ্চিত্র **১৯১-২৩৬**

- চাঁদ সওদাগর (১৯৩৪) পরিচালনা প্রফুল্ল ঘোষ
- বেহুলা (১৯৬৬) পরিচালনা জাহির রায়হান
- বেহুলা লক্ষিন্দর (১৯৭৭) পরিচালনা অমল দত্ত
- সতী বেহুলা (২০১০) পরিচালনা মনোজ কুমার
- মনসাকন্যা (১৯৯১) পরিচালনা সুজিত গুহ
- নাগপঞ্চমী (১৯৯৪) পরিচালনা বিজয় ভাস্কর
- মনসা আমার মা (২০০৪) পরিচালনা বিজয় ভাস্কর

পঞ্চম অধ্যায় - বাংলা টেলি ধারাবাহিকে মনসামঙ্গলের বিনির্মাণ **২৩৭-২৯১**

- বেহুলা - স্টার জলসা(২০১০-২০১১)
- মনসা - কালারস্ বাংলা (২০১৮-২০১৯)
- ভূমিকন্যা – স্টার জলসা(২০১৮-২০১৯)

উপসংহার **২৯২-২৯৪**

গ্রন্থপঞ্জি **২৯৫-২৯৭**

পরিশিষ্ট **২৯৮-৩৯৫**

- মনসাপালার লিখিতরূপ
- চিত্রসূচী

ভূমিকা

তুর্কী আক্রমণ পরবর্তী এক বিশেষ সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল বাংলায় মঙ্গলকাব্যগুলি রচনার প্রেক্ষাপট। ধর্মের টানে জাতিকে মুসলমান ধর্মান্তরকরণের প্রবল স্রোত থেকে রক্ষা করতে পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতার মেলবন্ধন ঘটানো হয় মঙ্গলকাব্যের পাতায়। সেই অস্থির সময়ে মানুষের বিপন্ন অস্তিত্ব, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা যেমন দেবচরিত্রে প্রতিফলিত হয়, তেমনই সেই দেবতার কৃপাতেই সকল প্রতিকূলতার অবসান তথা বিপন্মুক্তির কল্পনা কাব্যরূপ পায়। সমাজে প্রচলিত পাঁচালীই বিবর্ধিত তথা বিবর্তিত হয়ে আখ্যানকাব্য রূপে প্রকাশিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত মধ্যযুগের বিস্তৃত পরিসরে রচিত হয় বহু দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক মঙ্গলকাব্য। এদের মধ্যে মনসামঙ্গলের করুণ রসাত্মক কাহিনি, বেহুলার সতীত্ব, চাঁদের পৌরুষের আদর্শ সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মহিলাদের ঘরোয়া পাঠের পাশাপাশি পুরুষের মঞ্চে দাঁড়িয়ে কাব্যপাঠ ও বিশ্লেষণ - মনসামঙ্গল এই দুই ভাবে লোকসমাজে প্রচলিত হয়। জনপ্রিয়তা ও দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী একাধিক পুরুষ যুক্ত হয় আসরে, তৈরি হয় দল, আসে যন্ত্রানুসঙ্গ। এভাবেই মনসাযাত্রার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। আবার একক পাঁচালীর ধারাটিও কিন্তু রয়ে যায়। কালে কালে পুতুল নাচে, পটুয়া শিল্পে, কবিগানে মনসামঙ্গলের কাহিনিকে নানা আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়। আবার নাটক, সিনেমা, টেলি-ধারাবাহিক - অর্থাৎ মার্জিত অভিনয়শিল্পেও মনসামঙ্গল নিজ স্থান করে নেয়।

মঙ্গলকাব্য রচনার কাল পেরিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে আরও দুই শতাব্দীর অধিক কাল। একুশ শতকে এসেও মধ্যযুগে বহু কবির হাতে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলির প্রভাব সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপ্ত ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। একদিকে লোকসমাজে দেবী মনসাকে কেন্দ্র করে পূজাপাঠ, লোকাচার, উৎসব, অপরদিকে মনসামঙ্গলের মূল কাহিনি অবলম্বনে মনসাযাত্রা, রয়ানী, জাতমঙ্গল, কবি ঝাঁপান, মনসার পট ও পটের গানের মত লোকসংস্কৃতির পৃথক পৃথক ধারা প্রবহমান। আবার মার্জিত সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, গীতিনাটক, চলচ্চিত্র, টেলি-ধারাবাহিক, বাংলা ব্যাণ্ডের গান, মেকআপ আর্টিস্টদের

বিজ্ঞাপনের জন্য তৈরি মনসামঙ্গলের কাহিনি নির্ভর ভিডিও- এভাবেই বহুমুখী ধারার সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে মনসাসংস্কৃতির ধারাবাহিক প্রেক্ষাপট, বৃহত্তর মনসাচর্চার ইতিহাস। মনসাসংস্কৃতির এই ব্যাপ্ত অবস্থানের মধ্য থেকে নির্বাচিত কয়েকটি ধারার বিশ্লেষণের তাগিদেই বর্তমান গবেষণা কর্মের অবতারণা। পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় প্রচলিত মনসাপূজা কেন্দ্রিক লোকাচার, মঞ্চে মনসামঙ্গলের নানা ধারার উপস্থাপন, এবং সেই সূত্রেই যাত্রা, নাটক থেকে চলচ্চিত্র, দূরদর্শনের জন্য ধারাবাহিক - সব মিলিয়ে অভিনয় শিল্পে মনসামঙ্গলের প্রতিগ্রহণের নানা দিক এই গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মনসাসংস্কৃতি : লোকাচার ও প্রতিগ্রহণ (একটি আঞ্চলিক পর্যালোচনা) শীর্ষক গবেষণাপত্রের পাঁচটি অধ্যায়ের শিরোনাম নিম্নরূপ -

প্রথম অধ্যায় - মনসাকেন্দ্রিক পূজা, উৎসব, লোকাচারের নানা দিক

দ্বিতীয় অধ্যায় - মনসাকেন্দ্রিক অভিকরণমূলক লোকসংস্কৃতি

তৃতীয় অধ্যায় - বাংলা নাটকে মনসা কাহিনির ব্যবহার

চতুর্থ অধ্যায় - মনসামঙ্গল প্রভাবিত বাংলা চলচ্চিত্র

পঞ্চম অধ্যায় - বাংলা টেলি ধারাবাহিকে মনসামঙ্গলের বিনির্মাণ

প্রথম অধ্যায় *মনসাকেন্দ্রিক পূজা, উৎসব, লোকাচারের নানা দিক* । এই অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় প্রচলিত বিশিষ্ট কিছু মনসাপূজা, বিচিত্র লোকাচার ও উৎসবের প্রকৃতি ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার *ভেলা ভাসানো উৎসব,* সাগর দ্বীপের *নাগ ও বাসুকি পূজা,* হাওড়ার সামতা গ্রামের *সিজমনসা পূজা,* হাওড়ার ওয়াদিপুর ও বর্ধমানের নারকেলডাঙায় *মনসা ও দুর্গার সম্মিলিত পূজা,* অযোধ্যার *দশহরা পরব* তথা বাঁকুড়ার মনসাসংস্কৃতি, বর্ধমানের মঙ্গলকোটে জীবন্ত সাপ *ঝাঁকলাই পূজা,* নেপাকুলিতে কমলা বিমলা দুই বোন রূপে মনসা পূজা ও উদয়পুর গ্রামে *বেহুলা পূজা,* উত্তর ও দক্ষিণ পরগণা, হাওড়া হুগলি সহ বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত *অরন্ধন,* রাজবংশী সমাজে প্রচলিত *হালাবিয়া / জালাবিয়া* ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম *মনসাকেন্দ্রিক অভিকরণমূলক লোকসংস্কৃতি*। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মনসাযাত্রা, বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত রয়ানী, পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়া ও বাঁকুড়ার ভরতপুরের মনসার পট ও পটের গান, এবং মনসা পালার কবিগান বা কবি ঝাঁপান।

বাংলা নাটকে মনসা কাহিনির ব্যবহার শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে মনসামঙ্গল অবলম্বনে রচিত যে সাতটি নাটকের বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেগুলি হল - হরনাথ বসুর *বেহুলা* (১৯১০), মন্মথ রায়ের *চাঁদ সদাগর* (১৯২৭), পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের *চাঁদ সদাগর (বেহুলা)* (১৯৩০), তারাশঙ্কর মুখার্জীর *মনসামঙ্গল* (১৯৫৯), অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সওদাগরের নৌকা* (১৯৬৯), শেখর দেবরায়ের *মনসাকথা* (২০০২), এবং উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের *মনসামঙ্গল* (২০১৮)।

চতুর্থ অধ্যায়, মনসামঙ্গল প্রভাবিত বাংলা চলচ্চিত্র । এই অধ্যায়ে মনসামঙ্গল অবলম্বনে নির্মিত যে বাংলা চলচ্চিত্রগুলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেগুলি হল - জাহির রায়হান পরিচালিত *বেহুলা* (১৯৬৬), অমল দত্ত পরিচালিত *বেহুলা লক্ষীন্দর* (১৯৭৭), সুজিত গুহ পরিচালিত *মনসাকন্যা* (১৯৯১), বিজয় ভাস্কর পরিচালিত *নাগপঞ্চমী* (১৯৯৪), বিজয় ভাস্কর পরিচালিত *মনসা আমার মা* (২০০৪) এবং মনোজকুমার পরিচালিত *সতী বেহুলা* (২০১০)।

বাংলা টেলি ধারাবাহিকে মনসামঙ্গলের বিনির্মাণ শিরোনামে পঞ্চম তথা শেষ অধ্যায়ে দূরদর্শনের যে তিনিটি ধারাবাহিকের পর্যালোচনা করা হয়েছে সেগুলি হল - স্টার জলসা চ্যানেলে দেখানো *বেহুলা* (২০১০-২০১১) ও *ভূমিকন্যা* (২০১৮-২০১৯) এবং কালার্স বাংলার *মনসা* (২০১৮-২০১৯)।

প্রথম অধ্যায়

মনসাকেন্দ্রিক পূজা, উৎসব, লোকাচারের নানা দিক

মনসাপূজাকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজে প্রচলিত রয়েছে বহুবিধ লোকাচার, উৎসব। অঞ্চল ভেদে এর প্রকৃতি ভিন্ন, বহু বিচিত্র। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা, লোকমানসে প্রভাব বিস্তারকারী মনসাকেন্দ্রিক কিছু উৎসব নিম্নরূপ -

অরন্ধন

এলাকার পরিচয় -

১) গ্রাম - শুলংগুড়ি (জ্যাংড়া হাতিয়াড়া দু নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত), জেলা - উত্তর চব্বিশ পরগণা, পোস্ট ঘুনি, থানা- নিউ টাউন, কলকাতা ৭০০১৫৯ ।
গ্রামের মোট জনসংখ্যা - ১৩৪৯৬ , পুরুষ - ৬৯৭৮ , নারী - ৬৫১৮ , শিশু - ১৪০৯ (ছ' বছরের নীচে), সকলেই হিন্দু।

২) গ্রাম - মাকড়দহ, ব্লক - ডোমজুর , জেলা - হাওড়া, ৭১১৪০৯।
মোট জন সংখ্যা - ৩২২৯০, পুরুষ - ১৬৩৬৪, নারী - ১৫৫৩৮।

পূজার ইতিহাস - মনসা পূজার সঙ্গে যুক্ত *অরন্ধন* বহু প্রাচীন এবং বংশ পরম্পরায় প্রচলিত একটি লোকাচার। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় বেশ ধুম ধাম সহকারে *অরন্ধন* পালিত হতে দেখা যায়। ভাদ্র মাসে আয়োজিত এই মনসা পূজার বাস্তু পূজার সঙ্গে সূক্ষ্ম সম্পর্ক রয়েছে। যারা এই সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত সেখানে প্রতিটি গৃহস্থই বসত বাড়ি সংলগ্ন স্থানে দেবী মনসার প্রতীকী রূপে সিজমনসা গাছ রোপণ করেন এবং মা মনসা হিংস্র সাপের আক্রমণ থেকে পরিবারের সকলকে রক্ষা করবেন, এই বিশ্বাসে সেখানে নিত্য ফুল জল দেন। আবার শ্রাবণ বা ভাদ্র সংক্রান্তিতে এই সিজমনসা গাছের সামনেই কোথাও দুধ কলা দিয়ে অনাড়ম্বর পূজা হয়। কোথাও বা ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে দিয়ে সংস্কৃত মন্ত্র আদি দ্বারা ঘটা করে মনসা পূজা করার প্রথা রয়েছে। দেবী মনসার সঙ্গে গাছটির নাম সাদৃশ্যই

সম্ভবত এই সংস্কারের মূল। আবার কোনো কোনো মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় চণ্ডীর নিগ্রহের পর কৈলাস থেকে শিব মনসাকে পাঠিয়েছিলেন সিজুয়া পর্বতে। সিজুয়া অর্থে সিজ গাছের জঙ্গলে ভরা অঞ্চল। সেই সূত্রেও সিজ গাছকে কেন্দ্র করে মনসা রূপে পূজার প্রথা প্রচলিত হতে পারে। এক্ষেত্রে মনসা গৃহস্থের বাস্তু দেবতা।

পূজা পদ্ধতি - ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি বা ওই মাসের অন্য কোন দিন প্রচুর খাবার রান্না করে রাখা এবং পরের দিন সেই খাবার দিয়ে দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয়। পূজার দিন বাড়িতে কোন রকম আগুন জ্বালানো এবং রান্না করা নিষিদ্ধ। এই প্রথাই অরন্ধন নামে পরিচিত। অরন্ধনের মনসা পূজা উপলক্ষ্যে রান্নার ক্ষেত্রে কঠোর শুচিতার নিয়ম পালন করা হয়। কয়েকদিন আগে থেকেই চলে রান্নাঘর ধোয়া মোছার কাজ। রান্নাঘরের প্রতিটি বস্তু ধুয়ে তবেই শুরু হয় রান্নার কাজ। অরন্ধন সম্পূর্ণ মেয়েলী আচার। রান্না বা পূজার কাজে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। পূজার আগের দিন দুপুর থেকে শুরু হয় রান্নার প্রস্তুতি। স্নান করে গৃহস্থ সধবা নারীরা নতুন বা শুদ্ধ কাপড়, আলতা সিঁদুর পরে, শুরু করেন আয়োজন। রান্না শুরু হয় আগের দিন সূর্যাস্তের পর। গ্রামে মাটির উনুনে রান্না হয়। শহরেও অনেক বাড়িতে কেবল এই বিশেষ রান্নার জন্য মাটির উনুন ব্যবহার করা হয়, আবার অনেক বাড়িতে গ্যাস উনুনেই রান্না করা হয়। উনুনের চারপাশে ও মনসা গাছের সামনে আলপনা আর শাপলা ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়, কেউ বা সঙ্গে দেন কাশ ফুল । উনুনের গায়ে আঁকা হয় স্বস্তিক চিহ্ন। পাশেই জ্বালানো হয় একটি মাটির প্রদীপ। রান্না চলাকালীন তো বটেই সারারাত ঐ প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে রাখতে হয়। কোনও কোনও বাড়িতে বয়স্করা পড়েন মনসার পাঁচালী। রান্নার শুরু করার আগে শাঁখ, কাসর, ঘণ্টা বাজানো হয় ও উলুধ্বনি দেওয়া হয়। পরনে কাপড়ের আঁচল গলায় জড়িয়ে মা মনসার কাছে অনুমতি চেয়ে নেওয়া হয়, সেই সঙ্গে দেবী যেন কোন ত্রুটি বিচ্যুতির অপরাধ না নেন, সেই অভয় প্রার্থনা করা হয়। যিনি রান্না করবেন, রান্না চলাকালীন স্থান ত্যাগ করতে পারেন না। কোনো অশুচিতা হলে, তাকে আবার স্নান করে শুদ্ধ কাপড়ে রান্না ঘরে আসতে হয়। রান্না চলাকালীন পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা কারো কোনো বিপদ আপদ হলে সেই পরিবারে অরন্ধনের মনসা পূজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এছাড়া প্রচলিত

নিয়মানুযায়ী বিধবা বা অশৌচ থাকলে তারা ভোগের রান্নায় বা দেবীর পূজায় অংশ নিতে পারেন না।

অনেক পরিবারে ওল সিদ্ধ দিয়ে রান্না শুরু হয়। দেবীর ভোগের জন্য যা কিছু রান্না হয় তার অংশ আলাদা করে তুলে রাখা হয় দুটি পাত্রে। মায়ের ভোগে দেওয়ার জন্য একটি নতুন থালায়, আর চোদ্দ পুরুষের প্রতি উৎসর্গ করার জন্য পাথরের থালার ওপর কলা পাতায়। বাধ্যতামূলক ভাবে রাঁধতে হয় আলু, বেগুন, পটল শসা সহ বিজোড় সংখ্যায় ন্যূনতম নয়টি থেকে সামর্থ্য মত এগারো, তেরো, পনেরটি বা আরও বেশি ভাজার পদ। তবে ভাজা পদের সংখ্যায় এখন শিথিলতা এসেছে। পরিশ্রম কমাতে তিনটি বা পাঁচটি ভাজা পদ কোনও কোনও পরিবারে রান্না হয়। চালতা দিয়ে খেসারির বা মুসুরের ডাল, ওলের বড়া, নারকেল ভাজা, করলা ভাজা, ইলিশ বা রুই মাছ ভাজার যে কোন একটি রান্নার নিয়ম কোন কোন পরিবারে বাধ্যতামূলক। যারা পারেন, তারা সব কটি পদই রান্না করেন। ইলিশ বা চিংড়ির টক, ছোলা নারকেল দিয়ে বা ইলিশের মাথা দিয়ে কচু শাক রান্না পূজার একটি বিশিষ্ট পদ। গ্রামে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই একটা সময় পর্যন্ত নারকেল গাছ থাকায় নারকেল সহজলভ্য ছিল, আর স্বাদ বাড়াতেও নারকেল বিশেষ কার্যকারী। সম্ভবত এই কারণেই রান্না পূজার অনেক পদেই নারকেলের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। রান্না পদ নিয়ে আমিষ নিরামিষের ব্যবধান রয়েছে। অর্থাৎ কোনো পরিবারে কেবল নিরামিষ রান্না হবে, আবার কোনো পরিবারে আবার আমিষ রান্না বাধ্যতামূলক। মায়ের ভোগের জন্য ভাত রান্না হয় মাটির হাঁড়িতে। নতুন ঝুড়ি বা কলাপাতা দিয়ে রান্না সামগ্রী ঢেকে রাখা হয়। রান্নার শেষে আবার কাসর ঘণ্টা বাজিয়ে, শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি সহকারে উনুনে জল ঢালার নিয়ম রয়েছে। প্রতিটি ভোগের হাড়ি, কলসির মুখে শাপলার মালা দিয়ে সাজানো হয়। দেবী মনসার জন্য ভোগের রান্না এবং পরিবারের সকলের খাওয়ার রান্না হয় পৃথক। আলাদা ঘরে বা কাপড় দিয়ে চারপাশ ঘিরে নিয়ে তার মধ্যে বসে দেবীর রান্না করা হয়। যিনি মনসা দেবীকে নিবেদন করার জন্য রান্না করবেন, তাকে রান্নার সময় কেউ দেখবে না, আবার তিনিও কাউকে দেখবেন না। মায়ের ভোগ রান্না শুরু হলে যখন শঙ্খধ্বনি করা হবে, তখনই বাড়ির সকলের জন্য রান্না শুরু হবে। একই ভাবে দেবীর

ভোগের রান্না শেষ হলে উনুনে জল ঢাললে তবেই সকলের খাওয়ার রান্নার উনুনে জল ঢালা হবে।

পরদিন সকালে দেবীর রান্না হওয়া উনুন লেপে মুছে আবার আলপনা দেওয়া হয়। সূর্য ওঠার আগে বিজোড় পাতা যুক্ত মনসা ডাল এনে রান্নার উনুনে বসিয়ে, কাশ ফুল দিয়ে সাজানো হয়। উনুনকেও পরানো হয় শাপলা ফুলের মালা। প্রদীপ ধরিয়ে, আগের দিনের রান্না ভোগ মাটির থালা বা কলাপাতায় নিবেদন করে মনসার পাঁচালী পড়েন সমবেত নারীরা, তাদের নিজ নিজ সংসারের কল্যাণ কামনার মধ্যে দিয়ে পূজা পর্ব শেষ হয়। অতঃপর সারাদিন প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব সহ খাওয়া দাওয়া হই হুল্লোড় চলে। শুলংগুড়ি গ্রামের মুসলিমরাও বন্ধু, প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণে এই খাওয়া দাওয়া সহ সম্প্রীতির উৎসবে সামিল হয়।

পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকবিশ্বাস ও মিথ - বাঙ্গালির সংস্কৃতিতে মনসামঙ্গল তথা দেবী মনসার বহুমুখী প্রভাব বিচিত্র ধারায় বহমান। মনসামঙ্গলের দেবী একদিকে ক্রুর, নির্মম, হিংস্র, আবার অন্যদিকে তিনি মমতাময়ী, ভক্তবৎসল। অবিশ্বাসীর জন্য তার শাস্তির মাত্রা চরম। আবার একনিষ্ঠ ভক্তের প্রতি তিনি স্নেহময়ী, রক্ষাকর্ত্রী। মনসামঙ্গলের দেবী যখন বহু বাঙ্গালির ঘরের দেবী, মা মনসা রূপে পূজিত হয় তখন সেই পূজাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত লোকাচারেরও পড়েছে দেবী চরিত্রের প্রভাব। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত মনসাপূজা কেন্দ্রিক এক পরিচিত লোকাচার *অরন্ধন* বা *রান্না পূজায়* এই প্রভাব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। সামান্য অনিয়মেই মা মনসা কুপিত হবেন। আবার তুষ্ট হলে তিনিই সংসার সন্তানদের আগলে রাখবেন। এই বিশ্বাসে শুদ্ধাচারে কঠোর নিয়ম রীতি মেনে যথাসাধ্য পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে পালিত হয় অরন্ধনের যাবতীয় লোকাচার।

প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুযায়ী শ্রাবণ শিবের মাস। কারণ এই মাসেই নাকি সমুদ্র মন্থনে উঠে আসা বিষ পান করেছিলেন শিব। তাই অগণিত ভক্ত এই মাসে বিশেষত সোমবার মহাদেবের মাথায় জল ঢেলে তার পূজা করেন। শ্রাবণ মাসেই তারকেশ্বরে দূর দূরান্ত থেকে খালি পায়ে কাঁধে বাঁক নিয়ে শিবের মাথায় জল ঢালতে অগণিত ভক্ত সমাগম হয়

প্রতি বছর। শিবের মহান ভক্ত হয়েও চাঁদ মহাদেবের কন্যা মনসাকে অবহেলা করে চরম শাস্তি পেয়েছিলেন, তাই সাধারণ লোকসমাজ আর চাঁদের মত ভুল করে নিজেদের জীবনে বিপদ ডেকে আনতে চান না। ফলে নিরাপত্তার কামনায় লোকসমাজে ভাদ্র সংক্রান্তিতে মনসাপূজার প্রচলন ঘটে। আবার বর্ষাকালে চারদিক জলমগ্ন হওয়ায় গ্রামে গঞ্জে সাপের উপদ্রব বাড়ে। জীবিকার কারণে জেলেদের এই সময়টা দিন রাতের একটা বড় সময় কাটাতে হয় মাছ ধরতে নদী নালা জলাশয়গুলিতে। নিরাপত্তার আশঙ্কা থেকেই জেলেরা দেবীকে তুষ্ট করতে উৎসর্গ করেন ইলিশ বা বড় রুই মাছ। এখান থেকেই কোন কোন পরিবারে প্রচলিত রান্নাপূজায় এই মাছের পদ দেবীর ভোগে দেওয়া বাধ্যতা মূলক। হাওড়া, হুগলি জেলায় বংশ পরম্পরায় পালিত অরন্ধনের রান্না তিথিগত ভিন্নতায় বিভিন্ন নামে পরিচিত -

বুড়ো রান্না – ৩০ এ ভাদ্র রান্না ও তার পরের দিন মনসা পূজা ও অরন্ধন পালন হয়। বিশ্বকর্মা পূজার আগের দিনের এই রান্না বুড়ো রান্না নামে পরিচিত।

গাব্র বা গাবু রান্না – ২৯ এ ভাদ্র রান্না হয় আর পরের দিন মনসা পূজা ও অরন্ধন পালন হয়। এই বিশেষ দিনের রান্না গাব্র বা গাবু রান্না নামে পরিচিত।

আঠাশে রান্না – যাদের মধ্যে এই রান্না প্রচলিত, তারা ২৮ এ ভাদ্র রান্না করেন আর পরের দিন মনসা পূজা করেন, সেই সঙ্গে অরন্ধন পালন।

বুধো রান্না – ভাদ্র মাসের যে কোন বুধবার রান্না হয় তাই বুধো রান্না নাম। একই ভাবে পরের দিন অরন্ধন পালন করে মনসা পূজা হয়।

ইচ্ছা রান্না – ইচ্ছানুযায়ী ভাদ্র মাসের যে কোনো মঙ্গল বা শনিবার রান্না করার প্রথাকে ইচ্ছা রান্না বলে। কোনো কোনো পরিবারে সোম বা শুক্রবার ইচ্ছা রান্না হয়। একই ভাবে আড়ম্বর সহযোগে বিবিধ লোকাচার তথা অরন্ধন পালনের সঙ্গে মনসা পূজা করা হয়।

ঢ্যালাপ্যালা – হাওড়া, হুগলী জেলায় আরেকটি লোকপ্রথা প্রচলিত। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের শনি বা মঙ্গলবার মনসাপূজা হয়। সারা দিন চিড়ে মুড়ি ইত্যাদি শুকনো খাবার খাওয়ার নিয়ম রয়েছে। দিনের বেলায় উনুন জ্বালানোর নিয়ম নেই। এও এক প্রকার অরন্ধন। তবে

রাতে পিঠে পায়েস বানিয়ে খাবার নিয়ম রয়েছে। এই বিশেষ রীতি ঢ্যালাপ্যালা নামে পরিচিত।

অরন্ধনের লোকাচারে মনসামঙ্গলের প্রভাব - চাঁদ সদাগর পা দিয়ে ভেঙেছিলেন মনসার পূজা ঘট। তার ঔদ্ধত্যের কী মর্মান্তিক ফল, তিনি একে একে ছয় পুত্রকে হারিয়ে পেয়েছিলেন তা সকলের জানা। তাই দেবীর জন্য নিবেদিত রান্না করার সময় নিয়মের যেন কোনো প্রকার শৈথিল্য না হয় সে বিষয় অত্যন্ত সচেতন থাকেন গৃহের নারীরা। আবার মা মনসা একদিকে পিতা মহাদেব ও স্বামী জরৎকারুর কাছ থেকে অমানবিক অবহেলা পেয়েছেন, অন্যদিকে পূজা চাইতে গিয়ে চাঁদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন নারী দেবতা বলে চরম বঞ্চনা আর অপমান। তাই অরন্ধনের রান্নায় কেবল নারীদের অধিকার। উগ্র পুরুষতন্ত্রের প্রতি মনসার তথা লোকসমাজে নারীর বিদ্বেষের পরিচয় বহন করে এ জাতীয় প্রথা।

মধ্যযুগে মার্জিত ও লৌকিক সংস্কৃতির সমন্বয়ের মাধ্যম হিসাবে লেখা হয়েছিল অজস্র মঙ্গলকাব্য। এই ধারায় মনসামঙ্গল সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছিল। পরবর্তীকালে মনসাপূজাকেন্দ্রিক লোকাচারেও মঙ্গলকাব্যের মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। রান্না পূজার রান্নায় তাই ধনী গরীব তথা উচ্চ বর্ণ ও নিম্ন বর্ণের খাবারের মিশেল দেখা যায়। ইলিশ, বড় রুই মাছ যেমন অবস্থাপন্নের খাবার, তেমনই একসময় হতদরিদ্র মানুষেরা সব্জির অভাবে জঙ্গলের বা পথের পাশের কচু, ওল ইত্যাদি খেয়ে বাঁচতেন। অরন্ধনে এই দুই প্রকার রান্নাই প্রথা হিসেবে প্রচলিত। মনসামঙ্গলে মহাদেবের কন্যা হয়েও মনসাকে বনবাসী হতে হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই বনে জঙ্গলে যা পেয়েছেন তা দিয়েই হত দরিদ্র মানুষের মতই ক্ষুণ্ণিবৃত্তি নিবারণ করতে হয়েছে দেবীকে। অরন্ধনের মনসা পূজায় শাপলা ফুল এবং রান্নায় ওল, কচুর ব্যবহার হয়তো দেবীর এই করুণ জীবনকে গুরুত্ব দিতেই প্রচলিত হয়েছে। পাশাপাশি প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ জীবনযাপনের অঙ্গ হিসাবে লোকাচারে এই বিশেষ রীতিনীতির প্রচলন সম্ভব।

সাপ মাংসাশী প্রাণী। প্রজাতি ভেদে ইঁদুর, খরগোশ, পাখি, কীটপতঙ্গ, কেঁচো, ব্যাঙ, মাছ, টিকটিকি, ডিম ইত্যাদি এদের খাবার। ভাত তরকারি বা দুধ কলা এরা খায় না। অথচ

সাপেরা ঠাণ্ডা খাবার খায়, এই ভ্রান্ত লোকবিশ্বাস থেকেই সাপের দেবীকে আগের দিন রান্না করা অন্ন ব্যঞ্জন ঠাণ্ডা করে পরিবেশন করা হয়।

অরন্ধনের রান্নার প্রকৃতিতে ও পরিবেশন রীতিতে লোকমানসে মনসামঙ্গলের পরোক্ষ প্রভাব দেখা যায়। চাঁদ বণিকের উগ্র পুরুষকার নারী দেবতাকে হেয় করে দেবীর ক্রোধে সর্বস্বান্ত হয়েছিল। অন্যদিকে সর্বংসহা বেহুলার একনিষ্ঠতা মায়ের আশীর্বাদে ফিরিয়ে এনেছিল ধন জন সহ শ্বশুরের হারিয়ে যাওয়া সবকিছু। তাই লোকসমাজে নারীরা বেহুলার মত একনিষ্ঠ হয়ে প্রায় সারারাত রান্না করে। ঠাণ্ডা খাবারগুলি চিত্তের বিনম্রতার আর রান্নার শেষে ভাতে ও উনুনে জল ঢালা, চাঁদের অহঙ্কারের আগুনে জল ঢেলে দেওয়ার প্রতীকী। তাইতো পরের দিন আর গৃহে আগুন জ্বলে না। বেহুলার লড়াই ছিল স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর তথা বৈধব্যকে হারানোর, তাই অরন্ধনের রান্নার এই বিশিষ্ট লোকাচারে বিধবার প্রবেশ নিষিদ্ধ। নারীরা সাংসারিক কল্যাণের কামনায় পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন সহকারে উদযাপন করে মা মনসার পূজা।

রান্না পূজার খাবার খেতে গ্রামের কোনো মাঠ বা ফাঁকা জায়গায় সকলে মিলিত হবার প্রথা রয়েছে। যে সব পরিবারে অরন্ধনের প্রচলন আছে তারা তো বটেই যাদের প্রতিবেশী যে সকল পরিবারে এ রীতির প্রচলন নেই, তারাও একত্রিত হয়ে সকলের সঙ্গে খাওয়া দাওয়ায় সামিল হন। কোন কোন গ্রামে মুসলিমরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই খাওয়া দাওয়ায় অংশ নেয়। একে অপরের সঙ্গে নিজের নিজের খাবার বিনিময়ের মাধ্যমে এক আনন্দঘন মিলন উৎসব উদযাপিত হয়। তবে শহরে আজকাল আর ফাঁকা জায়গা তেমন পাওয়া যায় না, তাই যারা অরন্ধন পালন করেন, তারা নিজের বাড়িতে প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান, এবং নিজেরাও প্রতিবেশীদের বাড়ি গিয়ে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন। আর খাওয়া দাওয়ায় নারী, পুরুষ তথা পরিবারের সকলের সমানাধিকার। এভাবেই নারীকেন্দ্রিক মনসা পূজার কঠিন উপাচার দিয়ে শুরু হয়ে অরন্ধন শেষ অবধি মানুষের সাথে মানুষের মিলন উৎসবে পরিণত হয়। অরন্ধনে বাস্তুমাতা, সাপের দেবী, জেলে তথা লোকসমাজের রক্ষাকর্ত্রী রূপে মনসাপূজায় একদিকে মঙ্গলকাব্যের কাহিনি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, আবার রান্নার পদের বৈচিত্র্যে মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি একবিংশ শতকের

ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের যুগে এসেও প্রাচীন ঐতিহ্যকে বজায় রেখে মনসা পূজার পাশাপাশি বিপুল আয়োজন সহযোগে রান্না খাওয়াকে কেন্দ্র করে যে মিলন উৎসব উদযাপিত হয়, সৌহার্দ্য সমানুভূতির নিরিখে তা গভীর তাৎপর্যবাহী।

তথ্যসূত্র

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী জেলায় অরন্ধন উদযাপন দেখার অভিজ্ঞতা, এবং যারা এ উৎসব পালন করেন, তাদের কিছু জনের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার -

তথ্যদাতার পরিচয়

১) নাম - সরযূ রায়
পেশা - গৃহবধূ
বয়স - ৮৫
ঠিকানা - গ্রাম শুলংগুড়ি, থানা রাজারহাট উত্তর ২৪ পরগণা ।

২) নাম - চম্পা মালী
পেশা - গৃহবধূ
বয়স - ৪৪
ঠিকানা - মাকড়দহ, ২ নং গ্রাম, হাওড়া।

৩) নাম - সবিতা মালী
পেশা - গৃহবধূ
বয়স - ৯০
ঠিকানা - মাকড়দহ, ২ নং গ্রাম, হাওড়া।

৪) নাম - শিলা রাণী সরকার
পেশা - গৃহবধূ
বয়স - ৭৫
ঠিকানা - সাঁকরাইল, জুগাসা, হাওড়া।

৫) মধুমিতা রায়
পেশা - স্কুল শিক্ষিকা
বয়স - ৩৪
ঠিকানা - সিঙ্গুর, হুগলী।

৬) চামেলি নস্কর

বয়স - ৪০

পেশা - গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - শুলঙ্গুড়ি, থানা - নিউ টাউন, কলকাতা -৭০০১৫৯।

৭) রেবা নস্কর

বয়স - ৩২

পেশা - গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - শুলঙ্গুড়ি, থানা - নিউ টাউন, কলকাতা -৭০০১৫৯।

৮) মিনতি নস্কর

বয়স - ২৬

পেশা - গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - শুলঙ্গুড়ি, থানা - নিউ টাউন, কলকাতা -৭০০১৫৯।

৯) প্রতিমা নস্কর

বয়স - ৫০

পেশা - গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - শুলঙ্গুড়ি, থানা - নিউ টাউন, কলকাতা -৭০০১৫৯।

১০) মেনকা নস্কর

বয়স - ৫৫

পেশা - গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - শুলঙ্গুড়ি, থানা - নিউ টাউন, কলকাতা -৭০০১৫৯।

১১) পদ্ম নস্কর

বয়স - ৭২

পেশা - গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - শুলঙ্গুড়ি, থানা - নিউ টাউন, কলকাতা -৭০০১৫৯।

১২) মীরা নস্কর

বয়স - ৮২

পেশা - গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - শুলঙ্গুড়ি, থানা - নিউ টাউন, কলকাতা -৭০০১৫৯।

আলাবিয়া

এলাকার পরিচয় - রাজারহাট গোপালপুর ব্লক

জনসংখ্যা - ৪০২,৮৪৪ পুরুষ - ২০৩,৯১১ মহিলা - ১৯৮,৯৩৩ শিশু (ছ'বছর পর্যন্ত) - ৩৬,০১৫।

১) জ্যাংড়া, রামকৃষ্ণ পল্লী দক্ষিণ মাঠ, থানা - বাগুইহাটি, পোষ্ট- অশ্বিনী নগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০০৫৯

   জনসংখ্যা - ২৯,২০৮, পুরুষ - ১৫,২১৫, মহিলা - ১৩,৯৯৩, কলকাতা - ৭০০১৫৯।

২) শুলংগুড়ি কলোনি পাড়া, পোস্ট অফিস - গৌরাঙ্গ নগর, থানা - রাজারহাট নিউ টাউন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০১৫৯।

   গ্রামের মোট জনসংখ্যা - ১৩৪৯৬ , পুরুষ - ৬৯৭৮ , নারী - ৬৫১৮ , শিশু - ১৪০৯ (ছ' বছরের নীচে), সকলেই হিন্দু।

আলাবিয়ার সম্ভাব্য ইতিহাস - রাজবংশী সমাজে প্রচলিত মনসা পূজাকেন্দ্রিক একটি বিশিষ্ট লোকাচার *আলাবিয়া* । উপরে উল্লিখিত অঞ্চলে বসবাসকারী কিছু রাজবংশী পরিবারে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এর প্রচলন দেখা যায়। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা যে সব রাজবংশীরা উৎসবের এই ধারা বহন করে চলেছেন, তারা সকলেই পূর্ববঙ্গের ঢাকার আদি বাসিন্দা। সম্ভবত *আলাবিয়ার* সূত্রপাত ঢাকায়। ঢাকার মীরপুর, লবগঞ্জ, কুমারটুলি, সাবাড়, ফুলবেড়িয়া, কুঁদবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের রাজবংশীরা বংশ পরম্পরায় দেবী মনসার পূজা ও পূজা উপলক্ষে *আলাবিয়া* পালন করে থাকেন বলে জানা যায়। সেখানে একদিকে রয়েছে পারিবারিক পূজা আবার পাশাপাশি রয়েছে দুর্গাপূজার মত ধুমধাম সহকারে সর্বজনীন মনসাপূজা। বাংলাদেশের এই বিস্তৃত অঞ্চলের রাজবংশীরা, যারা মনসা পূজায় *আলাবিয়া* পালন করতেন, সকলেই ছিলেন জেলে অথবা মাছ ব্যবসায়ী। কালক্রমে এদের মধ্যে কারো কারো ঠিকানা পাল্টে গেছে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে, পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বদলে গেছে কারো কারো পেশা। আবার কেউ কেউ এপার বাংলায় এসেও নিজের পূর্বপুরুষের পেশা, ব্রত, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস সংস্কার

বজায় রেখেছেন। আবার সময়ের অভাব, পরিবারের প্রাচীনদের মৃত্যু ইত্যাদি কারণে কোনো কোনো পরিবারে মনসা পূজার প্রচলন থাকলেও আলাবিয়া এখন আর পালিত হয় না, সেই সঙ্গে রাজবংশীদের নিজস্ব মনসা গানেরও প্রচলন কমে গেছে অনেকাংশে। পরিবার পরিজনদের সার্বিক কল্যাণ কামনাই এই লোকাচারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে।

পূজা পদ্ধতি - শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসা পূজার সাত দিন আগে নারীরা বিজোড় সংখ্যক (তিন পাঁচ অথবা সাতটি) কচুপাতা পাশাপাশি রাখে। কচুপাতাগুলির ওপর রাখে এক তাল মাটি। সাধারণ মাটির সঙ্গে মেশানো হয় ইঁদুরের গর্তের মাটি। প্রতিটি মাটির তালের ওপর ছড়িয়ে দেয় সোনা মুগের ডাল। তার পর আরেকটি করে কচুপাতা দিয়ে তার ওপর ঢেকে রাখে। দু'দিন পরে বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর থেকে প্রতিদিন সকালে এবং বিকেলে সেখানে স্নান করে ভেজা কাপড়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে, ধূপ দিয়ে প্রণাম করে বাড়ির বৌ - মেয়েরা । সাতদিন পর সংক্রান্তির দিন কচুপাতা সরিয়ে আলাদা আলাদা সরায় মাটির তালগুলি তুলে নেওয়া হয় এবং সরাগুলি মনসা প্রতিমার সামনে সাজিয়ে রাখা হয়। *আলা* শব্দটির বুৎপত্তি এই রকম - অঙ্কুরিত চারাগাছগুলি আঞ্চলিক উপভাষায় জালি নামে প্রচলিত। জালি শব্দটি থেকেই কথ্য উচ্চারণে জালা এবং সেখান থেকেই ক্রমে আলা শব্দটি এসেছে। সরার সংখ্যা অনুযায়ী পাঁচ সাত বা তিনের আলা সম্পর্কে এক এক পরিবারে এক এক রীতি প্রচলিত। অঙ্কুরোদগমের এই প্রক্রিয়া রাজবংশীদের মধ্যে *আলা জাগানো* নামে পরিচিত। কেউ কেউ পাঁচটি সরায় অঙ্কুরিত চারা গুচ্ছ রাখার নিয়ম পালন করেন, একে পাঁচের আলা বলে। একইভাবে সাতের আলায় সাতটি, তিনের আলায় তিনটি মাটির সরা ব্যবহৃত হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই এর মধ্যে দুটি ছোট সরা থাকে, এ দুটিকে ব্যাঙের আলা বলা হয়। সম্ভবত সরার আকৃতির সাথে ব্যঙের চেহারার সাদৃশ্য থেকেই এরূপ নাম এসেছে।

যিনি *আলা* জাগান, তিনিই পূজায় মুখ্য ভূমিকা নেন। শ্রাবণ সংক্রান্তির আগের দিন তার নির্জলা উপবাস। পরের দিন পূজার সমস্ত রীতি নীতি সম্পন্ন হবার পর রাতে তিনি ফল মিষ্টি খেতে পারেন। অর্থাৎ প্রায় দু'দিন সম্পূর্ণ অনাহারে থেকে গৃহস্থ নারী দেবীর আরাধনা করেন। সঙ্গে যোগ দেন পরিবারের অন্যান্য মহিলা ও প্রতিবেশী নারীরা। সংক্রান্তির

আগের দিন নতুন মনসা প্রতিমা আসে গৃহে। মাকে পরানো হয় নতুন শাড়ি, গহনা। সোনা, রূপা, হলুদ, ধান, দূর্বা, কাজল, পাটকাঠি ছুঁইয়ে মায়ের অধিবাস করানো হয়। রাজবংশীরা বিয়ের আগে ঘরের মেয়েকে যেভাবে অধিবাস করান, সেই একই নিয়ম দেবীর অধিবাসের ক্ষেত্রেও কার্যকর। একটি কুলোয় ধান, যব, সাদা সরষে, কাঁচা হলুদ, পান সুপারি, চন্দন, দূর্বা, ঘি, কাজল, শঙ্খ, দর্পণ, সোনা, রূপা, কড়ি, আলতা, সিঁদুর, প্রদীপ, কাঁঠালি কলার ছড়া, ফুল মিষ্টি সাজিয়ে দেবীকে বরণ করা হয়। সেই রাতে দেবীর সামনে দেওয়া হয় দুধ আর কলা। পরদিন ভোরে, কাক ডাকার আগে গঙ্গা বা নিকটস্থ জলাশয় থেকে পূজা ঘটে জল ভরে এনে দেবীর প্রতিমার সামনে রাখা হয়। শুদ্ধ পোশাকে, পবিত্র মনে প্রথমে মনসা প্রতিমায়, তার পর অঙ্কুরিত চারা (আলা) সমেত সরাগুলিতে একে একে ফুলের মালা পরানো হয়। এর পর সরাগুলিকে মাথায় নিয়ে একসঙ্গে মনসা প্রতিমার চারদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়। তার পর চলে ফল ফুল নৈবেদ্য সহকারে পূজা পর্ব। শাস্ত্রীয় মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ কর্তৃক পূজা যজ্ঞাদি সম্পন্ন হয়। নানাবিধ রান্না করে উৎসর্গ করা হয় দেবীর ভোগ। প্রায় ছ'ঘণ্টা ধরে চলে পূজার দীর্ঘ অনুষ্ঠান।

এদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রতিবেশী বাড়ির দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে বর কনে সাজিয়ে উপস্থিত করা হয় দেবীর সামনে, সম্পন্ন হয় বিয়ের প্রতীকী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানই *আলাবিয়া* নামে প্রচলিত। *আলাবিয়ায়* ব্রাহ্মণ লাগে না। এটি সম্পূর্ণ নারী কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান। পৃথক পৃথক সরায় অবস্থিত গুচ্ছ গুচ্ছ চারা গাছ বা আলাগুলি দুটি পিঁড়িতে তোলা হয় , বর ও বধূ দুজনকেই সেই পিঁড়ি মাথায় ধরে বিয়ের যাবতীয় রীতি নীতি তথা আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। *আলা* মাথা থেকে মাটিতে পড়ে গেলে, চরম অমঙ্গলের লক্ষণ বলে বিশ্বাস করেন রাজবংশীরা। তাই মায়েরাই সমগ্র অনুষ্ঠান চলাকালীন মাথার ওপর *আলা* ধরতে ছেলেমেয়েদের সাহায্য করেন। বৌ এর কাপড়ের আঁচলে বর দেন ফুল, খই। সেই আঁচল মুঠোয় নিয়ে বৌ সাতবার প্রদক্ষিণ করে বরকে। ঘুরে এসে বরকে নমস্কার করে, বরের পা ধুইয়ে, নিজের চুল দিয়ে মোছায়। মালাবদল, দিক নমস্কার শেষে উলুধ্বনি দিয়ে ছেলে মেয়ে দুটির মাথা থেকে *আলা* নামিয়ে নেওয়া হয়। ছেলে মেয়ে দুটি

একে অপরকে মিষ্টি খাওয়ানোর মধ্যে দিয়ে শেষ হয় বিয়ের অনুষ্ঠান। *আলাবিয়া* প্রতীকী বিয়ে। তাই ছোট দুটি ছেলে মেয়ে না পাওয়া গেলে দুটি মেয়েকেই বর বৌ সাজিয়ে কাজ চালানো হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানের শেষে *আলায়* ছেটাতে হয় দুধ, দই, গঙ্গাজল ও খই। বিয়ের শেষে সন্ধ্যায় দেবীর পূজা হয় এবং পরের দিন সকালে আবার যথারীতি মনসা পূজা হওয়ার পর *আলা* বিসর্জন দেওয়া হয়। অনেক পরিবারে মনসা প্রতিমার বিসর্জনের দিন ঘরে উনুন জ্বলে না। তবে কোথাও কোথাও কালক্রমে এ নিয়মে শিথিলতা এসেছে। বিসর্জনের জন্য প্রতিমা ঘর থেকে বের করার সময় গোটা হলুদ, ইঁদুরের গর্তের মাটি, সোনা, রূপা পেছন ফিরে ঘরে ছোড়ার নিয়ম রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের *বিষহরা* আর পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের *আলাবিয়া* - প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে মনসা পূজার প্রচলন অত্যন্ত বেশি। প্রায় প্রতিটি কৃষক গৃহেই রয়েছে মনসার থান বা বেদী। দক্ষিণ দিনাজপুরের ফুলঘড়ায় শরৎকালে দুর্গাপূজার পরিবর্তে তিনশো বছরের প্রাচীন মনসা পূজা হয়। দেবী দুর্গার মতই ষষ্ঠী থেকে দশমী চলে পূজার্চনা। এখানকার রাজবংশীদের মধ্যেই প্রচলিত আরেকটি মনসাপূজা কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান *বিষহরা* । এটি লোকাচারপূর্ণ একটি গানের অনুষ্ঠান। বিয়ের দিন সকালে মনসা পূজা ও *বিষহরা* গান অনুষ্ঠিত হবার রীতি *ঠাকুর শান্তি* নামে প্রচলিত। মা মনসার কৃপায় বিবাহ কর্ম যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, ও নবদম্পতির আসন্ন জীবন শান্তিপূর্ণ হয় সেই কামনায় এই অনুষ্ঠান আচরিত হয়। অনেকে বিষহরা অনুষ্ঠানে মানত করেন, কামনা পূর্ণ হলে *ভাসান গান* পরিবেশিত হয়। মনসামঙ্গলের মূল আখ্যান অবলম্বনে এই লোকনাট্য অনুষ্ঠিত হলেও অঞ্চলভেদে পরিবেশিত কাহিনির তারতম্য রয়েছে। মূল গায়েন বা গীদাল *বিষহরা* গানের অনুষ্ঠানে মনসামঙ্গলের দুটি পংক্তি পড়ে ব্যাখ্যা করবেন। বাকিরা গাইবেন ধুয়াপদ, এই ধুয়াপদ গানের ভাবানুযায়ী গায়েনরাই তৈরি করে নেন। শ্রাবণ মাস জুড়ে পূর্ববঙ্গের বরিশালে এবং তার প্রভাবেই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলায় ছড়িয়ে থাকা মহিলাদের ঘরোয়া রয়ানী পাঠেও এই একই ভাবে প্রতি দুই পংক্তি গাওয়ার পর সম্মিলিত ধুয়া গাওয়ার প্রচলন রয়েছে। উত্তর চব্বিশ পরগণার রয়ানীর দলেও *বিষহরা*র মত মুখ্য গায়ক চামর দুলিয়ে প্রথমে দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পালাগান গাইতে শুরু করেন।

রাজবংশী সমাজে দেবী বিষহরী নানা রূপে পূজিতা - সাইটোল বিষহরী, কানী বিষহরী, চলন্তি বিষহরী প্রভৃতি। নৃত্যগীতের সময় ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম মুখা বাঁশি।

রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত মনসা পূজা উপলক্ষে বিয়ের নকল অনুষ্ঠান *আলাবিয়া*, আবার বিয়ের অনুষ্ঠানে মনসা পূজা ও গানের অনুষ্ঠান *ঠাকুর শান্তি* একই ধর্মীয় সাংস্কৃতিক চেতনা তথা লোকবিশ্বাসের দুটি রূপ। এই চেতনার গভীরে রয়েছে বেঁচে থাকার প্রাথমিক শর্তপূরণের আকাঙ্ক্ষা। ফসল তথা খাদ্যের নিরাপত্তা, বংশবিস্তারের নিরাপত্তা, আবার সাপের কামড়ের হাত থেকে বাঁচার নিরাপত্তার কামনাই রাজবংশী সমাজে প্রচলিত মনসাসংস্কৃতির এই ধারাগুলির মূল।

আলাবিয়ায় প্রজনন, কৃষি ও লোক বিশ্বাসের সমন্বয় - *আলাবিয়ার* বীজ বপন, ও আলা বা চারার অঙ্কুরোদগম একদিকে যেমন প্রজনন ও সন্তানের জন্মের প্রতীকী আবার বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য খাবারের ফলনেরও প্রতীকী। আবার মনসা পূজা উপলক্ষে যে নকল বিয়ের আয়োজন, তাও লোকজীবনে প্রজননের নিরাপত্তা তথা নির্বিঘ্নে সন্তান জন্মের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন বলেই মনে হয়। লোকবিশ্বাস মতে বিবাহিতা মেয়েদের পক্ষে সাপের স্বপ্ন শুভ। এখানেও মেয়েদের গর্ভবতী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত ও সেই সঙ্গে সাপকে প্রজনন তত্ত্বের সঙ্গে জুড়ে এক রহস্যময় ভাবনার পরিচয় পরিস্ফুট হয়। *আলাবিয়ায়* প্রজনন ও কৃষির সঙ্গে সাপের দেবী মনসার এই যোগাযোগ প্রাকৃতিক কারণেই ঘটেছে। চাষী জেলেদের জলে জঙ্গলে সাপের কামড়ের আশঙ্কায় বাড়ির মেয়েরা সাপের দেবীর কাছে তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করবে এটাই স্বাভাবিক। সেই সঙ্গে কৃষকের বহু আকাঙ্ক্ষিত শস্য নির্বিঘ্নে বেড়ে উঠুক এই কামনাও একাত্ম হয়েই থাকে। আবার সিজ গাছকে যখন মনসার প্রতিরূপ হিসাবে ধরা হয়, তখন বাঙালী চেতনায় বৃক্ষপূজার সংস্কার লক্ষ্য করা যায়।

আলাবিয়া পালনের জন্য গ্রামের নারীরা সমবেত হয়ে দলবদ্ধভাবে কাজ করেন। এই উৎসবের উদযাপনে লোকসমাজে প্রতিফলিত হয় ভক্তি, নিষ্ঠা পারস্পরিক সহযোগিতা, সমানুভূতি তথা মনসা সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত এক সার্বিক কল্যাণ চেতনা। আবার *আলাবিয়ার*

বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রদক্ষিণের পর বরের পা ছুঁয়ে বৌ এর প্রণাম, বৌএর হাতে বরের পা ধোয়ানো, বৌএর চুল দিয়ে বরের পা মোছানো, এই সব আচারে পুরুষতন্ত্রের উগ্র রূপ যুগ যুগ ধরে প্রবহমান, পাশাপাশি এই জাতীয় লোকাচারে শিশুমনে যে অসাম্যের শিক্ষা গেঁথে দেওয়া হয়, তা উৎসবের নেতিবাচক দিককে প্রতিপন্ন করে।

তথ্যসূত্র

তথ্যদাতার পরিচয়

১) অনিতা রাজবংশী

বয়স - ৩০

পেশা - গৃহবধূ

ঠিকানা - শুলঙ্গুড়ি কলোনি, পোস্ট অফিস - গৌরাঙ্গ নগর, থানা রাজারহাট, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

২) পার্বতী রাজবংশী

বয়স - ৬৫

পেশা - দিন মজুর

ঠিকানা - শুলঙ্গুড়ি কলোনি, পোস্ট অফিস - গৌরাঙ্গ নগর, থানা রাজারহাট, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

৩) গীতা রাজবংশী

ঠিকানা - জ্যাংড়া, রামকৃষ্ণপল্লী দক্ষিণ মাঠ, থানা - বাগুইআটি, পোষ্ট- অশ্বিনী নগর উঃ চব্বিশ পরগণা।

বয়স - ৪৫

পেশা - রান্নার কাজ করেন।

৪) দ্রৌপদী রাজবংশী

ঠিকানা - জ্যাংড়া, রামকৃষ্ণপল্লী দক্ষিণ মাঠ, থানা - বাগুইআটি, পোষ্ট- অশ্বিনী নগর উঃ চব্বিশ পরগণা।

বয়স - ৪৮

পেশা - গৃহবধূ।

৫) বিমলা রাজবংশী

ঠিকানা - জ্যাংড়া, রামকৃষ্ণপল্লী দক্ষিণ মাঠ, থানা - বাগুইআটি, পোষ্ট- অশ্বিনী নগর উঃ চব্বিশ পরগণা।

বয়স - ৩৮

পেশা - গৃহবধূ।

৬) ময়না রাজবংশী

ঠিকানা - জ্যাংড়া, রামকৃষ্ণপল্লী দক্ষিণ মাঠ, থানা - বাগুইআটি, পোষ্ট- অশ্বিনী নগর উঃ চব্বিশ পরগণা।

বয়স - ৪০

পেশা - দিন মজুর।

ভেলা ভাসানো উৎসব

এলাকার পরিচয় -

১) গ্রাম দঃ বুধোখালি, পোস্ট মধুখালি, থানা ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগণা

মোট জনসংখ্যা : ৮৭৫ জন, মহিলা - ৫০০,পুরুষ - ৩৭৫, শিশু -প্রায় ১০৫

ধর্ম : গ্রামের সকলেই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত

২) দশের ঘেরি, গ্রাম-দঃ রায়পুর, পোষ্ট - ঘেরি রায়পুর, থানা - ঢোলাহাট, ৭৪৩৩৪৯, দঃ ২৪ পরগণা

মোট জনসংখ্যা - ৬৫৯, পুরুষ - ৩৫৩, মহিলা - ৩০৬, শিশু ৫৪

ধর্ম - হিন্দু

৩) এগারোর ঘেরি, গ্রাম-দঃ রায়পুর, পোষ্ট - ঘেরি রায়পুর, থানা - ঢোলাহাট, ৭৪৩৩৪৯, দঃ ২৪ পরগণা

মোট জনসংখ্যা - ৭৩৩, পুরুষ - ৩৬২, নারী - ৩৭১, শিশু- ৯৬

হিন্দু - ১৯ জন

মুসলমান - ৬৪০

ভেলা ভাসানো উৎসবের প্রচলন - ক্যানিং থানার অন্তর্গত বুধোখালি গ্রাম। আদিবাসী এবং বাগদি সম্প্রদায়ভুক্ত দেড়শ পরিবার এখানে বসবাস করেন। এদের সকলেই চাষের কাজ

করেন, সকলেরই পদবী সর্দার। বিশ্বাসে সংস্কারে লোকাচারে এদের প্রধান আরাধ্য দেবী মনসা। প্রতিটি বাড়িতেই রয়েছে মনসার থান ও থানের পাশেই সিজমনসা গাছ। থানটি কেবল মাটির ছোট ছোট তিনটি ঢিপি। ওই ঢিপি তিনটিই দেবী মনসার প্রতিরূপ। পাশেই আরেকটি বড় ঢিপি রয়েছে। বড় ঢিপিটি মহাদেবের প্রতিরূপ। এভাবেই একেবারে সরল অনাড়ম্বর রূপে বুধোখালির প্রতি গৃহে দেবী মনসার অবস্থান। ভাদ্র সংক্রান্তিতে অরন্ধন সহকারে দেবীর বাৎসরিক পূজার প্রচলন বাংলার বহু অঞ্চলের মত এখানেও রয়েছে। সেই সঙ্গে গৃহের সন্নিকটস্থ পুকুরে দুধকলা ও ফল দিয়ে প্রতি শনি মঙ্গলবার দেবী মনসার কাছে সংসারের কল্যাণ কামনা করে কলার ভেলা ভাসানো হয়। কিছু বছর আগে এই পারিবারিক লোকাচার সর্বজনীন রূপ পায় একটি বিশেষ ঘটনার প্রভাবে। হঠাৎই (স্থানীয় অধিবাসীদের কথায় ২০০১ সালে) এই এলাকায় সাপের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। কয়েক জনের মৃত্যুও হয় সাপের কামড়ে। একই সঙ্গে গৃহস্থ নারীদের হাতের লাল পলায় সাপের ফণার চিহ্ন দেখা যায়। এই সময়ই গ্রামের কর্তা ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে মনসা পূজা করা এবং স্থানীয় মাতলা নদীতে ভেলা ভাসাবার সিদ্ধান্ত নেন। নির্দিষ্ট দিনে ভাদ্র সংক্রান্তির মনসা পূজার আগেই বিপর্যয় প্রতিরোধে ২৯শে শ্রাবণ মনসা পূজা ও ভেলা ভাসানো হয়। তাই শ্রাবণ মাসের বুধোখালির এই পূজা অকাল বোধন মনসা পূজা নামে পরিচিত হয়। গ্রামের অধিবাসীদের কথায় অকাল বোধন মনসা পূজা ও ভেলাভাসানোর এই উৎসব পালিত হওয়ার পর আশ্চর্যজনকভাবে সাপের প্রাদুর্ভাব কমে যায়। তখন থেকেই প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে সাধ্যমত ঘটা করে বুধোখালির এই আদিবাসী সম্প্রদায় সর্বজনীন মনসা পূজা ও ভেলাভাসানোর উৎসব পালন করে আসছে।

বুধোখালির মনসা সংস্কৃতি ও ভেলা ভাসানোর পদ্ধতি - প্রতিটি বাড়িতে মনসার থান ছাড়াও গ্রামেই রয়েছে মনসার মূল থান। গ্রামের অধিবাসীরা জানান থানটি শতাধিক বছরের পুরানো। বর্তমানে এই থানটি সংস্কার করে পাকা মন্দির করা হয়েছে। এখানে রয়েছে মনসার মাটির প্রতিমা। ২৯শে শ্রাবণ এই থানেই ব্রাহ্মণ ডেকে মনসা পূজা দেওয়া হয়। অরন্ধনের সকল নিয়ম মানা হয় এই পূজাতেও। অর্থাৎ পূজার আগের দিন রান্না, পরের দিন সেই রান্না করা খাবার, বা পান্তা খাওয়া। সেদিন বাড়িতে কোন আগুন জ্বলবে

না, রান্না হবে না। বুধোখালি ছাড়াও নিকটস্থ মধুখালি আর ভবেশ মণ্ডল পাড়ার সকলে জড় হয় মূল থানের পূজা প্রাঙ্গনে। পূজা শেষে ভ্যানে করে প্রতিমা সহ পূজার যাবতীয় আয়োজন নিয়ে ঢোল করতাল ইত্যাদি বিভিন্ন বাদ্য সহযোগে যাওয়া হয় মাতলা নদীতে। নদীতীরে প্রথমে গঙ্গা পূজা হয় তার পর আবার মনসা পূজা হয়। কলার ভেলায় দেবী মনসার মূর্তি, ঘট, সিজ ডাল দিয়ে ধূপ দীপ নৈবেদ্য সাজিয়ে ভেলা ভাসানো হয়। সম্মিলিত সকলে দেবী মনসার কাছে প্রতিবেশী গ্রামগুলির মধ্যে ঐক্য, সেই সঙ্গে পারিবারিক কল্যাণ কামনা করেন।

ভর : গ্রামীণ লোকবিশ্বাস ও ভেষজ চিকিৎসা - লোকবিশ্বাস অনুযায়ী ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত কোন বিশেষ ব্যক্তির বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে এক অতিলৌকিক বোধ প্রাপ্ত হওয়া এবং নানাভাবে সাধারণের সমস্যার সমাধান করার যে প্রচলন গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়, তাই ভর। বুধোখালি গ্রামে বিখ্যাত প্রয়াত সুসাঙ্গিনী সর্দার। পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় উনি মনসার থানে *ভর* হতেন। প্রতি শনি মঙ্গলবার দূর দূর থেকে আসা মানুষের সমস্যা সমাধান করতেন ইনি, দিতেন নানা রোগের ওষুধ। এমনকি স্থানীয় সাপের কামড়ে আক্রান্ত ব্যক্তিও তার দেওয়া ওষুধেই সুস্থ হতেন এমনই মত গ্রামবাসীদের। বুধোখালির মনসার মূল থানটি বর্তমানে ভারত সেবাশ্রমের শাখার অন্তর্গত। এই শাখার মালিক সুসাঙ্গিনীর পুত্র বিট্টু সর্দারের স্ত্রী তিথি সর্দার গ্রামবাসীর মধ্যে শিক্ষার অভাব ও কুসংস্কারের কথা বলেন। দেবী মনসা এবং তাকে কেন্দ্র করে প্রচলিত সংস্কারের প্রতি ভক্তি রেখেই তিথি বলেন পলায় সাপের চিহ্ন ফুটে ওঠার মত সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ঘটনা সম্ভবত সাপের কামড়ের ভীতির সঙ্গে যুক্ত অশিক্ষিত মানুষের মানসিক বিকারেরই ফল। তার মতে তার শাশুড়ি মা সুসাঙ্গিনী দেবী ভেষজ কিছু মূল্যবান ওষুধ জানতেন, যা দিয়ে তিনি মানুষকে সুস্থ করতেন। সাপের কামড়ে আক্রান্তকে সুস্থ করতে তিনি যে গাছটি ব্যবহার করতেন, তার স্থানীয় নাম শিবজটা। অ্যান্টি ভেনাম সিরামের পাশাপাশি এই গাছটির যদি মানুষের শরীরে সাপের বিষমুক্ত করায় প্রকৃতই কোনও ভূমিকা থাকে, তাহলে তা অবশ্যই বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়।

দঃ রায়পুরের ভেলা ভাসানোর সূত্রপাত - ডায়মণ্ডহারবারের রায়চক গ্রাম , পাথরপ্রতিমা ব্লকের দঃ রায়পুর ভেলা উৎসবের জন্য বিখ্যাত। দক্ষিণ রায়পুরের ৬এর ঘেরি, ৭এর ঘেরি, ৩এর ঘেরি, পিঁপড়েখালি, ১৩নম্বর, ১০এর ঘেরি, ১১র ঘেরি পাশাপাশি অবস্থিত সবগুলি গ্রামেই ভাদ্র মাসের শনি মঙ্গলবার সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় মনসা পূজা ও ভেলা ভাসানোর উৎসব। সাপে কামড়ের প্রাদুর্ভাব থেকে বাঁচতেই এই উৎসবের শুরু হয়েছিল সর্বত্র। দক্ষিণ রায়পুরে দশের ঘেরির মনসা পূজাকে ঘিরে ভাসান উৎসব প্রায় চল্লিশ বছরের প্রাচীন। তবে পাশাপাশি অন্যান্য গ্রামগুলিতে পরবর্তীকালে এই ভেলা উৎসবের সূত্রপাত। সেক্ষেত্রে সর্পভীতি অপেক্ষা বিনোদনই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভেলা উৎসবের রীতিনীতি - ভেলা বানানো নিয়ে চলে গ্রামগুলির মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই। গ্রামের ছেলেরাই শোলা দিয়ে বানায় ভেলা। ২০১৮ সালে ৩এর ঘেরি গ্রামে বানানো হয়েছিল স্বর্ণ মন্দিরের আদলে বিশালাকার ভেলা। ভেলার মধ্যে দেওয়া হয় একটি প্রদীপ, যেটা একটি হাড়ি বা মালসার মধ্যে রাখা থাকে। মনসার ঘট, সিজ মনসার ডাল, দেবীর ছবি বা প্রতিমা, পূজার পর তুলে দেওয়া হয় ভেলায়। সঙ্গে থাকে নৈবেদ্য তথা পূজার যাবতীয় উপাচার। দশের ঘেরি, তিনের ঘেরি গ্রামে বিষধর সাপদের সংগ্রহ করা হয় কয়েক মাস আগে থেকেই। কেউটে, গোখরো ইত্যাদি বিষধর সাপদের ধরে তাদের বিষ দাঁত ভেঙে আটকে রাখা হয়। তার পর ভেলা নিয়ে গ্রামের পথে যাওয়ার সময় গ্রামের ছেলেরাই একাধিক বিষাক্ত সাপ গলায় ঝুলিয়ে উচ্চগ্রামে বাজতে থাকা মাইকের সঙ্গে উদ্দাম নাচতে নাচতে নদীর দিকে এগিয়ে যায়। স্থানীয় সুতারবাগ নদীতে ভেলা ভাসানো হয়। ভেলায় পূজার উপাচারের সামনেই দেওয়া হয় বিষাক্ত সাপগুলিকে। ক্যানিং এর বুধোখালির মতই গোসাবা, কুলতলি, পাথরপ্রতিমার সব গ্রামেই ভেলা ভাসানোর দিন অরন্ধন পালিত হয়।

জলে জঙ্গলে পূর্ণ সুন্দরবন তথা দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রত্যন্ত গ্রামগুলির সাধারণ মানুষেরা সাপের ভয় থেকেই মূলত মনসাপূজা করেন। সেই সঙ্গে বহু বছরের মনসামঙ্গলের ঐতিহ্যও যুক্ত হয়ে আছে এই অঞ্চলের লোকচেতনায়। ফলে সাপের উপদ্রব বাড়লে, পূজার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক আচরণীয় অনুষ্ঠানও বাড়ে। এভাবেই মনসা পূজার সঙ্গে যুক্ত

হয়েছে ভেলা বা মান্দাস ভাসানোর উৎসব। আদিবাসীরাই এই উৎসবের সূচনা করেছিল বলে জানা যায়। তবে সুন্দরবনে ভেলা ভাসানো দেখতে হিন্দুদের পাশাপাশি কাছে দূরের গ্রাম থেকে মুসলিমরাও আসে। ফলে রূপ পায় এক সাংস্কৃতিক সমন্বয়। কালক্রমে শহুরে আধুনিকতা থেকে দূরে থাকা মানুষগুলির কাছে বিনোদনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় এই ভেলা উৎসব। এই বিনোদনের মাত্রা বাড়াতেই ভেলা নিয়ে যাবার সময় বাজে উচ্চগ্রামে মাইক। মাইকের সেই প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সমবেত বহু মানুষের উদ্দাম উল্লাস লোকসংস্কৃতির বিকৃতিকেই প্রকট করে। তাছাড়া প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করে বেআইনি ভাবে বিষধর সাপদের আটকে রাখায় পরিবেশের ক্ষতির দিকটি কিন্তু অবহেলিতই হয়।

মনসামঙ্গল কাব্যে মৃত স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে বেহুলা ভেসেছিল কলার ভেলায়। এই অনুষঙ্গেই দেবী মনসার পূজার সাথে সাড়ম্বরে ভেলা ভাসানোর রীতির প্রচলন হয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা সহ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। বিশেষত গোসাবা, কুলতলি, পাথরপ্রতিমা সহ বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে ভাদ্র মাসে মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে ভেলা ভাসানোর উৎসবের প্রচলন অত্যন্ত বেশি। পশ্চিমবঙ্গের নিকটবর্তী ওড়িশাতেও মনসা পূজার সাথে ভেলা ভাসানো উৎসব জাঁকজমক সহকারে পালিত হয়। ঐতিহ্যবাহী *মনসার পালাগান* বা *মনসা যাত্রায়* বেহুলার এই ভেসে চলাকে প্রাধান্য দিতে কোথাও কোথাও মঞ্চের নিকটবর্তী জলাশয়ে এই ভাসান পর্ব অভিনীত হয়। প্রান্ত বঙ্গীয় লোকচেতনায় গভীর ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে নারীর সতীত্ব, ত্যাগ, একাগ্রতা তথা কল্যাণী ভাবমূর্তির প্রতীকী মনসামঙ্গলের *ভাসান পর্ব*। মনসা পূজা উপলক্ষে নদীবক্ষে কলার ভেলা ভাসানোয় ধরা আছে সেই চেতনার প্রত্যক্ষ রূপ।

নৌকা বাইচ - বেহুলার ভেসে চলার সূত্র ধরে যেমন ভেলা ভাসানো উৎসবের সূত্রপাত, তেমনই মনসা পূজার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবেড়িয়া জেলায় মনসা পূজা উপলক্ষে ১লা ভাদ্র তিতাস নদীতে চলে আসছে বিখ্যাত নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। পাইকগাছায় স্থানীয় উলুবুনিয়া নদীতে, ঢাকার ধামরাই উপজেলার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া গাজীখালি নদীতে, কুমিল্লায় মেঘনা নদীতে মনসা পূজা উপলক্ষে নৌকা বাইচের এই ঐতিহ্য প্রবহমান। পরবর্তীকালে নৌকা বাইচ অন্যান্য পূজা

বা অনুষ্ঠানের সঙ্গে অথবা একক বিনোদন রূপেও নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এই নৌকা বাইচের সময় মাঝি মাল্লারা সমবেত কণ্ঠে যে গান গায়, তা *সারি গান* নামে অভিহিত। নৌকার মধ্যে ঢোল তবলা নিয়ে গায়েনরা গানে গানে উৎসাহ দেন মাঝিদের। নৌকা বাইচের সূত্রপাত যেহেতু মনসা পূজা তথা মনসামঙ্গলের কাহিনির অনুষঙ্গে ঘটেছিল, তাই এর সঙ্গে যুক্ত লোকগানগুলিও পরোক্ষ ভাবে মনসা সংস্কৃতির ফসল -

কোন মিস্তিরি নাও বানাইলো কেমন দ্যাখা যায়
ঝিল মিল ঝিল মিল করে রে ময়ূরপঙ্খী নায়
চন্দ্র সূর্য বান্ধা আছে নাওয়েরই আগায়
দূরবীনে দেখিয়া পথ মাঝি মাল্লায় গায়
ঝিল মিল ঝিল মিল করে রে ময়ূরপঙ্খী নায়
... ...

[শাহ আব্দুল করিম]

তথ্যসূত্র

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

তথ্যদাতা পুরুষ

১) নাম - আশুতোষ সর্দার
ঠিকানা - গ্রাম দঃ বুধোখালি, পোস্ট মধুখালি, থানা ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগণা
বয়স - ৪২
পেশা - দিনমজুর।

২) নাম - বিট্টু সরদার
ঠিকানা - গ্রাম দঃ বুধোখালি, পোস্ট মধুখালি, থানা ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগণা
বয়স - ৪০
পেশা - মালিক, বুধোখালি ভারত সেবাশ্রম।

৩) শেখর মণ্ডল
বয়স - ৩৯
পেশা - বেসরকারি কোম্পানিতে মার্কেটিং এর কাজে যুক্ত
ঠিকানা - গ্রাম+ পোস্ট দঃ রায়পুর, ৩নং ঘেরি, মণ্ডল পাড়া, থানা - ঢোলাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

৪) নাম - সুখেন নস্কর

বয়স - ৩৩

পেশা- ইলেকট্রিক মিস্ত্রী

ঠিকানা - গ্রাম+ পোস্ট দঃ রায়পুর, ১১ নং ঘেরি, থানা - ঢোলাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

৫) নাম- সুবীর ঘরামী

বয়স - ৬২

পেশা - কৃষক

ঠিকানা - গ্রাম+ পোস্ট দঃ রায়পুর, ১০ নং ঘেরি, থানা - ঢোলাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

৬) নাম - দীপক হালদার

বয়স - ৩৫

পেশা - কৃষক

ঠিকানা - গ্রাম+ পোস্ট দঃ রায়পুর, ১০ নং ঘেরি, থানা - ঢোলাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

মহিলা

১) নাম - চঞ্চলা সর্দার

ঠিকানা - গ্রাম দঃ বুধোখালি, পোস্ট মধুখালি, থানা ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগণা।

বয়স - ২১

পেশা - গৃহবধূ

২) নাম - সুমিত্রা সর্দার

ঠিকানা - গ্রাম দঃ বুধোখালি, পোস্ট মধুখালি, থানা ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগণা।

বয়স - ৪৩

পেশা - গৃহবধূ

৩) নাম - তিথি সর্দার

ঠিকানা - গ্রাম দঃ বুধোখালি, পোস্ট মধুখালি, থানা ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগণা

বয়স - ২৩

পেশা - শিক্ষিকা, ইংরাজি মাধ্যম প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভারত সেবাশ্রম, বুধোখালি।

৪) নাম - বাসন্তী সর্দার

ঠিকানা - গ্রাম দঃ বুধোখালি, পোস্ট মধুখালি, থানা ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগণা

বয়স - ৫০

পেশা - জনমজুর।

৫) নাম - কনিকা নস্কর

বয়স - ৫০

পেশা - গৃহকর্ম করেন

ঠিকানা - গ্রাম+ পোস্ট দঃ রায়পুর, ১১ নং ঘেরি, থানা - ঢোলাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

৬) নাম - মল্লিকা হালদার

বয়স - ২৮

পেশা - গৃহকর্ম করেন

ঠিকানা - গ্রাম+ পোস্ট দঃ রায়পুর, ১০ নং ঘেরি, থানা - ঢোলাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

৭) স্নেহলতা ঘরামি

পেশা - অঙ্গনওয়ারী কর্মী

বয়স - ৫৫

ঠিকানা - গ্রাম+ পোস্ট দঃ রায়পুর, ১০ নং ঘেরি, থানা - ঢোলাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

৪) প্রতিমা পুরকাইত

বয়স - ৫৪

পেশা - অঙ্গনওয়ারী সহায়িকা

ঠিকানা - গ্রাম+ পোস্ট- কাওড়াখালি, ১১ নং ঘেরি, থানা - ঢোলাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

মনসাদ্বীপের মনসা পূজা ও নাগমেলা

এলাকার পরিচয় -

সাগর ব্লক

আয়তন - ২৮২.১১ বর্গ কিলোমিটার

মোট জনসংখ্যা - ২১২,০৩৭

সাব ডিভিশন - কাকদ্বীপ

জেলা - দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

১) মনসাদ্বীপ

মোট জনসংখ্যা - ৬,২০৬ পুরুষ - ৩,২০৬ মহিলা - ৩০০০ পরিবার ১,২২৪

২) ধবলাট

মোট জনসংখ্যা - ৬৭৭৮, পুরুষ - ৩,৪৯৬ মহিলা - ৩,২৮২ পরিবার ১,৫৩৬

৩) গঙ্গাসাগর

মোট জনসংখ্যা - ১০,৩৪০ পুরুষ - ৫,২২৮ মহিলা - ৫,১১২ পরিবার - ২,০৩০

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরের কূলবর্তী প্রায় তিনশ বর্গকিলোমিটার বেষ্টিত সাগর দ্বীপ। সাগর দ্বীপের দক্ষিণে হুগলী নদী আর বঙ্গোপসাগরের সঙ্গম স্থলে হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থস্থান গঙ্গাসাগর। মোট ৪৩ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত এই দ্বীপে গঙ্গাসাগর মেলার পরেই আরেকটি অতি বিখ্যাত মেলা হল মনসা দ্বীপের *নাগ মেলা*। মনসা দ্বীপের আয়তন প্রায় পনের বর্গকিলোমিটার। স্থানীয় প্রাচীনদের মত অনুসারে মনসা দ্বীপের নামকরণের পেছনে যে ধর্মীয় চেতনা কার্যকর তা এই রকম – কপিল মুনি জঙ্গলাকীর্ণ নিম্নভূমির পূর্ব দক্ষিণ অংশের দক্ষিণে সমুদ্র তীরে সাধনা করেছিলেন, এই নিম্নভূমি তথা পাতালই গঙ্গাসাগর। আর পাতালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার অবস্থান বলেই গঙ্গাসাগরের নিকটেই মনসাদ্বীপের নামকরণ। তবে এই ব্যাখ্যার যাথার্থ্যতা যাই হোক না কেন, সমগ্র সাগর দ্বীপে মনসা পূজার ব্যাপক প্রচলনে একথা মনে হয় যে মনসাদ্বীপ নামটি দেবী মনসার মাহাত্ম্য প্রভাবিত স্থানীয় লোকবিশ্বাস তথা লোকচেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

মনসা দ্বীপের পূজার ইতিহাস - ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে মনসাদ্বীপের প্রথম মনসা পূজার প্রচলন হয়, উত্তর পূর্ব মনসা পাড়ার পুরুষোত্তমপুরে প্রতিষ্ঠিত মনসা মন্দিরে। পরবর্তীকালে ১৯৮০ সালে হঠাৎই মনসাদ্বীপে সাপের কামড়ের উপদ্রব অত্যন্ত বেড়ে যায়। ফলে প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়। তৎকালীন মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ সিদ্ধিতানন্দজী এই অঞ্চলে নাগ তথা মনসা পূজার পরামর্শ দেন। ডাক্তার শিবেন্দু রায়, যিনি চিকিৎসা করে এই সময় অনেক সাপে কাটা রুগী ভালো করেছিলেন, তিনিও মহারাজের পরামর্শে সহমত হন। সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমি সংরক্ষণ বিভাগে চাকুরিজীবী সীতানাথ মাইতি, স্থানীয় ধর্মপ্রাণ অবন্তি মান্না নাগ ও মনসা পূজার প্রচলনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের শিক্ষক পণ্ডিত দিবাকর পাণিগ্রাহী তখন ওড়িশা গিয়ে সেখানকার মোহান্তদের কাছ থেকে নাগ পূজা পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে আনেন। এবং সেই রীতি মেনেই মনসাদ্বীপে স্থানীয় পুরোহিতদের দ্বারা নাগরাজ বাসুকি ও মনসামাতার পূজা

শুরু হয়। আশ্চর্যজনক ভাবে প্রথম বছর পূজা হওয়ার পর থেকেই এই অঞ্চলে সাপের কামড়ের উপদ্রব বহুলাংশে কমে যায় বলে জানান প্রবীণ গ্রামবাসীরা। প্রথমে তিন বছরের মানসিক পূজার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক এই পূজার সুফল লোকসমাজে এতখানি প্রভাব ফেলে, যে কেবল মনসাদ্বীপ নয়, সমগ্র সাগরবাসী এগিয়ে এসে এই পূজাকে স্থায়ী ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। আজও এ অঞ্চলে সাপে কামড়ালে গ্রামের মানুষ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবার আগে দেবী মনসার নামে টাকা গুছিয়ে রেখে রুগীর আরোগ্যের কামনা করেন, রুগী সুস্থ হয়ে ফিরে এলে মা মনসার পূজা করেন ভক্তিভরে। আজও বিজ্ঞান চেতনার পাশাপাশি দৈবী বিশ্বাসের এক মিশ্র সংস্কার সাগরদ্বীপের লোকসমাজে কার্যকর।

স্থানীয় সম্পন্ন ব্যাক্তি ও প্রশাসনিক সাহায্যে দিনে দিনে বাড়তে থাকে পূজার প্রসার। অষ্টনাগ নাগিনী সহ বাসুকি ও মনসা মাতার পূজার সঙ্গে যুক্ত হয় গঙ্গামাতা, গণপতি, সাগরেশ্বর মহাদেব জীউ, যোগমায়া দেবী, বিশালাক্ষী মাতার ষোড়শোপচারে পূজা এবং সত্যনারায়ণের পূজা ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান। জন মনোরঞ্জনে পূজার সঙ্গে যুক্ত হয় মেলা, যা নাগমেলা নামে প্রচলিত। অত্যাধুনিক আলোকসজ্জা, নাগরদোলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যাত্রানুষ্ঠান। সরকারি উদ্যোগে নাগমেলা প্রাঙ্গণ সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যায়নের কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছে। এই নাগ ও মনসা পূজার প্রসার যেভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে তাও বিস্ময়কর। কারণ মেদিনীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার নামখানা, মুসৌরি, ইত্যাদি কাছাকাছি অঞ্চল থেকে তো বটেই বর্তমানে রাজস্থান, মধ্য ভারতের নানা প্রান্ত থেকে অসংখ্য ভক্তের সমাগম হয় এই পূজা ও মেলা উপলক্ষে। এমনকি কোন কোন বছর সুদূর আমেরিকা থেকে লোক সমাগম হয় এই *দ্বিতীয় গঙ্গাসাগর মেলা* বলে খ্যাত নাগমেলা প্রাঙ্গণে। অষ্টনাগ সহ বাসুকি পূজার দিন আগত ভক্তের সংখ্যা হয় লক্ষাধিক। পূজা ও মেলা প্রাঙ্গন আগত ভক্তের পক্ষে একেবারে অকুলান হয়ে পড়ে।

পূজা পদ্ধতি - প্রতি বছর কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে সপ্তাহকাল ব্যাপী এই পূজা ও মেলার আয়োজন হয়। ২০১৯ সালে এই পূজার ৪০তম বর্ষে বুলবুল ঝড়ের দুর্যোগের ফলে এক মাস পিছিয়ে যায় অনুষ্ঠান পর্ব। সে বছর ৩০এ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ (ইং ১৭/১২/২০১৯)

থেকে ৫ই পৌষ ১৪২৬ (ইং ২২/১২/২০১৯) পর্যন্ত মনসাদ্বীপের নাগ সরোবর প্রাঙ্গণে চলে নাগ ও মনসা মাতার পূজা ও মেলা উৎসব। প্রথম দিন পুণ্য তীর্থ গঙ্গাসাগর থেকে শোভাযাত্রা সহকারে *ঘট উত্তোলন*। এদিন সকালে মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত দশ জন পুরোহিত শাস্ত্রীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানের পালনের মাধ্যমে সাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দুটি বড় পিতলের কলসি এবং কয়েকটি মাঝারি মাপের মাটির কলসি নিয়ে তারা যাত্রা করেন। বড় একটি ঝুড়িতে একজন মাথায় নেন পঞ্চপল্লব, পান সুপারি, হরিতকী, বেলপাতা, কাটারি, ঠোঙায় আতপ চাল, বাতাসা, ফুল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপাচার। মন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয় বাজনার দল। সাগর ব্লকের উত্তর হারাধনপুরের এই বাজনার দলটি বহু বছরের পুরনো, এবং দলের সদস্যদের জীবন জীবিকায়ও দেবী মনসার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রভাব ক্রিয়াশীল। বাদকদের দলের নাম – *মা মনসা বাজনা পার্টি (উত্তর হারাধনপুর, সাগর)*। ঢোল, সানাই, খঞ্জনি, বাঁশি, খোল, করতাল, হারমনিয়াম, সহযোগে শোভাযাত্রা অগ্রসর হয়। বেশ কয়েকটি মোটর ভ্যানে পুরোহিতেরা, পূজার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকরা এবং বাজনার দল শোভাযাত্রার অগ্রভাগে থাকে। মনসাদ্বীপ গ্রামের প্রতিটি পরিবারের শিশু, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী প্রায় সকলেই নতুন বা ভালো পোশাক পরে শোভাযাত্রায় আনন্দে যোগ দেন। সারিবদ্ধভাবে এরা পুরোহিতদের পেছনে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে শঙ্খধ্বনি করতে করতে যাত্রা করে।

গঙ্গাসাগরে পৌঁছে পুরোহিতেরা সাগর তীরে একটি স্থান নির্বাচন করেন ঘট স্থাপন ও শাস্ত্রীয় বিধি বিধান পালন করবার জন্য। প্রথমে ছোট ঘড়ায় সাগর থেকে জল এনে, সেই জল ছিটিয়ে নির্দিষ্ট স্থান শুদ্ধিকরণ হয়। তার পর দুটি ধোয়া কলাপাতা মাটিতে রেখে তার ওপর বড় পিতলের কলসি দুটি স্থাপন করা হয়। কলসি দুটির ওপরে রাখা হয় দুটি নতুন গামছা এবং পঞ্চপল্লব। তারপর নতুন ধুতি গেঞ্জি পরিহিত পুরোহিতেরা কাঁধে নতুন গামছা নিয়ে সাগরের হাঁটু পর্যন্ত জলে নেমে শাস্ত্রীয় মন্ত্র উচ্চারণ সহ বিবিধ ক্রিয়াকলাপ শুরু করেন। প্রথমে কাটারি দিয়ে জল কেটে ধূপকাঠি, ফুল সহ নানাবিধ উপাচার দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে দেবী গঙ্গার আরাধনা হয়। তারপর জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে প্রায় আধ ঘণ্টা নাগ ও মনসার স্তুতি ও আবাহন করেন মূল পুরোহিতের অধীনে বাকি

সকল পুরোহিতেরা। আর তীরে দাঁড়িয়ে শঙ্খধ্বনি করেন উপস্থিত মহিলারা। তারপর আবার গঙ্গা বন্দনা করতে করতে পাড়ে রাখা মঙ্গল কলস দুটি নিয়ে এসে তা জলপূর্ণ করে কাঁধে করে এনে আবার পূর্ব স্থানে কলাপাতার ওপর স্থাপনা করা হয়। মূলত একজন প্রাচীন ব্যাক্তি সংকল্প করে কলসে জল তোলেন এবং সেই জলপূর্ণ কলস বা ঘট নাগ ও মনসার প্রতীক রূপে মন্দিরে নিয়ে যান। সঙ্কল্প মন্ত্র পাঠ করান মূল পুরোহিত। জল ভরার সময়ও মাঙ্গলিক শঙ্খ বাজান গ্রামের নারীরা। পাড়ে এনে মঙ্গল কলস দুটির ওপর পঞ্চপল্লব (আম, বট, অশ্বত্থ, পাকুড় ও যজ্ঞ ডুমুরের পাতা) ও নতুন গামছা রাখা হয়। এবার সামনে আরেকটি কলাপাতায় ঢালা হয় কিছুটা আতপ চাল। ফুল জলে পূর্ণ কোষাকুষি সামনে রাখা হয়। পাশেই একগুচ্ছ ধূপ জ্বালানো হয়। আতপ চালের ওপর একপাশে বেলপাতায় খোসা ছাড়ানো দুটি কাঁঠালি কলা, আরেক পাশে কিছুটা বাতাসা এবং একটা হরিতকী। আরেকটি কলাপাতায় কয়েকটি পান, কয়েকটি হরিতকী, একটি সুপারি, এবং একটি পঞ্চজবা। এখানে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে চলে আরেক পূজা পর্ব। মূল পুরোহিত কোষাকুষির জল ছিটিয়ে জোড় হাতে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে কেঁদে আকুল হন। বাসুকি ও মনসামাতার আবাহন সম্পূর্ণ হলে পুনরায় বাদ্য সহযোগে জলপূর্ণ কলস নিয়ে ফেরা হয় শোভাযাত্রা সহকারে। পূজা মন্দিরে জলভরা কলস দুটি প্রতিষ্ঠা করে *ঘট উত্তোলন* অনুষ্ঠান সমাপন হয়।

পরের দিন থেকে পর পর একে হয় ষোড়শোপচারে শাস্ত্রীয় বিধি বিধান অনুযায়ী গনেশ, গঙ্গামাতা, সাগরেশ্বর মহাদেব জীউ, বিষ্ণুদেব, যোগমায়া, অষ্টনাগ বাসুকি ও মনসা পূজা এবং শেষ দিন সত্যনারায়ণ পূজা এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান। যদিও নাগ ও মনসা পূজাই উৎসবের কেন্দ্র, তবুও কালে কালে পূজার ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা এই মহোৎসবের অঙ্গীভূত হয়েছে। বর্তমানে মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন সন্নিকটে নাগ সরোবর প্রাঙ্গণে এই পূজার জন্য স্থায়ী মন্দির নির্মাণের কাজ চলছে। ঘট উত্তলনের পর থেকে পূজা পর্বের শেষ দিন পর্যন্ত মনসাদ্বীপের সকল অধিবাসী নিরামিষ খান। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে বাসুকি নাগের পূজার দিন এখানে দর্শনার্থীর সংখ্যা লক্ষাধিক হয়।

এদিন সন্ধ্যা আরতির সময় মন্দির প্রাঙ্গণে বিষাক্ত সাপ দেখা যায় বলে জানা যায়। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস ভক্তের আহ্বানে এক বৃহদাকার সাপ রূপে নাগরাজ স্বয়ং আবির্ভূত হন।

লোকসমাজে প্রভাব - মনসা পূজার দিন এখানে আসেন মূলত মনসাদ্বীপের এবং পাশাপাশি গ্রামের নারীরা। এ দিন পঁচিশজন পুরোহিত সকাল দশটা থেকে বেলা চারটে পর্যন্ত শাস্ত্রীয় বিধি বিধান অনুযায়ী পূজা সম্পূর্ণ করেন। এখানের মনসা জাগ্রত দেবী বলে লোকবিশ্বাস। এই বিশ্বাস থেকেই অসংখ্য মানুষ মায়ের কাছে বিভিন্ন মানত করেন। মনোবাঞ্ছা পূরণের পর ভক্তিভরে এরা মাকে পূজা দিতে আসেন। ফল, ফুল মিষ্টির সঙ্গে শাড়ি নিবেদন করেন মায়ের কাছে। মনসা পূজার দিন মণ্ডপ প্রাঙ্গণে দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত অজস্র শাড়ি, ঝুড়ি ভরা ফল এ অঞ্চলের লোকজীবনে দেবী মনসার প্রভাবকে প্রমাণ করে। এদিন সন্ধ্যাবেলা মেলা প্রাঙ্গণে মনসা পালাগানের আয়োজন হয়। এই মনসা যাত্রার আসরেও দর্শকদের ভিড় হয় জমজমাট। পালা শেষ হওয়া অবধি এত লোক সমাগম দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অন্যান্য অঞ্চলের মনসার পালাগানের আসরে সেভাবে চোখে পড়ে না। শীতের রাতে মাঠের মধ্যে বাড়ি থেকে আনা বস্তা পেতে বসে শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধারা আনন্দে উপভোগ করেন চার ঘণ্টার মনসাপালাগান। পূজা উপলক্ষ্যে এক সপ্তাহ ব্যাপী যে মেলা এবং যাত্রানুষ্ঠান আয়োজিত হয় সেখানে মুসলিম নরনারীও আনন্দে যোগ দেন। মনসাপূজা সহ যে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চাঁদা দেওয়া থেকে সামিল হওয়ার ক্ষেত্রে সাগরদ্বীপে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির চোখে পড়ে।

মনসাদ্বীপ তথা সমগ্র সাগর ব্লকে মিশ্র অর্থনীতির মানুষের বসবাস। স্বাক্ষরতার হার এখানে বেশ ভালো। নিরক্ষর একেবারে নেই বলেই স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। লেখাপড়ায় ভালো ফলের দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে মেয়েরাই বর্তমানে এগিয়ে। নিম্নবিত্ত পরিবারে নারী পুরুষ উভয়েই ধান কাটা, চাষের অন্যান্য কাজ, বাগানের কাজে সামিল হয়। আবার কেউ কেউ সাময়িক ব্যাবসা হিসেবে নাগমেলায় চা ঘুঘনি ইত্যাদির দোকান করেন। এখানকার সাধারণ জনজাতির মুখের ভাষা উৎকল মিশ্রিত বাংলা। তবে সাগরের সব অর্থনীতির মানুষের মধ্যেই প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই সিজমনসা গাছ রাখার চল রয়েছে। এই গাছে প্রতিদিন জল দিয়ে এখানকার অধিবাসীরা মা মনসার কাছে পারিবারিক নিরাপত্তা,

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করেন। প্রতিটি গ্রামেই রয়েছে মনসা মন্দির। সেখানে প্রতি শনি মঙ্গলবার বিশেষভাবে মায়ের পূজা হয়। সাগরের মনসাপূজার আরেকটি বিশিষ্টতা হল, মন্দিরগুলিতে মা মনসা পুত্র আস্তিককে কোলে নিয়ে বিরাজমান। আর দেবীর সামনে প্রতিষ্ঠিত হেমঘট। এই হেমঘট একটি পিতলের ঘট, যা সজ্জিত হয়েছে মুকুট পরিহিতা দেবীর মুখমণ্ডল দিয়ে। ঘটের বাকি নিম্নাংশে পরিপাটি করে শাড়ি পরানো। একই ভাবে পাশে রয়েছে গণেশের হেমঘট, যার ওপরের অংশে গণপতির মুখমণ্ডল আর নিম্নাংশে সুসজ্জিত বেশবিন্যাস। এই ঘটেই যাবতীয় আরাধনা পদ্ধতি পালন করা হয়।

সাগরদ্বীপের মনসা সংস্কৃতি প্রসঙ্গে যে বিশেষ পূজা ও মেলার কথা না বললেই নয়, তা হল ধবলাটের মনসাবাজার এলাকার মনসাপূজা ও মনসামেলা। মনসাদ্বীপের পার্শ্ববর্তী গ্রাম ধবলাটের মনসা পূজাটি সত্তর বছরেরও পুরনো বলে জানা যায়। প্রাথমিক ভাবে একটি গাছের নীচে ঝুপড়িতে এই পূজার সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীকালে মায়ের স্থায়ী মন্দিরটি গড়ে ওঠে। এই মন্দিরে স্থাপিত মনসা দেবীর প্রতিমার মাথার পেছনে মূর্তি আকারে রয়েছে পঞ্চমুণ্ড সাপের ছত্রছায়া। মনসা মন্দিরের একেবারে কাছেই প্রকৃতির তাণ্ডবে বঙ্গোপসাগরে গ্রাসে তলিয়ে যাওয়া ভূমিরূপ। গত আয়লা ঝড়ের পরে এই বিপর্যয়ের চূড়ান্ত ছবি এখানে পরিস্ফুট। এই মন্দিরটিও ৫৮ বছরের পুরনো। গাছের তলায় যেখানে প্রথমে পূজার সূচনা হয়েছিল, সেই গাছের গোঁড়াটি বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে মনসা দেবীর প্রতীকী একটি ছোট পঞ্চমুণ্ড সাপের মূর্তি রয়েছে, যেখানে গ্রামের মানুষেরা ভক্তিভরে প্রণত হন। প্রতি বছর রাস পূর্ণিমায় দেবী মনসার বিশাল ঘটা করে পূজার আয়োজন করা হয়। সঙ্গে পালন হয় রাধা কৃষ্ণের রাস উৎসব। মনসা পূজা উপলক্ষ্যে এক সপ্তাহ ব্যাপী এক জাঁকজমক পূর্ণ মনসামেলার আয়োজন করা হয়। প্রবেশ পথ থেকে সম্পূর্ণ মেলা প্রাঙ্গণ আলোয় সেজে ওঠে। গ্রামের মানুষের মনরঞ্জনের হেতু প্রতি রাত্রে যাত্রাপালা প্রদর্শিত হয়। বিধ্বস্ত প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে থেকেও সমুদ্র তীরবর্তী ধবলাটের লোকসমাজে দেবী মনসার প্রতি বিশ্বাস, আস্থা, ও নির্ভরতার এক বাস্তব চেহারা পরিলক্ষিত হয়।

তথ্যসূত্র -

তথ্যদাতা (পুরুষ)

(১) নাম – মলয় মাইতি

বয়স – ৭২

পেশা – অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সুন্দরবন জনকল্যান সংঘ বিদ্যানিকেতন

ঠিকানা – মনসাদ্বীপ, থানা- সাগর, দঃ ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৩৭৩।

(২) তথ্যদাতা (পুরুষ)

নাম – রবিন বেরা

বয়স – ৪৬

পেশা – ব্যাবসা (ষ্টেশনারী জিনিসের দোকান)

ঠিকানা – রুদ্রনগর, থানা – হরিণবাড়ি, দঃ ২৪ পরগণা।

(৩) তথ্যদাতা (পুরুষ)

নাম – মেঘনাথ দলপতি

বয়স – ৪০

পেশা – মুদির দোকান

ঠিকানা – পুরুষোত্তমপুর, উত্তর পূর্ব মনসা পাড়া, থানা – সাগর, দঃ ২৪ পরগণা।

(৪) তথ্যদাতা(পুরুষ)

নাম – পরেশ চন্দ্র শাসমল

বয়স – ৮০

পেশা – শ্রমজীবী

ঠিকানা – গ্রাম-পুরুষোত্তমপুর, থানা- সাগর, ডাকঘর-মনসাদ্বীপ, দঃ ২৪ পরগণা।

(৫) তথ্যদাতা (পুরুষ)

নাম – নন্দগোপাল পোদ্দার

বয়স – ৬৬

পেশা – পৌরোহিত্য(মনসাদ্বীপ নাগ ও মনসা পূজার প্রধান পুরোহিত)

ঠিকানা – লক্ষ্মীবাজার,ধবলাট, দঃ ২৪ পরগণা

(৬) তথ্যদাতা (পুরুষ)

নাম – অজামিল খাটুয়া

বয়স – ৫২

পেশা – ধান রপ্তানির ব্যবসা, নাগমেলা কমিটির সহ সভাপতি

ঠিকানা - গ্রাম-পুরুষোত্তমপুর, থানা- সাগর, ডাকঘর-মনসাদ্বীপ, দঃ ২৪ পরগণা

(৭) তথ্যদাতা (মহিলা)

নাম – কবিতা কাণ্ডার

বয়স – ২৮

পেশা – শ্রমজীবী (নাগমেলায় চায়ের দোকান, চাষের কাজ, বাগানের কাজ)

ঠিকানা – গ্রাম-পুরুষোত্তমপুর, থানা- সাগর, ডাকঘর-মনসাদ্বীপ, দঃ ২৪ পরগণা।

(৮)তথ্যদাতা (মহিলা)

নাম – দেবশ্রী মালি

বয়স – ২৩

পেশা – গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম-পুরুষোত্তমপুর, থানা- সাগর, ডাকঘর-মনসাদ্বীপ, দঃ ২৪ পরগণা।

সামতা গ্রামের মনসা পূজা

এলাকার পরিচয় -

গ্রাম + পোস্ট - সামতা, থানা - বাগনান, জেলা - হাওড়া

গ্রামের মোট জনসংখ্যা - ২৮০০, পুরুষ - ১৪০০, মহিলা - ১৬০০, শিশু - ৬০০

গ্রামের সকলেই হিন্দু

পূজার ইতিহাস ও আঞ্চলিক লোকবিশ্বাস - সামতা গ্রামের একেবারে পূর্ব প্রান্তে বিশালাকার অশ্বত্থ, নিম গাছের মাঝখানে সিজ মনসা গাছে পৌষসংক্রান্তিতে ধুমধাম করে মনসা পূজা হয়। গ্রামের প্রাচীনদের মতে এ পূজা প্রায় তিনশো বছর থেকে হয়ে আসছে। কোনো প্রতিমা নেই, সিজ মনসা গাছেই এই পূজা চলে আসছে। কথিত আছে অশ্বত্থ, নিম আর সিজ মনসা গাছের একত্রে জন্মানোর বিষয়টি অলৌকিক। কামাক্ষা থেকে আগত কোনো এক সাধু নাকি মন্ত্র বলে গ্রামে এই গাছগুলি স্থাপন করে। একটি বালক খেলতে খেলতে একদিন দেবী মনসার দর্শন পান, এবং সেই প্রথম গাছগুলির সামনে বসে মনসা

পূজা শুরু করে। সেখান থেকেই গ্রামে মনসা পূজার প্রথম সূত্রপাত। পৌষ সংক্রান্তিতে সে দেবী দর্শন পেয়েছিল, তাই প্রতি বছর ঐ তিথিতেই গ্রামের সকলে মিলে পূজার আয়োজন করে।

ছোট ছোট গাছগুলি বৃহদাকার হলে উঁচু করে বাঁধিয়ে দেওয়া হয় মনসার থান। পূজার প্রসার বাড়লে লোকমনোরঞ্জনের জন্য যুক্ত হয় যাত্রানুষ্ঠান। তবে বর্তমানে পূজা উপলক্ষ্যে যাত্রার চল আর নেই। এ গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই তুলসি ও সিজ মনসার গাছ পূজিত হয়। সামতার পৌষ সংক্রান্তির মনসা থানের পূজায় ডাকাবেরিয়া, আষাঢ়িয়া ইত্যাদি প্রতিবেশী গ্রাম থেকে বহু মানুষ একত্রিত হয়। মনসার এই থানের পাশেই গ্রামের বাসিন্দা মেডিকেল কলেজের ডাক্তার চন্দ্রশেখর মহাপাত্র গ্রামের মানুষের পানীয় জলের সমস্যা দূর করতে একটি পুকুর খনন করিয়েছিলেন। কালক্রমে এই পুকুরকে কেন্দ্র করে নানা অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায়। এই পুকুরে গ্রামের কৃষক প্রভাতী জানা একদিন মাছ ধরতে গেলে একটি মাছের গা থেকে চারদিকে আলো ছড়িয়ে পরতে দেখেন। ভয়ে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। এই ঘটনার কথা গ্রামে ছড়িয়ে পরলে পুকুরটিতে দেবীর অবস্থান আছে, এই বিশ্বাস জন্মে গ্রামের মানুষের। এই পুকুরটি মনসা-পুকুর নামে পরিচিত হয়। বহুদিন পর্যন্ত ভয়ে ভক্তিতে তারা এই জল ব্যবহার করত না। দিনে দিনে ভয় থেকে মুক্ত হয়ে গ্রামবাসীরা আবার পুকুরের জল নিত্যকাজে ব্যবহার করতে শুরু করেন। তবে বার কয়েক এই পুকুরের জল সেচ করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু কখনই এর জল সম্পূর্ণ শুকোয় না বলে গ্রামের মানুষের বিশ্বাস। গ্রামেই দেবী মনসার নামে রয়েছে এক বিঘা জমি। গ্রামের একটি কমিটি বর্তমানে এই জমির তত্ত্বাবধান করেন। জমিতে চাষ করিয়ে যা কিছু লাভ হয়, সেই অর্থে মনসাপুকুরের সংরক্ষণের কাজ চলে। বিয়ে, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি গ্রামের যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে এই মনসা-পুকুরের জল ব্যবহৃত হয়। আবার শিবের গাজনের মত ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও এখান থেকে নেওয়া হয় ১০৮ কলসি জল।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলি সহ বাংলার গ্রাম গঞ্জে এরূপ মনসার থান অজস্র রয়েছে, কোনো থানে মনসা প্রতিমা স্থাপিত হয়েছে, কোথাও কেবল ঘট, কোথাও বা পাঁচ মাথা বিশিষ্ট সাপের মূর্তি, কোথাও বা সামতার মত সিজ গাছ। সামতা গ্রামের প্রতিটি

বাড়িতেই সিজ গাছে মনসা পূজার প্রচলন আছে। প্রত্যন্ত গ্রামে উঁচু বেদী বা থানে মনসা পূজা লোকজীবনের বদ্ধমূল ধর্মীয় চেতনা অনাড়ম্বর উদযাপনকে তুলে ধরে।

তথ্যসূত্র

তথ্যদাতা পুরুষ –

১) কার্ত্তিক মণ্ডল

বয়স - ৯৩ বছর

পেশা - চাষের কাজ করতেন

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - সামতা, থানা - বাগনান, জেলা - হাওড়া ।

২) প্রদ্যুত মণ্ডল

বয়স - ৫০ বছর

পেশা - চাষের কাজ করেন

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - সামতা, থানা - বাগনান, জেলা - হাওড়া ।

৩) ভোলানাথ ঘোষাল

বয়স - ৪৮ বছর

পেশা - হাইকোর্টে কর্মরত

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - সামতা, থানা - বাগনান, জেলা - হাওড়া।

৪) বিভাসকুমার ঘোষাল

বয়স - ৪৮ বছর

পেশা - বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - সামতা, থানা - বাগনান, জেলা - হাওড়া।

৫) শুভজিত ঘোষাল

বয়স - ১৪ বছর

অষ্টম শ্রেণির ছাত্র

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - সামতা, থানা - বাগনান, জেলা - হাওড়া।

৬) হেমন্ত ভৌমিক

বয়স - ২১ বছর

ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - সামতা, থানা - বাগনান, জেলা - হাওড়া ।

৭) তুহিন কোলে

বয়স - ২১ বছর

ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - সামতা, থানা - বাগনান, জেলা - হাওড়া ।

মহিলা

১) ববিতা ঘোষাল

বয়স - ৩৬ বছর

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - সামতা, থানা - বাগনান, জেলা - হাওড়া।

২) রঞ্জিতা ঘোষাল

বয়স - ৩৬ বছর

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - সামতা, থানা - বাগনান, জেলা - হাওড়া।

৩) তৃপ্তি মণ্ডল

বয়স - ১৮ বছর

ছাত্রী - দ্বাদশ শ্রেণি

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - সামতা, থানা - বাগনান, জেলা - হাওড়া ।

৪) রেখা মণ্ডল

বয়স - ৭৬

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - সামতা, থানা - বাগনান, জেলা - হাওড়া।

৫) মধুশ্রী মণ্ডল

বয়স - ২২ বছর

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - সামতা, থানা - বাগনান, জেলা - হাওড়া।

মানশ্রী গ্রামের ঈশানকুমারী পূজা

এলাকার পরিচয়

গ্রাম - দক্ষিণ মানশ্রী, পোস্ট - উত্তর মানশ্রী, থানা - উদয় নারায়ণপুর, পিন কোড - ৭১১৪১২, হাওড়া

আয়তন - ১.২১ বর্গ কিলোমিটার

মোট জনসংখ্যা - ২৮৯১, পুরুষ - ১৪৯৮, মহিলা - ১৩৯৩

মহাদেবের এক নাম ঈশান, তার কন্যা মনসা তাই ঈশানকুমারী। হাওড়া জেলার উদয়নারায়নপুর ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ মানশ্রী গ্রামে ঈশানকুমারী নামে দেবী মনসা বহু প্রাচীন কাল থেকে পূজিত হয়ে আসছেন। শতাব্দী প্রাচীন একটি সুবিশাল বটবৃক্ষের নীচে একটি অনুচ্চ থানে দেবীর পূজার প্রচলন ছিল। কিছু বছর আগে থেকে পূজার সঙ্গে মেলার প্রচলন হয়, এবং একটি ছোট্ট মন্দিরও নির্মাণ হয়। মন্দির গাত্রে খোদিত আছে ওঁ *মা ঈশান কুমারী আনন্দ মেলা, নির্মাণ কল্পে গোবর্ধন মাল, ১৪০১ বঙ্গাব্দ*। আবার অন্যত্র খোদিত তথ্য অনুযায়ী ১৪১১ বঙ্গাব্দের ২রা চৈত্র বিশাল বট গাছের নীচে ছোট্ট বেদী তথা মন্দির নির্মিত হয়। অর্থাৎ মেলার প্রচার ও মন্দির নির্মাণ কিছু বছর আগে হয়েছে কিন্তু থানে ঈশানকুমারীর পূজার প্রচলন বহু প্রাচীন।

ঈশানকুমারী পূজার বিশেষত্ব - প্রতিদিনের নিত্যপূজার পাশাপাশি প্রতি বছর ৭ই চৈত্র মানশ্রী গ্রামে ঈশানকুমারীর বাৎসরিক পূজা সাড়ম্বরে পালিত হয়। পূজা উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন জায়গায় দু'দিনের জন্য মেলা বসে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ সমবেত হয় পূজাপ্রাঙ্গণে। মানস পূরণে পাঁঠাবলি হয়। ৮ই চৈত্র অন্নকূট উৎসবে মায়ের ভোগ বিতরণ করা হয়। প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ এই উৎসবে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বিয়ে, অন্নপ্রাশন গ্রামের মানুষের যে কোনো সামাজিক কর্মে দেবীর পূজা বাধ্যতামূলক ভাবে প্রচলিত। শুধু দক্ষিণ মানশ্রী নয়, পাশাপাশি উঃ মানশ্রী, দেবীপুর, অভিরামপুর, ভবানীপুর, সোনাতলা, নিশ্চিন্দিপুর, উঃ রায়চক, মাগড়ি, হরিশপুর, রঞ্জিতপাটি, পাঁচারুল ইত্যাদি গ্রামের মানুষের মধ্যেও ঈশানকুমারী প্রতি ভক্তি বিশ্বাস সমানভাবে রয়েছে, তারাও

বাৎসরিক পূজা ছাড়াও নিজেদের পারিবারিক কল্যাণ কামনায় দেবীর কাছে আসেন। মানস পূরণে শনি বা মঙ্গলবার পাঁঠা বলি দেন।

লোকবিশ্বাস - মুণ্ডেশ্বরী ও দামোদর নদীর মাঝামাঝি অবস্থিত এই গ্রামে ঈশানকুমারীর অলক্ষ্য শাসন চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। গ্রামের সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেন যে বিশাল বটবৃক্ষের নীচে এই থানটি নির্মিত, কোন ব্যক্তি সেই গাছের ডাল ভাঙলে তার বড় কোনো ক্ষতি হবেই। এমন ক্ষতির সাক্ষী রয়েছেন বহু মানুষ। বটগাছটি চারপাশে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে চলেছে যুগ যুগ ধরে যাদের জমির ওপর এই গাছ বিস্তৃত হচ্ছে, তারা সশ্রদ্ধ মনে তাদের জমি ছেড়ে দিচ্ছেন ঈশানকুমারীর নামে।

ঈশানকুমারীকে খুব জাগ্রত দেবী বলে বিশ্বাস করেন গ্রামের মানুষ। সততার সঙ্গে শুদ্ধ মনে যা কিছু চাওয়া যায়, দেবী তা পূরণ করেন। এখানকার ন্যায় অন্যায় ধর্ম অধর্মের ওপর দেবীর নিয়ন্ত্রণ তথা কঠোর শাসন রয়েছে বলে জানান গ্রামবাসীরা। এই গ্রামে কোনো অনাচার করে কেউ দেবীর কোপ থেকে রেহাই পান না , বরং কঠোর শাস্তি পেতে হয়, এরকম উদাহরণ গ্রামের সকলেরই জানা। তাই ঈশানকুমারী মনসার অলৌকিক প্রভাব সম্পর্কিত এক প্রচ্ছন্ন চেতনা এই অঞ্চলের মানুষের ধর্ম অধর্ম, ন্যায় নীতি বোধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

ডাক্তার যেখানে চিকিৎসায় অপারগ এমন অনেক রোগীর পরিবার পরিজন ঈশানকুমারীর থানে এসে হাত পেতে বা আঁচল পেতে মানত করলে, দেবীর আশীর্বাদী ফুল বা পাতার ব্যবহারে মুমূর্ষু রোগী ভালো হয়েছে এমন অনেকের কথাই গ্রামবাসীদের মুখে শোনা যায় । একইভাবে দেবীর কাছে প্রার্থনা করে তার আশীর্বাদে বহু নারীর বন্ধ্যাত্ব নিবারণ হয়েছে, এমন কথা জানা যায়। ভক্তি বিশ্বাস তথা দেবীর মাহাত্ম্য গ্রামবাসীদের কাছে জীবন্ত হলেও সাপের কামড়ে ওঝা বা ঝাড় ফুঁকের অবৈজ্ঞানিক সংস্কার এদের মধ্যে নেই। স্থানীয় গাববেড়িয়া হাসপাতালেই আক্রান্তের চিকিৎসা করানো হয়।

ঈশানকুমারী নামের অভিনবত্বে, অন্নকূট উৎসবের বিশাল আয়োজনে সর্বোপরি লোকবিশ্বাস অনুযায়ী সদাজাগ্রত দেবীর শাসনে স্থানীয় মানুষের ন্যায়নিষ্ঠ থাকার যে মানসিকতা এখানে দেখা যায়, তা-ই মানশ্রীর এই মনসা পূজাকে বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র দিয়েছে।

তথ্যসূত্র

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

তথ্যদাতা পুরুষ

১) প্রবীর কোলে

বয়স - ৪৯

পেশা - চাষের কাজ

ঠিকানা - গ্রাম - দক্ষিণ মানশ্রী, পোস্ট - উত্তর মানশ্রী, থানা - উদয় নারায়ণপুর, পিন কোড - ৭১১৪১২, হাওড়া।

২) অশোক ঘোড়ুই

বয়স - ৬৭

পেশা - চাষের কাজ

ঠিকানা - গ্রাম - দক্ষিণ মানশ্রী, পোস্ট - উত্তর মানশ্রী, থানা - উদয় নারায়ণপুর, পিন কোড - ৭১১৪১২, হাওড়া।

৩) নরেন্দ্রনাথ মাল

বয়স - ৪০

পেশা - চাষের কাজ

ঠিকানা - গ্রাম - দক্ষিণ মানশ্রী, পোস্ট - উত্তর মানশ্রী, থানা - উদয় নারায়ণপুর, পিন কোড - ৭১১৪১২, হাওড়া।

৪) অভিজিৎ দে

বয়স - ৩৪

পেশা - চাষের কাজ

ঠিকানা - গ্রাম - দক্ষিণ মানশ্রী, পোস্ট - উত্তর মানশ্রী, থানা - উদয় নারায়ণপুর, পিন কোড - ৭১১৪১২, হাওড়া।

৫) শঙ্কর মাল

বয়স - ২৬

পেশা - চাষের কাজ

ঠিকানা - গ্রাম - দক্ষিণ মানশ্রী, পোস্ট - উত্তর মানশ্রী, থানা - উদয় নারায়ণপুর, পিন কোড - ৭১১৪১২, হাওড়া।

মহিলা

১) ইতি কোলে

বয়স - ১৭

একদশ শ্রেণির ছাত্রী

ঠিকানা - গ্রাম - দক্ষিণ মানশ্রী, পোস্ট - উত্তর মানশ্রী, থানা - উদয় নারায়ণপুর, পিন কোড - ৭১১৪১২, হাওড়া।

২) নমিতা মাল

বয়স - ৫৬

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম - দক্ষিণ মানশ্রী, পোস্ট - উত্তর মানশ্রী, থানা - উদয় নারায়ণপুর, পিন কোড - ৭১১৪১২, হাওড়া।

৩) রঞ্জিতা দে

বয়স - ৬০

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম - দক্ষিণ মানশ্রী, পোস্ট - উত্তর মানশ্রী, থানা - উদয় নারায়ণপুর, পিন কোড - ৭১১৪১২, হাওড়া।

৪) মাধবী মাল

বয়স - ৫৭

শিক্ষিকা, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র

ঠিকানা - গ্রাম - দক্ষিণ মানশ্রী, পোস্ট - উত্তর মানশ্রী, থানা - উদয় নারায়ণপুর, পিন কোড - ৭১১৪১২, হাওড়া।

৫) শোভা মাল

বয়স - ৮০

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম - দক্ষিণ মানশ্রী, পোস্ট - উত্তর মানশ্রী, থানা - উদয় নারায়ণপুর, পিন কোড - ৭১১৪১২, হাওড়া।

৬) রচিতা চক্রবর্তী

বয়স - ১৫

দশম শ্রেণির ছাত্রী

ঠিকানা - গ্রাম - দক্ষিণ মানশ্রী, পোস্ট - উত্তর মানশ্রী, থানা - উদয় নারায়ণপুর, পিন কোড - ৭১১৪১২, হাওড়া।

ওয়াদিপুর ও নারকেলডাঙায় দুর্গা ও মনসার সম্মিলিত রূপের পূজা

এলাকার পরিচয় -

১) গ্রাম - ওয়াদিপুর, থানা - ডোমজুর, জেলা - হাওড়া ৭১১৪১১

জনসংখ্যা - ৮৫১০, পুরুষ - ৪৫৫০, মহিলা ৩৯৬০

২) গ্রাম - নারকেলডাঙা, থানা - কালনা, জেলা - বর্ধমান

মোট জনসংখ্যা - ২৪৫, পুরুষ - ১২৮, মহিলা - ১১৭, শিশু - ২৯

ওয়াদিপুরে মন্দিরের ইতিহাস ও পূজা পরিচয় - ওয়াদিপুরের মনসা মাতার মন্দিরটি প্রায় তিনশো বছরের প্রাচীন। মন্দিরগাত্রে যে প্রতিষ্ঠা সাল উল্লিখিত তা ১১৪৫ সন, ৪ঠা বৈশাখ। গ্রামের প্রতিটি পরিবারেই মনসার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল। এই মন্দিরে মনসামাতার প্রতিমার দুদিকে রয়েছেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, বেহুলা ও লক্ষিন্দরের প্রতিমা। মনসার সঙ্গে বেহুলা লক্ষিন্দর অনেক জায়গায় পূজা পান, কিন্তু লক্ষ্মী, সরস্বতীর অবস্থানের বিষয়টি একেবারে অনন্য।

আগে মনসা সহ অন্যান্য দেব দেবীর মাটির প্রতিমা এই মন্দিরে পূজা হত, প্রতি বছর বিজয়া দশমীতে নতুন প্রতিমা এনে পুরনো মূর্তিগুলির ভাসান হত। কিছু বছর আগে শ্বেত পাথরের স্থায়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করা হয় মন্দিরে। মনসার এখানে মূল পূজা হয় দশহরা, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ও শারদ অষ্টমীতে। এছাড়া ভাদ্র সংক্রান্তিতে অরন্ধন ও মনসা পূজা হয়। ওয়াদিপুর গ্রামের বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী অরন্ধনের রান্নায় কেবল আলু ছাড়া আর কিছু ব্যবহৃত হয়না। এ ছাড়া প্রতি মাসের সংক্রান্তিতেই চিড়ে, মুড়কি পাঁচ রকমের ফল দিয়ে এ গ্রামের সকল পরিবার থেকেই নারীরা দেবীকে পূজা করেন। পূজা উপলক্ষ্যে কেশবপুর, নতিবপুর, কোরলা, জাবদাপোতা, খসমারা, দীঘির পাড়, রাজাপুর ইত্যাদি

প্রতিবেশী গ্রামগুলি থেকে বহু লোকের সমাগম হয় ওয়াদিপুরের মনসামাতার মন্দির প্রাঙ্গনে। মায়ের সামনে মানস পূরণে দণ্ডীকাটা হয়। শ্রাবণ সংক্রান্তির মনসা পূজায় দেবীকে ক্ষীর ভোগ নিবেদন করা হয়। মন্দিরে মনসার সামনে ছোট্ট সিংহাসনে আছে পিতলের কৃষ্ণ ঠাকুর। তাই মনসামন্দিরে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীও উদযাপন করা হয়। প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ করা যায়, রাস পূর্ণিমায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সাগর ব্লকের ধবলাটে রাধা কৃষ্ণের রাস উৎসব এ ধুমধাম করে মনসা পূজা হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও দেবীভাগবত পুরাণে মনসার নারায়ণ সাধনা এবং নারায়ণ কর্তৃক মনসা পূজার উল্লেখ আছে। রাস উৎসবে মনসাপূজা এবং মনসা মন্দিরে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পালন এক সাংস্কৃতিক সমন্বয়, এর সূত্রপাত যেভাবেই হোক না কেন, মনসা যে এক মিশ্র সাংস্কৃতিক চেতনা বহন করে চলেছে, এক্ষেত্রেও তা স্পষ্ট হয়।

প্রতিমায় ও উদযাপনে দুর্গা ও মনসার অভেদ কল্পনা - দুর্গাপূজার অষ্টমীতে মনসামন্দিরে চলে চণ্ডীপাঠ। মনসাও তো দুর্গার শক্তির আর এক প্রকাশ। তাই মনসামন্দিরেই চলে দুর্গোৎসব। এই ভাবনা থেকেই মনসার সঙ্গে থাকেন লক্ষ্মী সরস্বতী। অষ্টমীতে চলে পাঁঠাবলি, থালায় সাজিয়ে রক্তাক্ত ছাগমুণ্ড নিবেদন করা হয়, মনসার সামনে। তার পর চলে আখ, আনারস, কলা, চালকুমড়ো, লেবু এগুলির এক এক করে বলি।

বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার্চনায় মনসার গুরুত্ব - চৈত্র মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে পাড়ার প্রায় ২০০ জন সন্ন্যাস রীতি পালন করেন। পুরো চৈত্র মাস খাবার, পোশাক, আচরণে সংযম পালন করার পর ঝাঁপ ইত্যাদি কঠিন রীতি পালন করতে হয়। শেষে মনসা মন্দিরের সামনে এসে সন্ন্যাসীরা ভাবে বিভোর হয়ে নাচতে থাকে । এদের বিশ্বাস মনসা মায়ের হাতের আশীর্বাদী ফুল ঝরে পরলে তবেই সন্ন্যাস সফল হয়। বাঁকুড়ার অযোধ্যা গ্রামের দশহরা উৎসবের ভোক্তা নাচ ও ফুল কাড়ানোর সঙ্গে এর মিল রয়েছে।

দোলের আগের দিন ওয়াদিপুরে চাঁচর উৎসব হয়। গ্রামের খালের পাড়ের জমিতে বাঁশের লাঠি, গুলঞ্চ ডাল, নারকেলের পাতা বেঁধে তৈরি হয় ঘর। ঘর তৈরির পর মনসামন্দিরে দেবীর আরতি ও সন্ধ্যাপূজা করে সেখান থেকে ঢাক, ঢোল, বাজিয়ে মহা সমারোহে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে শুকনো পাতার ঘর ব্রাহ্মণ দ্বারা শুদ্ধিকরণ, পূজা ইত্যাদি করার পর পুড়িয়ে

ফেলা হয়। বাজি ফাটিয়ে আনন্দ উল্লাস করেন গ্রামের অধিবাসীরা। দোলের আগের দিন ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্দশীতে বাংলা ও ওড়িশায় বুড়ির ঘর পোড়ানো বা চাঁচর উৎসবের প্রচলন আছে। তবে এই উৎসবের সঙ্গে বিশেষ ভাবে মনসা পূজা যুক্ত হওয়া ওয়াদিপুরের বিশেষত্ব।

গ্রামে রয়েছে মনসা, শীতলা, শিব, মাকাল (দুর্গা) ও চণ্ডীর মোট পাঁচটি মন্দির, তবে মনসাই গ্রামের প্রধান দেবী। তাই যেকোনো দেবদেবীর বিশেষ পূজায় মনসা পূজা করা এ গ্রামে বাধ্যতামূলক। মনসাপূজা ছাড়া কোনো পূজাই সম্পূর্ণ হয় না।

মনসামন্দিরের সঙ্গে যুক্ত লোকবিশ্বাস - দেবীর কৃপায় অপুত্রকের পুত্র জন্মে, কঠিন রোগমুক্তি হয়, এই বিশ্বাসে দণ্ডীকাটার মত কঠিন সংস্কার পালন করতে মনসা মন্দিরে আসেন দূর দুরান্ত থেকে ভক্তেরা। কামনা পূর্ণ হলে নিয়মিত মনসা মন্দিরে আসেন, সাধ্যমত নিবেদন করেন দেবীর অর্ঘ্য। গ্রামের মানুষের বিশ্বাস এই মন্দিরের মনসামাতা অত্যন্ত জাগ্রত। তাই বহু মানুষের সমস্যা সমাধান হয় দেবীর কৃপায়। এই বিশ্বাস, ভক্তি থেকেই গ্রামের ধনী দরিদ্র সকলে মিলে সানন্দে সারা বছর দেবীর পূজার ব্যয়ভার বহন করেন।

ধর্ম সাংস্কৃতিক সমন্বয় - কোথাও দশহরায়, কোথাও ভাদ্র মাসের শেষে, কোথাও শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বাঙালী লোকায়ত সংস্কৃতিতে মনসা পূজিতা হন। ওয়াদিপুরের মনসামন্দিরে নিত্য পূজা, প্রতি মাসের সংক্রান্তির বিশেষ পূজা, দশহরা সহ বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত দেবীর প্রায় প্রতিটি পূজা তথা লোকাচার পালিত হয়। মনসামঙ্গল অনুসারে মনসা শিবকন্যা, আবার পুরাণ মতে তিনি কশ্যপ কন্যা, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনসার আরাধনা করেছিলেন। ওয়াদিপুরের মনসামাতার মন্দিরে চণ্ডী ও মনসার অভিন্নতা কল্পনা করে যে পূজা তা বিশেষ তাৎপর্যবাহী। যুগে যুগে সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে থেকে কেউ কেউ নিজ যোগ্যতায় পৌঁছে গেছে সাফল্যের চূড়ায়। দেবী মনসাও নানা ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। ওয়াদিপুরের মানুষের চেতনায় তাই দেবী চণ্ডী আর মনসা মহাশক্তির নিরিখে অভিন্ন হয়ে ওঠাকে তাই কাব্যের দেবীর সামাজিক প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ রূপায়ণ বলা যায়।

নারকেলডাঙার জগতগৌরী দেবীর মূর্তি ও পূজার উদ্ভব - বর্ধমানের কালনা থানার অন্তর্গত নারকেলডাঙার জগৎগৌরী দেবীর মধ্যেও মনসা ও দুর্গার সম্মিলিত রূপের প্রকাশ দেখা যায়। ওয়াদিপুরে মনসার সঙ্গে বেহুলা লক্ষিন্দর ও লক্ষ্মী সরস্বতী মূর্তি রয়েছে আর কালনার নারকেলডাঙায় সিংহের পিঠে পদ্মাসনা দেবীর মনসার বাম কোলে শিশু আস্তিক, আবার মাথায় অষ্টনাগ মূর্তি দেখা যায়। ওয়াদিপুরে যেমন দুর্গাষ্টমীতে মনসার সামনে চণ্ডী পাঠ হয়, নারকেলডাঙায় তেমনি দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও মনসার ত্রিস্তরীয় ধ্যানমন্ত্র পাঠ হয়। কথিত আছে কালাপাহাড়ের অত্যাচারে নারকেলডাঙার ঝাঁপানতলায় জগতগৌরীর উদ্ভব হয়। অনেক পরে ১২৯৯ সালে ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জগতগৌরীর মন্দির স্থাপন করেন। ত্রৈলোক্যনাথের পুত্র দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধনায় দেবী জাগ্রত হয়েছিলেন বলে জানান মন্দিরের বর্তমান সেবায়েত মুক্তিপদ চক্রবর্তী। নিত্যপূজা ছাড়াও শনি মঙ্গলবার দেবীর বিশেষ পূজা হয়। নাগপঞ্চমীর আগের দিন জগতগৌরীর রাজবেশ। দেবীর অধিবাস করানো হয়, সেই সঙ্গে চলে বারুদ উৎসব। ঝাঁপানে আগে সাপ খেলানো হত, তবে প্রশাসনের নির্দেশে বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গেছে।

গ্রাম পরিক্রমা, চলন্ত নাচঘর ও থাকা - দশহরা ও নাগপঞ্চমীতে দেবীর বাৎসরিক পূজা হয়। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে সোম বা শুক্রবার থেকে শুরু হয় দেবীর গ্রাম পরিক্রমা। ৩২টি গ্রামে তিথি অনুযায়ী দেবী অবস্থান করবেন। নাগপঞ্চমীর দু'দিন আগে দেবী ফিরে আসেন নারকেলডাঙার মূল মন্দিরে। যে গ্রামগুলিতে দেবী অবস্থান করেন সেগুলি হল - ভুরকুণ্ডা, দুপাড়া, গোপালদাসপুর, আটকাটিয়া কালিতলা, আটকাটিয়া মাঝেরতলা, ছোট বহরকুলি, হুগলী জেলার গহমী, নিয়াল, বড় বহরকুলি, বদ্যিপুর রাজরাজেশ্বর মন্দির, বদ্যিপুর পশ্চিমপাড়া, বদ্যিপুর নন্দিপাড়া, মীরহাট উত্তরপাড়া, মীরহাট দক্ষিণপাড়া, হাসানহাটি উঃ ও পূর্ব, দুপারা, আমোদাবাদ, তেহাটা, কুতুবপুর, পীরাগ্রাম, চাপাটি, গোয়ারা, সিমলাগোর, বৈঁচিগ্রাম, শিঙারকোণ, কুলটি প্রভৃতি। বৈদ্যপুরে, নারকেলডাঙায় নাচঘর বেরোয়। গরুর গাড়িতে গাছ, কাপড় দিয়ে ঘর তৈরি করে নাচ গান করা হয় । গ্রাম থেকে গ্রামে চলে এই চলমান নাচ গানের অনুষ্ঠান। এই নাচের অনুষ্ঠান দেখতে দূরদূরান্ত থেকে বহু লোকের সমাগম হয়। এছাড়া বড় ট্রাক্টরে মন্দির বানিয়ে ধাপে ধাপে পুতুল সাজিয়ে

রামায়ণ মহাভারতের নানা পৌরাণিক আখ্যান তুলে ধরা হয়, একে *থাকা* বলে। চলন্ত মন্দিরের সাথে থাকে বাজনা সহযোগে শোভাযাত্রা।

নারকেলডাঙার জগতগৌরী উৎসবে ঝাঁপানতলায় ১০০০টি ও মূলমন্দিরে ২৫০০টি পাঁঠাবলি হয়। এছাড়া সারা বছর শনি মঙ্গলবার দুটো থেকে দশটা বলির প্রচলন রয়েছে। মল্লভূম বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব শাসকদের প্রভাবে বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহুযুগ আগে থেকে বলি নিষিদ্ধ হয়েছে অথচ পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে নারকেলডাঙায় ধর্মের নামে এই নির্মম প্রথা ভয়ঙ্করভাবে চলছে।

মুসলমান ধর্মের মানুষও সাপের হাত থেকে বাঁচতে এই মন্দির থেকে ফুল নিয়ে যায়, এবং যেখানে আল্লাহ'র উপাসনা করে সেখানে নিয়ে যায়। সাপের ভয় এখানে ধর্মের মেলবন্ধন ঘটায়।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে চণ্ডী মনসার অভেদ ভাবনা - পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতের নানা রাজ্যে বিখ্যাত মনসামন্দিরে যে মনসা পূজা প্রচলিত, সেখানে মনসাকে মহাশক্তির প্রকাশ রূপেই দেখা হয়। এ প্রসঙ্গে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারের মনসা মন্দির বা হরিয়ানার পাঞ্চকুলা জেলার ১০০ একর বিস্তৃত এলাকা নিয়ে গঠিত মনসা মন্দির বা অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরী জেলার বিখ্যাত মনসামন্দিরের কথা উল্লেখযোগ্য। বাংলার দুর্গোৎসবে নবমী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিথি। সারাদেশে শক্তির আরাধনায় একই সঙ্গে নানাভাবে নবরাত্রি পালিত হয়। অধর্মের বিনাশ ও ধর্মের জয়ের প্রতীকী রূপে বহু স্থানে রাবণের কুশপুত্তলিকা দাহ করার প্রথা রয়েছে। উত্তরাখন্ড বা হরিয়ানায় উল্লিখিত মনসামন্দিরগুলিতেও নবরাত্রিতেই মনসার বাৎসরিক পূজা উদযাপিত হয়। সুতরাং মহাশক্তিরূপিণী দেবীকে দুর্গা, অম্বা, কালি, যে নামেই আমরা চিহ্নিত করি না কেন, তার সঙ্গে মনসার একাত্মতার তত্ত্ব শুধু বাংলার নয়, ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত।

ওয়াদিপুরের মনসামন্দিরে দুর্গাষ্টমী তিথিতে চণ্ডীপাঠ, কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পালন, শিবের গাজন উৎসবে মনসার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, চাঁচর উৎসবে অশুভ দলনের জন্য দেবী মনসার কাছে পূজার্চনা, আরতি, নারকেলডাঙায় সিংহবাহনা দেবী মনসাকে দুর্গা ও

জগদ্ধাত্রীর ধ্যানমন্ত্রে আরাধনা একটি বিশেষ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করে। ধর্মের টানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা মনসামঙ্গলের কবিদের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে করেছেন সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ। গবেষণাসূত্রে দেখা যায় বহু জায়গায় মনসার আদি সেবক আদিবাসী, ডোম, রাজবংশী প্রভৃতি লোকায়ত সম্প্রদায়। সুন্দরবনের বহু অঞ্চলে একেবারে সাদামাটা ভাবে একটা মাটির ঢিবি গড়ে আদিবাসীরা আজও মনসা পূজা করে। বাঁকুড়ার অযোধ্যা গ্রামের বিশাল মনসাপরবে ডোম সম্প্রদায়েরই প্রথমাবধি পূজার অধিকার। নারকেলডাঙ্গার জগতগৌরীর মন্দিরের কাছে উদয়পুরের বেহুলা মাতার মন্দিরের সেবায়েতও ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত। আবার যেসব মন্দিরে দুর্গার সঙ্গে মনসাকে সমন্বিত করা হচ্ছে তাদের আদি সেবায়েত ব্রাহ্মণ। সম্ভবত মনসা পূজা যখন সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখা বা সাপের ভয়, যেকোন কারণে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তখন আদিবাসী তথা নিম্নবর্ণের মানুষের পূজিতা দেবীকে আরাধনা করায় ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণীয়ের কৌলীণ্য বাঁধা হয়। সহজ উপায় হিসাবে লৌকিক আর পৌরাণিক দেবীর অভিন্নতা প্রচার করা হয়। মনসাই যদি দুর্গা বা জগদ্ধাত্রী হন, তাহলে ব্রাহ্মণের পক্ষে তার আভিজাত্য তথা বংশ কৌলীণ্য বজায় রেখে পূজা করতে আর কোনো অসুবিধা থাকে না।

তথ্যসূত্র

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

তথ্যদাতা পুরুষ

১) মুক্তিপদ চক্রবর্তী

পেশা - নারকেলডাঙা জগতগৌরী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত

বয়স - ৫৭

ঠিকানা - গ্রাম - ভুরকুন্ডা, পোস্ট - বদ্যিপুর,থানা - কালনা, জেলা - নারকেলডাঙা।

২) আদিত্য চক্রবর্তী

বয়স - ৮৩

নারকেলডাঙা জগতগৌরী মন্দিরের পূজার অন্যতম সেবায়েত, মন্দির সম্পর্কিত যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনা করেন।

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - বৈদ্যপুর, থানা কালনা, জেলা - বর্ধমান।

৩) বিমল বাউড়ি

বয়স- ৪৫

পেশা - দিনমজুর

ঠিকানা - গ্রাম - নারকেলডাঙা, থানা কালনা, জেলা - বর্ধমান।

৪) মনোহর বেশরা

বয়স - ৩০

পেশা - টোটো চালক

ঠিকানা - গ্রাম - নারকেলডাঙা, থানা কালনা, জেলা - বর্ধমান।

৫) পিন্টু চ্যাটার্জী

বয়স - ৪৫

পেশা - রং এর কাজ

ঠিকানা - ওয়াদিপুর, মনসাতলা, থানা - ডোমজুড়, জেলা - হাওড়া।

৬) হারাধন পাত্র

বয়স - ৭৮

পেশা - অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী

ঠিকানা - ওয়াদিপুর, মনসাতলা, থানা - ডোমজুড়, জেলা - হাওড়া।

৭) সুশোভন পাত্র

বয়স - ৫০

পেশা - বেসরকারি চাকরি, পঞ্চায়েত কর্মী

ঠিকানা - ওয়াদিপুর, মনসাতলা, থানা - ডোমজুড়, জেলা - হাওড়া।

মহিলা

১) শিলা পাত্র

বয়স - ৫২

গৃহবধূ

ঠিকানা - ওয়াদিপুর, মনসাতলা, থানা - ডোমজুড়, জেলা - হাওড়া।

২) দীপালি চ্যাটার্জী

বয়স - ৪০

গৃহবধূ

ঠিকানা - ওয়াদিপুর, মনসাতলা, থানা - ডোমজুড়, জেলা - হাওড়া।

৩) অপর্ণা পাত্র

বয়স - ৪৮

পেশা - জরির কাজ করেন

ঠিকানা - ওয়াদিপুর, মনসাতলা, থানা - ডোমজুড়, জেলা - হাওড়া।

৪) অর্চনা পাত্র

বয়স - ৫০

পেশা - জরির কাজ করেন

ঠিকানা - ওয়াদিপুর, মনসাতলা, থানা - ডোমজুড়, জেলা - হাওড়া।

৫) সাবিত্রি টুডু

বয়স - ৩২

গৃহবধূ

গ্রাম+পোস্ট - বৈদ্যপুর, থানা - কালনা, জেলা বর্ধমান।

৬) যমুনা হেমব্রম

বয়স - ৫৫

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম - নারকেলডাঙা, থানা - কালনা, জেলা বর্ধমান।

বর্ধমানের ঝাঁকলাই পূজা

এলাকার পরিচয় -

১) গ্রাম - ছোট পোষলা, গ্রাম কোড - ৩১৯১৫৩ পোস্ট - পোষলা, থানা - মঙ্গলকোট, জেলা - বর্ধমান, পিন কোড - ৭১৩১২৫ , এলাকার পরিধি - ৮৩.৩৯ হেক্টর মোট জনসংখ্যা - ৯৩০, পুরুষ - ৪৬৮, মহিলা - ৪৬২ , সকলেই হিন্দু

২) গ্রাম - মুসারু, পোস্ট - পোষলা, থানা - মঙ্গলকোট, জেলা - বর্ধমান মোট জনসংখ্যা - ১৩৩৬, পুরুষ - ৬৭২, মহিলা - ৬৬৪ , সকলেই হিন্দু

বাংলায় প্রচলিত সাপের দেবী মনসা। মনসা নিজে সাপ কিনা তা নিয়ে ভিন্ন মত প্রচলিত। তবে তিনি সর্পাভরণা। সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচতে, ভয়ে ভক্তিতে নিরাপত্তার জন্যই মূলত মনসা পূজার সূত্রপাত। মনসা পূজার সঙ্গেও সাপ খেলা দেখানো ঝাঁপান গানের

প্রচলন রয়েছে বাংলার নানা প্রান্তে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ভেলা ভাসানো উৎসবে জীবন্ত সাপ সংগ্রহ করে ভেলায় তাদের রেখে নদীতে ভাসানো হয় কোথাও কোথাও। মনসার প্রতিকৃতি হিসাবে নাগঘট পূজার প্রচলনও রয়েছে। নাগ ও সাপ এক্ষেত্রে একার্থবাচক। তবে জীবন্ত সাপকে দেবী মনসা জ্ঞানে পূজা করার রীতি সেভাবে প্রচলিত নয়। বর্ধমান জেলার কিছু গ্রামে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসাবে জীবন্ত সাপ পূজা হয়ে আসছে প্রায় চারশো বছর ধরে। মঙ্গলকোট থানার মুসারু, ছোটপোষলা, বড়পোষলা, পোলসোনা, নিগণ, শিকড়তো, মইদান - এই গ্রামগুলির জনপ্রিয় আঞ্চলিক দেবী ঝঙ্কেশ্বরী বা ঝাঁকলাই।

ঝংকেশ্বরীর পূজার উদ্ভব ও প্রসার - ঝঙ্কেশ্বরী বা গ্রামবাসীদের মুখে প্রচলিত ঝাঁকলাই কেউটে প্রজাতির একটি বিশেষ সাপ, যাকে দেবী কল্পনায় পূজা করা হয়। মুসারু, ছোটপোষলার ঝাঁকলাই মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত শ্যামল কুমার চক্রবর্তী ও গ্রামবাসীদের কথা অনুযায়ী মুসারু, ছোটপোষলা, বড়পোষলা, পোলসোনা গ্রামগুলির মধ্যবর্তী মাঠে জীবন্ত দেবী ঝাঁকলাই এর প্রথম দেখা পাওয়া গেছিল ৪০০ বছর আগে। মাঠের মধ্যে পাওয়া গেছিল কিছু বড় আকারের নুড়ি পাথর। শোনা যায় স্বপ্নাদেশ পেয়ে মন্দিরে নুড়িপাথরগুলিকেই দেবী জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা করেন তৎকালীন মুসারু গ্রামের পুরোহিত মুরলী মোহন চক্রবর্তী। এই চক্রবর্তী বংশই উত্তরাধিকার সূত্রে চারটি গ্রামের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবীর পৌরোহিত্য করে আসছেন। পরবর্তীকালে মুসারু, ছোটপোষলা, বড়পোষলা, পোলসোনা গ্রামে বড় মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কালো পাথরের দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় মুসারু ও ছোটপোষলার মন্দিরে। আষাঢ় প্রতিপদ তিথিতে দেবী ঝঙ্কেশরীর বাৎসরিক পূজা হয় উল্লিখিত গ্রামগুলিতে। মানসপূরণে সেদিন পাঁঠাবলি হয়। এছাড়া চক্রবর্তী বংশীয় পুরোহিত নিত্য পূজা করেন। মন্দির বর্তমান পুরোহিতের কাছে পাওয়া ঝঙ্কেশ্বরীর প্রকটকাল সম্পর্কে জানা যায়। নয়শো এগারো সালে আষাঢ় মাসে স্বপ্নাদেশ পেয়ে মুরলী মোহন চক্রবর্তী কৃষ্ণা প্রতিপদে দেবী ঝঙ্কেশ্বরীর পূজা প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর থেকে ঐ নির্দিষ্ট তিথিতেই প্রতি বছর দেবীর ধুমধাম করে পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝাঁকলাই পূজার বিশেষত্ব - মনসা পূজায় ধূপ ধুনোর ব্যবহার নেই, কিন্তু ঝঙ্কেশ্বরীর পূজায় ধূপ ধুনো ব্যবহৃত হয়। আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে প্রতি বছর ঘটা

করে ঝঙ্কেশ্বরীর পূজা হয়। মানস পূরণে পাঁঠাবলি হয়। এই পাঁঠাবলি মনসা পূজার সঙ্গেও নানা স্থানে প্রচলিত। পূজার আগের দিন তেল হলুদ দিয়ে দেবীর গাত্র মার্জন করা হয়। পূজার দিন সকালে সেবায়েত পরিবার দ্বারা পূজা হওয়ার পর, বীরভূম জেলার শ্রীকৃষ্ণপুরের জমিদারদের পক্ষ থেকে পূজা উৎসর্গ করা হয়, তারপর এলাকার উগ্রক্ষত্রিয় সাঁই মল্ল কুণ্ডু পরিবারের পূজা উৎসর্গ করা হয়। সব শেষে সর্বসাধারণের পূজা। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ গ্রামবাসীর নামে আদৌ কোনো পূজা ঝাঁকলাইকে উৎসর্গ করা হয় না, গ্রামবাসীরা লাইন দিয়ে আসে, টাকা বা নিবেদন সামগ্রী যা কিছু আনে তা মন্দিরে দিয়ে চলে যায়, তারা জানে যে তাদের পূজা উৎসর্গ করা হয়েছে, কিন্তু মন্দিরের সেবায়েত জানান যে যেহেতু পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকাচার পালন করতে অনেক রাত হয়ে যায়, তাই গ্রামবাসীদের পূজা উৎসর্গ করার আর সময় থাকে না, পরবর্তী উপাচার পালনের জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে যান।

এছাড়া এই পূজার বিশেষ উপাচার হিসাবে *নাগকলস বা ক্ষীরকলস যাত্রা* অনুষ্ঠিত হয়। চারটি গ্রামের মন্দির থেকে একটি কলসিতে ক্ষীর, দই, ও দেবীকে নিবেদন করা সামগ্রী রেখে নতুন গামছায় কলসির মুখ বেঁধে, চাঁদমালা রজনীগন্ধা, বেলফুলে কলসি সাজিয়ে, একজন ঢাকি সহ একজন ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। গ্রাম ঘুরে আসার পর চারটি মন্দির থেকে আসা চারজন ব্রাহ্মণ গ্রামগুলির মধ্যেখানে অবস্থিত মাঠে দেবীর আবির্ভাব স্থলে মিলিত হন। দেবীকে ভোগ নিবেদন করে চার ব্রাহ্মণ একত্রে ঐ মাঠেই ঝাঁকলাই এর পূজা করেন। পূজা শেষে কলস ভাঙা হয়। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী ক্ষীরকলস যাত্রার উপকরণ বাড়িতে রাখলে তা সাপের কামড় থেকে পরিবারের সকলকে নিরাপত্তা দেয়। এই বিশ্বাস থেকে গ্রামের মানুষেরা কলসের ফুল, চাঁদমালা, সংগ্রহ করে নিজের নিজের ঘরে নিয়ে যান।

ক্ষীরকলস যাত্রার অনুষ্ঠান শেষ হলে রাত ন'টা থেকে সাড়ে ন'টা নাগাদ সিংহাসনে উপবিষ্ট ঝঙ্কেশ্বরীকে গাড়িতে তুলে দেবীকে নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোয়। পাশাপাশি গ্রামগুলি থেকেও দেবীমূর্তি নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হলে পুনরায় একসাথে চলে দেবীর পূজা। রাত

বারোটা নাগাদ পূজা সমাপন হলে দেবীকে পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি রোয়াপূজা নামে পরিচিত।

ঝাঁকলাই সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস - উল্লিখিত গ্রামগুলির শোবার ঘরে, রান্না ঘরে, বাড়ির উঠোনে, মন্দিরে কেউটের সমগোত্রীয় ঝাঁকলাই নামে পরিচিত সাপগুলি যত্র তত্র দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে সাপটি অত্যন্ত বিষাক্ত তবে একটু নিস্তেজ প্রকৃতির, সচরাচর কামড়ায় না। গ্রামবাসীরা বলেন এই সাপ তাদের কোনো ক্ষতি করে না, উপরন্তু এই সাপের জন্য গ্রামে অন্য কোনো সাপের উপদ্রব নেই। যদি ঝাঁকলাই কামড়ায়, তাতেও কারও মৃত্যু বা কোনও ক্ষতি হয় না। এরা ঝাঁকলাই এর কামড়কে দেবীর প্রসাদ বলে মনে করেন। মুসারুর অধিবাসী ঝঙ্কেশ্বরীর মন্দিরগুলির বর্তমান পুরোহিত শ্যামল কুমার চক্রবর্তী বলেন তিনি সারা জীবনে প্রায় দু'হাজার সাপে কামড়ানো মানুষকে সুস্থ হতে দেখেছেন। যেখানে ঝাঁকলাই কামড়ায়, প্রচুর রক্ত বেরোয়, লাল হয়ে ফুলে যায়, প্রচণ্ড জ্বালা করে, কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তিকে উপবাসে রেখে, গ্রামের পুকুর থেকে স্নান করিয়ে মায়ের মন্দিরে আনার পর, দু'একদিনের মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যায়।

ঝাঁকলাই পূজার বিপন্নতা ও আনুষ্ঠানিকতায় বৈষম্য - সারা বছর নিত্য পূজা ও বিশেষ দিনে জাঁকজমক সহযোগে পূজার আয়োজন হলেও ঝঙ্কেশ্বরীর পূজা নিয়ে এক আসন্ন সম্ভাব্য সংকট তথা বিপন্নতার কথা বলেন বর্তমান সেবায়েত তিপান্ন বছর বয়স্ক শ্যামলকুমার চক্রবর্তী। এই পরিবার কর্তৃক দেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বিস্তৃত কালব্যাপী এরা দেবীর আরাধনা করে আসছেন। দেবীর সেবার স্বত্ব কেবল মুসারুর এই চক্রবর্তী পরিবারেরই রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষিত যুবকেরা কর্মসংস্থানের চাহিদায়, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তাগিদে অধিকাংশই এই প্রত্যন্ত গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী। ভয় ভক্তির মিশ্রিত চেতনার দ্বারা কিছুটা বাধ্য হয়ে কেউ না কেউ এ দায়িত্ব সামলাচ্ছেন এতকাল। তবে ভবিষ্যতে এ গুরু দায়িত্ব নেওয়ার অভাব হলে, কীভাবে পূজা চালানো সম্ভব হবে, সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন মন্দিরগুলির বর্তমান সেবায়েত শ্যামলবাবু ।

অন্যদিকে গ্রামের সাধারণ মানুষ এ পূজায় সামিল হলেও তাদের তো পূজার অধিকার নেই। মন্দিরের পুরোহিত চক্রবর্তীরা গ্রামগুলির অধিকাংশ তপশিলি জাতিভুক্ত চাষিদের

পূজায় সরাসরি অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অপাংক্তেয় বলে মনে করেন। আবার গ্রামগুলির সকলেই হিন্দু হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষও যথেষ্ট প্রকট। তাদের মতে ইতিপূর্বে নিকটস্থ সাতটি গ্রামে ঝঙ্কেশ্বরীর দেখা পাওয়া যেত, কিন্তু মুসলিমদের অনাচারেই দেবী এখন কেবলমাত্র চারটি গ্রামেই অবস্থান করেন।

ঝঙ্কেশ্বরী নামের উৎস সন্ধান - পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট ব্লকের পোষলা মৌজা, পলসোনা মৌজা, মুসারু মৌজা আগে ধৈঞা পরগণার অন্তর্গত ছিল। এই ধৈঞার পূর্ব নাম ঝঙ্ক অনুসারে সম্ভবত ঝঙ্কেশ্বরী নামের উদ্ভব হয়। আবার অনেকে বৌদ্ধ মহাযান তন্ত্রের সুপরিচিত দেবী জাঙ্গুলি থেকেই ঝাঁকলাই নামটির উদ্ভব বলে দাবী করেছেন। মঙ্গলকোট থানার বাবলাডিহি গ্রামে ন্যাংটেশ্বর শিব নামে পূজিত দেবমূর্তি আসলে জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের। আবার কুন্দা গ্রামের ব্রহ্মেশ্বর মূর্তিটি আদতে একটি বুদ্ধমূর্তি। বহিঃশত্রুর আক্রমণে ধর্মীয় চেতনা বিধ্বস্ত হলে, এই সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটে। এই কারণেই বৌদ্ধ দেবী জাঙ্গুলি থেকে ঝঙ্কেশ্বরীর উদ্ভব অনুমান করা হয়। একদিকে ঝঙ্কেশরীর পূজায় কেবল চক্রবর্তী পরিবারের অধিকার, এবং তাদের চোখে হেয় প্রতিপন্ন উল্লিখিত গ্রামগুলির কৃষক সমাজ, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে দেবীকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিদ্বেষ গ্রামের মানুষের চেতনায় বয়ে চলা সংকীর্ণ সামাজিক ভেদবুদ্ধি তথা ধর্মীয় গোঁড়ামির পরিচায়ক।

মনসা ও ঝঙ্কেশ্বরী - ছোট পোষলার মন্দিরের গায়ে লেখা আছে -

"শিবের বরে বেহুলা ফিরে পেল স্বামী
কীভাবে করলে পূজা মাগো তুষ্ট হবে তুমি
শিবের মানস কন্যা তুমি মা ভয়ঙ্করী
প্রণমি তোমায় মাগো দেবী ঝঙ্কেশ্বরী
কশ্যপ মুনির কন্যা তুমি মা দয়াময়ী
তোমার পূজা প্রচারি ওগো গুণমণি"

এ বর্ণনায় পুরাণ অনুযায়ী কশ্যপ মুনির কন্যা, শিবের মানস কন্যা মনসা আর ঝঙ্কেশ্বরীকে এক করে দেওয়া হয়েছে। ছোট পোষলার অনেক চাষির কথায় ঝাঁকলাই তো মা মনসারই রূপ। আবার অনেকে মনে করেন ইনি মনসামঙ্গলের কালনাগিনী। ঝঙ্কেশ্বরীর হঠাৎই শেষ

হওয়া লেজ মঙ্গলকাব্যে বেহুলার জাঁতির আঘাতে কেটে যাওয়া কালনাগিনীর লেজের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া এরূপ লোকবিশ্বাসের কারণ। অথচ মন্দিরের পুরোহিতের মতে ঝাঁকলাই সম্পূর্ণ পৃথক দেবী। যারা মন্দির বানিয়েছে, ঝঙ্কেশ্বরী যে পৃথক দেবী সে বিষয়ে অজ্ঞতার জন্যই তারা তারা নিজেদের মত সাজিয়ে তুলতে মন্দিরগাত্রে এরকম ভুল উক্তি খোদাই করে গেছেন। সেবায়েতের মতে ছোটপোষলা বা মুসারুর অনেক চাষিরা অজ্ঞতার জন্যই মনসা ও ঝঙ্কেশ্বরীকে এক মনে করেন। কিন্তু মনসার সঙ্গে ঝাঁকলাই এর কোনো সম্পর্ক নেই। দুই দেবীর পূজার উপাচার ও ধ্যানমন্ত্রও আলাদা।

মনসা ও ঝঙ্কেশ্বরী দুই-ই সাপের দেবী। মনসা বিস্তৃত কাল ব্যাপী বহু কবির লেখনী আশ্রয়ে মঙ্গলকাব্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবী হয়ে উঠেছেন। কাব্যে মনসা দেবী হিসাবে স্বীকৃতি তথা নিজ মহিমার প্রসার চেয়েছিলেন। বাস্তবে তিনি সমগ্র বঙ্গ সংস্কৃতিতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। অপরদিকে দেবী ঝঙ্কেশ্বরী প্রচার বিমুখ, তিনি কয়েকটি ছোট্ট গ্রামের মধ্যেই আবদ্ধ। মন্দিরের সেবায়েতের কথানুযায়ী নির্দিষ্ট গ্রামগুলির বাইরে তাদের দেবীর প্রচার নিষিদ্ধ। তবে এই ঝাঁকলাইএর মারণ বিষ থাকা সত্ত্বেও এতদ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে কেউটে প্রজাতির এই সাপের দীর্ঘ সহাবস্থান, তার কামড়ে মৃত্যু না হওয়ার ঘটনা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। ফলে নানা সময়ে নানা সংবাদসংস্থার মাধ্যমে দেবী ঝঙ্কেশ্বরীর কথা নানা ভাবে প্রচারিত হয়েছে।

বিভিন্ন কবির মনসামঙ্গল অনুসারে মনসা রাখাল বাড়ির, জালু মালুর পূজা পেলেও চাঁদ বণিকের পূজা পেতে তাকে চরম নির্মম হতে হয়েছিল। মনসার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে নানা গবেষণা আজও চলছে তবু দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি লৌকিক দেবীর পরিচয়েই সমাদৃত। পাশাপাশি আর এক সাপের দেবী ঝঙ্কেশ্বরী, যিনি কেবল একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের দ্বারা পূজিতা হয়ে আসছেন এবং ক্ষত্রিয়, কায়স্থেরা নিজেদের নামে দেবীকে পূজা নিবেদন করতে পারলেও সাধারণ গ্রামবাসীরা তপশিলি জাতিভুক্ত হওয়ায় কৌশলে ব্রাহ্মণ সেবায়েত তাদের প্রত্যক্ষভাবে পূজায় সামিল করছেন না। অর্থাৎ মনসা লোকসমাজেই অধিকতর পূজিতা, আর ঝঙ্কেশ্বরী ব্রাহ্মণের অধিকৃত দেবী। বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় মনসাপূজার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে ঝাঁপান গান, অন্যদিকে মুসারু, ছোটপোষলা, বড়পোষলা, পোলসোনা

গ্রামে বেদের প্রবেশ তথা ঝাঁপান গান নিষিদ্ধ। পাশাপাশি আলোচনায় একদিকে মনসা ও ঝঙ্কেশ্বরী সর্প সংস্কৃতির অঙ্গীভূত দুই দেবীর নিজেদের অবস্থানগত বৈপরীত্য উঠে আসে এবং সেই সাথে এদের কেন্দ্র করে সামাজিক বর্ণবৈষম্যের সংকীর্ণ চেহারাও প্রত্যক্ষ হয়।

তথ্যসূত্র

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

তথ্যদাতা পুরুষ

১) দিবাকর নন্দী

বয়স - ৬০

ঠিকানা - ছোট পোষলা, পোষ্ট - পোষলা, থানা - মঙ্গলকোট, জেলা - বর্ধমান

পেশা - চাষের কাজ।

২) হেমন্ত মণ্ডল

বয়স - ৮০

ঠিকানা - ছোট পোষলা, পোষ্ট - পোষলা, থানা - মঙ্গলকোট, জেলা - বর্ধমান

পেশা - চাষের কাজ।

৩) গদাধর দে

বয়স - ৭০

ঠিকানা - ছোট পোষলা, পোষ্ট - পোষলা, থানা - মঙ্গলকোট, জেলা - বর্ধমান

পেশা - ব্যাবসা ও চাষের কাজ।

৪) শরৎ সিং

বয়স - ৫৫

ঠিকানা - ছোট পোষলা, পোষ্ট - পোষলা, থানা - মঙ্গলকোট, জেলা - বর্ধমান

পেশা - ট্রাক চালান।

৫) পার্থ দে

বয়স - ৪৬

ঠিকানা - ছোট পোষলা, পোষ্ট - পোষলা, থানা - মঙ্গলকোট, জেলা - বর্ধমান

পেশা - রং মিস্ত্রি।

৬) শ্যামল চক্রবর্তী

বয়স - ৫৩

ঠিকানা - মুসারু, পোষ্ট - পোষলা, থানা - মঙ্গলকোট, জেলা - বর্ধমান

পেশা - পুরোহিত ।

৭) অজয় কুমার দে

বয়স - ৬৫

ঠিকানা - ছোট পোষলা, পোষ্ট - পোষলা, থানা - মঙ্গলকোট, জেলা - বর্ধমান

পেশা - উকিল।

মহিলা

১) মনিকা দে

বয়স - ৫৫

ঠিকানা - ছোট পোষলা, পোষ্ট - পোষলা, থানা - মঙ্গলকোট, জেলা - বর্ধমান

গৃহবধূ।

২) রমা মণ্ডল

বয়স - ৩৬

ঠিকানা - ছোট পোষলা, পোষ্ট - পোষলা, থানা - মঙ্গলকোট, জেলা - বর্ধমান

গৃহবধূ।

৩) বিজলী দে

বয়স - ৬২

ঠিকানা - ছোট পোষলা, পোষ্ট - পোষলা, থানা - মঙ্গলকোট, জেলা - বর্ধমান

গৃহবধূ।

কমলা, বিমলা ও বেহুলার পূজা

এলাকার পরিচয়

১) গ্রাম - নেপাকুলি, ব্লক - কালনা ২, পোস্ট - গোদা অন্নদা, থানা - কালনা, জেলা বর্ধমান

মোট জনসংখ্যা - ৮২১ (২০১১ জনগণনা অনুসারে, ২০২১ এ সম্ভাব্য ৭৯৬ - ৯০৩)

পুরুষ - ৪১৮, মহিলা - ৪০৩, ছয় বছরের কম বয়সী শিশু ৮৭ জন

২) গ্রাম - উদয়পুর, পোষ্ট - শিঙার কোণ, থানা - কালনা, জেলা - পূর্ব বর্ধমান

মোট জনসংখ্যা - ২০১১ জনগণনা অনুসারে ৮১১

পুরুষ - ৪১২, মহিলা - ৩৯৯, ছয় বছরের কম বয়সী শিশু ৬৮ জন

আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসের নাগপঞ্চমী তিথিতে বর্ধমানের কালনা ব্লকের অন্তর্গত নেপাকুলি গ্রামে মনসার বাৎসরিক পূজা হয়। গ্রামের মধ্যেই ময়রা পাড়ার মূল মন্দির থেকে পাল্কি করে দেবী আসেন ঝাঁপানতলার মনসামন্দিরে। নেপাকুলি গ্রামের ঘোষপাড়া, ময়রা পাড়া, পশ্চিমপাড়া, তাঁতি পাড়া, আয়না পাড়া, আদিবাসী পাড়া, মধুবাটি, উমারপুর, ঝড়োবাটি, দত্তদাড়িয়া টোন, কদম্বা, হাজরা পাড়া, থেকে দেবীর নিবেদন সামগ্রী আসে। আদিবাসী পাড়ায় নাগপঞ্চমী উপলক্ষে অনেকে নিজেদের মাটির বাড়িতে রং করেন। নেপাকুলির ঝাঁপানতলার মনসাপূজাটি প্রকৃতপক্ষে একটি পারিবারিক পূজা। তবে এই পূজায় সামিল হয় প্রতিবেশী গ্রাম থেকে আসা বহু মানুষ। যাদের পারিবারিক পূজা, সেই মন্ডল পরিবারের দীপক মণ্ডল, মঞ্জু মণ্ডলরা জানান, এটি ২০০ বছর পুরনো পূজা। মনসার নিত্যপূজা ছাড়াও দশহরাতে গঙ্গা থেকে জল এনে দেবীকে স্নান করাবার বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। নাগপঞ্চমীর দিন মইএ সাজিয়ে বাজনাসহ মধুবাটি, উমারপুর, কদম্বা থেকে দেবীর পূজার উপাচার নিয়ে আসা হয়। আগে মণ্ডল বাড়ির পূজা, তারপর অন্যান্য গ্রামের পূজা নিবেদন করা হয়। শোভাযাত্রা সহকারে দেবীকে নিয়ে যাওয়া হয় ঝাঁপানতলায়। এখানে দেবীর পূজার জন্য মন্দির নির্মিত হয়েছে। এখানে পূজার শেষে দেবীকে পুনরায় মণ্ডল বাড়ির আদি মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়।

ঝাঁপানতলায় মনসার পাকা মন্দির কিন্তু সারাবছর ফাঁকা থাকে, কেবল বাৎসরিক পূজার বিশেষ দিনে দেবীকে এনে মন্দিরে পূজা বিধি পালন করা হয়। সেই সঙ্গে ভক্তেরা দণ্ডী কাটা, ধুনো পড়ানো ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা পালন করেন। পূজা উপলক্ষে পাঁঠাবলি হয়।

মণ্ডল বাড়ির পাশে বাঁশবাগানের মধ্যে মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি দিয়ে তৈরি নেপাকুলির মা মনসার আদি মন্দির। পরিবারের সদস্যরা জানান, দেবীর নির্দেশ অনুযায়ী তাকে এই মাটির তৈরি মন্দিরে রাখা হয়। তিনি কোনো পাকা মন্দিরে থাকবেন না, এমনই

স্বপ্নাদেশ আছে এই পরিবারের। তাই বাৎসরিক পূজার দিনেই কেবল মাত্র ঝাঁপানতলার পাকা মনসামন্দিরে দেবীর পূজা হয়। কিন্তু সারাবছর দেবী ওই মাটির ঘরেই থাকেন। এখানের মনসা আসলে দুটি দেড় ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট পিতলের ঘট। এদের নাম কমলা ও বিমলা। এরা দুই বোন। অর্থাৎ দেবী এখানে দুই বোন রূপে বিরাজ করেন। বিভিন্ন সময় ধনী ব্যক্তিরা দেবীর কৃপায় বিপদ মুক্ত হয়েছেন, এবং বহু লোকের মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় মাথার মুকুট, গলার হার সহ প্রচুর সোনার অলঙ্কার দিয়ে দেবীকে সজ্জিত করেছেন তারা। দুবেলা একটি করে মোমবাতি জ্বালিয়ে, ফুল জল দিয়ে দেবীর নিত্য পূজা চলে একেবারে সাদামাটাভাবে। আশ্চর্যের বিষয় এত গহনায় মোড়া দেবীর ঘটদুটি কোনো নিরাপত্তা বেষ্টনী ছাড়াই ওই জঙ্গলে ঘেরা মাটির ঘরে বহু যুগ ধরে একই ভাবে আছে। সম্ভবত, মনসা সাপের দেবী ব'লে তার জন্য আলাদা কোনো নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়নি। মানুষের অন্তরের সর্পভীতিই দেবীর বহুমূল্য গহণার চারপাশে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেছে। নেপাকুলির মানুষেরা কমলা ও বিমলারূপী মনসাকে সংস্কারে বিশ্বাসে অত্যন্ত জাগ্রত দেবী বলে মানেন।

কালনা থানার অন্তর্গত উদয়পুর গ্রামে বেহুলা মাতার মন্দির রয়েছে। বর্ধমান জেলায় বেহুলা মাতার মন্দিরের প্রেক্ষাপটে রয়েছে প্রত্যক্ষভাবে মনসামঙ্গলের প্রভাব। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলার যাত্রাপথে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের নাম পাওয়া যায়। ক্ষেমানন্দের কাব্যে আমরা পাই হাসনের ঘাট দিয়ে হাসনহাটি হয়ে নারকেলডাঙায় পৌঁছে বেহুলা মনসা পূজা করেছিল। এখান থেকে সে বৈদ্যপুর যায়।[১] কেতকাদাসের মনসামঙ্গলের সূত্রেই বর্ধমান জেলার বৈদ্যপুর রোডের নারকেলডাঙার সন্নিকটস্থ বেহুলা নদীর তীরবর্তী উদয়পুর গ্রামে বেহুলাকে নিয়ে গড়ে উথেছে মিথ। প্রচলিত মিথ অনুসারে হাসনহাটিতে কাঙারুল শেখ নামে এক মুসলিমের বাড়ির গোয়াল ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল বেহুলা। বন্ধ ঘর খুলে গৃহকর্তা দেখেন একটি কমবয়সী মেয়ে গোয়াল আলো করে বসে আছেন। সে পরিচয় দিয়ে চলে গেলে, পরবর্তীকালে তার মহিমা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন ওই মুসলিম পরিবার বেহুলার পূজা করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মুসলমান হওয়ায় তারা উদয়পুরের হিন্দুদের পূজার দায়িত্ব দেন। সেই সময় থেকে উদয়পুরে একটি বট

গাছের নীচে আষাঢ়পঞ্চমী তিথিতে বেহুলা পূজার প্রচলন হয়। পরবর্তীকালে মন্দির স্থাপন করে এখানে বেহুলা মাতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪১৪ সালে পুরনো মন্দির সংস্করণ করে পুনর্নির্মাণ করা হয়। এখানে বেহুলার নিত্যপূজা ছাড়াও আষাঢ় পঞ্চমীতে ধুমধাম করে বাৎসরিক পূজা পালন করা হয়। বর্তমানে কালনা দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত এই হাসনহাটি গ্রাম। কিছুদিন আগে পর্যন্তও ওই গ্রামের কাঙারুল শেখের উত্তরসূরিরা বেহুলা মাতার বাৎসরিক পূজার নিবেদন সামগ্রী পাঠাতেন। আগে তাদের পূজা দিয়েই তারপর উদয়পুর, বেলকুলি, হাজরাপাড়া, পাশাপাশি সব গ্রামের পূজা নিবেদিত হত। কিন্তু শেষ কয়েকবছর থেকে হাসনহাটি থেকে আর দেবীর পূজা আসে না বলে জানান মন্দিরের বর্তমান সেবায়েত সত্যনারায়ণ পণ্ডিত। বেহুলার বাৎসরিক পূজায় বহু যুগের প্রথা ভেঙে নিবেদন সামগ্রী পাঠানো বন্ধ হওয়ায় বর্তমান প্রজন্মের কাছে ভিন্নধর্মের দেবীর গুরুত্ব হারিয়েছে বলে মনে হয়।

বেহুলার বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে আদিবাসীরা আসে বাজনা বাজিয়ে। পঞ্চাশ ষাটটি পাঁঠাবলি হয়। মনসাসংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ মনসামঙ্গল। সেদিক থেকে বেহুলার পূজাও এই সংস্কৃতির অঙ্গীভূত। উল্লেখ্য যে মনসার সঙ্গে বেহুলা লক্ষিন্দরের পূজা পশ্চিমবাংলার অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। যেমন হাওড়ার ডোমজুড় থানার অন্তর্গত ওয়াদিপুরের মনসামন্দিরে মনসামাতার প্রতিমার দুদিকে রয়েছেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, বেহুলা ও লক্ষিন্দরের প্রতিমা। পটের ছবিতে, টেরাকোটার শিল্পীদের তৈরি মনসাচালি বা মনসাবারিতে মনসার সঙ্গে বেহুলা লক্ষিন্দরের প্রতিকৃতি যথাক্রমে আঁকা ও গড়া হয়। এছাড়া মনসা পালার কবিগানের আসরে, মনসাযাত্রায় মনসার পাশাপাশি সমান গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসাবে বেহুলাকে তুলে ধরা হয়। এছাড়া বেহুলা নামেই তৈরি হয়েছে একাধিক চলচ্চিত্র, টেলি ধারাবাহিক। বাঙালি সংস্কৃতিতে মনসার পাশে বেহুলার অবস্থান যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে। মনসার ব্যতিরেকেও বেহুলা আরাধনা লোকসংস্কৃতির গভীরে ছড়িয়ে থাকা মনসাচেতনারই স্বতন্ত্র বহিঃপ্রকাশ। উপরন্তু উদয়পুরের পূজায় হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ, শুদ্রের সহাবস্থান জাতি, ধর্মের সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধে উৎসবের মানবিক মহত্ত্বকেই তুলে ধরে।

তথ্যসূত্র

গ্রন্থ

১) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, সম্পাদনা অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব,লেখাপড়া, নাগপঞ্চমী ১৩৮৪,পৃ ২৭১।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

তথ্যদাতা পুরুষ -

১) দীপক মণ্ডল (নেপাকুলির মনসার পারিবারিক সূত্রে সেবায়েত)
পেশা - ব্যবসা ও চাষ
বয়স - ৫৫
ঠিকানা - গ্রাম - নেপাকুলি, ময়রা পাড়া, ব্লক - কালনা ২, পোস্ট - গোদা অন্নদা, থানা - কালনা, জেলা বর্ধমান।

২) নারায়ণ মণ্ডল
পেশা - চাষ (নেপাকুলির মনসার পারিবারিক সূত্রে সেবায়েত)
বয়স - ৭০
ঠিকানা - গ্রাম - নেপাকুলি, ময়রা পাড়া, ব্লক - কালনা ২, পোস্ট - গোদা অন্নদা, থানা - কালনা, জেলা বর্ধমান।

৩) রাজু সিংহ
পেশা - দিনমজুর
বয়স - ৪৪
ঠিকানা - গ্রাম - নেপাকুলি, আইনা পাড়া, ব্লক - কালনা ২, পোস্ট - গোদা অন্নদা, থানা - কালনা, জেলা বর্ধমান।

৪) উত্তম দাস
পেশা - চাষ
বয়স - ২৮
ঠিকানা - গ্রাম নেপাকুলি, দত্তদাড়িয়াটোন, ব্লক কালনা ২, পোস্ট গোদা অন্নদা, থানা কালনা, জেলা বর্ধমান।

৫) কার্ত্তিক দাস

পেশা - চাষ

বয়স - ৭০

ঠিকানা - গ্রাম - নেপাকুলি, আইনা পাড়া, ব্লক - কালনা ২, পোস্ট - গোদা অন্নদা, থানা - কালনা, জেলা বর্ধমান।

৬) শক্তিপদ সিংহ

ব্যবসা থেকে অবসর নিয়েছেন

বয়স - ৭৩

ঠিকানা - গ্রাম - নেপাকুলি, আইনা পাড়া, ব্লক - কালনা ২, পোস্ট - গোদা অন্নদা, থানা - কালনা, জেলা বর্ধমান।

৭) সত্যনারায়ণ পণ্ডিত

বয়স- ৬৫

পেশা - চাষ, বেহুলা মাতার মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত সেবায়েত

ঠিকানা - গ্রাম - উদয়পুর, পোষ্ট - শিঙার কোণ, থানা - কালনা, জেলা - পূর্ব বর্ধমান।

৮) রাজনারায়ণ পণ্ডিত

বয়স- ৩৫

পেশা - ব্যবসা

ঠিকানা - গ্রাম - উদয়পুর, পোষ্ট - শিঙার কোণ, থানা - কালনা, জেলা - পূর্ব বর্ধমান।

১) মঞ্জু মণ্ডল

বয়স - ৪০

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম - নেপাকুলি, ময়রা পাড়া, ব্লক - কালনা ২, পোস্ট - গোদা অন্নদা, থানা - কালনা, জেলা বর্ধমান।

২) রীতা সরদার

বয়স - ৪২

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম - নেপাকুলি, ব্লক - কালনা ২, পোস্ট - গোদা অন্নদা, থানা - কালনা, জেলা বর্ধমান।

৩) সুমনা সিংহ

বয়স - ৩৩

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম - নেপাকুলি, আয়না পাড়া,ব্লক - কালনা ২, পোস্ট - গোদা অন্নদা, থানা - কালনা, জেলা বর্ধমান।

৪) ছবি সিংহ

বয়স - ৬২

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম - নেপাকুলি, আয়না পাড়া, ব্লক - কালনা ২, পোস্ট - গোদা অন্নদা, থানা - কালনা, জেলা বর্ধমান।

৫) স্বর্ণময়ী পণ্ডিত

বয়স - ৭৫

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম - উদয়পুর, পোষ্ট - শিঙার কোণ, থানা - কালনা, জেলা - পূর্ব বর্ধমান।

৬) পম্পা বিশ্বাস

বয়স - ৪৮

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম - উদয়পুর, পোষ্ট - শিঙার কোণ, থানা - কালনা, জেলা - পূর্ব বর্ধমান।

৭) মৌসুমি পণ্ডিত

বয়স- ৩৫

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম - উদয়পুর, পোষ্ট - শিঙার কোণ, থানা - কালনা, জেলা - পূর্ব বর্ধমান।

৮) আলপনা পণ্ডিত

বয়স- ৪৫

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম - উদয়পুর, পোষ্ট - শিঙার কোণ, থানা - কালনা, জেলা - পূর্ব বর্ধমান।

বাঁকুড়ার অযোধ্যা গ্রামের কালীবুড়ি মনসার পরব

এলাকার পরিচয় -

১) গ্রাম + পোস্ট - অযোধ্যা, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - বাঁকুড়া, পিন কোড - ৭২২১৬৭
মোট জনসংখ্যা - ৩১৭১, পুরুষ ১৬০২, মহিলা - ১৫৬৯
গ্রামের সকলেই হিন্দু

২) গ্রাম - মালপুর
পোষ্ট - রামসাগর, ব্লক - ওন্দা, জেলা - বাঁকুড়া, পিন কোড - ৭২২১৪৭
মোট জনসংখ্যা - ৩৬৩৯, পুরুষ ১৬৪৭, মহিলা - ১৬৬১
গ্রামের সকলেই হিন্দু

৩) গ্রাম - নাকাইজুরি, ব্লক - ওন্দা, জেলা - বাঁকুড়া , পিন কোড - ৭২২১৪৪
লোকসংখ্যা - ২১১৫, পুরুষ - ১০৪৭, মহিলা - ১০৬৮, ছয় বছরের কমবয়সী শিশু - ২৫৬, গ্রামের সকলেই হিন্দু

৪) পাঁচমুড়া - তালডাংরা গ্রাম পঞ্চায়েত এর অধীনস্থ গ্রাম, মহকুমা - খাতরা
মোট জনসংখ্যা - ৩৭১৯, পুরুষ ১৮৫৪, মহিলা - ১৮৬৫, পিন কোড - ৭২২১৫৬
গ্রামের সকলেই হিন্দু

বাঁকুড়া জেলা সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট উৎসব বিষ্ণুপুরের নিকট দ্বারকেশ্বর নদীর উত্তরে অবস্থিত অযোধ্যা গ্রামের মনসার পরব। অযোধ্যায় মনসার আঞ্চলিক নাম কালীবুড়ি। যে লোকাচারগুলির সমন্বয়ে এই অঞ্চলের মনসাসংস্কৃতি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে সেগুলি হল -

গিন্নিপালন, ঢাকে কাঠি, স্নানযাত্রা, দণ্ডীকাটা, ভোক্তানাচ, বনমালাছেঁড়া, গঙ্গাপূজা, আগুনসন্ন্যাস, সইঘর যাত্রা, ভৈরব ও মনসার মালাবদল, ও ধুনোপোড়ানো।

এ অঞ্চলের মানুষ *মা মনসার দহ, গিন্নিপালন, বিড়রা গ্রামে মনসার সইঘর* ইত্যাদি বিষয়ে বিচিত্র মিথকে বিশ্বাসে সংস্কারে গ্রহণ করেছে। অয়োধ্যা গ্রামে দেবী মনসাকে কেন্দ্র

করে গড়ে ওঠা মিথগুলির পরিচয় ও কালীবুড়ি মনসার পরবে পালিত হয়ে আসা লোকাচারগুলি নিম্নরূপ।

দশহরায় গঙ্গা পূজার পনেরো থেকে কুড়িদিন আগে একটি বিশেষ লোক অনুষ্ঠান গিন্নিপালনের মধ্যে দিয়ে অযোধ্যা গ্রামের মনসা পরবের সূচনা হয়। *গিন্নিপালন* মনসাপরবের সঙ্গে যুক্ত একেবারে আঞ্চলিক একটি উৎসব। বাঁকুড়ার অযোধ্যা ও পাশাপাশি অবস্থিত কয়েকটি গ্রাম ছাড়া সম্ভবত আর কোথাও এর প্রচলন নেই। দশহরা উৎসবটি হয় জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে। গিন্নিপালনে পালনীয় লোকাচারগুলি হল - *ফুল কাড়ানো, চুয়া কাটা, রামসীতার বিয়ে ও মনসা পূজা* ।

স্থানীয় অধিবাসীদের থেকে জানা যায় গিন্নিপালনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিশেষ মিথের কথা। বহু যুগ পূর্বে মা মনসা নাকি ছদ্মবেশে এসে একবার স্থানীয় নদীর তীরে স্নান করতে আসা গিন্নিদের সঙ্গে কথাবার্তা, গল্পগুজব, হাসি ঠাট্টা করেছিলেন। তারপর তিনি গ্রামের মনসা মন্দিরের সেবাইত ও অন্যান্য কিছু গিন্নিদের স্বপ্নাদেশ দেন এবং দ্বারকেশ্বর নদীর দক্ষিণ তীরের নিকটবর্তী অতি নির্জন স্থান চটাইএ তার সাথে খেলতে আসার নির্দেশ দেন। সেখান থেকেই এই উৎসবের সূত্রপাত। গিন্নিপালন সম্পূর্ণ নারীদের উৎসব। এখানে কুমারী মেয়ে ও পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

গিন্নিপালন উদযাপিত হয় শনি বা মঙ্গলবার। যে গিন্নিরা উৎসবে সামিল হবেন, তারা আগের দিন কোনো আমিষ খাবেন না। অযোধ্যায় মনসার সেবাইত পূর্বপুরুষ সূত্রে ডোমেরা। এরাই প্রতি বছর গিন্নিপালনের দিন ঠিক করে দেন। গ্রামের একজন মহিলা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গিন্নিদের নিমন্ত্রণ করে আসেন। ইনি ডাকিয়া গিন্নি নামে পরিচিত। যে গিন্নিরা বহু বছর থেকে গিন্নিপালনের সঙ্গে যুক্ত তাদেরই আমন্ত্রণ জানানো হয়। গিন্নিপালনের দিন সকালে স্নান করে নতুন বস্ত্র পরে গিন্নিরা বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গে নেন, কাঁসার বড় বাটি (প্রচলিত কথায় জামবাটি), ঘটি, নতুন গামছা, তেল, হলুদ, পদ্মফুল, পুঁটলিতে বাঁধা মানতের ফুল, মিষ্টি, ফল, চিড়া ইত্যাদি। প্রথমে নিকটবর্তী ভৈরব বা ধর্ম

ঠাকুরের থানে গিন্নিরা জড় হন। পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী মনসামন্দির থেকে আসে ঢাকি। এরপর ঢাকের বাজনার সঙ্গে গিন্নিরা মনসামন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

মনসামন্দিরে এসে যে লোকাচার সম্পন্ন হয়, তার নাম ফুল কাড়ানো। মনসাকে যে ফুল নিবেদন করা হয়, তা দেবীর মাথা থেকে মেঝেতে পড়লে সেই ফুল দেবীর অনুমতিসূচক ধরা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অযোধ্যা গ্রামে জাঁকজমক সহকারে সম্পন্ন এই মনসার পরব সুসম্পন্ন করার জন্য রয়েছে দশহরা কমিটি। এদের প্রয়াসেই গিন্নিপালন থেকে শুরু করে মনসা পরবের যাবতীয় বিধি আচার সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। মনসার সেবাইত দেবীর অনুমতির ফুল, মানতের ফুল মিষ্টি,পান ও দশহরা কমিটির বরাদ্দ মিষ্টি তুলে দেন রাজার গিন্নির হাতে। জন্মসূত্রে জমিদার বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত গিন্নিই রাজার গিন্নি পরিচয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। এই উৎসবে কোনো জাতিভেদ বা ধনী গরীবের বৈষম্য থাকে না ।

মনসামন্দির থেকে গিন্নিরা যাত্রা করেন দুই কিলোমিটারের অধিক দূরবর্তী জাম, কেন্দ, বাঁশ ঝাড় পরিবেষ্টিত চটাই-এর উদ্দেশ্যে। তারা বুড়া ধর্মস্থানের কাছের ঘাট দিয়ে তপ্ত দুপুরে খালি পায়ে প্রচণ্ড গরম বালির উপর দিয়ে নদীর চর দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গন্তব্যস্থলে রওনা হন। গরমে পায়ের তলায় ফোস্কা পড়ে যায়। তাই কষ্ট কমাতে ভেজা খড় বিছিয়ে দেওয়া হয় উত্তপ্ত নদীর চরে। গিন্নিদের সঙ্গে থাকেন কেবল ঢাকি আর গিন্নিদের পার হবার সহযোগী কয়েকজন। নদীর মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছানোর পর নদীর অপর কুলের গ্রাম চড়ুইকুড় থেকে আসা গিন্নিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অযোধ্যার গিন্নিরা এক সঙ্গে যাত্রা করেন।

অযোধ্যার সন্নিকটস্থ পেঁচাকুড়া, লোহার আড়া গ্রামের গিন্নীরাও একই দিনে গিন্নিপালনে সামিল হন। পেঁচাকুড়ার গিন্নিরাও একই উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেও চটাই-এ পৌঁছানোর আগেই তারা নদীর মাঝখানে বালির চরে নিজেদের সীমানা নির্ধারিত করে সেখানে বসে গিন্নিপালনের আচার বিধি পালন করেন। বিডরা, পাণ্ডুরহাটি, বামুনপুকুর, এই তিন গ্রামের

গিন্নিরা মিলিত হয়ে স্থানীয় জঙ্গলে ঘেরা এক থানে গিন্নিপালন করেন। লোহারআড়া গ্রামের গিন্নিরা তাদের গ্রামের বড় পুকুরের পাড়ে গিন্নিপালন করেন।

অযোধ্যা ও চড়ুইকুড়ের গিন্নিরা চটাই-এ পৌঁছে দুটি চুয়া কাটে। চুয়া অর্থাৎ বালিতে কাটা খাল। একটি মা মনসার জন্য, একটি নিজেদের প্রয়োজন ও স্নান করার জন্য। এরপর ওই চুয়ার থেকে ঘট ভরে তুলে তাতে সিঁদুর লাগিয়ে মা মনসা হিসাবে পূজা করা হয়। পূজারীর কাজটি করেন ডাকিয়া গিন্নি। যেহেতু অযোধ্যার মনসা পূজায় প্রথমাবধি ডোম সম্প্রদায়ের অধিকার, তাই সেবাইত ডোম পরিবারের থেকে আগত গিন্নিই ডাকিয়া গিন্নির কাজ তথা পূজার কাজ করেন। গিন্নিরা রাজার গিন্নির মাধ্যমে নিজ নিজ কামনা বা মানত জানান মাকে। আর পূর্বের অভীষ্ট পূর্ণ হলে নানা প্রকার মিষ্টি, ফল ও শত পদ্মফুল দিয়ে দেবীর পূজা করেন। পূজা শেষে এখানেই প্রসাদ বিতরণ হয়। এখান থেকে কোনো প্রসাদ বাড়ি নিয়ে যাবার নিয়ম নেই। গিন্নিরা ছাড়াও ঢাকি ও সহযোগী ছেলেদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। গিন্নিরা কেবল ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তাদের সঙ্গে আনা ঘটি বাটি ইত্যাদি বাসনপত্র।

হয়তো বছরে একটা দিন সংসারের চিন্তা না করে নারীদের নিজেদের মত করে কাটানো, খাওয়া দাওয়া করাই এই ধরনের লোকাচার গড়ে ওঠার কারণস্বরূপ।

পূজা পর্ব শেষ হলে রাম সীতার বিবাহের আয়োজন করা হয়। গিন্নিদের একজন রাম, আর এক জন সীতা সাজে, তারপর জামগাছকে সাক্ষী রেখে তাদের বিয়ে হয়। রাজার গিন্নি হয় রাম, আর পূর্ব নির্ধারিত কেউ সীতা। সীতার মা কর্মকার পাড়ার কোনো গিন্নি সাজবেন, এমনটাই প্রচলিত নিয়ম। গিন্নিদের সাজানো হবে খড়ি মাটি, পদ্মফুলের মালা, জামপাতার মুকুট ইত্যাদি দিয়ে। মালাবদল, গিঁট বাঁধা ইত্যাদি বিয়ের আনুষঙ্গিক আচার পালিত হবে। বিবাহ সম্পাদনের কাজটি করবেন চড়ুইকুড় থেকে আসা গিন্নিদের একজন। কন্যাদান করতে পারেন কর্মকার পাড়ার গিন্নি। দান হিসাবে পাঁচটি জামবাটি ও পাঁচটি বাটি দেবার নিয়ম রয়েছে। তবে দানের বাসন দিন শেষে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বিয়েতে ঢাক বাজে, গিন্নিরা উলুধ্বনি দেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের শেষে নয়জন বিধবা গিন্নি বর বধূ ও

জামগাছকে নয়বার প্রদক্ষিণ করেন। এরপর বাসরের আনন্দ অনুষ্ঠান। উপস্থিত একমাত্র পুরুষ ঢাকিকেও এবার ফেরত পাঠিয়ে গিন্নিরা নিজেদের মধ্যে নাচ গান হাসি মশকরায় মেতে ওঠেন। মনসামঙ্গলের গান, কালি বা কৃষ্ণকীর্তন, রাম সীতার গান ইত্যাদি নানা পৌরাণিক গান, ছড়া কাটা ইত্যাদি নিজেদের মত করে পরিবেশন করেন গিন্নিরা। কী কী গাইতে হবে, তার সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। পৌরাণিক লৌকিক দেবদেবী বিষয়ক নানা গান এরা গেয়ে থাকেন। এরপর আবার মনসা পূজা করে গিন্নিরা আহার গ্রহণ করেন। এরপর স্নান সেরে গিন্নিদের মধ্যে চলে গল্পগুজব। বিকেলে গিন্নিরা আবার স্নান করে মনসা পূজা করে, নিজেদের পাত্রে চটাইয়ের জল ভরে নিয়ে, ডোমগিন্নিদের দেওয়া পান মুখে দিয়ে রাম সীতাকে নিয়ে যাত্রা করেন। মাঝপথ থেকে তাদের সঙ্গে যোগ দেন অপেক্ষারত যন্ত্রীরা। ডজনখানেক ঢাক বেজে ওঠে, সঙ্গে ব্যাণ্ডপার্টির বাজনা, ঢোল সানাই বাজে। নিকটস্থ হাই স্কুল সংলগ্ন ঘাটের কাছে থাকা বটগাছের কাছে আসে গিন্নিরা। এখানে এসে বটপাতা নিয়ে পুনরায় রামসীতাকে নয়বার প্রদক্ষিণ করে বটগাছকে গিন্নিপালনের সাক্ষী করা হয়। এখানে অযোধ্যা ও প্রতিবেশী গ্রামগুলি থেকে আসা কয়েক হাজার দর্শক গিন্নিপালনের শেষ মুহূর্তগুলো দেখতে জড়ো হন। শেষে উচ্ছসিত নাচ গান সারা হলে গিন্নিরা মনসা মন্দিরে ফিরে আসার জন্য যাত্রা করেন। ফেরার সময় পথের সব মন্দির বা থানে (ধর্ম ঠাকুরের থান বা ভৈরব থান ইত্যাদি) গিন্নিরা ভক্তিভরে জল ঢালেন। মনসামন্দিরে এসে রাম সীতার বস্ত্রের গিঁট খুলে বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার ঘোষণা করা হয়।

এরপর গিন্নিরা মনসামন্দির থেকে পান নিয়ে যে যার বাড়ি ফেরেন। বাড়ি ফেরার পথেও পথচলতি সব থানে জল ঢালতে ঢালতে ফেরেন। বাড়ির তুলসী মণ্ডপে ও ঘরের ভেতর প্রদীপ জ্বেলে গিন্নির কোনো কমবয়সী মেয়ে বা পুত্রবধূ তার জন্য অপেক্ষা করেন। গিন্নি বাড়িতে প্রবেশ করলে তার পা ধুইয়ে দেওয়া হয়, তারপর জলের ছিটা দিয়ে তাকে বাড়িতে প্রবেশ করানো হয়। এরপর স্নান সেরে গিন্নি রাতে মনসামন্দিরের মনসামঙ্গল গান শুনে উপস্থিত সকল গিন্নিকে বিদায় জানাবেন। এভাবেই গিন্নিপালন উৎসবের সমাপন হবে।

গিন্নিপালনের কয়েকদিন পর থেকে শুরু হয় *ঢাকে কাঠি* ও *ভোক্তা নাচ* নামক লোক অনুষ্ঠান। *ঢাকে কাঠি* বলতে মনসা পরবে ঢাক বাজাবার শুরুকে বোঝানো হয়। এই বাজনা চলতে থাকবে একেবারে পরবের শেষ পর্যন্ত। ঢাকের তালে তালে নাচবেন ভোক্তারা। যারা উপবাসে থেকে কিছু ধর্মীয় বিধি নিষেধ পালনের মধ্যে দিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ন্যাস নেন, এবং মনসার ঘট মন্দির থেকে মনসার দহে নিয়ে যান তারাই ভক্ত, আঞ্চলিক ভাষায় ভোক্তা। এরা প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায় ঘট নিয়ে মনসার দহে স্নান করেন, এবং ফিরে এসে এক বিশেষ নাচ পরিবেশন করেন। এই নাচ ভোক্তা নাচ নামে পরিচিত। রোজই বহু ভক্ত মা মনসার নামে সন্ন্যাস নেন। যেদিন থেকে ভোক্তা হবেন, সেদিন থেকে পরবের শেষ পর্যন্ত তাদের সন্ন্যাস পালন করতে হয়। জামাই ষষ্ঠীর দিন প্রচুর ভোক্তা সন্ন্যাস নেন। প্রায় দুই শত ভোক্তা সেদিন রাত বারোটা পর্যন্ত দেবীর থানের সামনে নাচে। সবচেয়ে বেশি ভোক্তা হন দশহরার দিন। সেদিন প্রায় দেড় হাজার ভোক্তা এক কিলোমিটার ব্যাপী দণ্ডী কাটে। শারীরিক কষ্টকে ছাপিয়ে যায় মনের আনন্দ। ভোক্তা হলে নিজের বাড়িতে খাবার, ঘুমাবার নিয়ম নেই। পরের বাড়িতে নিরামিশ খেতে হয়। ঠাকুরের থানে বা মন্দিরে নতুন গামছা পেতে রাতে থাকে ভোক্তারা। প্রতিবেশী কোন বাড়িতে খাওয়া আর মন্দিরে রাতে থাকাও ছেলেদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের। নয় থেকে দশদিন রোজ সন্ধ্যাবেলা এই ভোক্তানাচ চলতে থাকে। অযোধ্যার দশহরা উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ মনসার ঘট মাথায় নিয়ে এই বিশেষ ভোক্তা নাচ। দশহরার আগের দিন ভোর তিনটে থেকে মা মনসার দহে স্নানের উদ্দেশ্যে যায়। মা মনসার দহ আসলে দ্বারকেশ্বর নদীর ওপর একটি হ্রদবিশেষ। এই জলাশয়ের প্রতি এ অঞ্চলের মানুষের বিশেষ ভক্তি রয়েছে। এখানকার লোকজন বলেন, এই দহ থেকেই থেকে মা মনসার ঘট উঠেছিল কোনো একজনের জালে। স্বপ্নাদেশ পেয়ে ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত সেই জেলে মনসা পূজা শুরু করে। প্রাথমিকভাবে জেলের বাড়িতে, তারপর গাছতলায় পূজা হত। পরবর্তীকালে ইংরেজ কর্তৃক বাবু উপাধি প্রাপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় স্থানীয় জমিদার অযোধ্যা গ্রামে ১৮৭২ সালে মনসামন্দির নির্মাণ করেন এবং দেবী স্বরূপ মনসার ঘটকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। উল্লেখ্য যে রাঢ়ের যে কোনো পূজাতেই স্নানযাত্রার বিশেষ গুরুত্ব

দেখা যায়। পাত্রসায়রে শিবের গাজন উপলক্ষেও এই আড়ম্বরপূর্ণ স্নানযাত্রার প্রচলন রয়েছে। ভোর থেকে এক থেকে দেড় হাজার ছেলে মা মনসার দহ থেকে মনসা মন্দির পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার পথ দণ্ডী কাটে। এখানে যাদের মানত ছিল তারা ছাড়াও ছোট ছেলেরা মনের আনন্দে দণ্ডী কাটে। রাতে নতুন গামছা পেতে দুর্গামেলায় বা কোনো আটচালার নীচে থাকে। সন্ধ্যা থেকে রাত একটা-দুটো পর্যন্ত অযোধ্যার পাঁচটি পাড়ার ছেলেরা পর পর মনসার সামনে নাটমন্দিরে গিয়ে নাচবে, সঙ্গে ব্যান্ডপার্টির বাজনা বাজবে। প্রত্যেক পাড়ার জন্য নাচের সময় ভাগ করা থাকে। স্থানীয় পূজাকমিটির নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়।

রাত দেড়টার সময় আর এক লোকঅনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম *বনমালাছেঁড়া* । বিচুলি ও আমপাতা দিয়ে একটা মালা গাঁথা হয়। সম্ভবত আগেকার দিনে বনের কোনো পাতা এই মালা গাঁথতে ব্যবহৃত হত, তাই অনুষ্ঠানটির এরূপ নামকরণ। এই মালাটি রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দশ থেকে এগারো ফুট উপরে টানানো হয়। একজন ভক্ত দৌড়ে এসে এই মালাটি ছেঁড়ে। সাধারণ মানুষ অতটা ওপরে লাফাতে পারবে না, কেবল ভক্তের পক্ষেই এমন অসাধ্য সাধন সম্ভব, এমনই বিশ্বাস এখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে।

দশহরার সকালে অনুষ্ঠিত হয় গঙ্গাপূজা। শোভাযাত্রা সহকারে মা মনসার দহে গিয়ে এই গঙ্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর শোভাযাত্রা ফিরে আসার সময়ে গ্রামবাসীরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ির সামনে জলপূর্ণ ঘট, ঘটে আমপল্লব, হরিতকী, বনমালা ইত্যাদি দিয়ে, শঙ্খ বাজিয়ে প্রণাম করেন।

এরপর দ্বিতীয় অনুষ্ঠান আগুন সন্ন্যাস। যারা সন্ন্যাস নিয়েছে, তারা প্রায় ত্রিশ ফুট বিস্তৃত কয়লার আগুনের ওপর দিয়ে তিন বার ছুটে যাবে এবং আসবে। প্রতি বার দুধে পা দিয়ে যাত্রা শুরু করবে।

এরপরের অনুষ্ঠান ফুল কাড়ানো। প্রতিটি পাড়া থেকে দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদনের সামগ্রী নিয়ে আসবে। প্রতিটি পাড়ার জন্য সময় নির্ধারিত থাকে। দেবীর ঘট থেকে ভক্তের মাথায়

ফুল পড়ার আগে পর্যন্ত ভক্তেরা নাটমন্দিরে নাচতে থাকবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাণ্ডের সঙ্গে পর পর এক একটি পাড়া থেকে এসে নাচবে ও দেবী মনসার আশীর্বাদী ফুল সংগ্রহ করবে। উল্লেখ্য গিন্নিপালনের দিনও ফুল কাড়ানো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সইঘর অনুষ্ঠান - বিডরা গ্রামে একটি ছোট মনসার মন্দির রয়েছে। মনসার থান থেকে ছোট ছোট ঘট নিয়ে শোভাযাত্রা সহযোগে বিডরায় যাওয়া হয়। প্রচলিত মিথ অনুসারে বিডরার জনৈক মহিলা মা মনসাকে মন থেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন, এবং মনসাপূজার জন্য অধীর হয়েছিলেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে নানাবিধ অত্যাচার করতেন এবং কিছুতেই মনসা পূজা করতে দিতেন না। একদিন তাকে ঘরে আটকে রেখে পরিবারের সকলে অন্যত্র যান। তখন কমবয়সী একটি মেয়ে এসে তার সঙ্গে সই পাতায় তাকে পূজার সামগ্রী, নতুন শাড়ি ইত্যাদি দেয়, মেয়েটির উপস্থিতিতে সে মনসা পূজা করে। মেয়েটি চলে যাওয়ার আগে তার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে ঐ মহিলাকে অবগত করে। তিনিই দেবী মনসা একথা বুঝিয়ে মহিলাকে দর্শন দেওয়া, সই পাতানো ইত্যাদি যাবতীয় কথা পরিবারের সকলের কাছ থেকে গোপন করার নির্দেশ দেন। কিন্তু মহিলার শ্বশুরবাড়ির লোকজন ফিরে এসে নতুন শাড়ি, পূজার সামগ্রী দেখে অবাক হয়ে তাকে অত্যাচার করতে থাকে, নিপীড়ন অসহ্য হলে সে সত্য কথা বলতে বাধ্য হয়। মনসার নির্দেশ অমান্য করায় সেই মুহূর্তে সে পাষাণে পরিণত হয়। এ খবর গ্রামের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে সেই বাড়িতে মনসা পূজা শুরু হয়। পরবর্তীকালে এই বাড়িতেই একটা মনসামন্দির নির্মাণ করে দেবীর ঘট প্রতিষ্ঠা করে মনসাপূজার সুবন্দোবস্ত করা হয়। দশহরার দিন অযোধ্যার মত বিডরা গ্রামেও মনসার পূজা তথা উৎসবের প্রচলন রয়েছে। সেখানেও *ভোক্তা নাচ, আগুন সন্ন্যাস* ইত্যাদি লোকাচার পালিত হয়। ব্যাণ্ডপার্টি সহ শোভাযাত্রা সহকারে অযোধ্যার মনসা থান থেকে দশহরার দিন মনসার বারি (ছোট জলঘট) নিয়ে বিডরার মনসা থানে আসা হয়। বিডরায় পৌঁছালে সেখানের মনসামন্দিরেও মনসা পূজা হয়, তারপর আবার ফিরে আসে অযোধ্যায়। দেবী তার সইয়ের কাছে যান, তাই এই সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকে সইঘর অনুষ্ঠান বলা হয়। সইঘর থেকে ফেরার পর মনসা থানে মনসার মূল ঘট মাথায় নিয়ে স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। স্নানযাত্রায় এক হাজার ভোক্তা

এবং আশেপাশের গ্রাম থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার দর্শনার্থী সমবেত হন। মনসাকে স্নান করানো হয় পূর্বে উল্লিখিত মা মনসার দহে। মনসার দহে যাবার সময় মাঝপথে জনার্দনের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে মায়ের গহনা খোলা হয়।

ভৈরবের সঙ্গে মালাবদল - এই গ্রামে রয়েছে ভৈরবের থান। ভৈরব, যিনি হিন্দু পৌরাণিক দেবতা শিবের একটি ভয়ঙ্কর প্রকাশ বলে জানা যায় , তিনি বাংলার নানা প্রান্তে লৌকিক দেবতা হিসাবে পূজিত হচ্ছেন। *ভৈরবের থান* গ্রামবাংলার বহু স্থানে দেখা যায়। বাঁকুড়ার অযোধ্যা গ্রামের ভৈরবের থান সরাসরি মনসা পরবের সঙ্গে সম্পর্কিত। গ্রামবাসীদের চেতনায় ভৈরব ও মনসা ভাইবোন। স্নান যাত্রার সময় মা মনসাকে ভৈরবের থানে উপনীত করা হয়। এখানে ভাই বোনে মালাবদলের বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। মালাবদল করানোর সময় মা মনসা ভোক্তার মাথাতেই থাকে। এই অবস্থাতেই ভৈরব থানে মনসার পূজা করা হয়। পূজা শেষ হলে দেবীকে স্নানঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। মনসামঙ্গলকাব্য অনুযায়ী মনসা শিবকন্যা। আবার মালাবদল প্রাচীনকাল থেকে নারীপুরুষের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিশেষ রীতি হিসাবে প্রচলিত। অথচ অযোধ্যার দশহরার স্নানযাত্রার সময় মনসা ও ভৈরবের ভাইবোন হিসাবে মালাবদল একেবারে অভিনব লোকাচার।

রাতের অন্ধকারে মনসার দহে কোনো রকম আলো না জ্বেলে এক এক করে মনসার ছোট ঘট এবং মূল ঘট মাথায় নিয়ে ভোক্তারা ডুব দেবে। এভাবে স্নান সম্পন্ন হতে রাত এগারোটা বেজে যায়। এরপর মনসার ঘট মাথায় নিয়ে অয্যোধ্যার একের পর এক পাড়ায় শোভাযাত্রা চলতে থাকবে। প্রতিটি পাড়ায় দেবী যাওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের জন্য বাজনা সহযোগে নাচের আয়োজন থাকে। প্রতিটি পাড়া ঘুরে মনসার থানে ফিরতে পরদিন সকাল হয়ে যায়।

দশহরার পরদিন সকালে দেবী মনসামন্দিরে ফিরলে মানস পূরণের কৃতজ্ঞতা জানাতে শতাধিক লোক ধুনা পোড়ায়। দুই হাতে ও মাথায় মাটির সরা বসিয়ে তার ওপর ধুনো জ্বালানো হয়। দেড় থেকে দু ঘন্টা চলে এই ধুনো পোড়ানোর অনুষ্ঠান। দশহরার পর থেকে পরপর কয়েকদিন মনসামন্দিরে মনসামঙ্গল পাঠ হয়। গায়েনরা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের

মনসামঙ্গল মুখস্থ গান করেন। গায়েনরা সকলেই পুরুষ, সকলেই অযোধ্যার বাসিন্দা। লোকমনোরঞ্জনের জন্য এরা নিজেদের কিছু সংযোজন বিয়োজন করে থাকেন। ধুতি পরে বসে খোল করতাল নিয়ে এরা তিন থেকে চার দিনে সম্পূর্ণ কাব্য সংক্ষেপে পাঠ সম্পন্ন করেন।

বাঁকুড়ার শ্রেষ্ঠ মনসা পরব অযোধ্যা গ্রামের দশহরা উৎসব। মোটামুটি অভিন্ন সংস্কৃতিকে বহন করলেও বাঁকুড়ার অন্যান্য গ্রামেও মনসাপূজা উপলক্ষে কিছু স্বতন্ত্র লোকাচার দেখা যায়। বাঁকুড়ার নাকাইজুরির পতঙ্গপুরে মনসাপূজা উপলক্ষে *কামিলতোলা* হয়। ভোক্তাদের একজন হয় পাট ভোক্তা। তিনি রাতের বেলা মনসার ঘট নিয়ে পাটে চেপে নদীর ঘাটে জল ভরতে যাবেন। পাট হল কাঠের তক্তা, যার ওপর প্রায় দুশো থেকে তিনশো পেরেক সূচালো দিক বের করে গাঁথা থাকে। পাট ভোক্তাকে পাটের ওপর শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তার জল ভরার সময় ভোক্তারা ছাড়া কেউ দেখবেন না। ঘট জলপূর্ণ হবার পর সুকৌশলে জলভরতি ঘটকে উলটে মাথায় নেবে সে। এমনভাবে ঘট উল্টাবে যে এক বিন্দু জলও বাইরে পড়বে না। পাটভোক্তার এইভাবে জলভরা বাঁকুড়ায় *কামিল তোলা* নামে পরিচিত। অযোধ্যা গ্রামে শিবের গাজন উপলক্ষেও এই কামিল তোলার প্রচলন আছে।

বাঁকুড়ার মালপুর গ্রামের মনসা পূজা - অযোধ্যার মত এত বিস্তৃত ও জাঁকজমকপূর্ণ না হলেও বাঁকুড়ার অধিকাংশ গ্রামেই ভক্তি ও নিষ্ঠা সহযোগে দেবী মনসার আরাধনা প্রচলিত। ওন্দা থানার অন্তর্ভুক্ত রামসাগরের মালপুর গ্রামে দেবীর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অযোধ্যা গ্রামের মতই। এখানেও জলাশয় থেকে উঠেছিল শিলা। স্থানীয় রায়গোড়ার পুকুর থেকে শতাধিক বছর আগে এই শিলামূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। তবে এই শিলামূর্তি উঠেছিল একটি কচ্ছপের পিঠে। মন্দিরের বর্তমান সেবায়েত সাগর রায়ের পিতামহ ক্ষুদিরাম রায় ১৯২২ সালে কচ্ছপের প্রতিরূপ সমেত ওই শিলামূর্তি মা মনসা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নাদেশ পান। প্রাথমিকভাবে ওই শিলা স্থানীয় গাছতলায় রেখে পূজা শুরু হয়। পরবর্তীকালে মনসামাতার মন্দির নির্মিত হলে সেখানে দেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। ১৪০২ সালে সংস্কারসাধন করে আবার মন্দির নির্মিত হয়। এখানে দেবীর নিত্য পূজা ছাড়াও বাৎসরিক উৎসব হয় নাগপঞ্চমী তিথিতে। মন্দিরের সেবায়েত রায়, মিশ্র ও গোস্বামী

পরিবার। মন্দিরে মনসার মূল শিলামূর্তির পাশাপাশি কয়েকটি মনসাচালি, বহু মনসাবারি ও মাটির হাতি ঘোড়া রয়েছে। এগুলি মানত পূরণে ভক্তদের দেওয়া। এছাড়া মন্দিরগাত্রে পাঁচমাথা সাপ ও তার মধ্যে দেবীর মুখাবয়ব নির্মিত হয়েছে কোনো ভক্তের দ্বারা।

নাগপঞ্চমী তিথিতে মনসার বার্ষিক উৎসব হয়। আগের দিন মন্দিরে মনসামঙ্গল পাঠ ও গান হয়। নাগপঞ্চমীর দিন মায়ের মূল ঘট মাথায় নিয়ে বড়সায়ের পুকুরের উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রা বের হয়। মায়ের স্নানযাত্রায় সমবেত হন মালপুর ছাড়াও আশেপাশের গ্রামের মানুষ। প্রচুর ঢাক বাজে। যারা ঠাকুর মাথায় নেন, তাদের রুটি গুড় মুগকলাই সিদ্ধ ফল ইত্যাদি খেয়ে থাকতে হয়। সকালে স্নানযাত্রা সম্পন্ন হবার পর সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত হোম পুষ্পাঞ্জলি সহযোগে পূজা চলে। আগুনসন্ন্যাস, ভর হয়। মানত পূরণে দেবীকে শাড়ি, সোনা, ফল, ঢাক, মাটির হাতি ঘোড়া দেন ভক্তরা। নাগপঞ্চমীর পরের দিন দেবীকে দেওয়া হয় আঁশপান্নার ভোগ, অর্থাৎ না ভেজে পেঁয়াজ রসুন ছাড়া রান্না মাছ। যে সময় এই পূজা শুরু হয় তখন আর্থিক সঙ্গতির অভাবেই এভাবে রান্না মাছ ভোগ হিসেবে দেওয়ার প্রথার শুরু হয়েছে। দেবীর নামে দেবত্র জমি রয়েছে, যেখান থেকে মন্দির সংরক্ষণ, পূজা ইত্যাদির খরচ চলে। মালপুরের প্রতিটি পরিবারের বিবাহিত মেয়েরা মনসা পূজা উপলক্ষ্যে তাদের পিত্রালয়ে এসে আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী দেবী অত্যন্ত জাগ্রত। দুর্গাপূজার থেকেও মনসাপূজা এদের কাছে অনেক বেশি আনন্দের।

আবার বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্পীদের মনসাচালি, মনসাবারি, মনসাঘট, মনসাকে নিবেদন করার জন্য মাটির হাতি ঘোড়া তৈরির ঐতিহ্য প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য। অযোধ্যার মনসামন্দিরে কালিবুড়ি মনসাকে নিবেদন করা এই টেরাকোটার হাতি ঘোড়ায় একেবারে পূর্ণ হয়ে আছে। এগুলিও ঈশ্বর বিশ্বাসে পূজিত হয়। বাঁকুড়ার তালডাংরা থানার অন্তর্গত পাঁচমুড়া গ্রামে টেরাকোটার জন্য বিখ্যাত। এখানকার হস্তশিল্পের খ্যাতি পৃথিবী বিখ্যাত। এই গ্রামের শিল্পী টেরাকোটার কাজের জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও অর্জন করেছেন। প্রাচীনকাল থেকেই এখানে তৈরি হয় বিচিত্র মনসার চালি ও মনসার ঘট বা মনসাবারি। কাঁচা হলুদ আর গেরুয়া পাথর দিয়ে তৈরি হয় রং। চালিগুলি বৃত্তাকারে বহু সাপের ফণা

দিয়ে সাজানো হয়। মধ্যে বেহুলা লক্ষিন্দর মা মনসা, আর এদের ওপর শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব। মনসামঙ্গলে কৃষ্ণের কথা নেই। তবে মনসার চালিতে কেন কৃষ্ণের মূর্তি গড়া হচ্ছে, এ প্রশ্ন স্বভাবতই আসে। সম্ভবত বিষ্ণুপুরে মল্লরাজবংশ রাজত্ব করার সময় তাদের অধীনস্থ এলাকাগুলিতে বৈষ্ণব প্রভাব ছড়িয়ে পরে। মল্লরাজবংশের ৪৯তম শাসক বীর হাম্বীর শ্রী নিবাস আচার্য কর্তৃক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। এই সময় থেকে মল্লভূমে বলি নিষিদ্ধ হয়। বাঁকুড়ার নানা স্থানের নামকরণেও এর প্রভাব দেখা যায় - বিষ্ণুপুর, অযোধ্যা, বৃন্দাবনপুর, রামসাগর, লক্ষ্মীসাগর, শ্যামসুন্দরপুর, রামচন্দ্রপুর, গোপীনাথপুর, রাধামোহনপুর, নিত্যানন্দপুর, নিকুঞ্জপুর, ব্রজরাজপুর ইত্যাদি। হাম্বীরের পুত্র রঘুনাথ সিংহ যেমন শ্যাম রায় , কালাচাঁদ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। রঘুনাথের পুত্র বীর সিংহও লালজির মন্দির, তার রানী চূড়ামণি (বা শিরোমণি) ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে মদনমোহন ও মুরলীমোহনের মন্দির নির্মাণ করেন। বীর সিংহের সময়কার জল সংরক্ষণের বাঁধগুলির নামও লক্ষ্যনীয় - কৃষ্ণবন্ধ, যমুনাবন্ধ, শ্যামবন্ধ, কালিন্দীবন্ধ ইত্যাদি। সুতরাং প্রাচীন টেরাকোটার শিল্পে যে এর প্রভাব পড়বে, সেটাই তো স্বাভাবিক। সম্ভবত এই কারণেই মনসার চালিতে কৃষ্ণের মূর্তি গড়ে চলেছেন শিল্পীরা।

বর্তমানে মনসা ঘট , মনসাবারি, বা মনসাচালির চাহিদার প্রকৃতি বদলেছে বলে জানান পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্পীরা। আগে কেবল মাত্র পূজার জন্যই এগুলি বিক্রি হত আর এখন ঘর সাজাবার সরঞ্জাম হিসাবে দূর দূরান্তের মানুষের চাহিদা বহুলাংশে বেড়েছে। ধর্মবোধের পাশাপাশি ধর্মব্যতিরেকেও মনসাচালিগুলি মানুষের শিল্প তথা সৌন্দর্যবোধের ধারক বাহক হিসাবে গৃহসজ্জায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাঁকুড়ার অযোধ্যা গ্রামে দশহরার দিন মনসা পূজা উপলক্ষ্যে সারা রাত ব্যাপী অনুষ্ঠান দেখতে লক্ষাধিক মানুষ সমবেত হন। মনসার সেবাইত পূর্বপুরুষ সূত্রে ডোম হলেও ইদানিং দশহরার দিনে ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজা করানো হচ্ছে। একেবারে লৌকিক সংস্কৃতির আবহে, এখানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ লক্ষণীয়। অযোধ্যায় কালীবুড়ি সম্ভবত পৃথক লৌকিক দেবী ছিলেন। কারণ এখানে কালীবুড়ি ও মনসার পৃথক থান রয়েছে। বার্ষিক পরবের সময় প্রথমে কালিবুড়ি তারপর মনসার পূজা হয়। এই মনসাও কালিবুড়ি নামেই

পরিচিত। দেবী মনসাকে শিবকন্যা পরিচয়ে সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন মনসামঙ্গলকারেরা। ভিন্ন প্রেক্ষাপটে সম্ভবত মনসার সঙ্গে একাত্ম হয়ে কালীবুড়ির লৌকিকতার কিছুটা উত্তরণ ঘটানো হয়েছে। অযোধ্যার এত জাঁকজমক পূর্ণ মনসা পরবেও বলি হয় না। বাঁকুড়ার অন্যান্য অঞ্চলেও মনসা সহ অন্যান্য পূজায় বলি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মল্ল রাজাদের প্রভাব। গিন্নিপালনে নির্জন স্থানে গিয়ে গিন্নিদের রাম সীতা সেজে নকল বিয়ের আয়োজন, নাচ গান সব মিলিয়ে যেন ছেলেখেলার সমধর্মী। সারা বছর সংসারের জন্য পরিশ্রম করা নারীদের একটা দিন নিজেদের মত করে হাসি খেলায় কাটানোর এই প্রথায় কিছুটা হলেও নারী স্বাধীনতার প্রচ্ছন্ন ভাবনা কার্যকর।

তথ্যসূত্র

অযোধ্যা, মালপুর, পাঁচমুড়ার বাসিন্দাদের থেকে নেওয়া ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার -

তথ্যদাতা পুরুষ -

১) নাম - সন্তু কর
বয়স - ৩৭
পেশা - ব্যবসা করেন, কবি, প্রাবন্ধিক।
ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - অযোধ্যা, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - বাঁকুড়া।

২) নাম - অংশুমান কর্মকার
বয়স - ৩৭
কাঁসার বাসন তৈরির পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, লোকসংস্কৃতির গবেষক।
ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - অযোধ্যা, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - বাঁকুড়া।

৩) নাম - দুর্গাদাস পণ্ডিত
বয়স - ৫০
অযোধ্যার মনসা মন্দিরের পূজারি
ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - অযোধ্যা, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - বাঁকুড়া।

৪) নাম - দেবদাস পণ্ডিত
বয়স - ৬৫
অযোধ্যার মনসা মন্দিরের পূজারি
ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - অযোধ্যা, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - বাঁকুড়া।

৫) নাম - সমর পণ্ডিত

বয়স - ৪৮

অযোধ্যার মনসা মন্দিরের পূজারি

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - অযোধ্যা, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - বাঁকুড়া।

৬) নাম - মনোহর বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়স - ৫৫

পেশায় - স্কুল শিক্ষক

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - অযোধ্যা, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - বাঁকুড়া।

৭) নাম - বলরাম কর্মকার

বয়স - ৭০

পেশা - কাঁসার বাসন তৈরির ব্যবসা

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - অযোধ্যা, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - বাঁকুড়া।

৮) নাম - সাগর রায়

বয়স - ৭০

পেশা - ব্যবসা

ঠিকানা - গ্রাম - মালপুর, পোষ্ট - রামসাগর, থানা - ওন্দা, জেলা বাঁকুড়া।

৯) নাম - শঙ্কর মিশ্র

বয়স - ৬৫

পেশা - অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী

ঠিকানা - গ্রাম - মালপুর, পোষ্ট - রামসাগর, থানা - ওন্দা, জেলা বাঁকুড়া।

১০) নাম - সৌমেন রায়

বয়স - ৪৪

পেশা - ব্যবসা

ঠিকানা - গ্রাম - মালপুর, পোষ্ট - রামসাগর, থানা - ওন্দা, জেলা বাঁকুড়া।

১১) নাম - সুমিত গোস্বামী

বয়স - ৭১

পেশা - ব্যবসা

ঠিকানা - গ্রাম - মালপুর, পোষ্ট - রামসাগর, থানা - ওন্দা, জেলা বাঁকুড়া।

১২) নাম - সমীরণ গোস্বামী

বয়স - ৪৮

পেশা - চাষবাস

ঠিকানা - গ্রাম - মালপুর, পোষ্ট - রামসাগর, থানা - ওন্দা, জেলা বাঁকুড়া।

১৩) নাম - অনাদি কুম্ভকার

বয়স - ৬০

টেরাকোটার কাজ করেন

ঠিকানা - গ্রাম পাঁচমুড়া, থানা - তালডাংরা, জেলা - বাঁকুড়া।

১৪) নাম - শিবু কুম্ভকার

বয়স - ৩৫

টেরাকোটার কাজ করেন

ঠিকানা - গ্রাম পাঁচমুড়া, থানা - তালডাংরা, জেলা - বাঁকুড়া।

১৫) নাম - তাপস কুম্ভকার

বয়স - ৩২

টেরাকোটার কাজ করেন

ঠিকানা - গ্রাম পাঁচমুড়া, থানা - তালডাংরা, জেলা - বাঁকুড়া।

১৬) নাম - ধীরেন্দ্রনাথ কুম্ভকার

বয়স - ৭৯

টেরাকোটার কাজ করেন

ঠিকানা - গ্রাম পাঁচমুড়া, থানা - তালডাংরা, জেলা - বাঁকুড়া।

মহিলা

১) নাম - সন্ধ্যা মেটে (এদের পূর্বপুরুষদের হাতেই মনসার শিলা জালে উঠেছিল)

বয়স - ৪৫

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - অযোধ্যা, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - বাঁকুড়া।

২) প্রতিমা মেটে

বয়স - ২৬

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - অযোধ্যা, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - বাঁকুড়া।

৩) নাম - যমুনা মুখোপাধ্যায়

বয়স - ৭৪

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - অযোধ্যা, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - বাঁকুড়া।

৪) সবিতা মল্ল

বয়স - ৬২

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - অযোধ্যা, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - বাঁকুড়া।

৫) পিয়ালি কর

বয়স - ২৪

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম + পোস্ট - অযোধ্যা, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - বাঁকুড়া।

৬) ভারতী লোহাই

বয়স - ৪০

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম - মালপুর, পোষ্ট - রামসাগর, থানা - ওন্দা, জেলা বাঁকুড়া।

৭) সোমা গোস্বামী

বয়স -৬৬

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম - মালপুর, পোষ্ট - রামসাগর, থানা - ওন্দা, জেলা বাঁকুড়া।

৮) মনিকা রায়

বয়স - ৫৬

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম - মালপুর, পোষ্ট - রামসাগর, থানা - ওন্দা, জেলা বাঁকুড়া।

৯) মনিকা রায়

বয়স - ৫৬

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম - মালপুর, পোষ্ট - রামসাগর, থানা - ওন্দা, জেলা বাঁকুড়া।

১০) মালতী কুন্ডু

বয়স - ৫৫

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম - মালপুর, পোষ্ট - রামসাগর, থানা - ওন্দা, জেলা বাঁকুড়া।

১১) শিল্পা কুম্ভকার

বয়স - ১৯

কলেজের ছাত্রী

ঠিকানা - গ্রাম পাঁচমুড়া, থানা - তালডাংরা, জেলা - বাঁকুড়া।

১২) তুলসী কুম্ভকার

বয়স - ৫৭

গৃহবধূ

ঠিকানা - গ্রাম পাঁচমুড়া, থানা - তালডাংরা , জেলা - বাঁকুড়া।

১৩)উর্মিলা কুম্ভকার

বয়স - ২৯

গৃহবধূ

টেরাকোটার কাজ করেন

ঠিকানা - গ্রাম পাঁচমুড়া, থানা - তালডাংরা, জেলা - বাঁকুড়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনসাকেন্দ্রিক অভিকরণমূলক লোকসংস্কৃতি

রয়ানী

এলাকার পরিচয় -

১) শুলংগুড়ি কলোনি পাড়া, ব্লক রাজারহাট, পোস্ট অফিস - গৌরাঙ্গ নগর, থানা - রাজারহাট নিউ টাউন, কলকাতা ৭০০১৫৯, জনসংখ্যা - ১৩,৪৯৬ পুরুষ - ৬৯৭৮, মহিলা - ৬৫১৮, শূন্য থেকে ছয় বছরের শিশুদের মোট সংখ্যা - ১৪০৯, ছেলে - ৭৩২, মেয়ে - ৬৭৭

২) বাণীপুর, হাবড়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পিন কোড - ৭৪৩২৩৩

মোট জনসংখ্যা - ৭১০৭, পুরুষ - ৩৬৬৩, মহিলা - ৩৪৪৪, ৯৮.৩২% হিন্দু, ১.৪৪% মুসলিম

৩) নিউব্যারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা

মোট জনসংখ্যা - ৭৬,৮৪৬, পুরুষ - ৩৮,২৩৯, মহিলা - ৩৮,৬০৭, ছ'বছর বয়স পর্যন্ত শিশু - ৫১৫৭

৯৮.৯০% হিন্দু ০.৭৩% মুলসিম

রয়ানীর উদ্ভব ও স্থানিক সম্প্রসারণ - দেবী মনসাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ধারায় রয়ানী একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। সংস্কৃত রজনী শব্দ থেকে রয়ানী শব্দটির উদ্ভব। মনসামঙ্গল কাব্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ রাত জেগে পাঠ করা হত। এই কাব্য পাঠের অনুষ্ঠানই রয়ানী নামে পরিচিত হয়। পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গল কাব্যধারায় সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছিল বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ। বিজয়গুপ্তের জন্ম হয়েছিল বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে (বর্তমানে ফুল্লশ্রী)। স্বাভাবিকভাবেই গৈলা সহ বরিশালে পদ্মাপুরাণ ঘরে ঘরে পদ্মাপুরাণ পাঠের রীতি প্রচলিত

হয়। কালে কালে পদ্মাপুরাণ পাঠ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সুতরাং রয়ানী পাঠের বিশেষ রীতির উদ্ভব হয়েছিল এই বরিশালেই।

বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণোত্তর বিশেষ আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত কাল পরিসরে মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক ধারা অজস্র কবির লেখনী আশ্রয়ে রচিত হয়েছিল। বাংলার ঘরে ঘরে লক্ষ্মী, সরস্বতী, সন্তোষী, শীতলা বা মনসা ইত্যাদি ব্রতকথামূলক পাঁচালী সুর করে পাঠের চল শতাব্দী প্রাচীন। মঙ্গলকাব্য পাঠে, শোনায়, এমনকি ঘরে রাখলে গৃহস্থের মঙ্গলসাধন হয় এই লোকবিশ্বাসে মধ্যযুগে লোকসমাজে ব্যাপকভাবে মঙ্গলকাব্য পাঠ তথা মঙ্গলগান গাওয়ার প্রচলন হয়েছিল।

সুকুমার সেন মহাশয় মঙ্গলকাব্যকে বলেছেন *ব্রতগীত পাঞ্চালী* । মঙ্গলকাব্য প্রসঙ্গে তিনি রয়ানী ও জাগরণকে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন –

এগুলিতে শেষ পালার পূর্ব পালার গুরুত্ব সমধিক। কাহিনির ক্লাইম্যাক্স সেইখানেই। সেখানে দেবতা নায়ককে বিপদ থেকে উদ্ধার করিতেছেন। এই পালাটির গান সারারাত ধরিয়া সকাল পর্যন্ত চলিত তাই পালাটির সাধারণ নাম জাগরণ (কোথাও কোথাও রয়ানী অর্থাৎ রজনী)।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে আশুতোষ ভট্টাচার্যও মঙ্গলগানের যে দীর্ঘ পালাটি সারা রাত্রি ব্যাপী গাওয়া হত, তাকেই জাগরণ বলেছেন। কিন্তু রয়ানী আর জাগরণকে তিনি একার্থ বাচক করেন নি। বরিশাল অঞ্চলে মনসামঙ্গলের কাহিনী অবলম্বন করে যে লোকসঙ্গীতের প্রচলন হয় এবং যেখানে লক্ষ্মীন্দরের সর্প দংশন থেকে আরম্ভ করে পুনর্জীবন লাভের পালা সারারাত গাওয়ার রীতি ছিল, তাকেই রয়ানী বলেছেন। এই সারা রাত ব্যাপী পালাগান হওয়ার পেছনে একটি লোকবিশ্বাস কার্যত ক্রিয়াশীল। পালা পাঠের আসরে নায়ক বা সমতুল্য কারো একবার মৃত্যু পালা গাওয়ার পর পুনরায় তার জীবন ফিরে পাওয়ার আগে, অর্থাৎ জীয়ান পালা পাঠের আগে আসর ছাড়লে সংসারের অমঙ্গল হয় এই বিশ্বাস লোক সমাজে আজও আছে। এই বিশ্বাসের ফলে মনসা বা শীতলার মাহাত্ম্য প্রচার

মূলক লোকযাত্রায়ও লক্ষীন্দর বা চন্দ্রকেতুর ছেলেদের মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভের আগে পর্যন্ত দর্শকেরা আসর ছাড়েন না। মঙ্গলকাব্য পাঠের ক্ষেত্রেও একদিকে যেমন গায়েন নায়কের মৃত্যু থেকে জীবন ফিরে পাওয়া অবধি একই সাথে পাঠে বাধ্য থাকেন, মাঝখানে বিরাম নিতে পারেন না, অপর দিকে শ্রোতারাও ওই সময়ের মধ্যে আসর ছাড়তে পারেন না। সুতরাং কাব্যের ওই দীর্ঘ অংশ পড়তে রাত শেষ হয়ে যায়। সারা রাত ব্যাপী এই প্রকার মনসামঙ্গলকাব্য পাঠই রয়ানী নামে পরিচিত। আশুতোষ ভট্টাচার্য কেবল বরিশালের মনসামঙ্গল পাঠকে রয়ানী বলেছেন আবার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গে রাত জেগে যে মঙ্গলগান প্রচলিত ছিল, তাকেই রয়ানী বলেছেন।

রাত জেগে পাঠ করা হয় বলেই পালাগান প্রসঙ্গে জাগরণ নামটিও প্রচলিত হয়েছে। রয়ানী ও এক প্রকার জাগরণ তবে রয়ানী আর জাগরণ এক নয়। কারণ চণ্ডীর জাগরণ গান বা ধর্মমঙ্গলের জাগরণকে রয়ানী বলা হয় না। কেবল মনসামঙ্গল পাঠের লোকাচারই রয়ানী নামে পরিচিত। কালক্রমে বরিশাল তথা পূর্ববঙ্গের সীমা অতিক্রম করে মনসামঙ্গল কাব্য পাঠের রীতি পশ্চিমবঙ্গেও সম্প্রসারিত হয়েছে। আজও পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতিতে রয়ানীর বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। তবে রয়ানী বলতে দুই বাংলায়ই কেবল পদ্মাপুরাণের নির্বাচিত অংশ পাঠকে না বুঝিয়ে এখন শ্রাবণ মাস ব্যাপী বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের সামগ্রিক পাঠকেই বোঝায়। আবার শ্রাবণ ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময় নাগপঞ্চমী তিথি, আষাঢ় বা ভাদ্রের বিশেষ তিথিতে মনসা পূজা উপলক্ষে মঞ্চে পদ্মাপুরাণ উপস্থাপন করেন রয়ানীর দলগুলি।

বরিশালের লোকসমাজে নারীরা একমাস ব্যাপী পড়তেন সমগ্র পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্য। কোন অংশ বাদ দেওয়ার রীতি ছিল না। মরণ আর জিয়ান পালা (কোথাও কোথাও ঢলান ও জিয়ান বলেও প্রচলিত) একসাথে পড়ার রীতি ছিল। অবিরাম পড়তে পড়তে রাত শেষ হয়ে যেত। এভাবেই রয়ানী নামক বিশেষ লোকাচারের সূত্রপাত হয় বরিশালে। কালক্রমে সমগ্র পূর্ববঙ্গে তথা পশ্চিমবঙ্গেও পদ্মাপুরাণ পাঠ তথা রয়ানী জনপ্রিয় হয়।

রয়ানীর আর একটি ধারায় বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ মঞ্চে পরিবেশিত হয়। মঞ্চে গায়েন সমগ্র পদ্মাপুরাণ পাঠ ও গান করেন, কোথাও কোথাও গল্পের মত করে বোঝান। সঙ্গে থাকে ধুয়া গাওয়ার দল এবং যন্ত্রীরা। গায়কদের পায়ে ঘুঙ্গুর, হাতে চামর।

পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে পদ্মাপুরাণ পাঠ তথা রয়ানী গানের সম্প্রসারণের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছিল। দেশ বিভাজন পরবর্তীকালে বরিশাল তথা পূর্ববঙ্গের বহু মানুষ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় রয়ানী পাঠের রীতি যাদের পারিবারিক সংস্কারে পরিণত হয়েছিল, এদেশে এসে নানা প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হলেও পদ্মাপুরাণ পাঠের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। বরিশাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা নারীদের মাধ্যমেই বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ পাঠ পশ্চিমবঙ্গেও ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়। এই লোকাচার তথা সংস্কারকে স্বাগত জানিয়ে গ্রহন করে মূলত পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল (ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা ইত্যাদি) থেকে আগত উদ্বাস্তু সমাজ। পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসীদের মধ্যে পদ্মাপুরাণ পাঠ সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারে না। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলী ইত্যাদি জেলায় পদ্মাপুরাণ পাঠের ধারা অব্যাহত।

বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগণায় রয়ানীর দুটি ধারা প্রচলিত - ১) ঘরোয়া পাঠ ও ২) নাচ গান অভিনয় সংযোগে মঞ্চে উপস্থাপিত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

মহিলাদের ঘরোয়া পাঠ ও গান - উত্তর চব্বিশ পরগণার শুলঙ্গুড়ি কলোনি পাড়ায় বেশ কিছু বাড়িতে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসা পূজার আগে সমগ্র শ্রাবণ মাস ব্যাপী পদ্মাপুরাণ পাঠ হয়। প্রতিদিন এক বা একাধিক পালা করে এগিয়ে কাব্যটি এক মাসে প্রথম থেকে শেষ অবধি সম্পূর্ণ পড়ার রীতি আজও প্রচলিত। গ্রামের যে সব বাড়িতে মনসা পূজা হয়, সেই সব বাড়িতে প্রতিবেশী কিছু নারী সমবেত হয়ে রাতের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই পাঠ করেন। শব্দার্থের বিস্তারের ধারায় রয়ানী বলতে উত্তর চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে এখন কেবলমাত্র পদ্মাপুরাণের নির্বাচিত জাগরণ গানকে না বুঝিয়ে শ্রাবণ মাস ব্যাপী সমগ্র মনসামঙ্গল পাঠকে বোঝায়। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে মালসী, কেদার, ভাটিয়াল, গান্ধার-

এই রাগগুলির উল্লেখ থাকলেও লোকসমাজে গানগুলি লোকসুর অবলম্বনেই গীত হয়। পয়ার ও লাচাড়ির ক্ষেত্রে সুরের ভিন্নতা রয়েছে। তাছাড়া সমগ্র কাব্য একই সুরে গাওয়া হয়। পয়ারের ক্ষেত্রে প্রতি দুইটি পদের পর ধুয়া গাওয়ার রীতি রয়েছে। প্রতি পালায় বদলে যায় ধুয়া। মূল গায়েনের সঙ্গে কেবল ধুয়া গাওয়ার সময় সমবেত সকলে যোগ দেন। কোনো পালায় মূল গায়েন কাব্যে উল্লিখিত সেই পালার ধুয়াকে অনুপযুক্ত মনে করলে আগের কোন পালার ধুয়াকে সেখানে গাইতে পারেন। অর্থাৎ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে মূল গায়েন পালার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রয়োজন মত ধুয়া নির্বাচন করেন। পয়ারের সুরে ব্রতকথার আবৃত্তিধর্মীতা থাকলেও সুরেলা গায়েনের পাঠে তা কোথাও কোথাও বেশ আকর্ষণীয় হয়। মনসা, সনকা, বেহুলার ট্রাজেডির বর্ণনায় লাচাড়ির করুণ সুরে চোখে জল ভরে আসে সমবেত নারীদের।

মঞ্চে কথায় নাচে গানে উপস্থাপিত রয়ানী - উত্তর চব্বিশ পরগণার নিউব্যারাকপুরে , হাবড়ার বাণীপুর সহ বিভিন্ন গ্রামে, ও শহরে মঞ্চে রয়ানী গাওয়ার প্রচলন রয়েছে।

রয়ানীর মঞ্চ - মনসাপূজা উপলক্ষে গৃহকর্তার সাধ্যমত আয়োজনে মঞ্চ তৈরি হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ির উঠোনে মাদুর পেতে, উপরে সামিয়ানা লাগিয়ে বা যে বাড়িতে মনসামন্দির ও মন্দির সংলগ্ন চাতাল আছে, সেখানে রয়ানীর আসর বসে।

দল পরিচয় - নিউব্যারাকপুরে ৭৫ বছর বয়স্কা শোভারাণী হালদারের ৬০ বছরের পুরনো রয়ানীর দল *শোভারাণী সম্প্রদায়* বা ৩৫ বছর বয়স্ক শোভন মিস্ত্রির পরিচালিত দল *মঞ্জুরাণী সম্প্রদায় মা মনসা সহায়* এর মত বহু দল উত্তর চব্বিশ পরগণায় রয়েছে। দলগুলির সদস্যসংখ্যা মোটামুটি দশ জন। হারমনিয়াম, বাঁশি, জুরি, খোল, করতাল ঢাক, ঢোল - এই বাদ্যগুলি বাজাবার জন্য থাকে যন্ত্রী, বাকিরা গায়েন। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ এদের সকলের মুখস্তপ্রায়। পুরো পালা সম্পূর্ণ করতে এক মাসের ওপর সময় লাগে। অনেক বাড়িতে ঘরোয়া রয়ানী পাঠের মতই দল এনে মঞ্চে একমাসের টানা রয়ানীর আয়োজন করা হয়। তবে খরচ সাপেক্ষ হওয়ায় এরকম লম্বা অনুষ্ঠান খুবই কম আয়োজিত হয়। পাঁচ দিন, তিন দিন বা এক দিনের আয়োজন হয় বেশি। দল এক্ষেত্রে

প্রতিটি পালা থেকে নির্বাচিত পদ গান ও বর্ণনার মাধ্যমে কাহিনি শেষ করেন। সঙ্গে থাকে তালে তালে নাচ। মূল গায়েন এর সঙ্গে আরও একজন দাঁড়িয়ে গান ও পাঠ করে। দুই জন গায়েনের জন্য থাকে দুটি মাইক। এছাড়া যন্ত্রানুসঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক ব্যবহৃত হয়। মূল গায়েন প্রায় পুরো পালা গান করেন। এছাড়া বাকি গায়েনদের মধ্যে থেকে এক এক জন উঠে এসে মূল গায়েনের সঙ্গ দেন। পুরুষ গায়েন পরেন ধুতি আর ফতুয়া, মহিলারা তাঁতের শাড়ি,পায়ে থাকে ঘুঙুর। সকলের গলায় থাকে উত্তরীয়। গায়েনরা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে পালাগান করার সময় সামনে রাখা থালা থেকে দু'হাতে দুটি চামর তুলে নেন।

উপস্থাপন রীতি - দু'জন গায়েন দাঁড়িয়ে মূল পদ গান, সেই সঙ্গে ধুয়া গান বসে থাকা গায়েনরা এবং সকল যন্ত্রী। নাটকীয় আকর্ষণ তুলে ধরতে কোথাও কোথাও উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ আমদানি করা হয়। বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই সংলাপে গায়েনরা আঞ্চলিক বাকরীতির প্রয়োগ ঘটান। যেমন, পার্বতী স্বামীকে খুঁজতে খুঁজতে নদীর তীরে এলে মাঝির সঙ্গে দেবীর কথোপকথন।

পার্বতী - ও মাজি, আমার স্বামীরে দ্যাকছো নাকি ?

মাঝি - তোমার স্বামী ? ক্যামন দ্যাকতে তারে ?

পার্বতী - মাতায় বরো বোরো জটা, গায়ে ছাই ভস্ম মাকা ...

মাঝি - ও ওই লোক যে নদী পার হইয়া গ্যালো, কিন্তু করি দেলো না, সেই তোমার স্বামী?

পার্বতী - হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই আমার স্বামী ... ...

[মঞ্জুরাণী সম্প্রদায় মা মনসা সহায়, গায়েন মঞ্জুরাণী বিক্রম ও শোভন মিস্ত্রি]

এই ভাবে জনমনোরঞ্জনের জন্য পদ্মাপুরাণের উপস্থাপনায় যুক্ত হয় রয়ানীর দলের নিজস্ব সংলাপ। আবার ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কিছু কিছু ঘটনা গল্পের মত করে তুলে ধরেন মূল গায়েন। ফলে সংলাপ, গল্প, কাব্যপদ, লোকসুর, ছন্দে তালে নাচ সবমিলিয়ে মনসামঙ্গলের উপস্থাপনায় একটি বিশেষ আঙ্গিক গড়ে ওঠে রয়ানীর আসরে।

লোকগানের ব্যবহার - মনসা জরৎকারু ও বেহুলা লক্ষিন্দরের বিয়ে উপলক্ষে জলভরার গান, নাপিতের ক্ষৌরকর্মের গান, অধিবাস, কনে সাজানোর জন্য রয়ানীর আসরে পদ্মাপুরাণের সাথে যুক্ত করা হয় জনপ্রিয় কিছু লোকসঙ্গীত।

লোকাচার - উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় মঞ্চে পরিবেশিত রয়ানীর কিছু লোকাচারের সংযোজন ঘটেছে। যেমন গান শুরুর সময় গৃহিণী কুলোয় চাল, শাড়ি, সব্জি, গামছা, পান সাজিয়ে মনসা প্রতিমার সামনে ভুজ্যি নিবেদন করেন, সেই সঙ্গে উপস্থিত মহিলারা উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি করেন। মনসার জন্ম, বিবাহ, লক্ষিন্দরের জন্ম, বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহ, লক্ষিন্দরের প্রাণ ফিরে পাওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গেও উলুধ্বনি, শঙ্খ বাজানোর রীতি রয়েছে। এছাড়া জালু মালুর বাড়ির পূজা উপস্থাপনের সময় জালুর মাকে মনসার বর দেওয়া প্রসঙ্গে পরিবারের একজনকে মঞ্চে তুলে ধরা হয় এবং তাকে দিয়ে বর প্রার্থনা করানো হয়। রয়ানীর আসরে এই রীতি *বর গাওয়া* নামে পরিচিত। চাকরি, বিয়ে, রোগমুক্তি, আর্থিক উন্নতি ইত্যাদি মনোমত বর প্রার্থনা করেন মঞ্চে উপবিষ্ট ব্যক্তি। তাকে পরতে হয় নতুন বস্ত্র। দেবীকে নিবেদন করতে হয় একটি কুলোয় সাজিয়ে শিষ ডাব, একটি ঝুনো নারকেল, মিষ্টি, চাল, নতুন কাপড়, গামছা, পাঁচটি ফল, জলঘট, হরিতকি, পান ইত্যাদি। পরিবারের একজন এয়ো বরণের উপাচার মাথায় নিয়ে আসে। নিবেদন করার আগে গায়েনরাই প্রতিটি বস্তুতে সিঁদুর ফোটা লাগিয়ে দেন। বর প্রার্থনাকারী গামছা পেতে মায়ের কাছে বর প্রার্থনা করেন। গায়েনরা কেঁদে কেঁদে গান গেয়ে মায়ের কাছে বর কামনা করেন, গামছায় বেঁধে দেন পান, সুপারি, আশীর্বাদী ফুল, মাথায় দিয়ে দেন একটি শিষ ডাব। দেবীর আশীর্বাদ স্বরূপ ডাবটি মাথায় নিয়েই তাকে মন্দির থেকে ঘরে ফিরতে হয়। সনকার সাধ ভক্ষণ উপলক্ষে মঞ্চে দশ প্রকার শাক ঝুড়ি ভরে এনে, গান করেন গায়েনরা। রয়ানীর দলের পরিভাষায় এই গান শাক তোলার গান নামে পরিচিত।

রয়ানীর আসরে বেহুলা লক্ষিন্দরের বাসর রাতের উপস্থাপনা করা হয় অভিনব রীতিতে। লোহার ঘরের প্রতীকী হিসাবে একটি বদ্ধ হাঁড়িকে ব্যবহার করা হয়। বাসর ঘরে স্বামীর খিদে মেটাতে বেহুলা রান্না করেছিল, উনুন জ্বেলেছিল তিনটে নারকেলের সাহায্যে। তাই হাঁড়ির মধ্যে রাখা হয় চাল, এবং তিনটি ঝুনো নারকেল। এরপর গাওয়া হয় *রান্নার*

পাঁচালী। অর্থাৎ বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ থেকে বাসর ঘরে বেহুলার রান্নার বিবরণ রয়ানীর পরিভাষায় *রান্নার পাঁচালী* নামে প্রচলিত।

মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেসে যাবার সময়ে বেহুলা গোদার ঘাটে উপনীত হলে রয়ানীর গায়েনরা নাটকীয় উক্তি প্রত্যুক্তি তথা গানের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেন। মঞ্চে গান গাওয়ার সময় উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেন বড়শি। লখিন্দরের জিয়ান পালা গাইবার জন্য রয়ানীর আসরে ২১ টি পান, ২১ টি সুপারি, ২১ টি কলা, নারকেল, নতুন কাপড় বা ধুতি, ১ কেজি ২৫০ গ্রাম চাল ইত্যাদি দরকার হয়। এগুলি দিয়ে নতুন দেহ গঠন হয়।

শিবকে খুঁজতে যাওয়া পার্বতীর নৌকা পারাবারের কড়ি চাওয়া হয় উপস্থিত দর্শক তথা গৃহকর্তার কাছে। মাথায় চামর বুলিয়ে গানে গানে মূল্য চান গায়েনরা। লখিন্দরের বিয়ের সময় প্রতিবেশী বাড়ি থেকে আনা হয় বর যাত্রী। মন্দির প্রাঙ্গনে দরজা আটকানো হয়। বরযাত্রীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তবে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। এভাবেই মঞ্চে দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতাদের মেলবন্ধন ঘটে সেই সাথে প্রচলিত লোকাচারের মঞ্চায়ন হয়।

বলা বাহুল্য যে পাঁচ বা তিন দিনের রয়ানীতে বেশ কয়েকবার দেবীকে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যে ভুজ্যি নিবেদন করা হয় তাতে রয়ানীর দলগুলির উপরি রোজগার হয়। এছাড়া মাঝিকে কড়ি দেওয়া, বা বরযাত্রীর পথ আটকে টাকা নেওয়া - ইত্যাদি নানা অছিলায় দলগুলির সামান্য রোজগার হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত মনসা যাত্রার দলগুলির কথা প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ করা যায়। মনসা যাত্রা বা মনসার পালাগানেও কাহিনির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নানা অছিলায় উপরি রোজগারের চেষ্টা করা হয়। যদিও দুটি ক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে উপার্জন হয় যৎসামান্য। শাড়ি, গামছা, চাল, ডাল, ফল ইত্যাদি দেবীকে যা কিছু নিবেদন করা হয় তা দলের সদস্যদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। রয়ানী বা মনসাযাত্রা উভয় ক্ষেত্রেই উপরি রোজগারের জন্য নানা আয়োজন দলগুলির আর্থিক বিপন্নতাকেই প্রতিপন্ন করে। মনসাযাত্রা বা রয়ানী উভয় ক্ষেত্রেই দলগুলির নিজ

নিজ ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য এবং ঐকান্তিক ভালোবাসায় অবিচ্ছিন্ন মনসাসংস্কৃতির ধারা যুগ যুগ ধরে প্রবহমান।

তথ্যসূত্র

১) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশিং, সপ্তম মুদ্রণ, ২০০৪, পৃ.১৫৭।

২) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৩৮।

৩) শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, সপ্তর্ষি প্রকাশন, মুদ্রণ ২০১৫, পৃ. ৪৫,৪৬।

* উত্তর চব্বিশ পরগণার শুলংগুড়ি কলোনি পাড়ার বাসিন্দা, দীর্ঘদিন রয়ানী পাঠের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের সাক্ষাৎকার-

তথ্যদাতা মহিলা

১) নাম - কমলা দাস।
বয়স - ৭৫।
গৃহবধূ।
ঠিকানা - শুলংগুড়ি কলোনি পাড়া, পোষ্টঅফিস - গৌরাঙ্গ নগর, থানা - নিউ টাউন, উত্তর চব্বিশ পরগণা আদি নিবাস বরিশাল।

২) নাম - চারু শীল।
বয়স - ৬৫।
গৃহবধূ।
ঠিকানা - শুলংগুড়ি কলোনি পাড়া, পোষ্টঅফিস - গৌরাঙ্গ নগর, থানা - নিউ টাউন, উত্তর চব্বিশ পরগণা আদি নিবাস বরিশাল।

৩) নাম - কাননবালা গায়েন।
বয়স - ৭০।
গৃহবধূ।
ঠিকানা - শুলংগুড়ি কলোনি পাড়া, পোষ্টঅফিস - গৌরাঙ্গ নগর, থানা - নিউ টাউন, উত্তর চব্বিশ পরগণা আদি নিবাস বরিশাল।

৪) নাম - শোভা অধিকারী।

বয়স - ৮০।

গৃহবধূ।

ঠিকানা - শুলংগুড়ি কলোনি পাড়া, পোষ্টঅফিস - গৌরাঙ্গ নগর, থানা - নিউ টাউন, উত্তর চব্বিশ পরগণা, আদি নিবাস বরিশাল।

৫) নাম - বিউটি অধিকারী।

বয়স - ৪০।

ঠিকানা শুলংগুড়ি কলোনি পাড়া, পোষ্টঅফিস - গৌরাঙ্গ নগর, থানা - নিউ টাউন, উত্তর চব্বিশ পরগণা আদি নিবাস বরিশাল

গৃহবধূ।

৬) নাম - কবিতা বাড়ুই।

বয়স - ৫২।

গৃহবধূ ।

ঠিকানা - শুলংগুড়ি কলোনি পাড়া, পোষ্টঅফিস - গৌরাঙ্গ নগর, থানা - নিউ টাউন, উত্তর চব্বিশ পরগণা আদি নিবাস বরিশাল।

৭) নাম - কমলা ব্যাপারী।

বয়স - ৭৮।

গৃহবধূ।

ঠিকানা - শুলংগুড়ি কলোনি পাড়া, পোষ্টঅফিস - গৌরাঙ্গ নগর, থানা - নিউ টাউন, উত্তর চব্বিশ পরগণা আদি নিবাস বরিশাল।

৮) নাম - গৌরী দাস।

বয়স - ৫০।

গৃহবধূ ।

ঠিকানা - শুলংগুড়ি কলোনি পাড়া, পোষ্টঅফিস - গৌরাঙ্গ নগর, থানা - নিউ টাউন, উত্তর চব্বিশ পরগণা আদি নিবাস বরিশাল।

৯) নাম - সরযূ সিকদার।

বয়স - ৭০।

গৃহবধূ ।

ঠিকানা - শুলংগুড়ি কলোনি পাড়া, পোষ্টঅফিস - গৌরাঙ্গ নগর, থানা - নিউ টাউন, উত্তর চব্বিশ পরগণা আদি নিবাস বরিশাল।

১০) নাম - নমিতা মণ্ডল ।

বয়স - ৮৪।

গৃহবধূ।

ঠিকানা - শুলংগুড়ি কলোনি পাড়া, পোষ্টঅফিস - গৌরাঙ্গ নগর, থানা - নিউ টাউন, উত্তর চব্বিশ পরগণা আদি নিবাস বরিশাল।

মঞ্চে প্রদর্শিত রয়ানী দেখার অভিজ্ঞতা, ও দলের সদস্যদের সাক্ষাৎকার -

* দলের নাম - মঞ্জুরাণী সম্প্রদায় মা মনসা সহায়

তথ্যদাতা পুরুষ

১) নাম - শোভন মিস্ত্রী

বয়স - ৩৫

ঠিকানা - নিউ ব্যারাকপুর, ছোট বটতলা, উত্তর চব্বিশ পরগণা

পেশা - ভাগবত পাঠ করেন, রয়ানীর দল পরিচালনা, গায়েন হিসাবে অংশগ্রহণ

২) নাম - ফণী নট্ট।

ঠিকানা - নিমতা, তারকেশ্বর পল্লী, উত্তর দমদম।

বয়স - ৬০।

জীবিকা - রয়ানীর দলে ঢোল বাজান।

৩) নাম - স্বপন নট্ট।

ঠিকানা - সোদপুর, ঘোলা, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

বয়স - ৫৯।

জীবিকা - রয়ানীর দলে বাঁশি বাজান।

৪) নাম - বিমল নট্ট।

ঠিকানা - সোদপুর, নাটাগড়, তরুণ পল্লী, উত্তর চব্বিশ পরগণা ।

বয়স - ৬৫।

জীবিকা - রয়ানীর দলে হারমনিয়াম বাজান।

৫) নাম - বলরাম সরকার ।

ঠিকানা - বামনগাছি, কুলবেরিয়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

বয়স - ৬০।

পেশা - রয়ানীর দলে গায়েন হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

মহিলা সদস্য।

১) নাম - মঞ্জুরাণী বিক্রম।

ঠিকানা - গ্রাম মহেশ্বরপুর, পোস্ট - বাদু, থানা - বারাসাত, আদি নিবাস বরিশাল।

বয়স - ৬০।

জীবিকা - উক্ত রয়ানীর দলে প্রধান গায়েন রূপে কাজ করেন, লোকশিল্পী হিসাবে সরকারী ভাতা পান।

২) নাম - সবিতা গায়েন।

ঠিকানা - নিউ ব্যারাকপুর, রামকৃষ্ণ পাঠাগার নিকটস্থ, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

বয়স - ৫৫

জীবিকা - রয়ানীর দলে গায়েন হিসাবে কাজ করেন, ফুলের ব্যবসাও করেন।

৩) নাম - দেবীরাণী বিশ্বাস।

ঠিকানা - সুভাষ পল্লী, বারাসাত, নোয়াপাড়া।

বয়স - ৬০।

জীবিকা - রয়ানীর দলে গায়েন হিসাবে কাজ করেন, সেলাইয়ের কাজ করেন।

৪) নাম - গৌরী মল্লিক।

ঠিকানা - দত্তপুকুর, চন্দ্রপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

বয়স - ৬৫।

জীবিকা - রয়ানীর দলে গায়েন হিসাবে কাজ করেন।

৫) নাম - শেফালী সরকার।

ঠিকানা - সুভাষ পল্লী, বারাসাত, নোয়াপাড়া।

বয়স - ৬৫।

জীবিকা - রয়ানীর দলে গায়েন হিসাবে কাজ করেন।

* দলের নাম - শোভারাণী সম্প্রদায়

মহিলা সদস্য -

১) পরিচালক - শোভারাণী হালদার।

বয়স - ৭৫।

ঠিকানা - নিউ ব্যারাকপুর, লেলিংগড়, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

পেশা - রয়ানীর দল পরিচালনা এবং উপস্থাপনায় অংশগ্রহন।

২) নাম - সবিতা গায়েন।

ঠিকানা - নিউ ব্যারাকপুর, ছোট বটতলা।

জীবিকা - রয়ানী গান।

বয়স - ৫৬।

৩) নাম - শান্তি মজুমদার।

ঠিকানা - মধ্যমগ্রাম, সুভাষপল্লী।

জীবিকা - রয়ানী গান।

বয়স - ৬৫।

পুরুষ সদস্য

১) নাম - তরুণ হালদার।

ঠিকানা - বাইগাছি,শক্তিনগর, অশোকনগর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

বয়স - ৩৫।

জীবিকা - বেসরকারী কোম্পানিতে এক্সপোর্টের কাজ করেন, সতেরো বছর বয়স থেকে রয়ানীর দলের গায়েন হিসাবে নিযুক্ত।

২) নাম - সুভাষ হালদার।

বয়স -৬১।

ঠিকানা - পশ্চিম আগাপুর, নিউ ব্যারাকপুর।

জীবিকা - টোটো চালক, রয়ানীর আসরে ঢোল বাজান।

৩) নাম - সুজয় নস্কর।

বয়স - ২৫।

ঠিকানা - বাণীপুর, উত্তর ২৪ পরগণা।

জীবিকা - রয়ানী গান করে এবং ঢাক বাজায়।

৪) নাম - রমেশ হালদার।

বয়স - ৮০।

ঠিকানা - চাঁদপুর, লেলিংগড়, নিউ ব্যারাকপুর।জীবিকা - রয়ানীর গায়েন, পূর্বে মিস্ত্রীর কাজ করতেন।

৫) নাম - সন্তু নট্ট।

বয়স - ৬০।

ঠিকানা - অশোকনগর, কল্যাণগড়, উত্তর ২৪ পরগণা।

জীবিকা - ২০ বছর বয়স থেকে রয়ানীর আসরে বাঁশি বাজান, বিয়েবাড়ির বাজনার দলে যন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন।

মনসাপালা কেন্দ্রিক কবিগান

বাংলা লোকসঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট ধারা কবিগান। কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আসরে উপস্থিত দুই গায়েনের গানে গানে প্রতিযোগিতা চলে। এই গায়েনকে আবার কবিও হতে হয়। তিনি মঞ্চে তার বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, মনন ও প্রতিভার সমন্বয়ে তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা করেন, এবং কখনও কথায় কখনও সুরে যুক্তি তর্কে বিপরীত কবির বক্তব্য খণ্ডনে তথা নিজ বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। এভাবেই আসরে কথায় গানে চলে কবির লড়াই। মনসামঙ্গলের কাহিনি অবলম্বনে যে কবির লড়াই বঙ্গদেশে প্রচলিত, তার প্রকৃতি সাধারণ কবিগান অপেক্ষা কিছুটা পৃথক। এখানে বিষয় বৈচিত্র্য কম। চাঁদ বনাম মনসা, মনসা বনাম জরৎকারু - এরকম মনসামঙ্গলের কাহিনির অন্তর্গত কোন বিষয় বিভিন্ন পুরাণ ও সমসাময়িক ঘটনার অনুষঙ্গে তুলে ধরা হয়। কবিগানের দলে কবির সঙ্গে থাকে যন্ত্রীরা। তারা প্রয়োজন মত ধুয়া গায়। তবে ভিন্ন ভিন্ন কবির ক্ষেত্রে গায়নশৈলী, মনন, উপস্থাপন রীতি স্বতন্ত্র।

মনসা পালার যে কবিগান, মনসামঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে তার আয়োজন হলেও কবির লড়াইএ বিপরীত পক্ষকে হারাতে বিভিন্ন পুরাণ তথা রামায়ণ মহাভারতের মত মহাকাব্যে গভীর বুৎপত্তি আবশ্যক। তবে আয়োজকেরা তিন ঘণ্টা, বা ছয় ঘণ্টা যে সময় কবি সরকারদের নির্দিষ্ট করে দেন, সেই মত দুই কবি মঞ্চে ওঠার আগে পালা ভাগ করে নেন নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে। চাঁদ মনসার বাদ-বিসম্বাদে এক পক্ষ চাঁদ, অপর পক্ষ মনসার ভূমিকায় চালিয়ে যান কবির লড়াই। তবে কবিদের সম্পূর্ণ মনসাকাব্য পালা আকারে শেষ করতে সময় লাগে সাত থেকে আট দিন। এখন অবশ্য এই দীর্ঘ কবির আসর খুব কমই আয়োজিত হয়। একদিকে কবিগানের সঙ্গে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের বাদক, কলাকুশলীদের ব্যায়ভার সহ অন্যান্য খরচ চালানোয় অসুবিধা, অন্যদিকে মানুষের ব্যস্ততার কারণে দুই বা এক দিনের মনসাপালার কবির আসরের আয়োজন হয়

বেশি। দেববন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত। মনসার জন্ম, বনবাস, পূজা পালা (জেলে বাড়ির পূজা, জালু মালুর বাড়ির পূজা), চাঁদ সদাগরের কাছে পূজা চাওয়া এবং পূজা নিষিদ্ধ করায় চাঁদ সদাগরের চরম বিপর্যয়, চাঁদের বাণিজ্য পালা, লক্ষিন্দরের বিবাহ পালা, দংশন ও মরণ পালা, ও একদম শেষে জিয়ান পালা - এই ক্রমানুসারে সংক্ষেপেই শেষ করা হয় এখনকার দিনের বেশিরভাগ মনসাকেন্দ্রিক কবিগান। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, সহ নানা জেলায় প্রান্তবঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হিসাবে মনসাপালার কবিগান, কবিদের ভাষায় *কবি ঝাঁপান* নিজ মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

মহিলা কবি শান্তিলতা বিশ্বাস ও মনসাপালার কবিগান - নদিয়া জেলায় এমন বহু কবিয়ালের কথা জানা যায়, যারা মনসামঙ্গলের কাহিনী কেন্দ্রিক কবিগান করে থাকেন। তবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মহিলা কবি হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন নদিয়া জেলার ফুলিয়ার কৃষিপল্লীর শান্তিলতা বিশ্বাস। ইনি বৈষ্ণব। বাড়িতে ৭২ বছর পুরানো প্রতিষ্ঠিত মনসা মন্দির। এই মন্দিরেই তিনি বাস করেন। মনসার চতুর্ভুজা দেবীমূর্তির দুপাশে রয়েছেন বেহুলা ও নেতা। রাধানাথ রায়ের পদ্মাপুরাণ, বিজয়গুপ্ত, দ্বিজ বংশীদাস, কানা হরিদত্ত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ইত্যাদি কবির পুঁথিসহ বাইশ কবির মনসামঙ্গল প্রায় মুখস্ত তার। এর সঙ্গে শিব পুরাণ, কালিকা পুরাণ ইত্যাদি পুরাণপাঠের অভিজ্ঞতা তার মনসাপালার কবিগানকে সমৃদ্ধ করেছে। মনসা কাব্যে জ্ঞান, একনিষ্ঠতা, সঙ্গীত প্রতিভা, বহু বছরের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতায় আজ দুই বঙ্গেই মনসাপালা কেন্দ্রিক কবিগানের আসরে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়।

কবিগানের প্রকৃতিগত বিবর্তন - ইতিমধ্যে এই সুপ্রাচীন সংস্কৃতিতে এসেছে এক ধারাবাহিক বিবর্তন। পঁচিশ বছর আগেও মনসাপালাকে কেন্দ্র করে যে কবিগানের আসর বসত, সেখানে অবাধে চলত খিস্তি খেয়ুড়ে ভরা অশ্লীল ভাষার কাদা ছোঁড়াছুড়ি । খুবই সামান্য আয়োজনে গ্রামের জঙ্গলে বা বাঁশ বাগানে, তাবু বা চট টানিয়ে এই মনসার কবিগান করা হত। এই গানে কবি সরকাররা এতটাই অকথ্য অশ্লীল ভাষা ব্যাবহার করতেন, যে গ্রামের মা, বোনেরা, বা রুচিশীল কোন মানুষের পক্ষেই সেই আসরে উপস্থিত

থাকাটা সম্ভবপর ছিল না। পুরুষরাই কেবল উপস্থিত থাকতেন এই আসরে। সব মিলিয়ে এই মনসা পালার কবিগান ছিল একেবারেই গ্রাম্যতাপূর্ণ লোকাচার বিশেষ। যিনি চাঁদের হয়ে লড়তেন, তিনি বিপরীত পক্ষকে, আবার যিনি মনসার হয়ে লড়তেন, তিনি চাঁদের প্রতিনিধিকে গালি গালাজ করার এই রেওয়াজ চালু ছিল বঙ্গদেশে বহুকাল। ফুলিয়ার শান্তিলতা বিশ্বাসের মত লোকশিল্পীরাই প্রথম মনসাকেন্দ্রিক কবিগানকে একটি মার্জিত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। চাঁদ মনসা বিবাদের প্রচলিত কাহিনীর সাথে যুক্ত হয় একাধারে পুরাণের আনুষঙ্গিক প্রেক্ষাপটের সমর্থন, অপরদিকে মনসামঙ্গলের কাহিনীর অন্তরালে মানবজীবনের অন্তর্নিহিত সত্যের তাৎপর্যে দেহতত্ত্বের রূপক বিশ্লেষণ। বর্তমানে বাঁকুড়া, বর্ধমান, নদীয়া, সহ পশ্চিমবঙ্গের বহু প্রান্তীয় অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয় শান্তিলতা বিশ্বাসের মনসাপালা কেন্দ্রিক কবিগানের আসরে। অশ্লীল অকথ্য শব্দ প্রয়োগের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলকাব্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে পৌরাণিক অনুষঙ্গের প্রয়োগে কবি ঝাঁপান শিক্ষিত মার্জিত শ্রেণির মনোগ্রাহী হয়েছে।

দেহতত্ত্ব ও কবিগান - আসরে কবি সরকাররা কাহিনী পরিবেশন করেন বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য থেকে, আর পদ গেয়ে থাকেন মূলত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ থেকে পদ নিয়ে । চাঁদ না মনসা কে বড়? - এই বিশেষ প্রশ্ন থেকে দুই কবি সরকারের দাবি পৌঁছয় পুরুষ না প্রকৃতি, - এই নির্বিশেষ প্রশ্নে। পরম পৌরুষবান চন্দ্রধর বণিক নারী দেবতার মহিমা মানতে নারাজ। তার পক্ষের কবি সরকার বিজয়গুপ্তের কাব্য থেকে পদ গেয়ে এই রকম প্রশ্ন তুলবেন- মনসার মত নারী যে কিনা নিজের একটি নষ্ট হওয়া চোখ সারাতেও ব্যর্থ, তিনি কিভাবে জগত পালন করবেন। অপর দিকে মনসা পক্ষের কবি তার যুক্তি দিয়ে বোঝাবেন, নারী যদি শ্রেষ্ঠ নয়, তবে দেবাদিদেব মহাদেব কেন শক্তির আসন বুকে নিয়েছিলেন ? নারীর প্রেম ত দেবতা থেকে মানব সকল পুরুষের চির আকাঙ্ক্ষার অনুভব।

প্রেম লাগি মহাযোগী শ্মশানচারী পঞ্চানন
কিঞ্চিত ধ্যানের মর্ম লাগি

বুকে নিয়েছিল শক্তির আসন।
প্রেম কি সামান্য রতন?
প্রেম লাগি রাধার পায়ে দাস খত দিল
আমার সেই কৃষ্ণধন
প্রেম কি সামান্য রতন?*

এই প্রেমের বলেই চার যুগে শক্তি রূপিণী মা শ্যামার চরণতলে সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ মহাদেব শিবের অবস্থান। আর দেবী পদ্মাবতী যিনি কলি যুগে মা মনসা নামে আবির্ভূত হয়েছেন সকল পাপ, অন্ধকার, থেকে মুক্ত হয়ে মানুষকে চৈতন্যের আলোয় জীবনের সঠিক পথ দেখাতে। তিনিই আদি শক্তিরূপিণী। তার মধ্যেই দুর্গা, কালিকা, লক্ষ্মী, শীতলার অবস্থান। এভাবেই গ্রন্থভিত্তিক যুক্তির প্রয়োগে, কাব্য কাহিনির ক্রমিক অগ্রগতির সঙ্গে লোকসঙ্গীত, তথা কবি সরকারদের ছন্দে ছন্দে নেচে ওঠার জমজমাট কলাকুশলতায় মনসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় কবির আসরে।

মনসা কাহিনীর মধ্যে যে দেহতত্ত্বের রূপক অবস্থানের কথা বর্তমান কবি সরকারেরা বলেন, তা এই রকম – বাস্তবে প্রতিটি সম্ভাব্য পিতা বছরে একবার গর্ভবান হন। যে গর্ভভার তিনি মাথায় ধরে রাখেন অধিকপক্ষে তিন মাস কুড়ি দিন। অন্যদিকে সম্ভাব্য মায়েরা বছরে বারো বার গর্ভবতী হন। পুরুষ গর্ভভার ধরে রাখতে না পারলে নারীর কাছে আসেন। নারী ঋতুবতী থাকলে তিনি পুরুষের গর্ভভার গ্রহন করে অন্তঃসত্ত্বা হন। নারীদেহে সেই গর্ভ প্রতিপালিত হয় দশ মাস দশ দিন। সুতরাং পুরুষ নারী মিলিয়ে মোট চোদ্দ মাসে এই দেহ পূর্ণ হয়। যেকোন স্বাভাবিক চেহারার মানবদেহ এই চোদ্দ পোয়া, আশি মুঠ তথা সাড়ে তিন হাতেই সম্পূর্ণ হয়। এর এক চুলও কম বা বেশি নয়। মনসামঙ্গলের চাঁদ বণিকের চোদ্দ তরী আসলে চোদ্দ পোয়ায় গঠিত মানবদেহের রূপক। নারী দেহের নাভী থেকে ঊর্ধ্বদেশ হল কাব্যের উত্তরদেশ, যেখানে আছে দুটি দধিভাণ্ড এবং তার ওপরে মুখমণ্ডলরূপ আয়নামহল। আর নাভীর নিম্নাঙ্গ হল দক্ষিণদেশ। সেখানে মহাপদ্মের নীচে আড়াই পাকে বাঁধা আছে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, যাকে বুকে চেপে সেই সাত

সমুদ্র পারের অতলে বাস করছেন দেবী মনসা। বিবাহের পরেই লক্ষিন্দর বেহুলার দেহের সেই অতলে হারাতে চেয়েছিল। বেহুলা কিন্তু নিজ সংযমের পরিচয় দিয়েছিল।

অখণ্ড কলিকা প্রভু নহেত প্রকাশ।
বিকশিত কমলে ভ্রমরে করে আশ।।
... ...
তপ্ত তপ্ত কবু প্রভু খাওন না জাএ।
জুড়াইয়া খাইলে অধিক স্বাদ পাএ।।[৮]

এই সংযমের বলেই সে তার স্বামীকে উদ্ধার করতে পেরেছিল। বাস্তব জগতে প্রতিটি পুরুষ প্রতি রাত্রে অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে নারী দেহের আসক্তির ফল স্বরূপ সমস্যাসঙ্কুল কালিদহে ডুবে মরে। না জেনে না বুঝে বাণিজ্য করতে গেলে, অর্জিত ফল অচিরেই নষ্ট হয়। যেমন পদ্মাপুরাণের চাঁদ এই দক্ষিণ দেশেই বাণিজ্য করতে গিয়েছিল, যেখানে তার বাণিজ্য তরীগুলির ভরাডুবি হয়। বেহুলার সংযম তার একনিষ্ঠতা, হার না মানা জেদ, যুগে যুগে নারীর পক্ষে শিক্ষণীয়। তার ছয় মাস স্বামীর সঙ্গে কলার ভেলায় ভাসা সেই উদারতা, সেই সংযমকেই চিহ্নিত করে। বাস্তব জগতে যে সকল পিতামাতা বৈবাহিক জীবনের সূচনায় নিজেদের মধ্যে আলাপ, পরিচয়, প্রেম তথা হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপনের আগেই গর্ভস্থাপন করেন, তাদের গর্ভে জন্মানো সন্তানদের অপুষ্টতা তথা বিকলাঙ্গতার কারণ তাদের পিতামাতার প্রাথমিক অসংযম। তাই মনসামঙ্গল বলে এ কাব্যগান স্বামী বাঁচাবার গান। নারীর চরিত্র গঠন করার গান। সমগ্র বাঙালী জাতির চেতনা চৈতন্য জাগাবার গান। বহু অর্থ ব্যয় করে দুর্গা, কালি, বা মনসারূপী শক্তির আরাধনায় জাতির মুক্তি নেই। প্রতিটি পুরুষের সহধর্মিণীই জীবন্ত মনসা। নারীদেহে বাহাত্তর হাজার সাপ বাস করে যা তার নাড়ীস্বরূপ। এর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রধান। এদের মধ্যে সুষুম্না জাগরিত হলে মনসার তথা জ্ঞানের তথা উদার চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাগীতির সাধনতত্ত্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক-

চর্যাপদ ও মনসাপালার কবিগান - চর্যাকারদের ধর্মমতে বোধিচিত্ত বা মহাসুখ লাভই সাধকের পরম কাম্য। মনসাপালার কবিয়ালরা নারীর দেহের প্রধান প্রধান নাড়ীর জাগরণের ফলে চেতনার জাগরণের কথা বলেছেন। বহুকাল পূর্বে রচিত চর্যায় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনতত্ত্বের সাথে তার মিল লক্ষ্য করবার মত। চর্যায় বলা হয়েছিল, বাম নাসারন্ধ্র থেকে প্রবাহিত বামগা নাড়ী প্রজ্ঞারূপিণী আর ডান নাসারন্ধ্র থেকে প্রবাহিত ডানগা নাড়ী উপায়রূপিণী। এর মধ্যে অবস্থিত মধ্যগা নাড়ী পথেই সাধকের বোধিচিত্তের উদ্বোধন ঘটে। ডানগা ও বামগা নাড়ীর ক্রিয়াধারাকে বিশুদ্ধ ও মিলিত করলে নাভিদেশের নির্মাণচক্রে বোধিচিত্তের উদ্ভব হয় অর্থাৎ সকল বিষয়ের প্রতি একটি কল্যাণ চেতনা দৃঢ় হয়। এর পর মধ্যগা নাড়ী পথে সেই চেতনা পৌঁছয় ঊর্ধ্বগতিতে হৃদয়ে অবস্থিত ধর্মচক্রে, তারপর ক্রমোন্নত ধারায় কণ্ঠে অবস্থিত সম্ভোগ চক্রে, এবং তারপর একই গতিতে মস্তকে অবস্থিত মহাসুখচক্রে। এই মহাসুখ যা মোহমায়াভরা জাগতিক অবস্থা থেকে সাধকের উত্তরণ ঘটায় এক মহাজাগতিক তথা পারমার্থিক বোধে।

মনসাপালার কবিয়ালেরাও সেই মহাজাগতিক বোধকেই দেবী মনসা রূপে বর্ণনা করেন। আর মস্তকে উত্তীর্ণ চৈতন্য যা চর্যাকারদের মহাসুখ, কবিয়ালদের অনুভবে তা জগতের প্রতিটি পুরুষের মস্তকে ধরে রাখা সেই গর্ভ অবস্থা, মনসাকাব্যে তা চন্দ্রধরের চন্দ্র। এই গর্ভাবস্থাকে নির্দিষ্ট সময়াবধি ধরে রাখতে পারে না বলেই নিয়ত প্রতিটি পুরুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটে। সেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হতে গেলে নিজ নিজ সহধর্মিণীর মধ্যেকার মনসারূপী চেতনাকে উপলব্ধি করতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে চর্যাগানের বোধিচিত্ত আর কবিগানের মনসা এক হয়ে যায় এবং দুটি ক্ষেত্রেই রূপকের আড়ালে ধর্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বের গুহ্য অবস্থানও লক্ষ্য করা যায়। চর্যাকারেরা পৃথক পৃথক পদে বাস্তব সমাজ জীবনের নানা ঘটনা বর্ণনার আড়ালে তাদের তত্ত্বকথাকে আবৃত করেছিলেন, আর মনসাপালার কবিয়ালেরা মনসামঙ্গলের কাহিনীর অন্তরালে তাদের তত্ত্বকথাকে প্রতিস্থাপিত করেছেন। এই প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে উক্ত কবিয়ালদের ওপর চর্যাগীতির প্রভাব থাকার সম্ভাবনা নেই বলেই মনে হয়। কারণ এমন কবিয়ালও আছেন যারা বংশ পরম্পরায় প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার সঙ্গে সেভাবে যুক্ত নন, চর্যাপদের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই, অথচ

মনসা বিষয়ক কাব্য ও পুরাণে তাদের বুৎপত্তি গভীর। ফুলিয়ার মহিলা কবি শান্তিলতা বিশ্বাস দাবী করেন মনসাপালার কবিগানকে তত্ত্বের আলোকে প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব তার নিজের। তার গভীর অধ্যয়ন, ব্যাপক মনসা চর্চায় তিনি মনসা কাব্যের অন্তরালে থাকা এত যুগের অনালোকিত তত্ত্বে আলোকপাতে সমর্থ হয়েছেন। এ তত্ত্বে বাইরের আর কোন পুঁথির প্রভাব নেই। এ ব্যাখ্যা বিভিন্ন মনসাকাব্য ও বিভিন্ন পুরাণে উল্লিখিত মনসাকথার নির্যাস।

সাংস্কৃতিক সমন্বয় - এই কবিগানে আর একটি বিবর্তন ঘটেছে ধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে। একটা সময় পর্যন্ত বৈষ্ণবেরা মনসা সংস্কৃতি থেকে দূরেই অবস্থান করতেন। কিন্তু বর্তমানে যারা নানা ভাবে মনসার সাধনা করছেন, গৃহে বা মন্দিরে তারা অনেকেই বৈষ্ণব। মনসা পালার কবিয়ালেরা কিন্তু দাবী করেন এই ধর্ম সমন্বয়ের গৌরব তাদের প্রাপ্য। কারণ কবির আসরে তারা বিভিন্ন পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের পদ বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে মনসা বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ চূড়ামণি।

আত্মারামাচ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধ যোগিনী ।
ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্তা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।।[২]

বর্তমানে কবির আসরে দেবী মনসা বৈষ্ণব মাতাজীতে পরিণত হয়েছেন। পুরাণ অনুসারে স্বয়ং ভগবান নারায়ণ দেবী মনসার পূজা করেছিলেন।[৩] এর সঙ্গেই যুক্ত হয়ে যায় সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের দিকটি। মনসা লৌকিক দেবী হিসাবেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূজিতা। অন্যদিকে বৈষ্ণবেরা আর্য সংস্কৃতির সাথে যুক্ত। অথচ আজ বৈষ্ণবেরা নিজ গৃহে মনসা মন্দির স্থাপন করেছেন এবং দেবীর আরাধনা করছেন, সেই সঙ্গে আসরে দেবীর মাহাত্ম্যমূলক গানও গাইছেন। তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলায় বিশেষ আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে যখন মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ কাব্যের ধারার উত্থান হয়েছিল তার পেছনেও ছিল এই সাংস্কৃতিক সমন্বয় তথা আর্য অনার্য মেলবন্ধনের দিকটি। আর একুশ শতকে বৈষ্ণব কবিয়ালেরা যখন আসরে মনসাগান করেন, তখন স্বতঃস্ফূর্ত সাংস্কৃতিক সমন্বয় তথা পারস্পরিক সম্প্রীতিও একই সাথে প্রকাশিত হয়।

তথ্যসূত্র -

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

তথ্যদাতার পরিচয়

১) নাম - শান্তিলতা বিশ্বাস।

বয়স - ৫৫।

পেশা - লোকশিল্পী, নিজের কবি গানের দল আছে।

ঠিকানা - ফুলিয়া, কৃষিপল্লী, নদিয়া।

২) নাম - অনুপ মণ্ডল।

বয়স - ৩০।

পেশা - কবি, চিত্রশিল্পী, লোকসংস্কৃতিবিদ।

ঠিকানা - গ্রাম - রঘুনাথপুর, পোস্ট - চূর্ণী রঘুনাথপুর, থানা- ধানতলা, জেলা - নদিয়া।

৩) নাম - উৎপল প্রামাণিক।

বয়স - ৪২।

পেশা - শান্তিলতা বিশ্বাসের কবিঝাঁপানের আসরে জুড়ি বাজান।

গ্রাম ও পোষ্ট - ধোপট্ট, জেলা - নদিয়া, ৭১১১০৩।

৪) নাম - সুভাষ দাস।

বয়স - ৩০।

পেশা - শান্তিলতা বিশ্বাসের কবিঝাঁপানের আসরে কিবোর্ড বাজান।

গ্রাম ও পোস্ট - ভীমপুর, জেলা - নদিয়া।

৫) নাম - বিশ্বজিৎ দাস।

বয়স - ২৫।

পেশা - শান্তিলতা বিশ্বাসের কবিঝাঁপানের আসরে ঢোল বাজান।

গ্রাম - দাসপাড়া, পোষ্ট - আড়ংঘাটা, নদিয়া।

৬) নাম - সুবোধ দাস ।

বয়স - ৪৬।

গ্রাম - ঢাকুরিয়া, পোষ্ট - ঢাকুরিয়া ঘুচুলিয়া, নদিয়া ৭৪১৪০২।

পেশা - শান্তিলতা বিশ্বাসের কবিঝাঁপানের আসরে দোতারা বাজান।

* ফুলিয়ার কবি সরকার শান্তিলতা বিশ্বাসের অনুষ্ঠানে তার গাওয়া পদের অংশবিশেষ।

সহায়ক গ্রন্থ -

১) বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃ.৪১৮।

২) মহর্ষি বেদব্যাস, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, সম্পাদনা সুবোধচন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটীর, ২০১৮, পৃ.২১৩।

৩) মহর্ষি বেদব্যাস, দেবীভাগবতম, সম্পাদনা পঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ.৯৭৮।

৪) ড.নির্মল দাশ, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০০৫,পৃ.৫২।

পটশিল্পে মনসামঙ্গল

এলাকার পরিচয় -

১) গ্রাম নয়া, থানা পিংলা, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর

মোট জনসংখ্যা - ৩৯৬০ (২০১১ জনগননা অনুসারে) পুরুষ -২০২৬ ,মহিলা - ১৯৩৪

গ্রামের সকলেই মুসলমান

২) গ্রাম - ভরতপুর, ব্লক ছাতনা, জেলা বাঁকুড়া

মোট জনসংখ্যা ৪০৩, পুরুষ ২১১, মহিলা ১৯২ (২০১১ জনগননা অনুসারে)

গ্রামের সকলেই হিন্দু

বাংলার লৌকিক দেবী মনসা। ঘটে, পটে, সিজ গাছে, কখনো বা কালো হাড়িতে, উনুনে বা প্রতিমায় বাংলাদেশের লোকসমাজে নানা রূপে তার অবস্থান। পটে মনসার অবস্থানের স্বতন্ত্র তাৎপর্য রয়েছে। বাংলা লোকসংস্কৃতির ধারায় একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিল্পরূপ হল পট। পট সাধারণত পূজা হয় না। তবে চিত্রকলা ও লোকগান একই সঙ্গে সংস্কৃতির দুটি সমান্তরাল ধারায় দেবী মনসা পটশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। সংস্কৃত পট্ট থেকে এসেছে বাংলা পট শব্দটি। পট্ট অর্থাৎ বস্ত্রখণ্ড। কাপড়ে আঁকা চিত্র তাই পটচিত্র। বর্তমানে অবশ্য আর্টপেপারে এঁকে পেছন দিকে আঠা দিয়ে কাপড় লাগিয়েও পট তৈরি হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, সরকারের নানা কর্মসূচী, আদিবাসিদের জীবনকাহিনী, সমাজে নারীর

অবস্থান তথা লিঙ্গবৈষম্যের মত সামাজিক সমস্যা, চক্ষুদানের মত সমাজকল্যাণকর বিষয়, সুনামি, ভুমিকম্পের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়, পোলিও প্রচারের মত লোকসচেতনতামূলক বিষয়, অথবা মহাপুরুষদের জীবনকথা, সহ সমসাময়িক নানা বিষয় পটুয়া শিল্পে রূপায়িত হয়। পটুয়াদের সঙ্গে লোকসমাজে জনপ্রিয়তার জন্য পটশিল্পের উদ্ভবের প্রাথমিক পর্যায়ে এরা মঙ্গলকাব্য, মহাকাব্যের পৌরাণিক আখ্যানকেই বেছে নিয়েছিল। এই সব আদি পটের মধ্যে অন্যতম বেহুলা লক্ষীন্দরের কাহিনী কেন্দ্রিক মনসার পট ও পটের গান। মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হওয়ার আগে মধ্যযুগে পাঁচালী পাঠের চল ছিল। পাঁচালীই বৃহৎ ও জটিল আখ্যানধর্মী মঙ্গলকাব্য রূপে প্রকাশিত হয়েছিল যুগ চাহিদায়। আবার মঙ্গলকাব্যের মূল ঘটনার নির্যাস নিয়ে, কখনও বা তার সাথে পটুয়াদের নিজ মনন যুক্ত হয়ে রচিত হয় পাঁচালির মতই সরল একমুখী পটের গান। পট মূলত বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখানো হত, সেই সঙ্গে শোনানো হত কাহিনি ভিত্তিক গান। লোকসমাজে এর জনপ্রিয়তা ছিল। পটকারেরা গান শুনিয়ে চাল, আলু, পয়সা ইত্যাদি উপার্জন করত। এই রীতি এখনও চালু আছে, তবে আগের চেয়ে কম।

পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা থানার অন্তর্গত নয়া গ্রাম। বর্তমানে গ্রামের বাহাত্তরটি পরিবারের ছোট থেকে বড় সকলেই পূর্বপুরুষ সূত্রে পটের কাজের সঙ্গে যুক্ত। পটুয়ারা সকলেই মনসার পটের বিশেষ গুরুত্বের কথা ব্যক্ত করেছেন। এদের মতে মনসার পটই এদের আদি পট। এই গ্রামের পটুয়ারা সকলেই মুসলিম। মনসামঙ্গলের মত পৌরাণিক কোন আখ্যানই এদের পড়া নেই। লোকমুখে প্রচারিত গল্পকথাকে আশ্রয় করেই এদের পটের ছবি ও গানের গড়ে ওঠা। ফলে মুসলিম পটুয়াদের মুখে মঙ্গলকাব্যের দেব দেবীর গান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে। অন্যদিকে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর কাঙ্ক্ষিত বিজয় যাত্রাকে আধুনিক যুগেও সম্প্রসারিত করেছে।

নয়ার পটশিল্পীদের গড়া মনসার পট মূলত দুই প্রকার। আয়তাকার পট ও জড়ানো পট। আয়তাকার পটটিতে একটিই ছবিতে রয়েছেন সর্পাসনা দেবী মনসা, মাথায় পঞ্চনাগ, ডানে চাঁদ সদাগর ও বামে বেহুলা। জড়ানো পট আবার দুই প্রকার। আড়াআড়ি জড়ানো পট আর লম্বা জড়ানো পট। আড়াআড়ি জড়ানো পটে চার থেকে পাঁচটি ছবিতে মনসামঙ্গল

কাব্যকথার মূল বিষয় রূপায়িত হয়। এগুলি মূলত ঘর সাজাবার উপকরণ হিসেবে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয়। নয়া'র মমতা চিত্রকরের(৩৬) থেকে পাওয়া এই আড়াআড়ি জড়ানো পটের প্রথম আর শেষ দুটি ছবিই দেবী মনসার, দু'দিকে পূজারত চাঁদ বেনে আর বেহুলা। দ্বিতীয়টি বেহুলার গৃহে বিবাহ সম্বন্ধ করতে আগত জনার্দন ঘটক ও বেহুলার পিতা মাতার ছবি। তৃতীয় ছবিতে বেহুলা লক্ষীন্দরের বিয়ের পর পালকি যাত্রার দৃশ্য আর চতুর্থ পর্যায়ে লোহার বাসর ঘরে লক্ষীন্দরের সর্প দংশনের ছবি। পঞ্চম ছবিতে মৃত স্বামীকে নিয়ে বেহুলার ভাসান যাত্রা, গোদার ঘাটের দৃশ্য। এইভাবে মোট ছ'টি ছবিতে পটটি সমাপ্ত। আবার রানী চিত্রকরের থেকে পাওয়া আয়তাকার জড়ানো পটটিতে মাত্র তিনটি ছবি। প্রথমটি চাঁদ বেনে আর বেহুলার মাঝে দেবী মনসার ছবি। চাঁদের হাতে হেতালের লাঠি আসলে তার সাথে মনসার বিবাদকে প্রতিফলিত করে। দেবী সর্পাসনা। মাথায় পঞ্চনাগ, দু হাতেও সাপ। দ্বিতীয় পটের দুটি ভাগ। একটিতে চাঁদ সদাগরের মৃত ছয় পুত্র আর ছয় বিধবা পুত্রবধূর ছবি। আর অপরভাগে সায় বেনের গৃহে বেহুলা লক্ষীন্দরের ছবি। শেষ ও তৃতীয় পটে চাঁদের বাম হাতে ফুল দিয়ে মনসা পূজার ছবি। সেই সঙ্গে দেবীর পূজারত নেতা ও বেহুলার ছবি।

লম্বা জড়ানো পট বেশ দীর্ঘ। এখানে ঘটনাক্রম অনুসারে প্রায় পনের থেকে কুড়িটি ছবি থাকে। এই ছবিগুলি দেখিয়ে পটুয়ারা মনসামঙ্গল কাব্য কাহিনী কেন্দ্রিক গান গাইতেন ছবির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। এই গান পটুয়াদের নিজ সৃষ্ট এবং পটুয়া শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। নয়া'র রাণী চিত্রকরের থেকে পাওয়া মনসামঙ্গলের লম্বা জড়ানো পটের ছবি ও গানের যে পরিচয় পাওয়া গেল তা নিম্নরূপ -

'মনসামঙ্গল' পটের প্রথম ছবিতে রয়েছে মহাকালি, ব্রহ্মা, যুগল শিবপার্বতী, কৃষ্ণ – এইসকল দেবতার ছবি। এই ছবির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ দেব বন্দনা মূলক গানের অংশ কিন্তু বর্তমানে পটের গানে পাওয়া যায় না। মঙ্গলকাব্যের সূচনার দেব বন্দনা অংশটির সঙ্গে এই ছবিটি সঙ্গতিপূর্ণ। মনসার পটের প্রথম ছবির গানের অংশটি যুগে যুগে লোকসমাজের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লুপ্ত হয়ে গেছে। অথবা সহজ একমুখী লোকসংস্কৃতির সঙ্গে

সামঞ্জস্য রেখে মনসামঙ্গল পটের গানের সূচনায় স্থান পেয়েছে কেবল দেবী মনসার বন্দনা। দেবী মনসাকে স্বাগত জানিয়ে সমবেত কণ্ঠে পটুয়ারা গাইবেন –

ও তুই কেন এলি সরোবরে বেহুলা সুন্দরী
ও তোর পায়ের জল মোর গায়ে পড়িল আমি বিষহরী
ও তোর বাসর ঘরে মরবে পতি হবি কোঁড়ের আড়ি
জয় দিয়ে পূজিলাম মাকে জয় বিষহরী

এই সমবেত কণ্ঠে গান গাইবার রীতিকে পটুয়ারা বলে পয়ার ধরে গাওয়া। মধ্যযুগে রচিত অনুবাদ কাব্য বা মঙ্গলকাব্যে পয়ার ছন্দের আধিক্য ছিল। পয়ারে লেখা গানগুলি সমবেত লোকগান হিসাবে গাওয়ার চল ছিল, কিছু কিছু ক্ষেত্রে যা এখনও বর্তমান। সম্ভবত এই কারণেই পটের গানের যে যে অংশ সমবেত গাওয়ার রীতি ছিল, সেগুলিকে পটকারেরা পয়ার বলে থাকেন। মনসামঙ্গল কাব্য অবলম্বনে *রয়ানী* বা *কবি ঝাঁপানে* এই ধুয়া গাওয়ার রীতি আজও প্রচলিত। পটের গানের মাঝে মাঝে সমবেত গানের রীতি অনেকটা ধুয়া গাওয়ার সমধর্মী।

দেবীর বন্দনা গাওয়ার পর একক কণ্ঠে গাওয়া হয় মনসার জন্মকথা, নাগবেষ্টিত পরিমণ্ডলে অবস্থান, এবং চাঁদের সঙ্গে বিবাদের প্রসঙ্গ –

মনসা জগতে গৌরী জয় বিষহরী
পদ্মফুলে জন্ম নিল মা মনসা কুমারী
নাগের হল খাট পালঙ্ক নাগের সিংহাসন
মঙ্গলা বোড়ার পৃষ্ঠে মা মনসা কুমারী
তরজে গরজে বেনা মোচড়ায় দাড়ি
কাঁধে তুলে নাচে বেনা হেতালের বাড়ি
বলে, যদি বেটি ঢ্যামনের গো নাগাল যদি পাই
মারিব হেতালের বাড়ি কোমর কুচাই

উপরোক্ত গান গাওয়ার সময় দেখানো হয় পটের দ্বিতীয় ছবিটি। সেখানে রয়েছে চন্দ্রবোড়া সাপের পৃষ্ঠে পদ্মফুলে অধিষ্ঠিতা দেবী মনসার ছবি। বিবাদমান চাঁদ সদাগরের তর্জন গর্জন করে দাড়ি মোচড়ানোর ছবি পটে না থাকলেও হেতালের লাঠিটি তার হাতে স্পষ্ট। পটের গানে দেবীকে গালি দিয়ে ক্রুদ্ধ চাঁদ বণিক অকপটে ঘোষণা করে নাগালের মধ্যে পেলে তিনি হেতালের লাঠি দিয়ে মেরে তার কোমর কুচিয়ে দেবেন। মনসামঙ্গলে চাঁদ বণিক হেতালের লাঠি দ্বারা মনসার পূজা নিমিত্ত প্রস্তুত ঘট ভেঙেছিলেন। পটের গানে চাঁদের জবানিতে মনসার কোমর কুচানোর ইচ্ছা সেই ঘট ভাঙারই বিবর্তিত রূপ। মনসামঙ্গল পটের তৃতীয় ধাপে চাঁদের মৃত ছয় পুত্র ও ছয় বিধবা পুত্রবধূর ছবি চিত্রিত। এই *ছবি দেখিয়ে পটুয়ারা গান –*

সেই গালি বিষহরী আপনি শুনিল

ক্রোধ করে চাঁদ বেনার ছয় পুত্র খেল

ছয় পুত্র খেল ছয় বধূ হইল রাঁড়

জন্মে নাহি দিল বেনা কড়ার পুস্পবন

চাঁদের গালি শুনে ক্রুদ্ধ বিষহরী চাঁদের ছয় পুত্রের প্রাণ হরণ করলেন। ছয় পুত্রের মৃত্যু ও ফলতঃ ছয় পুত্রবধূর বিধবা হওয়ার মর্মান্তিক শোচনীয় ঘটনাও চন্দ্রধরের মনকে দুর্বল করতে পারে না। ইহজন্মে কখনো মনসার পূজা না করার সিদ্ধান্তে সে অবিচল থাকে। এ কাহিনি পুরোপুরি মনসামঙ্গল অনুসারী।

এরপর সমবেত গানে বেহুলার আসন্ন বিপর্যয়ের সঙ্কেত। পটের চতুর্থ ছবিতে দেখা যায় চাঁদ বণিক, জনার্দন ঘটক, ও বেহুলা লক্ষীন্দরকে। নিছনি নগরে বেহুলার পিতৃগৃহে, চম্পকনগর থেকে চাঁদ সদাগর এসেছেন তার সপ্তম তথা শেষ অবলম্বন পুত্র লক্ষীন্দারের বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে, সঙ্গে জনার্দন ঘটক। ঘটকের হাতে হুঁকো। পটের ছবিতে যে বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকে, গানের কথায় থাকে তার কিছুটা পরিপূরণ। যেমন বেহুলার নৃত্য বিদ্যায় পারদর্শিতার কথা। বা জনার্দন ঘটকের পান খেয়ে দাঁত লাল করার প্রসঙ্গ-

আছেরে কোলের পুত্র দুর্লভ লক্ষীন্দর

তার বিয়ে দিতে গেল গো নিচনি নগর

নিচনি নগরে ঘর অমূল্য বেনানী

তার মেয়ের নাম রেখেছে বেহুলা লাচনী

সমন্ধ করিতে গেল জনার্দন বুড়া

পান খেয়ে দাঁত করেছে মরিচের গুঁড়া

পঞ্চম ছবিটি বিবাহের। ছবিটিতে বিবাহ আসরে মাঝখানে রয়েছে বেহুলা লক্ষীন্দর, ডানপাশে মুণ্ডিত মস্তক, কপালে তিলক পরিহিত বিবাহের পুরোহিত, যিনি মাল্য বিনিময় করাচ্ছেন। আর বাম পাশে শঙ্খহাতে বেহুলার মা। ষষ্ঠ ছবিতে বিবাহিত বেহুলা লক্ষীন্দরের, চার জন বাহকের কাঁধে চেপে পালকিতে গমনের দৃশ্য –

বিয়ে হল লক্ষীন্দর গো পালকিতে চড়িল

আগুড়ি পিছুড়ি তাহার কাঁধে তুলে নিল

পরবর্তী অর্থাৎ সপ্তম ছবিটি বেহুলার বাসর ঘরের। পুত্র ও পুত্রবধূর সুরক্ষার নিমিত্ত চাঁদ সদাগর সাঁতালি পর্বতে নির্মাণ করিয়েছেন লোহার বাসরঘর। সেখানে বেহুলা লক্ষীন্দর ঘুমিয়ে পড়লে, সূক্ষ ছিদ্রপথে কালনাগিনীর প্রবেশ করে। কাল নাগিনীও লক্ষীন্দরের সোনার দেহে কোথায় কামড়াবে বুঝে উঠতে পারেনা। সে লক্ষিন্দরের মাথার কাছ থেকে নেমে আসে পাশে। এমন সময় পাশ ফিরতেই লক্ষিন্দরের পা লাগে কালনাগিনীর মাথায়। মাথায় পা লাগার অজুহাতে নাগিনী সেই মুহূর্তে চন্দ্র সূর্য কে সাক্ষী রেখে লক্ষীন্দরকে দংশন করে। বিষের জ্বালায় লক্ষীন্দর জেগে ওঠে, ডাকাডাকি করে জাগায় বেহুলাকে। বেহুলা সোনার জাঁতি ছুড়ে মারে কালনাগিনীর গায়। জাঁতির ঘায়ে লেজ কাটা যায় তার। ব্যাথায় ছটফট করতে করতে সে পালিয়ে যায়। পটের গানে কাহিনীটি বর্ণিত হয় এই ভাবে-

সান্তালি পর্বতে আছে লোহার বাসরঘর

তাতে শুয়ে নিদ্রা গেল বেহুলা লক্ষীন্দর

সুতার সঞ্চারী কালনাগিনী মেড়ে সাঁদায়িল

লক্ষীন্দরের রূপ দেখে সে ভাবিতে লাগিল

বলে, এ হেন কাঞ্চন শরীর কোনখানে খাব
দেব গণে জিজ্ঞাসিলে কি বোলে বলিব
মাথার শীতলেতে ছিল সর্প পাশলেতে এল
ঘুমের ঘরেতে লখা পাশ মোড়া দিল
পাশ মোড়া দিতে লখা সাপের মুণ্ডে পড়ে লাথি
হেদে হেদে চন্দ্র সূর্য তোমরা হও সাক্ষী
চন্দ্র সূর্য সাক্ষী রেখে মারিল কামড়
বিষের জ্বালায় জেগে ওঠে গো লক্ষীন্দর
ওঠো না গো ওগো রামা সায় বেনের ঝি
তোরে এল কাল নিদ্রা মোরে খেল কী
কন্যা যে জাগিয়াছিল নিশা ভোর রাতি
সাপেরে পিটিয়ে মারে সুবর্ণের জাঁতি
লেজ কাটা গেল কালিনীর আড়াই আঙ্গুল
কালিনী পালিয়ে যায় যে ব্যথায় আকুল

পটের সপ্তম ছবিটিতে একটি বদ্ধ ঘরে বেহুলার কোলে শুয়ে আছে লক্ষিন্দর, বেহুলার হাতে জাঁতি। ঘরের মধ্যে জ্বলছে একটি প্রদীপ। লক্ষীন্দরের ডানপায়ে সাপের কামড়ের চিহ্ন স্পষ্ট, ঝরছে রক্ত। ছবিতে ঘরের মধ্যে অঙ্কিত পাঁচটি কালো সাপ আসলে একটি কালনাগিনীর ভয়ঙ্করতার প্রতীকী। এই ভয়ঙ্করতাকে গুরুত্ব দিতেই পটের অষ্টম ছবিটি কেবল একটি সাপের ছবিতেই সম্পূর্ণ।

নবম ছবিতে চিত্রিত একটি কলাগাছের পাশে বেহুলা, চাঁদ সদাগরের কথোপকথনের দৃশ্য। চাঁদের হাতে কলার ভেলা প্রস্তুতের জন্য একটি কুড়াল। নিম্নোক্ত গানের অংশের ঘটনাটি এই রূপ - নেড়া গিয়ে চাঁদকে লক্ষীন্দরের মৃত্যুর খবর দেয়। পুত্রের মৃত্যুশোকে উন্মত্ত চাঁদ দু হাত তুলে নাচতে শুরু করে। চ্যাংমুড়ি কানি মনসাকে বিদ্রুপ করে চ্যাং মাছ পোড়া দিয়ে পান্তাভাত খেতে ব্যস্ত হয়। বেহুলা মনসার সঙ্গে বিবাদের জন্য তার

শ্বশুরমশাইকে তিরস্কার করে এবং মৃত স্বামীসহ কলার ভেলায় ভাসিয়ে দিতে তাকে অনুরোধ করে। পটের গানে আছে-

দৌড়ে গিয়ে ন্যাড়া নাপর সদাগরে কয়
তোমার পুত্র মারা গেছে শুনেন মহাশয়
বলে ভাল হল আমার পুত্র লক্ষীন্দর মরিল
দুই হাত তুলে বুড়া নাচিতে লাগিল
কতখনে হবে রে ন্যাড়া রজনী প্রভাত
চ্যাং মাছ পোড়া দিয়ে খাব পান্তা ভাত
দাও গো শ্বশুর তোমার মুণ্ডে পড়ুক বাজ
এত ঠাকুর থাকতে কেন মনসার সঙ্গে বাদ
দিয়েছিলে শাঁখা সিঁদুর লও খসায়িয়া
কলার মান্দাস শ্বশুর দাও সাজাইয়া
একখানা রাম কলাগাছে তিন খুঁটি করিল
পাশেতে গজাল মেরে বেহুলা ভাসিল

অতঃপর বেহুলার বিলাপটি আবার সমবেত কণ্ঠে গাওয়ার রীতি প্রচলিত।

(কী হল কী হল আমার বাসর ঘরে পতি মরল) ২ বার
(সোনার বরণ স্বামী আমার বিষেতে নীল বর্ণ হল) ২ বার
(আমি যদি হই গো সতী বাঁচাইব মরা পতি) ২ বার
(আমার ভাগ্যে এ দুর্গতি কোড়ে রাঁড়ী হতে হল) ২ বার

পটের দশম ছবিটিতে মৃত স্বামীকে নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে চলেছে বেহুলা। নদীর পাড়ে মাছ ধরছে একটি বুড়ো, যার পা দুটি খুব ফোলা ফোলা। গানে বর্ণিত ঘটনায় রয়েছে নদীতে ভাসমান সুন্দরী বেহুলাকে দেখে গোদা বুড়ো উপহাস করে। তার উপহাসের উপযুক্ত জবাব দিয়ে বেহুলা নিজ পথে অগ্রসর হয়। বেহুলার দুরবস্থার খবর পেয়ে তার ছয় ভাই এসে তাকে পিতৃগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু বেহুলা রাজি হয় না। সে জানায়, ভাইয়ের সংসারে থাকলে ভ্রাতৃবধূদের সঙ্গে কলহ, বিবাদ অপরিহার্য। আসলে মৃত

স্বামী বাঁচাবার নিজ সঙ্কল্পে অটুট থাকার জন্য ভ্রাতৃবধূদের সাথে কলহের সম্ভাবনার অজুহাতে ভাইদের ফিরিয়ে দিয়েছে সে। দশম পট দেখিয়ে যে গান পটুয়ারা গায়, তা এই রকম –

ভাসিতে ভাসিতে ভেলা কতই দূরে গেল
হেনকালে সীমন্তিনীর ছয় ভাই এল
ভাই বলে ওগো দিদি প্রাণের ভগিনী
মরা স্বামী সাথে কেন জলে ভাস তুমি
ঘরে ফিরে চল দিদি আমরা সেবা নেব
ঐ যে তোমার ছটি ভাঁজকে নিজে খাটায়িব
বাপ মায়ের ঘর দাদা আর নাই কো সাজে
কোদল্যা ভাঁজের সঙ্গে দাদা সদাই দ্বন্দ্ব বাজে
অল্প বয়সে দাদা হলাম হলাম কড়ে রাঁড়ী
কতনা ফেলাব আর নিরামিষ হাঁড়ি
ভাইদের পরিবর দিয়া ভাসিয়া চলিল
ওই গোদাঘাটে গিয়ে মান্দাস ঠেলিতে লাগিল
গোদা বুড়া বড়শি আড়ে গাঙুয়ার চরে
শুধু অন্ন না খায় গোদা রুই মাছ ধরে
সুন্দরী রূপসী দেখে করে উপহাস
বল বল সীমন্তিনী কোন দেশে বাস
তোর বুকে ছাই রে গোদা তোর বুকে ছাই
মা মনসার দাসী আমি জলে ভেসে যাই

এরপর একাদশ ছবিতে একটি ঘাটে দুটি নারীর কাপড় কাচার দৃশ্য। আড়াল থেকে তাদের দেখছে দুটি শিশু। এই পট দেখিয়ে পটুয়ারা গায় -

এই ভাবে ছয় মাস ভাসিয়া চলিল

তমলুকের ঘাটে ভেলা ঠেলিতে লাগিল

ধনা মনা দুই ভাই শোয়াইয়া ঘাটে

নেতা ধোপানী কাপড় কাচে তমলুকের ঘাটে

নেতায় কাপড় কাচে কাপড় কাচুঁড়্যার ফুল

বেহুলা কাচে কাপড় সূর্য সমতুল

মৃত স্বামীর দেহাবশেষ নিয়ে বেহুলা তমলুকের ঘাটে উপস্থিত হয়। সেখানে দুই ছেলে ধনা মনা কে শুইয়ে রেখে নেতা ধোপানী কাপড় কাচছিল। বেহুলা তার সঙ্গে যোগ দেয়। বেহুলা নিজ হাতে ধোয়া উজ্জ্বল কাপড় নিয়ে নেতার সঙ্গে পৌঁছায় স্বর্গপুরে। দ্বাদশ পটের ছবিটি স্বর্গলোকের। উপস্থিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। দুটি নারী বস্ত্র হাতে নিয়ে করজোড়ে ত্রিদেবের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সেই কাপড় নিয়ে বেহুলা দেবপুরে গেল

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের কাছে বর চেয়ে নিল

দিলাম বেটি বর বেহুলা দিলাম বেটি বর

ছয় ভাসুর স্বামী লয়ে যাও শ্বশুরঘর

শেষ অবধি বেহুলার জয়ধ্বজা উড্ডীন হয়েছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের বরে জীবন ফিরে পেয়েছে তার স্বামী, সঙ্গে ছয় ভাসুর। শ্বশুরের সাত ডিঙাও পুনরুদ্ধার করেছে সে। এবার তার ঘরে ফেরার পালা। সুতরাং ত্রয়োদশ ছবিতে সেজে উঠেছে সপ্ত ডিঙা। প্রথমটিতে বেহুলা – লক্ষ্মীন্দর। পরের ছ'টিতে ছয় ভাসুর। সাতটি ডিঙ্গাই একটি নাগের পিঠে দৃশ্যমান। চতুর্দশ তথা শেষ ছবিটিতে মনসা পূজার দৃশ্য। ছবিতে আছে সাত পুত্র ও পুত্রবধূর সাথে পুজারত চাঁদ সদাগর পাশে পূজায় বলির নিমিত্ত সাদা হাঁস।

সাত ডিঙ্গা সাজাইল মনের হরষে

আজ মরা স্বামী বাঁচতে বেহুলা তবে গেল দেশে

শেষবার সমবেত কণ্ঠে পটুয়ারা গান-

(ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে সাথীরে ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে) ২ বার

(পূবের আকাশ রাঙা হল সাথী ঘুমাইওনা জাগরে) ২ বার

ডিঙ্গা ভাসাও...

একক কণ্ঠে মূল গায়েন নিজ পরিচয় দানের মাধ্যমে শেষ করেন চোদ্দ ছবির মনসামঙ্গল কাহিনী ভিত্তিক পটের গান।

নাগের পৃষ্ঠে ডিঙ্গাবুলি দিল উঠায়িয়া

হংস বলি কেটে করে মা মনসার পূজা

সর্বলোকের পুষ্পাঞ্জলি গো জলে ভেসে যায়

চাঁদ বেনার পুষ্পাঞ্জলি মা মনসার পায়

সেই থেকে মনসার পূজা গো সর্বঘরে হল

আর বেহুলার মত সতী গো কেহ না রহিল

এই খানেতে শেষ করিলাম মনসার বন্দনা

আমি রানী চিত্রকর, নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঠিকানা

মঙ্গলকাব্য দেবমহিমা প্রচারমূলক আখ্যান। বর্তমান পটেও ছবি ও গানে শেষ পর্যন্ত মনসার পূজা প্রচারের কাহিনী প্রতিষ্ঠিত হল। তাই পটুয়ারা একে যথার্থই 'মনসামঙ্গল' পট বলে অভিহিত করে থাকেন। মনসার পটের গান লোকসমাজে সৃষ্ট। যারা গান রচেন সেই পটুয়ারা অধিকতর প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণি অবধি স্কুলে পড়েছেন। প্রথাগত শিক্ষার সাথে সেভাবে তাদের যোগ নেই। ফলে তাদের কথ্য আঞ্চলিক উপভাষাতেই রচিত হয়েছে পটের গান। নয়া'র পটকারদের গাওয়া মনসার পটের গানে আঞ্চলিক উচ্চারণে পরিবর্তিত কিছু লোকশব্দের প্রয়োগ নিম্নরূপ –

কোঁড়ে রাঁড়ী > কন্যে / কনে রাঁড়ী (বিধবা স্ত্রী)

বড়া > বোড়া (চন্দ্রবোড়া সাপ)

তরজে গরজে > তর্জন গর্জন করে

ঢ্যামন > ঢ্যামনা (অপশব্দ)

অমুল্য > অমলা (বেহুলার মা)

লাচনী > নাচনী

আগুড়ি পিছুড়ি > আগে পেছনে চলে যারা

পাশলেতে > পাশে

কোদল্যা > কোন্দল করে যে বা যারা

পরিবর > প্রবোধ

ডিঙ্গাবুলি > ডিঙ্গাগুলি

নাপর > নফর (চাকর)

মনসামঙ্গল কাব্য প্রভাব মনসামঙ্গল পটের গানের কিছু অংশে স্পষ্ট। যেমন লোহার বাসর ঘরে লক্ষ্মীন্দরকে কালনাগিনীর দংশনের ঘটনার বর্ণনায় পটুয়ারা বলছেন –

সান্তালি পর্বতে আছে লোহার বাসরঘর
তাতে শুয়ে নিদ্রা গেল বেহুলা লক্ষ্মীন্দর
সুতার সঞ্চারী কালনাগিনী মেড়ে সাঁদায়িল
লক্ষ্মীন্দরের রূপ দেখে সে ভাবিতে লাগিল
বলে, এ হেন কাঞ্চন শরীর কোনখানে খাব
দেব গণে জিজ্ঞাসিলে কি বলে বলিব
মাথার শীতলেতে ছিল সর্প পাশলেতে এল
ঘুমের ঘরেতে লখা পাশ মোড়া দিল
পাশ মোড়া দিতে লখা সাপের মুণ্ডে পড়ে লাথি
হেদে হেদে চন্দ্র সূর্য তোমরা হও সাক্ষী
চন্দ্র সূর্য সাক্ষী রেখে মারিল কামড়
বিষের জ্বালায় জেগে ওঠে গো লক্ষ্মীন্দর
ওঠো না গো ওগো রামা সায় বেনের ঝি
তোরে এল কাল নিদ্রা মোরে খেল কী
কন্যা যে জাগিয়াছিল নিশা ভোর রাতি
সাপেরে পিটিয়ে মারে সুবর্ণের জাঁতি
লেজ কাটা গেল কালিনীর আড়াই আঙ্গুল

কালিনী পালিয়ে যায় যে ব্যথায় আকুল

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে উক্ত অংশের যে বর্ণনা পাই তা এরকম –

সাঁতালি পর্বতে দেখ লোহার বাসরঘর ।
তাহে শুয়্যা নিদ্রা যায় বালা লক্ষ্মীন্দর ।।
... ...
সুতার সঞ্চারে কালি বাসরে প্রবেশে ।।
... ...
এ হেন সুন্দর গায়ে কোনখানে খাব ।
দেবী জিজ্ঞাসিলে তারে কি বোল বলিব ।।
... ...
হেনকালে পাশমোড়া দিল লক্ষ্মীন্দর ।
পদাঘাত বাজে তার দণ্ডের ওপর ।।
উঠিয়া কালিনী তবে কহে সত্য কথা ।
চন্দ্র সূর্য সাক্ষী হও যতেক দেবতা ।।
বিষদন্ত দিয়া কালি দংশে তার পায় ।
দুর্ল্লভ লখাই জাগে বিষের জ্বালায় ।।
চিয় গো চিয় গো রামা সায়বান্যার ঝি ।
তরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি ।।
বেহুলা নাচনী জাগে শেষভাগ রাতি ।
সাপিনিরে পেল্যা মারে সুবর্ণের জাঁতি ।।
পুচ্ছ কাটা গেল তার আড়াই আঙুলি ।
সাপিনী পলায়্যা গেল ব্যাথায় আকুলি ।।

উল্লিখিত তুলনায় স্পষ্ট যে মনসামঙ্গল পটের গানে কেতকাদাসের কাব্যের প্রভাব তো আছেই এমনকি কোন কোন পঙক্তি একেবারেই কেতকাদাস থেকে নেওয়া। লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু পরবর্তী ঘটনায়ও একই ভাবে কেতকাদাসের কাব্যের সাথে মিল লক্ষণীয় । ছেলের

মৃত্যুতে চাঁদ ভেঙে পড়ে না, বরং নাচতে থাকে। মনসার কাছে চাঁদকে দুর্বল করার মত আর কোন অস্ত্র রইল না, এই ভেবে চরম শোকে উদ্ভ্রান্ত চাঁদের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণই কেতকাদাসের কাব্য অনুসারী। পটুয়ারা গায় –

দৌড়ে গিয়ে ন্যাড়া নাপর সদাগরে কয়
তোমার পুত্র মারা গেছে শুনেন মহাশয়
বলে, ভাল হল আমার পুত্র লক্ষীন্দর মরিল
দুই হাত তুলে বুড়া নাচিতে লাগিল
কতখনে হবে রে ন্যাড়া রজনী প্রভাত
চ্যাং মাছ পোড়া দিয়ে খাব পান্তা ভাত

কেতকাদাসের কাব্যে আছে -

নাড়া গিয়া ধায়্যা কয় শুন সদাগর।
লোহার বাসরে মৈল লখাই সুন্দর।।
শুনিঞা যে চাদবান্যা মাতোয়াল হৈল।
কান্ধে হিন্তালের বাড়ি নাচিতে লাগিল।।
ভালো হৈল পুত্র মৈল কি তার বিষাদ।
চেঙ্গমুড়ি কানি সনে ঘুচিল বিবাদ।।
ক্রোদ্ধ হয়্যা নাড়ারে বলিছে চাদবান্যা।
কানির উচ্ছিষ্ট মড়া পেল নিঞা টান্যা।।
ঝাট কর্যা কাট নাড়া রাম কলাপাত।
মচ্ছ পোড়াইয়া আজি খাব পান্তাভাত।।

কলার ভেলায় ভাসমান বেহুলা যখন ভাইদের সঙ্গে পিতৃগৃহে ফিরে না গিয়ে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে, সেই অংশের কথোপকথনেও স্পষ্ট কেতকাদাসের প্রভাব । কেতকাদাসের কাব্যে আছে –

বেহুলা কহিল আমি হই কড়্যা রাঁড়ী ।
কত না পেলাব আর নিরামিষ্য হাঁড়ি ।।

মা বাপের বাড়ী মোরে আর নাহি সাজে ।

সকল ভাউজ সঙ্গে নিত্য দ্বন্দ্ব বাজে ।।

আর পটকারেরা গান –

বাপ মায়ের ঘর দাদা আর নাইকো সাজে

কুঁদুল্যা ভাজেদের সঙ্গে দাদা সদাই দ্বন্দ্ব বাজে

অল্প বয়সে দাদা হলাম কড়্যে রাঁড়ী

কত না ফেলাব আর নিরামিষের হাড়ি।।

বাঁকুড়া জেলার ভরতপুর গ্রামে আঠেরোটি পটুয়া পরিবারের বাস। নয়ার শিল্পীরা যেখানে সরকারী সাহায্য পেয়ে দেশ বিদেশে বিখ্যাত হয়ে উঠছেন, ভরতপুরের শিল্পীরা সেখানে প্রচার পরিচিতির দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে আছেন। কেবলমাত্র পট দেখিয়ে উপার্জন করা এদের অনেকের পেশা হলেও পটের বিষয় বৈচিত্র, নতুন নতুন কাজের সম্ভার এখানে সেভাবে দেখা যায় না। নয়ার মত এরাও মনসার আয়তাকার ও জড়ানো দুরকম পট বানালেও পুরো পাড়ায় মাত্র দুতিনটি মনসার পটের দেখা পাওয়া গেল। জড়ানো পটে রয়েছে মনসার ছবি, জালুমালু দুই ভাইয়ের মনসা পূজার ছবি, চাঁদ কর্তৃক মনসার পূজা ঘট ভাঙা, স্বামীকে বাঁচাতে শিবের সামনে বেহুলার মিনতির ছবি, সবশেষে আবার মা মনসার পূজার ছবি রয়েছে। আর আয়তাকার পটে সর্পাসনে শোভিতা দেবী মনসার একক ছবি। নয়ায় পটুয়া পাড়ার প্রতিটি পরিবারের প্রায় সকলেই শিল্পী, এরা যেভাবে ছবি আঁকে তেমনই গানেও সকলেই পারদর্শী। কিন্তু ভরতপুরে পটের গানের ঐতিহ্য টিকে আছে মাত্র চার পাঁচ জনের মধ্যে। এরা ছোট খোল করতাল নিয়ে বসে সমবেত গান গায়। বলা বাহুল্য ভরতপুরের পটশিল্প, বাংলার ঐতিহ্যবাহী এমন একটি শিল্পকর্ম যার বর্তমান অবস্থা বিলুপ্তির পথে।

লোকগান ঐতিহ্য ও পরম্পরার সমন্বয়ে বাংলার নিজস্ব সম্পদ। পটের গানেও সেই ঐশ্বর্য গভীর ও ব্যাপক। এই গান লোকসমাজ সৃষ্ট এবং যুগ যুগ ধরে নিজ গতিতে প্রবহমান। নয়ার মনসার পটের গানের কিছু অংশে মঙ্গলকাব্যের পংক্তি সমূহের প্রায় হুবহু ব্যবহার লোকগানের নিজস্ব ধর্মকে লঙ্ঘিত করে, স্বচ্ছন্দ বিনির্মাণের গতিকে করে অবরুদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই কেতকাদাসের কাব্যপ্রভাব পটের গানের কিছু অংশে এসেছে। এটুকু সীমাবদ্ধতাকে নিয়েই মনসাসংস্কৃতির বহু প্রসারিত ক্ষেত্রে মনসার পট ও পটের গানের বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র

গ্রন্থ -

১) বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, সম্পাদনা জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃ. ৪৫৯।

২) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ,মনসামঙ্গল, সম্পাদনা অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব, লেখা পড়া, পৃ. ২৫৫, ২৫৭, ২৫৯, ২৬৪।

৩১/৫/২০১৯ তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা থানার অন্তর্গত নয়া'র পটুয়াদের এবং ১০/১০/২০২১ তারিখে ভরতপুরের পটুয়াদের থেকে নেওয়া ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার -

তথ্যদাতার পরিচয়

১) রাণী চিত্রকর

বয়স- ৫৬

পেশা - পটের কাজ

ঠিকানা - গ্রাম নয়া, থানা পিংলা, জেলা পশ্চিম মেদিনিপুর।

২) মধুমিতা চিত্রকর

বয়স - ১৯

পেশা - পটের কাজ

ঠিকানা - গ্রাম নয়া, থানা পিংলা, জেলা পশ্চিম মেদিনিপুর।

৩) রুমা চিত্রকর

বয়স - ৪৫

পেশা - পটের কাজ

ঠিকানা - গ্রাম নয়া, থানা পিংলা, জেলা পশ্চিম মেদিনিপুর।

৪) মমতা চিত্রকর

বয়স - ৩৬

পেশা - পটের কাজ

ঠিকানা - গ্রাম নয়া, থানা পিংলা, জেলা পশ্চিম মেদিনিপুর।

৫) মামনি চিত্রকর

বয়স - ৩০

পেশা - পটের কাজ

ঠিকানা - গ্রাম নয়া, থানা পিংলা, জেলা পশ্চিম মেদিনিপুর।

৬) স্বর্ণ চিত্রকর

বয়স - ৫৮

পেশা - পটের কাজ

ঠিকানা - গ্রাম নয়া, থানা পিংলা, জেলা পশ্চিম মেদিনিপুর।

৭) জবা চিত্রকর

বয়স- ৩২

পেশা - পটের কাজ

ঠিকানা - গ্রাম নয়া, থানা পিংলা, জেলা পশ্চিম মেদিনিপুর।

৮) উলুপি চিত্রকর

বয়স - ২৫

পেশা - পটের কাজ

গ্রাম - ভরতপুর, ব্লক ছাতনা, জেলা বাঁকুড়া।

পুরুষ -

১) শ্যামসুন্দর চিত্রকর

বয়স-৭৫

পেশা - পটের কাজ

ঠিকানা - গ্রাম নয়া, থানা পিংলা, জেলা পশ্চিম মেদিনিপুর।

২) সুমন চিত্রকর

বয়স-৩৩

পেশা - পটের কাজ

ঠিকানা - গ্রাম নয়া, থানা পিংলা, জেলা পশ্চিম মেদিনিপুর।

৩) বাসুদেব চিত্রকর

বয়স - ৫৫

পেশা - পটের কাজ

গ্রাম - ভরতপুর, ব্লক ছাতনা, জেলা বাঁকুড়া।

৪) রাধাই চিত্রকর

বয়স - ৩৫

পেশা - পটের কাজ

গ্রাম - ভরতপুর, ব্লক ছাতনা, জেলা বাঁকুড়া।

৫) শম্ভু চিত্রকর

বয়স - ৪০

পেশা - পটের কাজ

গ্রাম - ভরতপুর, ব্লক ছাতনা, জেলা বাঁকুড়া।

৬) ডাবলু চিত্রকর

বয়স - ৩০

পেশা - পটের কাজ

গ্রাম - ভরতপুর, ব্লক ছাতনা, জেলা বাঁকুড়া।

৭) রাহুল চিত্রকর

বয়স- ১২

পেশা- পটের কাজ

গ্রাম - ভরতপুর, ব্লক ছাতনা, জেলা বাঁকুড়া।

মনসাযাত্রা

বাংলার গ্রামগঞ্জে প্রচলিত একটি পরিচিত অভিনয় শিল্প যাত্রাপালা। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক বিষয় নিয়ে প্রাচীন কাল থেকেই যাত্রার চল রয়েছে এদেশে। যাত্রা শব্দটির আভিধানিক অর্থ *‘গমন’ (তীর্থ যাত্রা,সমুদ্র যাত্রা), যাপন বা নির্বাহ (সংসারযাত্রা), দেবতার উৎসবাদি (ঝুলন যাত্রা, রথ যাত্রা), মিছিল (শোভাযাত্রা),* ‘*দৃশ্যপটহীন মঞ্চে অভিনয় বিশেষ’*। আদি অর্থ গমন থেকে পরবর্তীকালে উৎসব উপলক্ষে মঞ্চে অভিনয় প্রদর্শনের জন্য গমন ও ক্রমে যাত্রা অর্থে গীত বাদ্য সহযোগে অভিনয়কেই বোঝানো – বিষয়টিতে শব্দার্থের বিবর্তনের ধারা কার্যকর। বাংলা সাহিত্যের আদি পর্ব থেকে আজ অবধি নাটক, যাত্রা ইত্যাদি অভিনয় শিল্পের এক ধারাবাহিক চলন লক্ষ্য করা যায়। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চৈতন্য জীবনীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর প্রাথমিক পর্যায় ধরা আছে। পরবর্তী কালে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা হলেও

গ্রামজীবনে লোকনাট্য তার স্বতন্ত্র ধারা বজায় রাখে। গানের আধিক্যে লোকসমাজে তা পালাগান নামে প্রচলিত হয়। সিনেমা টেলিভিশনের সঙ্গে নতুন নতুন মাধ্যমে বিনোদনের দুনিয়া আজ বহুমুখী। তবু বাংলার লোকসমাজে যাত্রাপালা আজও স্বতন্ত্র আবেদন রাখে। মধ্যযুগে রচিত দেবী মনসার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক মনসামঙ্গল কাব্য আবহমান কাল ধরে রূপে ও ভাবে বাংলা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। লোকসংস্কৃতির ধারায় মনসাযাত্রা এরই একটি বিশিষ্ট রূপ। লোকসমাজে মনসাযাত্রা, মনসার গান নামেই অধিক প্রচলিত।

মনসার পাঁচালী ও মনসা যাত্রা - বাংলায় প্রচলিত মঙ্গলকাব্যগুলিও ছিল বহু প্রাচীনকাল থেকে গ্রামজীবনে প্রচলিত পাঁচালীর বিবর্তিত ও বিবর্ধিত রূপ। বাংলাদেশের নানা প্রান্তে এই পাঁচালীর চল আজও রয়েছে - কোথাও তা গৃহবধূর বারব্রতে লোকসুরে কয়েক পাতার মুদ্রিত রচনা পাঠে, কোথাও বা পালাকারদের বিস্তৃত রচনায় তথা মঞ্চে গীত বাদ্য সহযোগে উপস্থাপনায়। মনসার পাঁচালী গাইবার সময় গায়েন একা দেবীর সাজে সজ্জিত হয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে মনসামঙ্গলের বিভিন্ন পালা গাইতেন। এই পাঁচালীকেই দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তীকালে লোকযাত্রায় রূপান্তরিত করা হয়। বেড়ে যায় অভিনেতা গায়ক বাদকের সংখ্যা, সেই সঙ্গে ইয়ামা, ইলেকট্রিক কী-বোর্ড ইত্যাদি আধুনিক বাদ্যযন্ত্র দিনে দিনে যুক্ত হতে থাকে বিভিন্ন দলের সঙ্গে। কখনো লোক মনোরঞ্জনের জন্য, কখনো বা উপরি রোজগারের আশায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মনসাযাত্রায় যুক্ত হতে থাকে লোকদলগুলির গড়ে তোলা নানা মৌলিক কাহিনি। কিন্তু মনসামঙ্গলের মূল কাহিনিসূত্র অনুযায়ী মনসার পাঁচালীর গঠনরীতিই মনসাযাত্রায় অনুসৃত হয় আর তাই মনসার পাঁচালী ও মনসাযাত্রার পালা বিভাজন একেবারে একই। তবে উপস্থাপন রীতির বিস্তর ফারাক রয়েছে। কালক্রমে মনসা যাত্রাপালা মনসার পাঁচালীর চাহিদা অনেকটা কমিয়ে দিলেও বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রামেগঞ্জে লোকসমাজে মনসার পাঁচালী আর মনসাযাত্রার দু'টি স্বতন্ত্র ধারা আজও বহমান।

পালা বিভাজন - পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, উত্তর চব্বিশ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া সহ বিভিন্ন জেলার লোকসমাজে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র লোকযাত্রার দল, যারা কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্য ও আখ্যানকাব্যের কাহিনি অবলম্বনে যাত্রাপালা পরিবেশন করে থাকেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় আঞ্চলিক লোকবিশ্বাস ও

দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী অজস্র দল মনসা, শীতলা ও বনবিবি এই তিন দেবীর মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক যাত্রাপালা উপস্থাপন করে থাকেন। আবার উত্তর চব্বিশ পরগণার ঢাকুরিয়া কালিবাড়ির 'মা মনসা গীতি নাট্য সংস্থা'র মত দলে রাজা হরিশচন্দ্র, নিমাই সন্ন্যাস ইত্যাদি ধর্মীয় যাত্রাপালার পাশাপাশি 'মাতৃ পূজায় চাঁদ সওদাগর' নামক মনসাযাত্রা পরিবেশন করে থাকেন। তবে অন্যান্য জেলা অপেক্ষা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার মনসা-শীতলা-বনবিবি কেন্দ্রিক যাত্রাপালার আয়োজক দলের সংখ্যা অনেক বেশি। এই সব দলের অভিনীত মনসাযাত্রা মূলত চারটি পালায় বিভক্ত –

১) *চাষ পালা,*

২) *জন্ম পালা,*

৩) *বাণিজ্য পালা* এবং

৪) *ভাসান পালা।*

চাষ পালা মূলত হরগৌরী কথা। মনসা কথার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক না থাকায় এবং গৃহস্থের সঙ্গতি অনুযায়ী সমগ্র পালাকে পরিসরে সংক্ষিপ্ত করার তাগিদে মনসাযাত্রার অনেক দলই আর বর্তমানে চাষপালা উপস্থাপন করেননা। জন্মপালায় রয়েছে মনসার জন্ম কথা। মহাভারতের নাগমাতা কদ্রুর শিব রতি পান করা, তার গর্ভে নাগলোকে মনসার জন্ম, এবং কদ্রুর মাতৃস্নেহে শিবকন্যা মনসার ছোট থেকে বড় হওয়ার অভিনব কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে মনসাযাত্রার জন্মপালায়। চাঁদ বণিকের বাণিজ্য যাত্রা, বেহুলা লক্ষিন্দরের জন্ম কথা, বাণিজ্য করে ফেরার সময় নদীপথে তার বাণিজ্য তরী নিমজ্জন, চাঁদের ভিখারি দশা, মনসার নানাবিধ চক্রান্ত ইত্যাদি মনসামঙ্গলের কাহিনির বাধা ছকেই মনসাযাত্রার পালাকারেরা বাণিজ্য পালার কাহিনি গেঁথেছেন। আর ভাসান পালায় মৃতস্বামীকে নিয়ে কলার ভেলায় বেহুলার ভাসান কথাই মূল উপজীব্য হলেও এই পালার সিংহভাগ জুড়ে আছে পালাকারদের সৃষ্ট *নয়াবাজার* পর্ব।

সম্পূর্ণ মনসাযাত্রা অভিনয় করতে এদের সময় লাগে টানা সাত থেকে আটদিন। দলের সদস্যসংখ্যা গড়ে বারো থেকে ষোল জন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নবিত্তের বাড়িতেই

অভিনয়ের কাজ হয়। স্বাভাবিকভাবেই সাত আট দিন একটি দলকে বাড়িতে রেখে, তাদের খাওয়া থাকার ব্যাবস্থা করা এবং দলের পারিশ্রমিকের ব্যয়ভার তারা বহন করতে পেরে ওঠেন না। অনেকেই মনসা পূজা উপলক্ষে কেবল এক দিনের জন্য দলকে আনেন নিজগৃহে, আর সেক্ষেত্রে অন্যান্য পালা অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক প্রেম-পরিণয় পূর্ণ, এক রাতে শেষ করার উপযোগী ভাসান পালার অভিনয় চলে অধিকাংশ সময়।

দল পরিচয় – বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে দেবী মনসার মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক লোকযাত্রার দলের কলাকুশলীরা কেউই সেভাবে প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত নন। যদিও মনসামঙ্গলকাব্য অনুসারেই যাত্রার মূল কাহিনী সূত্র গাঁথা, তথাপি দলের প্রায় কেউই পুরাণ বা মঙ্গলকাব্য পড়েননি। যাত্রার সংলাপ, বা গান সবই দেখে বা শুনে শুনে আয়ত্ত করেছেন এরা। এত দীর্ঘ পালাগানের কোথাও কোন লিখিত রূপ নেই, মৌখিক পরম্পরায় এই শিল্প লোকজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে সব দলের কুশীলবেরাই অখ্যাত কোন গুরুর কথা বলেন, পুরাণের মনসাকথা তথা মনসামঙ্গলকাব্যে যার ছিল সুনিপুণ জ্ঞান। অভিনেতাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অভিনেত্রীদের তুলনায় সব দলেই বেশী। ফলে পুরুষেরাই অনেকাংশে মহিলা চরিত্রে অভিনয় করেন। কোন কোন দলে কোন মহিলা সদস্য নেই, পুরুষেরাই সকল নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যন্ত্রী সহ প্রতিটি দলের গড়ে সদস্য সংখ্যা বারো থেকে ষোল জন। প্রতিটি দলেই অভিনেতারা সাজ সজ্জা বদলে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেন। এমনকি দক্ষ গায়ক অভিনেতাদের চার থেকে পাঁচটি চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়। যাত্রাপালা অভিনয়ের সময় সন্ধ্যা থেকে সারা রাত, দিনের বেলায় শিল্পী কলাকুশলীরা বিশ্রাম নেন। অত্যন্ত পরিশ্রমসাপেক্ষ এই ধরণের যাত্রাপালা উপস্থাপনের জন্য নিজের জেলায় তো বটেই প্রতিবেশী বিভিন্ন জেলায়ও আমন্ত্রণ পান এরা। বর্তমানে ইউ টিউবের মত উন্নত প্রযুক্তি এদের বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হওয়ায় দূর দূরান্তর থেকেও কখনও কখনও কাজের সুযোগ পাচ্ছেন এরা।

এদের মধ্যে কোন কোন দলের দু এক জন কর্মী, বা কখনো দল মালিক নিজে সরকারী ভাতা (মাসিক ১০০০ টাকা) লাভে সমর্থ হলেও অধিকাংশ দলের শিল্পী, বাদক সহকর্মীরা তা থেকে বঞ্চিত। আজকের দিনে বিভিন্ন দলের শিল্পী, কুশীলবের এক রাতের পারিশ্রমিক

গড়ে পাঁচশ টাকা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ক্যানিং এর 'ডাবু শিবশক্তি ও ভাগ্যলক্ষ্মী মনসামঙ্গল যাত্রা সংস্থা', নদীয়ার শান্তিপুরের 'সৃষ্টি অদ্বৈত সম্প্রদায়', মালদহের রতুয়া থানার অন্তর্গত 'আদ্যাশক্তি মহামায়া মা মনসা গান', উত্তর চব্বিশ পরগণার ঢাকুরিয়ার ‘মা মনসা গীতিনাট্য সংস্থা’, ডায়মণ্ডহারবারের ধামুয়ার 'মা মনসা যাত্রা ইউনিট' বা সাগর ব্লকের ধবলাটের 'মা দশভূজা সিংহবাহিনী গীতিনাট্য সংস্থা'র মত দল কোনোটি পঁচিশ বছরের কোনওটি পঁয়ত্রিশ বছরের পুরোনো দল হলেও তারা লোকশিল্পীদের জন্য বরাদ্দ সরকারী ভাতা থেকে বঞ্চিত। কোন দলের বছরে কাজ জোটে পঞ্চাশ রাত, কোন দলের নব্বই থেকে একশ রাত। দলের সঙ্গে যুক্ত সকলেই জীবিকা নির্বাহের জন্য চাষের কাজ, ছোট ব্যবসা (যেমন ঘুঘনির দোকান)বা দিন মজুরের মত অন্য কোন কাজের সঙ্গে যুক্ত। জয়নগরের ১২ নং জালাবেরিয়ার 'আদি ত্রিধারা গীতিনাট্য সংস্থা'র মত দলের বছরে দুশোর অধিক রাত্রি কাজ হবার কথা জানান দল মালিক খোকন মণ্ডল। যাত্রাকালে ব্যাবহার হয় ইয়ামা, কারা নাংড়া, জিপসি, নাল, করতাল, ডুগি তবলা এই সকল বাদ্যযন্ত্র। মঞ্চে অভিনয় কালে মনসা, বেহুলা, সনকা, প্রভৃতি নারী চরিত্র সহ প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের অভিনেতা বা অভিনেত্রীর পায়ে বাঁধা থাকে ঘুঙুর।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা সহ পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় অজস্র মনসাযাত্রার দল থাকলেও সংলাপে, গানে, মনসামঙ্গলকাব্য ব্যতিরেকে মৌলিক কাহিনী সংযোজন, নেপথ্য সঙ্গীতের সুর, এমনকি চরিত্রের বাচনভঙ্গি, অভিনয় কলা বহুলাংশে হুবহু একই ছাঁচে ঢালা। দীর্ঘকালের অনুশীলনে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মনসাযাত্রার দলগুলির চেতনায় জ্ঞাতে অজ্ঞাতে এক অবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রবহমান।

মঞ্চ - মনসা যাত্রাপালার মঞ্চ বলতে বেশির ভাগই গৃহস্থের বাড়ির উঠোন, যেখানে মাথার অপর একটি তাবু টানানো, আর মাটিতে প্লাস্টিক বা বস্তা জাতীয় কিছু। ওপরে তাবুর সঙ্গে বাঁশের কঞ্চি বা কাঠের সাহায্যে দড়ি বেধে ঝোলানো আট দশটি মাইক্রোফোন, মঞ্চের পেছন থেকে দড়ি টেনে এগুলির উচ্চতা প্রয়োজন মত বাড়ানো কমানো হয়। মঞ্চের সামনে পেছনের ব্যাবধান বজায় রাখার জন্য থাকে পর্দা। এই পর্দা কোন দলের নিজস্ব, রঙিন, সুসজ্জিত। আবার কোথাও বা গৃহস্থের কাছ থেকে চেয়ে আনা অনাড়ম্বর

মলিন দু তিনটি কাপড় বা কাপড়ের টুকরো। আবার সম্পন্ন গৃহস্থ পালাগানের জন্য তৈরি করান কাঠ দিয়ে মাটি থেকে তিন-চার ফুট উঁচু মঞ্চ। মঞ্চের ওপরে কার্পেট। মাথার ওপর থাকে সামিয়ানা। কোন কোন দলের আছে স্টেজ লাইট ও লেজার লাইট। তবে সব দলেই মঞ্চে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার হয় তিন ধাপের কাঠের সিঁড়ি। এটি দলের নিজস্ব। সিঁড়িটিতে লেখা থাকে দলের নাম, ঠিকানা, যোগাযোগ নং। অভিনেতা অভিনেত্রীরা প্রয়োজন মত এই ধাপগুলির ওপরে দাঁড়িয়ে অভিনয় করেন।

লোকশিল্পীদের বিপর্যস্ত ব্যক্তিজীবন - লাইট মাইক, পোশাক পরিচ্ছদের খরচ সীমিত আয়ের মধ্যে চালাতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় বেশিরভাগ লোকদলকে। একদিকে যেমন লোকশিল্পী তথা পর্দার পেছনে অবস্থানকারী সহকর্মীদের আন্তরিক ভালবাসায় বেঁচে আছে বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্যমণ্ডিত যাত্রার দলগুলি। শুধুমাত্র যাত্রার কাজে এদের সংসার চলে না, আর তাই বছরের বাকি সময়ে এই শিল্পীদের প্রায় সকলেই চাষের কাজ বা দিনমজুর হিসেবে খেটে অন্ন সংস্থান করতে হয়। সারা রাত যিনি নায়ক বা নায়িকা, দেবতা বা দেবী চরিত্রে অভিনয় করেন, বেঁচে থাকার তাগিদে, সংসার চালাতে, দিনের আলোয় তাকেই মলিন বেশে ক্ষেতের কাজে, ঘুঘনির দোকানে, বা দিন মজুরের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। চড়া সাজগোজ আতিশয্যপূর্ণ অভিনয় আর উচ্চকিত গান বাজনার অন্তরালে দলের শিল্পী কলা-কুশলিদের ব্যক্তিগত জীবন এক বিপন্ন আর্থ সামাজিক অবস্থার নজির।

মনসামঙ্গল কাব্য ও মনসার পালাগান – তুলনামূলক বিশ্লেষণ - যেহেতু বহু কবির হাতে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের মূল কাহিনি অনুসারেই মনসাযাত্রা বা মনসার পালাগান রচিত হয়েছে, তাই চাঁদ মনসার বিবাদই উভয় ক্ষেত্রে মূল বিষয়। মঙ্গলকাব্য বর্ণনাত্মক আর যাত্রা, নাটকের মতই সংলাপ পরম্পরায় বিন্যস্ত। ভাবের আতিশয্য, সংলাপে উচ্চকিত সুরের ব্যাবহার এই জাতীয় লোকযাত্রার সাধারণ বৈশিষ্ট, সর্বোপরি অজস্র গানের সমাবেশ লোকযাত্রাকে করেছে মেলোড্রামাটিক। মঙ্গলকাব্যের মূল কাহিনিকে ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশন করলেও এই জাতীয় লোকযাত্রায় বেশ কিছু মৌলিক সংযোজন, পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন কারণে মনসাযাত্রায় যুক্ত হওয়া পালাকারদের সৃষ্ট মৌলিক কাহিনি, এবং মনসামঙ্গলের কাহিনির পরিবর্তিত রূপের উপস্থাপনই বর্তমান বিশ্লেষণের বিষয়।

চাষপালায় রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব – মনসাযাত্রায় ব্যবহৃত চাষপালায় পরিবেশিত হয়, শিবের চাষ করার কাহিনি। প্রচলিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে কোথাও কৃষক শিবের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। কেবল মনসার জন্মকথা প্রসঙ্গে শিব কাহিনির প্রয়োজনীয় অংশটুকুর বিবরণ আমরা পাই বিভিন্ন কবির লেখনীতে। দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে শিব দুর্গার বিস্তারিত কাহিনি রয়েছে। দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, সতীর মৃতদেহ নিয়ে মহাদেবের ভ্রমণ, সতীতীর্থের কথা, মদন ভস্ম, পার্বতীর জন্ম, শিব পার্বতীর বিবাহ, গনেশ কার্তিকের জন্ম, ইত্যাদির বিবরণ বংশীদাসের কাব্যে থাকলেও শিবের চাষ করার প্রসঙ্গ কিন্তু নেই। বরং কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব এখানে লক্ষ্যনীয়।

মনসার পালাগানে উপস্থাপিত চাষ পালার কাহিনি সূত্র এই রকম – কৈলাসে শিব পার্বতীর সংসারের দুঃখ দারিদ্র তথা অর্থাভাব ঘোচাতে শিব চাষ করতে যাওয়ার মনস্থ করেন। বিশ্বকর্মার কাছ থেকে লাঙ্গল, বৃষভানুর কাছ থেকে বলদ প্রভৃতি চাষের সরঞ্জাম জোগাড় করে আনেন পার্বতী। ভাগ্নে নারদ শিবের সঙ্গে যান তাকে চাষের কাজে সাহায্য করতে। বল্লুকার মাঠে বসবাসের জন্য গোলপাতার ছাউনি দিয়ে কুটির নির্মাণ করে তারা চাষের কাজ শুরু করে। নারদ হাল বলদ সহযোগে জমি কর্ষণ করে, আর শিব ধানের বীজ রোপণ করে। এইভাবে ছয় মাসের পরিশ্রমের শেষে চাষের কাজের শেষে কাদাসারা পালন করতে শিব নারদকে সরু চালের ভাত আর মাগুর মাছের ঝোল রাঁধতে বলেন। কাদার কাজ শেষ ,তাই কাদাসারা পালন। অন্যদিকে স্নানের ঘাটে শিবের আলাপ হয় হীরা কুচুনির সঙ্গে। হীরা তার নিজের কুটিরে শিবকে আমন্ত্রণ করে,তাকে ভালবেসে রেঁধে খাওয়ায়। নারদ মামার এই কর্মকান্ডের কথা জানতে পেরে কৌশলে শিবের নির্দেশে কৈলাসে যান, এবং পার্বতীকে শিবের চারিত্রিক অসঙ্গতির কথা জানান।

রামেশ্বরের শিবায়নে শিব চাষ করতে গিয়েছিল দেবীচক দ্বীপে[১]। আর মনসাযাত্রায় শিব চাষ করতে যায় বল্লুকার মাঠে। মধ্যযুগের একাধিক কাব্যে বল্লুকার মাঠের উল্লেখ রয়েছে। রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলের ‘লুইচন্দ্র পালা’য় লুইচন্দ্র মৃগয়া করত বল্লুকার মাঠে। আবার কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে শিব পাটনী ছদ্মবেশী পার্বতীর সঙ্গে মিলনের জন্য

বল্লুকায় পাতার কুটীর নির্মাণ করেছিল। কেতকাদাস পশ্চিমবঙ্গের কবি, আর তার কাব্যে শিব প্রসঙ্গেই বল্লুকা'র উল্লেখ পাই, তাই সম্ভবত কেতকাদাসের মনসামঙ্গলের প্রভাবেই মনসার গানের 'চাষ পালা'য় বল্লুকার মাঠের কথা এসেছে। শিবায়নে শিবের চাষের কাজে সাহায্য করতে গিয়েছিল ভীম, পালাগানে সেই জায়গায় এসেছে নারদ। যদিও ভীম ও নারদ দুজনেই কাব্যে ও পালাগানে উভয় স্থানেই শিবকে মামা সম্বোধন করেছে। মনসাযাত্রার চাষপালায় মহাদেবের সঙ্গে হীরা কুচুনির আন্তরিক সম্পর্কে শিবায়নের 'কোঁচিনী পাড়ায় শিব' শীর্ষক পালার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শিবায়নে দেখা যায় ভিখারি শিবের মন্মথ রূপে কোঁচিনী নগরের নারীরা কামশরে জর্জরিত হয়ে ছুটে আসে এবং যে যার সামর্থ্য মত আলু, চাল, সব্জি, গব্য, নাড়ু মুড়ি মুড়কি দিয়ে তার ঝোলা ভরিয়ে দেয়। মনসাযাত্রার চাষ পালায়ও হীরা কুচুনি ক্ষুধার্ত শিবকে নিজ গৃহে বসিয়ে রান্না করে খাওয়ায়।

মনসাযাত্রার চাষপালার পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে শিবায়নের চাষপালার হুবহু মিল দেখা যায়। নারদের কৈলাস যাওয়া, শিবকে কৈলাসে ফিরিয়ে আনার জন্য পার্বতীকে মন্ত্রণা দেওয়া, নারদের পরামর্শে শিবকে ঘায়েল করতে পার্বতীর মশা, মাছি, ডাঁশ, জোঁক পাঠানো, দশভুজার বাগদিনী বেশে শিবের সঙ্গে ছলনা, শিবের মাছ ধরা, বাগদিনী বেশী পার্বতীকে আংটি দেওয়া, ছলনায় পার্বতীর চাষভূমি ত্যাগ, শিবের কৈলাসে ফেরা এবং হর দুর্গার বচসা, পার্বতীর স্বামীর কাছে শাঁখা চেয়ে না পাওয়া, সন্তানদের নিয়ে দেবীর কৈলাস ত্যাগ করে পিত্রালয়ে যাত্রা, পথে শিব কর্তৃক ঝড়বৃষ্টি ও মায়ানদী সৃষ্টি করে বিপত্তি, পার্বতীর পিত্রালয়ে পৌঁছানোর আনন্দে সেখানে উৎসব, শিবের শাঁখারী বেশে পার্বতীকে শাঁখা পরানো এবং হর পার্বতীর মিলনের ঘটনা সমূহ লোকযাত্রায় যেভাবে দেখানো হয় তা একেবারে কবি রামেশ্বরের শিবায়নের অনুগামী।

জন্মপালায় পুরাণ, মহাকাব্য ও মঙ্গলকাব্যের অভিনব যোগসূত্র স্থাপন– মনসা যাত্রার জন্মপালায় উপস্থাপন করা হয় প্রথম জীবনের কাহিনি। মনসার জন্মের প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে এগারো বছর বয়সে পিতার খোঁজে আস্তিকের মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেবার ঘটনা পর্যন্ত জন্মপালার বিস্তার। যে পুরাণগুলিতে সরাসরি মনসার আখ্যান পাওয়া যায়,

তাদের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ[২] ও দেবীভাগবত পুরাণ[৩] অন্যতম। এই দুটি পুরাণেই বলা হয়েছে, মনসা কশ্যপ মুনির মানস কন্যা। প্রাচীন কালে পৃথিবী নাগেদের দ্বারা ভারাক্রান্ত হলে মানব সমাজ মহামুনি কশ্যপের শরণাপন্ন হন। প্রজাপতি ব্রহ্মার নির্দেশে কশ্যপ বেদের বীজমন্ত্র অনুসারে একটি মন্ত্র সৃষ্টি করেন। কশ্যপ মুনির ধ্যানের সময় ওই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তার মন থেকে সৃষ্টি হয়, এই দেবীই মনসা। ইনি শিবের আরাধনা করে তাকে তুষ্ট করেছিলেন,এবং মহাদেবের থেকে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন। এই দেবী শ্রীকৃষ্ণ সহ মুনি, মনু, নাগ ও মানব কর্তৃক পূজিতা হয়েছেন।

মহাভারতে[৪] সরাসরি মনসা নামের উল্লেখ না থাকলেও কশ্যপ পত্নী কদ্রুর প্রসব করা ডিম থেকে এক হাজার নাগের জন্মের ঘটনা রয়েছে। স্বপত্নী বিনতার সঙ্গে দাসীত্বের পণে জেতার জন্য কদ্রুর শেখানো ছলনার পথ অবলম্বনে তার নাগ সন্তানেরা নারাজ হলে সে জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে নাগ জাতীর ভস্ম হয়ে যাবার অভিশাপ দেয়। মহাযোগী জরৎকারু মুনি পূর্ব পুরুষদের বংশ রক্ষার্থে স্বনামের নারীকে বিবাহ করতে চাইলে, নাগরাজ বাসুকি সানন্দ হৃদয়ে তার ভগিনী জরৎকারীকে মুনির হাতে সম্প্রদান করেন। জরৎকারু মুনি বিনা অপরাধে পত্নীত্যাগ করেন। মুনিপত্নী স্বামীর নিকট একটি সন্তান প্রার্থনা করেন। কারণ কদ্রুর অভিশাপ থেকে ভ্রাতৃকুলকে বাঁচাতে পারবেন তার গর্ভের সন্তান। অতঃপর জরৎকারু স্ত্রীকে প্রবোধ দিয়ে বলেন তার গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে সে পরম জ্ঞানী হবে এবং পিতা ও মাতা উভয়ের বংশই সে রক্ষা করবে। জরৎকারী নাগলোকে ফিরে যান এবং সেখানে সুলক্ষণ সন্তান আস্তিকের জন্ম হয়। আস্তিক সকল বেদ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। ওদিকে ব্রহ্মশাপে তক্ষক নাগের দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হলে তার পুত্র জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ করেন, যজ্ঞের আগুনে পুড়ে সাপেদের মৃত্যু হতে থাকে। মনসার আজ্ঞায় মহাজ্ঞানী আস্তিক মুনি জন্মেজয়ের কাছে যান, এবং তার জ্ঞানোপদেশ শুনে জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ বন্ধ করতে সম্মত হন। মহাভারতের আস্তিক কর্তৃক জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ নিবারণের এই ঘটনা, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ স্বীকৃত। এখানে দুটি সুত্রের মিলন লক্ষ্যনীয় –

১) মহাভারতের জরৎকারীই পুরাণের মনসা। কারণ উভয়েই নাগরাজ বাসুকির ভগিনী, মহাযোগী পরম জ্ঞানী জরৎকারু মুনির পত্নী এবং আস্তিকের মাতা, যে আস্তিক পরীক্ষিৎ পুত্র জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ নিবারণ করেছিল।

২) দেবীভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে মনসার পিতা কশ্যপ। মহাভারতেও কশ্যপের আশীর্বাদে কদ্রুর গর্ভে হাজার নাগের জন্ম হয়, তাদের মধ্যে বাসুকি একজন, আর বাসুকির ভগিনী জরতকারীই যদি মনসা হয়, সেক্ষেত্রে মনসা কদ্রু ও কশ্যপের কন্যা। তবে মনসার জন্ম নিয়ে মহাভারতে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। কারণ কদ্রুর গর্ভের হাজারটি ডিম থেকে পাঁচশো বছরে হাজার জন নাগ পুত্রের জন্ম হয়। কিন্তু নাগকন্যার জন্মের কোন উল্লেখ নেই। অথচ নাগ জাতির উদ্ধারের প্রসঙ্গে নাগেদের বোনের প্রসঙ্গ রয়েছে।

এখানেই অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে পুরাণের এবং মহাকাব্যের মনসার জন্মকথার পার্থক্য দেখা যায়। কারণ মঙ্গলকাব্যগুলির বিবরণ অনুসারে মনসা শিব রতি থেকে উৎপন্ন অযোনিসম্ভবা কন্যা। এই সূত্রেই আর একটি প্রসঙ্গে আলোকপাত করা যাক। সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ বলেন, মধ্যযুগে হিন্দুত্বের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সহ আরও নানা কারণে যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের অধ্যায় সূচিত হয়েছিল, সেখানে লৌকিক দেবী মনসাকে পৌরাণিক শিবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় কন্যার সম্পর্কে। কিন্তু পুরাণে মনসার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে তার অবস্থানকে কেবল লৌকিককতায় সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। সেখানে তিনি স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কর্তৃক পূজিতা। সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হওয়ায় জলে জঙ্গলে পরিপূর্ণ লোকসমাজে সাপের ভীতি থেকেই তার পূজার ব্যাপকতা থাকা খুবই স্বাভাবিক। মনসা তাই একটি মিশ্র সংস্কৃতির ধারক বাহক দেবী রূপেই অধিষ্ঠিত। মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাস তার পদ্মাপুরাণে মনসার জন্ম কথায় মনসাযাত্রার পুরাণ, মহাকাব্য, ও মঙ্গলকাব্যের অভিনব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন মনসাকে নাগমাতা কদ্রুর গর্ভজাত সন্তান রূপে উপস্থাপন করে। পূর্ববঙ্গের কবি বংশীদাস রায় (ষোড়শ – সপ্তদশ শতক) সংস্কৃত ভাষা ও পুরাণে অভিজ্ঞ ছিলেন। তার কন্যা চন্দ্রাবতী রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন। সুতরাং তার রচনায় সংস্কৃত পুরাণ, মহাকাব্যের প্রভাব খুবই স্বাভাবিক। তার পদ্মাপুরাণে রয়েছে,

বিষহরী অবতার সৃষ্টির জন্যই শিবরতি পাতালে নেমেছিল, একথা বুঝে ব্রহ্মা তাকে কদ্রুর গর্ভে স্থাপন করেন –

' কদ্রুর কোলেতে জন্ম অর্ধ অঙ্গ নাগ ।
শিবের ঔরসে জন্ম দেব অর্ধ ভাগ'।।[৫]

অধিকাংশ মনসামঙ্গল কাব্য মতে শিব রতি পদ্মের মৃণাল বেয়ে পাতালে পৌঁছালে সেখানে অসাধারণ রূপবতী অযোনিসম্ভবা দেবী মনসার জন্ম হয়। মনসার জন্ম সম্পর্কে পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য ও মহাকাব্যের অভিনব মেলবন্ধন সূচিত হয়েছে বংশীদাস রায়ের পদ্মাপুরাণে। মনসাযাত্রায়ও মনসাকে কদ্রুর গর্ভজাত কন্যা রূপেই উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে হয় দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণের প্রভাব রয়েছে, অথবা লোকযাত্রার আদি পালাকারগণ নিজেরাই এই অভিনব যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। তবে যাই হোক না কেন, দ্বিজ বংশীদাসের কাব্য থেকে পালাকারদের পারিপার্শ্বিক ঘটনা সংস্থাপন, উপস্থাপন রীতিতে রয়েছে বিস্তর ফারাক।

প্রথমত, মনসার পালাগানে তার জীবনের প্রথম পর্ব যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা এইরকম - পাতালে নাগ মাতা কদ্রু ভুল করে সুধা ভেবে পদ্মপত্রের ওপর ভাসমান শিবরতি পান করেন (নাগেরা কদ্রুর সন্তান, মহাভারত অনুসারেই দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে নাগগণের জন্মবৃত্তান্ত পাই)। এবং তার পরই কদ্রুর শরীরে তীব্র কষ্ট শুরু হয়। শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কদ্রু স্বামী কশ্যপকে আহ্বান করেন। তিনি ধ্যান যোগে জানতে পারেন কদ্রু যা পান করেছেন তা আসলে শিব রতি (মনসামঙ্গলের ঘটনা অনুযায়ী শিবরতি পদ্মের মৃণালের মারফৎ পাতালে পৌঁছয়। মধ্যযুগের কবিদের যে বৈজ্ঞানিক মনন ছিল, আজকের টেস্ট টিউব আর পদ্মের মৃণালের রূপগত সাদৃশ্য তা প্রমাণ করে)। অতঃপর কদ্রুর গর্ভে বেড়ে ওঠা সন্তানের পাতালপুরীতে জন্ম হয় – ইনিই মনসা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পালাকারেরা একই গান একাধিক নারীর জবানীতে বসিয়ে পালায় তাদের গর্ভাবস্থা, সাধভক্ষণ, সন্তান জন্মের পর শিশুর নাড়ি ছেদন ইত্যাদি লোকাচার তুলে ধরেছেন। তাই জন্ম পালার কদ্রু ও মনসা, বাণিজ্য পালায় সনকা একই গান গেয়ে নিজের নিজের গর্ভাবস্থার বিবরণ তুলে ধরেন দর্শকের সামনে। কদ্রু ও কশ্যপের কন্যা

(পালাগানে কশ্যপকে পালক পিতা হিসাবেই তুলে ধরা হয়েছে) মনসা নাগলোকে পিতা মাতা ও নাগ ভ্রাতা ভগিনীদের আদরে বড় হয়।

মনসা যৌবনে পৌঁছলে কশ্যপ আর কদ্রু তার বিবাহের জন্য যোগ্য পাত্র কিভাবে সন্ধান করবেন সে বিষয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন কারণ নাগলোকে তার যোগ্য পাত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই তারা মনস্থ করেন মনসাকে কৈলাসে পাঠাবেন 'বিমাতা দর্শনে'। এইভাবেই কৌশলে পার্বতীর কাছে মনসার বিবাহ যোগ্য পাত্র সন্ধানের দায়িত্ব অর্পণ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না, কশ্যপ আর কদ্রুর। ওদিকে মনসাও তখন খেলার সাথীদের নিয়েই ব্যস্ত। হঠাৎই পিতা মাতার সিদ্ধান্তে নাগলোক ত্যাগ করে অজানা জীবনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে গিয়ে সেও অন্তরে ক্ষত বিক্ষত হয়। ষোল বছর বয়সে পিতা কশ্যপের সঙ্গে কালিদহে শিব সন্নিধানে যাবার দৃশ্য তাই মা-মেয়ের বিচ্ছেদ বেদনায় করুণ, অশ্রুসিক্ত। নাগলোকে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীদের মধ্যে বেড়ে ওঠা মনসার প্রথম জীবনের এক প্রাণোচ্ছল ছবি পালাকারদের হাতে যে নিবিড় আন্তরিকতায় উপস্থাপিত হয়েছে, তা মনসামঙ্গল কাব্য ব্যতিরেকে মৌলিক। আর একটি বিষয়ও খুবই প্রাসঙ্গিক মনে হয় - যে পিতা সন্তানের জন্মের খবর রাখে না, তার বড় হয়ে ওঠায় যার কোনো ভূমিকা থাকে না, অথচ ক্ষমতাশালী বলে মা এবং পালক পিতা কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে তাকে উপেক্ষা করতে পারছেন না। মেয়ের জন্য কেবল পিতার সমকক্ষ পাত্রের চাহিদায় তাকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিতে বাধ্য হন। পালাকারদের এই ভাবনা তো বৃহত্তর বাঙালীর সমাজ মননেরই প্রতিচ্ছবি, যেখানে বিবাহের ক্ষেত্রে বংশকৌলীন্য, জাতি, গোত্র, সামাজিক অবস্থানকে অত্যন্ত প্রাধান্য দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত জরৎকারুর পত্নীত্যাগ প্রসঙ্গ - মনসাকে তার স্বামী জরৎকারু মুনি বিনা অপরাধে ত্যাগ করেছিলেন, একথা পুরাণ মঙ্গলকাব্য মহাকাব্য সর্বত্র স্বীকৃত। তবে মঙ্গলকাব্যে এ প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ভিন্ন ভিন্ন গল্প পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, দেবী ভাগবত পুরাণ ও মহাভারতে এ প্রসঙ্গে যে কাহিনি পাওয়া যায়, তা এই রকম - একদা সন্ধ্যা হয়ে যাবার পরও স্বামীর ঘুম ভাঙছে না দেখে জরৎকারী দ্বিধায় পড়ে। ব্রাহ্মণের পরম পালনীয় সন্ধ্যা- ধর্ম করতে না পারলে স্বামী ঘুম থেকে জেগে হয়ত ক্রোধান্বিত হবেন। অবহেলায়

'সন্ধ্যা' না করলে ব্রাহ্মণের মহাপাপ হয়, এই চিন্তায় মুনিপত্নী জরৎকারুকে জাগিয়ে দেন। ঘুম ভাঙিয়ে স্বামীর অপ্রিয় কাজ করার অপরাধে মুনি নিজ পত্নীত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। জরৎকারী স্বামীর কাছে সন্ধ্যা ধর্ম পালনের কথা বললে, মুনি সূর্য অস্ত যাওয়ার কারণে সূর্যকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হন, সূর্য সন্ধ্যাকে নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হন এবং বিনয় বাক্যে তাকে তুষ্ট করেন। মুনি সন্ধ্যা ধর্ম পালনের আগে সন্ধ্যা যে বিদায় নেয়নি তা বোঝাতে সমর্থ হলে, মুনি সূর্যকে অভিশাপ দেওয়া থেকে ক্ষান্ত হন। কিন্তু তার স্ত্রী ত্যাগের সিদ্ধান্তে অটুট থাকেন। মুনিপত্নী কাতর ভাবে এই গুরুদণ্ড ফিরিয়ে নেবার অনুরোধ করলেও প্রত্যাখ্যাতা হন।

দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে উপরোক্ত ঘটনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যদিও কিছু রদবদল ঘটেছে তার রচনায়। জরৎকারু মুনির সাথে বিবাহের পর একদিন পদ্মাবতী নদীতে স্নান করতে গেলে, উগ্রতপা মুনি তাকে দেখে আসক্ত হয়ে পড়েন এবং তার সঙ্গ প্রার্থনা করেন। পদ্মাবতী নিজের পিতা ও স্বামীর পরিচয় দিয়েও উগ্রতপাকে ক্ষান্ত করতে অক্ষম হন এবং তার হাত থেকে কিছুটা সময় চেয়ে কিছুক্ষণের জন্য রেহাই পান। মুনির হাত থেকে বাঁচার কৌশল স্বরূপ নেতার পরামর্শ মত অন্য কোন সখীকে সাজিয়ে তার কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত করে পদ্মা। মনসার অনুরোধে নেতা পদ্মার অলঙ্কারে সেজে উগ্রতপা মুনির কাছে যায়, গান্ধর্ব মতে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। উগ্র ধনঞ্জয় নামে তাদের পুত্র জন্মাবার পর মুনি আবার একদিন নদীতে স্নানরত পদ্মাকে দেখেন এবং তার চরণবন্দনা শুরু করেন। নেতা মুনির কাছে পূর্ব বৃত্তান্ত খুলে বললে উগ্রতপা পদ্মার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে স্বামীত্যাগের অভিশাপ দেন।

এই ভাবে জরৎকারুর পত্নী ত্যাগের প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন দ্বিজ বংশীদাস। একদা দ্বিতীয় প্রহরে মনসার কোলে মাথা রেখে তার স্বামী ঘুমিয়ে পড়েন। সেই সময় কালীয় নাগ গরুড়ের সাথে বিবাদ করে উত্তরের রমণক দ্বীপ থেকে দক্ষিণের কালিন্দী হ্রদে যাচ্ছিলেন। নাগের ফণায় সূর্যের কিরণ ঢেকে গেলে পৃথিবী অন্ধকারময় হয়। উগ্রতপার অভিশাপে পদ্মার বুদ্ধিভ্রম ঘটে। সন্ধ্যা অতিবাহিত হচ্ছে ভেবে সে স্বামীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে।

কালীয় নাগ ততক্ষণে কালিন্দী পৌঁছে গেছে, তাই আকাশে আবার সূর্যোদয় হয়। ক্রুদ্ধ জরৎকারু মিথ্যে বলে ঘুম ভাঙ্গানোয় স্ত্রীকে ত্যাগ করেন।

এবার মনসাযাত্রার ঘটনায় আসা যাক। পালাগানে জরৎকারু যেন তেন প্রকারেণ স্ত্রী ত্যাগে তৎপর। একদিন জরৎকারু মনসার কোলে নিদ্রা গেলে সেও স্বামীর পাশে ঘুমিয়ে পড়ে। অতঃপর জরৎকারু জেগে সন্ধ্যাকে ডেকে ষড়যন্ত্র করে মনসাকে বিভ্রান্ত করার জন্য। সন্ধ্যা স্বীকৃত হন। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সন্ধ্যা এসে ঘুমন্ত মনসাকে ডেকে ধূপ দীপ জ্বালাতে নির্দেশ দেন। মনসার কোলে ঘুমন্ত স্বামী তাই সে প্রথমে নিজের অবস্থার কথা বলে প্রদীপ জ্বালাতে অস্বীকৃত হয়। তখন সন্ধ্যাদেবী বিবাহিতা নারীর সন্ধ্যাকালে প্রদ্বীপ প্রজ্জ্বলন যে একান্ত কর্তব্য সেকথা বলে মনসাকে ইষ্টনাম করতে এবং প্রদীপ জ্বালতে নির্দেশ দেন। মনসা স্বামীর মাথা খুব সন্তর্পণে কোল থেকে নামিয়ে নিজ কাজে অগ্রসর হয়। এই সময় জরৎকারু জেগে ওঠার অভিনয় করেন, এবং পূর্ব সিদ্ধান্ত মত সন্ধ্যাদেবীও বিদায় নেন এবং সূর্যোদয় হয়। মনসাকে প্রতারিত করে জরৎকারু তাকে ত্যাগ করেন।

জরৎকারু মহাযোগী। তিনি যে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তপস্যায় নিমগ্ন হতে চেয়ে মনসার সঙ্গে ছলনা করেছিলেন একথা পুরাণ, মহাকাব্য তথা মঙ্গলকাব্যের সকল কবিদের দ্বারা স্বীকৃত। তবে সন্ধ্যা দেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্র করে স্ত্রী ত্যাগের ঘটনায় মনসাযাত্রার জরৎকারুর প্রতারণার মাত্রা চড়িয়ে তাকে একটি খল চরিত্রে পর্যবসিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। মহাজ্ঞানী জরৎকারু পরম শিবভক্ত, উপরন্তু মনসার স্বামী, সুতরাং পুরাণ বা মঙ্গলকাব্যে তার পত্নীত্যাগকে কেবল উগ্রতা হিসাবেই তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু পালাকারদের সহজ বিশ্লেষণে জরৎকারুর অধর্ম, অন্যায় ষড়যন্ত্র অকপটে ধরা দিয়েছে।

তৃতীয়ত, স্বামী প্রত্যাখ্যাতা মনসাকে পার্বতীর আশ্রয় দান – মোটামুটি সব মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায় স্বামী প্রত্যাখাতা হবার পর মনসা সেভাবে কারো কাছে আশ্রয় পান নি। পূর্ববঙ্গের কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে দেখা যায় যে শিব কর্তৃক আশ্রয় পেলেও বিমাতা চণ্ডীর সঙ্গে বিবাদের ফলে কন্যাকে বনবাসে পাঠাতে বাধ্য হন তিনি। মনসার ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও দেবীভাগবত পুরাণে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – জরতকারু মনসাকে

পরিত্যাগ করলে তিনি কৈলাসে যান। সেখানে পার্বতী তাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দেন এবং মহাদেব জ্ঞানোপদেশ দ্বারা তার শোক নিরাময়ে প্রয়াসী হন। শুভক্ষণে পিত্রালয়ে মনসার পুত্র জন্মে। নিজের স্বামী, অভীষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণ, শিক্ষাগুরু মহাদেবের প্রতি ভক্তিজুতাথাকায় দেবী মনসার অপর নাম অস্তি। অস্তির পুত্র তাই আস্তিক নামে প্রসিদ্ধ হন। মহাদেব মঙ্গলবাচন পূর্বক জাতকাদি কাজ সব সম্পন্ন করেন। তিনি দৌহিত্রকে বেদ শিক্ষা দেন।

মনসাযাত্রার পালাকারেরা উল্লিখিত ঘটনা উপস্থাপনে মঙ্গলকাব্যগুলির থেকে প্রভাবিত হননি। সরাসরি পুরাণ কথা থেকে প্রভাবিত হয়ে তারা যে ঘটনা তুলে ধরে তা এই রকম – স্বামী কর্তৃক বিতাড়িতা হয়ে গর্ভবতী মনসা ফিরে আসেন কৈলাসে। সেখানে সে পায় বিমাতা পার্বতীর স্নেহের পরম আশ্রয়। পুত্র আস্তিকের জন্ম হলে সেও মাতামহ ও মাতামহীর ছত্রছায়ায় স্নেহে আদরে বড় হতে থাকে। পুত্রের পাঁচ বছর বয়স হলে মনসা তাকে শিক্ষা দানের জন্য সচেষ্ট হন। এবং পার্বতীকে অনুরোধ করেন তার শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে। এখানে এসেছে স্থান কালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাঁচ বছর বয়সে শিশুর পাঠশালায় ভর্তির প্রসঙ্গ। আরেকটি নতুন কথা পালাকারেরা যুক্ত করেছেন এই প্রসঙ্গে। সেটা হল ঋষি বশিষ্টকে আস্তিকের গুরু হিসাবে নিয়োগ করা। পার্বতী নিজে স্নেহের নাতি আস্তিককে নিয়ে বশিষ্টের পাঠশালায় যান এবং ভর্তি করেন লেখাপড়া শেখার জন্য। সেখানে তার শিক্ষা সুসম্পন্ন হলেও গুরুর প্রশ্নের উত্তরে সে পিতৃপরিচয় দিতে পারে না। ফলস্বরূপ বশিষ্ট আস্তিককে জারজ সন্তান বলে অপমান করে, অপবাদ ও ধিক্কারে জর্জরিত করে, এমনকি প্রচণ্ড প্রহার করে তার পাঠশালা থেকে তাড়িয়ে দেন। অপমানিত আস্তিক কৈলাসে ফিরে এসে মায়ের কাছে পিতৃপরিচয় জানতে চান। অভিমানী মনসা পুত্রের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে, স্নেহের সঙ্গে মাতামহী পার্বতী তার পিতৃপরিচয় সম্পর্কে তাকে অবগত করান।

পুরাণের মতই মনসাযাত্রায় স্বামীর আশ্রয় হারিয়ে কৈলাসে বিমাতার নিশ্চিন্ত আশ্রয় পায় পদ্মাবতী। পুরাণে যেখানে শিব নিজেই আস্তিকের শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, পালাগানে বশিষ্টকে সে দায়িত্ব দেওয়া হয়। বশিষ্টের আস্তিককে জারজ বলে প্রহার, এবং জারজ

সন্তানের সংস্পর্শে কলঙ্কিত হয়েছে বলে তার পাঠশালা ধুয়ে শুদ্ধিকরণ করার ঘটনা অমানবিক মূল্যবোধহীন জ্ঞানহীন নৃশংস ব্রাহ্মণ সমাজকে চিহ্নিত করে। এটি পালাকারদের নিজস্ব সংযোজন। সামগ্রিকভাবে লোকযাত্রার জন্ম পালায় মনসার প্রথম জীবনের এই পর্বের ঘটনায় পুরাণের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

মনসামঙ্গল কাব্য অনুসারী মনসাযাত্রার বাণিজ্যপালা – মোটামুটিভাবে বিভিন্ন কবির মনসামঙ্গলে চাঁদ বণিকের দক্ষিণ দেশে বাণিজ্য যাত্রা থেকে শুরু করে তার নিজগৃহে ফেরা পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ অনুসারে মনসাযাত্রার বাণিজ্যপালা পরিবেশন করা হয়। তবে পালাকারেরা পরিচিত কাহিনির মধ্যেও কোথাও কোথাও কিছু রদবদল ঘটিয়েছেন। আবার লৌকিক আচার অনুষ্ঠান সামাজিক প্রথা যুক্ত হয়ে সামগ্রিক উপস্থাপনাকে করেছে লোক মননের কাছাকাছি। লোকযাত্রার বাণিজ্যপালার সেই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত কাহিনিগুলি নিম্নরূপ –

ঊষা অনিরুদ্ধের জন্ম প্রসঙ্গ – শৈব বণিক চাঁদ সদাগরের কাছ থেকে পূজা পাওয়ার জন্য মনসা নেতার পরামর্শে করে স্বর্গের নৃত্যশিল্পী ঊষা ও অনিরুদ্ধকে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়। মনসার ষড়যন্ত্রেই দেবসভায় নাচের সময় তাদের তালে ভুল হয় এবং উপস্থিত শিবের অভিশাপে ঊষা অনিরুদ্ধের মর্ত্য জন্ম হয়। পালাগানে উপস্থাপিত এ কাহিনি মনসামঙ্গল কাব্যানুসারী। বিজয় গুপ্ত[৬], দ্বিজ বংশীদাস[৭], জগজ্জীবন ঘোষাল[৮], বিপ্রদাস পিপলাই[৯], সকলের কাব্যেই এ ঘটনা পাই। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে[১০] ঊষা অনিরুদ্ধের জন্মের প্রেক্ষাপটে রয়েছে হরি ও হরের প্রচণ্ড সংগ্রাম ও অনিরুদ্ধের প্রতি শিবের অভিশাপের কাহিনি। পালাগানে দেখানো হয় মনসা ঊষা অনিরুদ্ধকে বাধ্য করে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে। তারপরই অগ্নি থেকে উঠে আসে অনিরুদ্ধের প্রাণ স্বরূপ একটি ফল আর ঊষার প্রাণ স্বরূপ একটি ফুল। মনসা গনক বেশ ধারণ করে ফুলটি দিয়ে আসেন উজানি নগরে সায়বেনের স্ত্রী অমলাকে আর ফলটি নিয়ে যান চম্পক নগরে চাঁদের স্ত্রী সনকার কাছে। উভয়কেই সন্তান ধারণের জন্য যথাক্রমে ওই ফুল ও ফল আড়াইটি মরিচ আর গঙ্গা জল দিয়ে পিষে খেতে বলেন। বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গলে ঊষা অনিরুদ্ধের তনুত্যাগের কাহিনি রয়েছে। তবে অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠে আসা ফুল ও ফল খেয়ে সনকার ও

অমলার গর্ভে যথাক্রমে লক্ষিন্দর আর বেহুলার জন্মের ঘটনা পালাকারদের নিজস্ব সংযোজন।

বৃদ্ধা ধাত্রী ও দ্বারিক প্রসঙ্গ – লক্ষিন্দরের জন্মের পর নাড়ি ছেদনের জন্য সনকা দাসীকে বলে দাইকে খবর দিতে। দাসী দ্বারিককে পাঠায় দাইকে খবর দেওয়ার জন্য। বৃদ্ধা দাইএর অসংলগ্ন বেশ, মাথা পাকা চুলে একেবারে সাদা, হাতে বিড়ি, উপরন্তু কানে কম শোনায় দ্বারিকের কথার প্রত্যুত্তরে সে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে, সেই সঙ্গে বুড়ির নাতনি আর দ্বারিকের রঙ্গ তামাশা – সব মিলিয়ে এক কৌতুক মুখর এক দৃশ্য উঠে আসে মনসাযাত্রার বাণিজ্য পালায়। এই দৃশ্য পালাকারদের মৌলিক সংযোজন।

বিধাতা কর্তৃক লক্ষিন্দরের ভাগ্য লিখন – লক্ষিন্দরের জন্মের পর বিধাতা তার ভাগ্য লিখতে যাচ্ছেন সনকার ভবনে। মনসা তার পথ আটকায়। তার নির্দেশেই বিবাহরাত্রে সর্প দংশনে লক্ষিন্দরের অকাল মৃত্যু লিখতে সম্মত হন বিধাতা। ওদিকে নবজাতক কে নিয়ে সনকা একাকিনী। আর তাই দাই বুড়ি নাড়ি কাটতে এলে তাকে অনুরোধ করে এক সপ্তাহের জন্য নিজের কাছে রাখেন সনকা। বিধাতা রাতের বেলায় লক্ষিন্দরের নাড়ি কাটতে এলে দাই বুড়ি তার পথ আটকায়, এইভাবে পর পর তিনবার বিধাতাকে ফিরিয়ে দেয় দাই বুড়ি। শেষ রাতে বিধাতা আবার আসেন এবং সেবারও দাই এর চোখ এড়িয়ে শিশু পুত্রের কাছে পৌঁছতে অপারগ হন তিনি। বিধাতা বাধ্য হয়ে নিজের পরিচয় দেন এবং দাইকে তার আসার কারণ খুলে বলেন। দাই সম্মত হন এবং বিধাতা শিশু লক্ষিন্দরের ললাটলিখন সম্পূর্ণ করেন। বাণিজ্য পালার এই কাহিনিও পালাকারদের স্বরচিত।

একই পাঠশালায় বেহুলা লক্ষিন্দরের ভর্তি ও শিক্ষাগ্রহণ – একই পাঠশালায় বেহুলা লক্ষিন্দরের শৈশবে শিক্ষাগ্রহণের দৃশ্য মনসাযাত্রায় দেখানো হয়। এখানেই ভাসানপালার জনপ্রিয় নয়াবাজার পর্বের প্রেক্ষাপট সূচিত হয়। পাঠশালায় পাঠরত লক্ষিন্দরকে দেখা যায় সকল ছাত্রের মধ্যে বেহুলার প্রতি বিশেষ ভাবে মনযোগী হতে। লোক মনোরঞ্জনের জন্যই পালাকারেরা মূল কাহিনির মধ্যে এই ধরণের সংযোজন করেছেন।

হনুমান ও চন্দ্রধর বণিকের মল্লযুদ্ধ – মনসার ষড়যন্ত্রে কালিদহে চাঁদ বণিকের বাণিজ্যতরী নিমজ্জনে হনুমানের সক্রিয় ভূমিকা প্রায় সব মনসামঙ্গলেই দেখা যায় (ব্যতিক্রমও রয়েছে, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে এই প্রসঙ্গে হনুমানের উল্লেখ নেই)। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিপ্রদাস পিপলাই, বংশীদাস রায়, জগজ্জীবন ঘোষাল, নারায়ণ দেব – এদের সকলের কাব্যেই দেখা যায় মনসার নির্দেশে হনুমান চাঁদের সপ্ত ডিঙ্গা (কারো কারো রচনায় চোদ্দ ডিঙ্গা) ডুবিয়ে দেন। সব কাব্যেই কিন্তু গঙ্গা, ইন্দ্র ইত্যাদির প্রভাবে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপে সামিল হয়েছেন হনুমান। অর্থাৎ ব্যক্তি হিসাবে তার চাঁদের সামনে আত্মপ্রকাশ মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায় না, তিনি তার কর্মেই প্রকট। কিন্তু মনসা যাত্রায় স্বয়ং হনুমান হাজির হয়েছেন এবং মল্লযুদ্ধে চন্দ্রধরকে পরাজিত করেছেন। চাঁদ বণিক হেরে গিয়ে স্বীকার করেছেন যে শিব অংশে জাত হনুমান চরম শক্তিশালী, অপ্রতিরোধ্য। চাঁদ আর হনুমানের এই মল্লযুদ্ধের দৃশ্যায়ন পালাকারদের নিজস্ব সংযোজন।

বাণিজ্য পালার বেশ কয়েকটি জায়গায় লোকাচার, সামাজিক ক্রিয়াকলাপের দৃশ্যায়ন করতে গিয়ে সরাসরি দর্শকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন দলের কুশীলবেরা। সেরকমই কয়েকটি ঘটনা নিম্নরূপ –

চাঁদের ভিক্ষা – কালিদহে মনসার চক্রাতে চাঁদ বণিকের সপ্তডিঙ্গা বাণিজ্য তরী ভরাডুবির পর কোনক্রমে প্রাণে বাঁচলেও সে সর্বস্বান্ত হয় এবং উদর জ্বালায় ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়। পালাগানে চাঁদ চরিত্রের অভিনেতা নিজেই দর্শকদের মধ্যে নেমে আসে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে। তার করুণ গান উপস্থিত দর্শকদের অশ্রুসিক্ত করে তোলে। 'রাজা নই আমি ভিখারি' এই গানে চাঁদ বণিকের দুর্দশার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকট হয় চরিত্রাভিনেতাদের ব্যক্তিগত জীবনের দুরবস্থা তথা আর্থিক বিপন্নতা। টানা দশ থেকে পনেরো মিনিট দর্শকদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে চলে ভিক্ষা পর্ব । দর্শকেরাও সশ্রদ্ধ মনে দু এক টাকা ফেলে দেন ঝুলিতে। এমন কি শিশুদের হাতেও দু এক টাকা দিয়ে মা বাবা চাঁদের ঝুলিতে দানের জন্য এগিয়ে দেন। চাঁদের মত একজন মহাতেজা ব্যক্তির আশীর্বাদে শিশুর মঙ্গল হবে, এই বিশ্বাসে চাঁদরূপী অভিনেতার পা ছুঁইয়ে শিশুদের প্রণাম করান বাবা মা। নেহাতই সামান্য রোজগার তবুও

প্রাণ ঢেলে অভিনয় করেন অভিনেতা। পাশাপাশি পৌরাণিক চরিত্রগুলি সম্পর্কে গ্রামের মানুষের সরল লোকবিশ্বাস শ্রদ্ধা ভক্তির এক নিবিড় মনন এই দৃশ্যে প্রতিফলিত হয়।

সনকার সাধ প্রসঙ্গ – লোকযাত্রায় সাধারণত কাহিনির মধ্যেকার যে কোন লোকাচার সাড়ম্বরে পালন করা হয়। বাণিজ্য পালায় সনকার সাধ ভক্ষণের মঞ্চায়নে এক স্বতন্ত্র লোকবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। যে বাড়িতে পালাগানের দল আনা হয়েছে সেই পরিবারের অথবা প্রতিবেশী কোন পরিবারে এমন কোন নারী যদি থাকেন, যিনি দীর্ঘদিন বিবাহিতা কিন্তু মা হতে পারেন নি, তাকে সনকার পরিবর্তে মঞ্চে উপবিষ্ট করিয়ে সাধ ভক্ষণের যাবতীয় আচার আচরণ পালন করা হয়। বরণ, মিষ্টিমুখ, নতুন শাড়ি, শাঁখা, সিঁদুর পরানো এই সকল রীতি পালন করেন ওই নারীর আত্মীয়া নারীরা, অবশ্যই দলের নির্দেশ অনুসারে। তবে আশীর্বাদ করে আত্মীয়েরা ওই নারীকে যা দেন সেই অর্থ বা শাড়ি কিন্তু যাত্রা দল গ্রহণ করে। এও উপরি রোজগারের মাধ্যমস্বরূপ। লোকসমাজে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে মনসার প্রতি ভক্তি সহকারে যাত্রাপালার এই অভিনয় পর্বে যুক্ত হলে অচিরেই তাদের সন্তান আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।

হিজড়া নাচ – শহরে গ্রামে সর্বত্রই সদ্যজাত সন্তানকে কেন্দ্র করে হিজরাদের বিকৃত নাচ গান, অকথ্য গালি গালাজ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের প্রচলন রয়েছে। এই অপসংস্কৃতিকেই তুলে ধরা হয়েছে মনসা যাত্রার বাণিজ্য পালায়। সনকার ভবনে আগত সদ্যজাত লক্ষিন্দরকে নিয়ে তুমুল উল্লাসে হিজরাদের নাচ দেখানো হয় কোন কোন দলে। মঞ্চ থেকে নেমে এসে দর্শকের সামনে গিয়ে বিকৃত রুচির শারীরিক বিভঙ্গ দেখিয়ে অর্থ উপার্জন একদিকে সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরে, আর এক দিকে অতি সামান্য (বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে দশ বিশ টাকার বেশি নয়) অর্থের জন্য পুরাণ কাহিনিতে এই বিকৃত উপস্থাপন লোকশিল্পীদের বিপন্ন আর্থিক অবস্থাকেও প্রকাশ করে। তবে সব দলে হিজরা নাচ দেখানো হয়না। বরং বহু দলের পক্ষ থেকে ধর্মীয় কাহিনিতে এই সকল অসংলগ্ন ঘটনার অনুপ্রবেশকে নিন্দনীয় বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

ভাসান পালার অভিনবত্ব – একটানা সাত আট রাতের মনসার পালাগানে সবচেয়ে জনপ্রিয় শেষ পালাটি যা মূলত ভাসান পালা। অর্থাভাবে যেখানে এক বা দুদিনের জন্য মনসার

পালাগানের আয়োজন হয় সেখানে এই ভাসান পালাটিরই উপস্থাপন হয়। কারণ এখানেই রয়েছে বেহুলার অসাধ্য সাধন আর চাঁদ কর্তৃক মনসার পূজা প্রচারের মূল কাহিনি। সেই সঙ্গে ভাসান পালায় পালাকারদের সংযোজিত যে মৌলিক কাহিনি গুলি লোকসমাজে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে, তার পরিচয় নিম্নরূপ –

নয়াবাজার পর্ব - বাণিজ্য পালায় বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহ পূর্ব প্রেমপর্বের পটভূমি তৈরি করেছেন পালাকারেরা, যেখানে বেহুলা লক্ষিন্দর একই পাঠশালায় লেখাপড়া শিখছে, এরকমই দৃশ্যের মঞ্চায়ন হয়। শৈশবের মুগ্ধতাই যৌবনের অনুরাগে পরিণত হয়, একথা ভাসান পালায় লক্ষিন্দরের জবানিতে জানা যায়। সনকা লক্ষিন্দরকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে বেহুলাকে পাবার জন্যই মৌনব্রত গ্রহণ করে গৃহত্যাগী হয়। নবগ্রাম নামক একটি স্থানে পৌঁছে সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সে নয়াবাজার স্থাপন করেন। লক্ষ্যনীয় যে নয়াবাজারের বিভিন্ন ব্যাবসায়ীরা ব্যাবসার মূলধন হিসেবে লক্ষীন্দরের কাছ থেকে যে অর্থ দাবি করে তা একেবারে আজকের দিনের অর্থমূল্য অনুসারী। এভাবেই পুরাণ গ্রথিত হয় সমকালের প্রেক্ষাপটে, দর্শকেরাও বেশি করে একাত্ম হন শিল্পীদের সঙ্গে। বাজার পরিষ্কার করার কাজে আসে উত্তমা হাঁড়ি। উত্তমার স্বামী মাতাল, কাজকর্মে অপটু। বাজার পরিষ্কার করার জন্য স্বামীর সাহায্য প্রয়োজন। এই পর্বে স্বামীকে সে যেভাবে ঝাঁটাপেটা করে কাজ করায়, এবং শেষমেশ যেভাবে তাদের প্রেম দেখানো হয়, তাতে নিম্নবিত্ত বাঙালী পরিবার- মাতাল পুরুষ আর তার মুখরা পরিশ্রমী স্ত্রীর সংসারের চিরন্তন ছবি ফুটে ওঠে। এই উত্তমাকেই মূল পর্বের ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। লক্ষিন্দরের নির্দেশে টাকার বিনিময়ে উত্তমা উজানি নগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলাকে কৌশলে নয়াবাজারে নিয়ে আসে। উত্তমার সঙ্গে নয়াবাজার যেতে নাছোড়বান্দা বেহুলা অনেক অনুরোধ উপরোধের পর মা অমলার থেকে অনুমতি আদায় করে। অবশেষে উত্তমার মধ্যস্থতায় বেহুলা লক্ষীন্দরের প্রেম পর্ব সূচিত হয় এবং চন্দ্র সূর্য সাক্ষী রেখে মালাবদল করে তাদের গন্ধর্ব বিবাহ দেখানো হয়। এই পর্বে উত্তমার মাতাল স্বামী, নয়া বাজারের ঠক ব্যাবসায়ী, বুড়ো ঘুঘনি বিক্রেতা- এই ভাঁড় চরিত্রগুলি লোকসমাজে হাসির খোরাক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

গদাই পাঁচির বিবাহ পর্ব - লক্ষিন্দরের বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে ঘটক দ্বিজবর উজানি নগরে সায়বেনের গৃহে উপস্থিত হয়। চাঁদ সদাগর ও মনসার বিবাদ সম্পর্কে অবগত সায়বেনের স্ত্রী অমলা মেয়ের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে এই সম্পর্কে রাজি হতে পারেন না এবং কৌশলে বিবাহ প্রস্তাব নাকচ করতে অসম্ভব দাবী রূপে বেহুলার ওজনের সোনার দাবি করেন ঘটকের কাছে। মনসার আশীর্বাদে ঘটক দ্বিজবর চাহিদা মত সোনা দিতে সক্ষম হন। এ ঘটনাও মনসাযাত্রার মৌলিক সংযোজন। অতঃপর চাঁদের আনা লোহার কলাই রান্না করার জন্য গদাই পালের বাড়ি থেকে কাঁচা হাড়ি ও কাঁচা সরা আনার ঘটনা মনসামঙ্গল কাব্য অনুযায়ী দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই পর্বে গদাই পালের বিবাহের ঘটনা যাত্রাদলের নিজস্ব সংযোজন। কুম্ভকার গদাই পাল বিয়ে পাগল। তিন তিনটি স্ত্রীর মৃত্যুতে তার দুঃখের শেষ নেই। এই দৃশ্যের শুরুতে তাকে দু পা ছড়িয়ে বসে হাউ মাউ করে কাঁদতে দেখা যায়। সায়বেনের নির্দেশে দ্বারিক কাঁচা হাড়ি ও কাঁচা সরা কিনতে গদাইয়ের কাছে এলে সে জানায় আবার বিয়ে হলে তবেই সে কাজে মন দিতে পারবে। বাধ্য হয়ে দ্বারিক তার দিদির মেয়ে পাচির সঙ্গে গদাইয়ের বিয়ের প্রস্তাব করে। গদাই পালের হাস্যকর আচরণ, ছেঁড়া জামা, গলায় গামছা, ফোকলা দাঁত, নোংরা চেহারা সব মিলিয়ে একেবারে কিম্ভুতকিমাকার। উপরন্তু সে কানে কম শোনে। পাচি বা পাচির মা, যে কোন নারীকে পেলেই সে কৃতার্থ হবে, এমন হাবভাব, পাত্র যাচাই করার জন্য হবু শাশুড়ির প্রশ্নের উত্তরে তার অসংলগ্ন কথাবার্তা, চালচলনে ছেলে বুড়ো সকল দর্শক হাসিতে ফেটে পড়ে। অতঃপর গদাই পাচির বিবাহ এবং লোহার কলাই রান্নার জন্য কাঁচা হাড়ি ও কাঁচা সরা তৈরি হবার ঘটনা। লোকমনোরঞ্জনের জন্যই এই রূপ কাহিনীর সংযোজন করেছেন পালাকারেরা।

বেহুলার অগ্নিপরীক্ষা – বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে যাওয়ার অনুমতি চাইলে চাঁদ সদাগর প্রথমে রাজি হননি। তিনি বেহুলাকে অগ্নিপরীক্ষার শর্ত দেন এবং সেই মত অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করেন। বেহুলা তার সুদৃঢ় মনোবল দ্বারা সেই অগ্নিকুণ্ড পার করে শ্বশুরের দেওয়া শর্ত পুরণ করে স্বামীর প্রাণ ফেরাতে কলার ভেলায় পাড়ি দেয়। বিবাহের পূর্বে বেহুলাকে লোহার কলাই সিদ্ধ করে অসাধ্য সাধন করতে হয়েছিল। সকল

মনসামঙ্গলেই এই পরীক্ষার বিবরণ পাওয়া যায়। নারায়ণদেবের কাব্যেও স্বামী ভাসুরদের প্রাণ ফিরিয়ে আনার পর সনকা ও চাঁদ বেহুলার সতীত্বের বীভৎস সব পরীক্ষা নিয়েছিল। মেয়েদের সতীত্বের পরীক্ষা নেওয়া ভারতীয় সংস্কৃতিতে নতুন নয়। সতীদাহের মত নিষ্ঠুর অমানবিক প্রথা তো বাঙালী সমাজেও কার্যকর ছিল। সুতরাং জনমনোরঞ্জনের জন্য সাহিত্যে (রামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষা), সিনেমা নাটকে যাত্রায় বিষয়টির বার বার ব্যবহার হয়েছে। মৃত স্বামীর সঙ্গে কলার ভেলায় ভাসার শর্ত রূপে চাঁদের প্রস্তুত অগ্নিপরীক্ষায় সফল হওয়ার ঘটনা মনসাযাত্রার সংযোজন। সতীত্বের বদ্ধমূল সংস্কার ও কুসংস্কার এক্ষেত্রে স্পষ্টত কার্যকর।

কাচের ওপর নাচ - লোক মনোরঞ্জনের জন্য এবং দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে অনেক দলে একশো কেজি ভাঙা কাচের ওপর নৃত্য পরিবেশিত হয় ভাসান পালায়। এভাবে বেহুলার দেবসভায় নৃত্যকে দর্শকের কাছে আরও মর্মস্পর্শী করে তুলে ধরা হয়। কাঁচের ওপর নাচের সময় নৃত্যশিল্পী এবং মহিলা দর্শকদের নিজের চুল খুলে রাখার লৌকিক নিয়ম রয়েছে। তাই প্রয়োজনে নির্দিষ্ট নারী চরিত্রে অভিনয়কারী পুরুষ শিল্পী মেয়েদের মত লম্বা চুল রাখেন। মঞ্চে নাচ শুরু হলে নিজেদের চুল খুলে দিয়ে উপস্থিত নারীরা উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য জনপ্রিয় বাংলা সিনেমা 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না'য় সাপের কামড়ে আক্রান্ত রাজপুত্রের বিষ তোলার সময়ও বিষ তোলায় পারদর্শী মেয়েটি নিজে চুল খুলে বীণ বাজায়, এবং উপস্থিত সকল নারীদেরও চুল খুলে দিতে বলে। গ্রামাঞ্চলে একটা সময় পর্যন্ত সাপে কামড়ালে ওঝা বা বেদের বিষ তোলার যে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গেই এই মেয়েদের চুল খোলার সংস্কারও জড়িয়ে ছিল। প্রতিগ্রহণের ধারায় সেই সংস্কারের রূপায়ণ হয় চলচ্চিত্রে, লোকযাত্রায়। আজ প্রত্যন্ত গ্রামেও সাপে কামড়ালে সচেতন মানুষ ডাক্তারের কাছে যান। তবে মনসা যাত্রার ভাসান পালায় মনসা তথা সকল দেবদেবীকে খুশি করতে বেহুলার নৃত্যের সময় দর্শক সহ সকল মহিলাদের চুল খোলার রীতি কোনো কোনো দলে প্রচলিত আছে। এছাড়া একই সাথে সাতটি পিতলের কলসি (দলের লোকের কথায় ডাবর) নিয়ে কাঁচের ওপর নৃত্যও দেখায় কোন কোন দল। একটা সময় যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন

অভিনেতা বা অভিনেত্রী। যন্ত্রণা বাস্তব হলেও লুটিয়ে পড়াটা পূর্ব পরিকল্পিত। এরপর মঞ্চে উপস্থিত অন্য অভিনেতা মনসার ঘটের জল ছিটিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলেন। এই উপস্থাপনার জন্য দর্শকের কাছে দেবীর নামে শিল্পীকে যথাসাধ্য টাকা দান করার জন্য অনুরোধ করা হয়। দর্শকও এগিয়ে এসে সামর্থ্য মত টাকা দিয়ে আহত অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে সম্মানিত করেন। যাত্রার কাহিনীতে এই ধরণের সংযোজন মূলত বাড়তি রোজগারের জন্য করা হয়। সামান্য উপার্জনের জন্য এভাবে চরম কষ্ট সহ্য করায় লোকযাত্রার দলগুলির আর্থিক বিপন্নতা ধরা পড়ে।

পাশাপাশি দলীয় কুশীলবদের ধর্মপ্রাণতার প্রমাণ দেয় যাত্রার নানা অংশ। লক্ষিন্দরকে দংশন করার জন্য দেবী মনসা কালনাগিনীকে আদেশ করেন। কালনাগিনী অরাজি হলে দেবী তাকে চাবুকের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করেন। মঞ্চে মোটা দড়িকে চাবুক হিসেবে দেখানো হয়। পালা শেষ হবার পরেও কালনাগিনীর ভূমিকায় অভিনয়কারী অভিনেতার শরীরে দড়ির দাগ চরিত্রের সঙ্গে তাদের একাত্মতা প্রমাণ করে। কাঁচের ওপর নাচ বা দড়ির আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা মা মনসার আশীর্বাদ প্রদত্ত বলেই তারা জানান।

বিয়াল্লিশ কর্মা প্রসঙ্গ - বিশ্বকর্মার পুত্র বিয়াল্লিশ কর্মা চরিত্রটি মনসাযাত্রার ভাসান পালার নতুন সংযোজন। চাঁদের নির্দেশে লোহার বাসরঘর নির্মাণ করার সময় সে পিতাকে সাহায্য করে। বিয়াল্লিশ কর্মা বিয়ে পাগল। আর বিয়ের খরচা চালাতে টাকার প্রয়োজন। আর তাই মনসার নির্দেশে বাসর ঘরের ঈশান কোনে ছিদ্র করে ফেরার সময় সে মনসার কাছে পারিশ্রমিক টাকার দাবী করে। দেবী অস্বীকার করলে বিয়াল্লিশ কর্মা সকলের কাছে মনসার চক্রান্ত ফাঁস করে দেবার হুমকি দেয়। ক্রুদ্ধ মনসাও অভিশাপ দেন যত দিন মর্ত্যলোকে তার পূজা প্রচারিত না হবে, তত দিন পিতা পুত্রের বাকশক্তি অবরুদ্ধ থাকবে। তবে সেই সঙ্গে এই আশীর্বাদও করেন মনসাপূজার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও পূজা প্রচারিত হবে। বিয়াল্লিশ কর্মা প্রসঙ্গ মনসার গানে পালাকারদের নিজেদের সংযোজন। এক টানা করুণ রসাত্মক কাহিনীতে মূলত কৌতুক রসের আমদানি করতেই এই চরিত্রের অবতারণা।

ভাসান পালায় কাহিনি সংস্থাপনে অসংগতি – মনসাযাত্রায় ভাসান পালার পালাকারদের সংযোজিত নয়াবাজার পর্ব লোকসমাজে খুবই জনপ্রিয় তা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু কাহিনির ক্রমবিন্যাসে সামঞ্জস্যের অভাব এক্ষেত্রে চোখে পড়ে। নয়াবাজার পর্বে লক্ষিন্দর বেহুলাকে পাবার জন্য গৃহত্যাগী হয়। এমনকি ভিনদেশে একটি বাজারও বসিয়ে ফেলে। তার উদ্দেশ্য সফল হয় বেহুলার ভালোবাসা অর্জন করে। ইতিপূর্বে বাণিজ্য পালায় তারা একই পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেছিল, এবং বালক বয়সেই লক্ষিন্দর বেহুলার প্রতি আসক্ত হয়েছিল, এমনটা দেখানো হয়েছিল, কিন্তু নয়াবাজার পর্বে প্রায় ঘণ্টা দুই তাদের প্রেমপর্বের দৃশ্যায়ন হলেও পাঠশালা ও প্রথম সাক্ষাতের কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ করে না নায়ক নায়িকা ।

প্রেমপর্ব সাঙ্গ হলে বেহুলা লক্ষিন্দর নিজ নিজ গৃহে ফিরে যায়, এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে বিবাহের জন্য কোন প্রয়াস নেয় না। কোন কোন দলে আবার নয়াবাজারেই চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী রেখে বেহুলা লক্ষিন্দরের গন্ধর্ব বিবাহ দেখানো হয়। অথচ এরপর লক্ষিন্দর গৃহে ফেরে এবং তার সম্মতিতেই তার পিতা ঘটক দ্বিজবর কে পাঠান দিকে দিকে কন্যা সন্ধানের জন্য। যে লক্ষিন্দর বেহুলাকে পাওয়ার জন্য একদিন অসাধ্য সাধন করেছিল, সে-ই কিভাবে ঘটকের মনোনীত যে কোন কন্যার সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দেয়। অন্য দিকে বেহুলাও লক্ষিন্দর প্রসঙ্গের অবতারণা করে না নিজের পিতামাতার কাছে। ঘটক দ্বিজবর এলে, লক্ষিন্দরের জন্য বিয়ের প্রস্তাব এসেছে, একথা না জেনেই সে বিবাহে সম্মত হয়। এক্ষেত্রে পালাকারেরা কাহিনির পারম্পর্য তথা কার্য কারণ সম্পর্ক বজায় রাখতে অসমর্থ হয়েছেন।

ভাসান পালায় মঞ্চে অভিনেতা আর দর্শকের যোগসাধন -

পদ্মার সাজসজ্জা - স্নানের ঘাটে বেহুলার পায়ের জল ছদ্মবেশী মনসার গায়ে লাগে। দেবীর চক্রান্তে বেহুলা অভিশপ্ত হয়। অতঃপর মনসা তার ভেজা সাজসজ্জা বদলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। দলের আমন্ত্রক পরিবারের গৃহকর্ত্রীকে নতুন সজ্জায় সাজিয়ে দিতে ডাকা হয় মঞ্চে। আলতা, সিঁদুর, শাঁখা পলা, ফুলের মালা, নতুন শাড়ি, মিষ্টি নিয়ে এসে দেবীকে সাজানো এবং বরণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বেশির ভাগ মনসাযাত্রা দলেই মনসা চরিত্রে

অভিনয় করেন পুরুষ শিল্পী। দলের নির্দেশ অনুযায়ী পদ্মার সাজসজ্জার দৃশ্যের জন্য আগে থেকেই মনসা চরিত্রের অভিনেতা বা অভিনেত্রীর হাতের মাপের শাঁখা পলা কেনা হয়। এই দৃশ্যেও সাজসজ্জার শাড়ি ইত্যাদি দলের উপরি আদায় হয়।

বেহুলা লক্ষিন্দরের আশীর্বাদ পর্ব – বিবাহের আগে বেহুলা লক্ষিন্দরের আশীর্বাদ পর্ব প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলে। এই উপলক্ষে বাড়ির দুটি শিশুকে বেহুলা লক্ষিন্দরের প্রতিনিধি স্থানীয় করে মঞ্চে আশীর্বাদ করা হয়। মাথায় ধান দূর্বা দিয়ে মিষ্টি খাইয়ে আশীর্বাদ করতে গানে গানে চলে আমন্ত্রণ। শিশু দুটির সুখ সমৃদ্ধির কথা বলে আশীর্বাদ করতে ডাকা হয় তাদের বাবা মা, কাকা কাকিমা, ঠাকুমা, পিসি সহ প্রতিবেশীদের। আত্মীয় পরিজনেরা মন খুলে সাধ্যমত এ ক্ষেত্রে টাকা দিয়ে তাদের আশীর্বাদ করেন। বলা বাহুল্য এ রীতিও দলের অতিরিক্ত উপার্জনের মাধ্যম রূপেই প্রচলিত হয়েছে।

একই ভাবে বেহুলা লক্ষিন্দরের বিয়ের সময় মঞ্চে উপস্থিত হয়ে টাকা দিয়ে নবদম্পতির হস্তবন্ধন খোলার জন্য এবং ব্রাহ্মণবিদায় দেবার জন্য শিশু দুটির পরিবার থেকে তাদের অভিভাবকদের ডেকে নেওয়া হয়। বিয়ের পর চাঁদের বাড়িতে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করার ক্ষেত্রেও ওই দুটি শিশুকে সামনে রেখে পরিবারের আত্মীয়ের কাছ থেকে পাওয়া আশীর্বাদী টাকা দলের ঝোলায় যায়।

লক্ষিন্দরের জীবনদানের দৃশ্যেও কোন কোন দলের তরফ থেকে মা মনসার চরণে সাধ্যমত প্রণামী দেবার আহ্বানে সাড়া মেলে দর্শকের। মাইকে দাতার নাম করে ঘোষণা করা হয় যে মা মনসা তাকে এবং তার পরিবারকে সমস্ত বিপদ আপদ রোগব্যাধি তথা সর্পাঘাত থেকে উদ্ধার করবেন।

এছাড়া লক্ষিন্দরের পুনর্জীবন লাভের পর বেহুলার সিঁথির সিঁদুর ছোট করে কাটা বিছুলির টুকরোতে লাগিয়ে বিক্রি করা হয় কোন কোন দলে। গানে গানে বেহুলা চরিত্রের অভিনেত্রী মা বোনেদের সতীত্ব সিঁদুর কেনার জন্য আহ্বান জানান। সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখা, ভালো স্বামী পাওয়ার জন্য গ্রামের নারীরা এই সিঁদুর লাগানো বিছুলির টুকরো অল্প মূল্যে কিনে নিয়ে ঘরে রাখেন।

মনসা যাত্রার গান - আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গানের আধিক্যের জন্য এই যাত্রা বর্তমানে লোকসমাজে পালাগান নামেই পরিচিত। সকল দলেই মনসার বন্দনা গান দিয়ে যাত্রারম্ভ। আর তারপর থেকে ছোট বা বড় প্রতিটি দৃশ্যেই একাধিক গানের প্রয়োগে সম্পূর্ণ পালা অজস্র গানে পূর্ণ হয়ে ওঠে। পালাকারদের রচিত গানগুলি ছয় থেকে দশ লাইনের হয়ে থাকে। প্রতিটি দলেই দু এক জন পাকা গাইয়ে থাকেন। এরাই মঞ্চের পেছনে থেকে মঞ্চে উপবিষ্ট গায়েনের সঙ্গে গলা মেলান। তবে প্রায় সকল দলেই সুদক্ষ যন্ত্রীদের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। পালাকারদের লেখা এই গানগুলি কখনো মৌলিক, কখনো বা কথায় বা সুরে থাকে বাংলা বা হিন্দি কোন জনপ্রিয় গানের প্রভাব। সিনেমার গান, অথবা জনপ্রিয় আধুনিক গান বা লোকগীতিও সরাসরি গ্রহণ করেন পালাকারেরা। পালাকারদের রচিত মৌলিক গানগুলি বিভিন্ন জেলার দলে কথা সুর প্রায় একই রেখে উপস্থাপনা করা হয়। কিন্তু সিনেমার গান বা অন্য কোন জনপ্রিয় গান একই জেলায় দল বিশেষে পৃথক হয়ে যায়। যুগোপযোগী এবং আকর্ষণীয় করার জন্য মনসা যাত্রার উপস্থাপক দল বা গাইয়ে এ ধরণের সংযোজন করে থাকেন। এক্ষেত্রে দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাবও ক্রিয়াশীল। কাহিনি অনুযায়ী পালাকারদের লেখা গান কখনও কৌতুকমুখর, কখনও রোম্যান্টিক কখনও বা ভক্তিমূলক। একই গানে গানে কদ্রু, মনসা, সনকা তাদের গর্ভাবস্থার বর্ণনা দেন। একই গানে লক্ষিন্দর মৌনব্রতে যাবার সময় আর আস্তিক পিতার খোঁজে যাবার সময় তাদের মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেন। মঞ্চের অভিনেতারা দর্শকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন গানের মাধ্যমে। সনকার সাধভক্ষণের আশীর্বাদ করার জন্য, বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহের পূর্বে আশীর্বাদ করার জন্য , বিবাহকালে হস্তবন্ধন খোলার জন্য, বধূবরণ কালে আশীর্বাদ করার জন্য দর্শকদের মঞ্চে ডাকা হয় গানে গানে। চাঁদ ভিক্ষা করে গান গেয়ে, বেহুলার যাত্রাপথের বিবরণ পাই গানে গানে। মঞ্চে মনসা পূজা থেকে শুরু করে যাবতীয় পারিবারিক রীতি নীতি পালনের জন্য উপস্থিত দর্শকদের শঙ্খ আর উলুধ্বনি করতে নির্দেশ দেওয়া হয় গানে গানে। লোকসমাজে প্রচলিত মনসাযাত্রার সামগ্রিক চলন নির্ভর করে গানের ওপর। তাই এই যাত্রানুষ্ঠান লোকসমাজে মনসার গান নামেই পরিচিত।

মনসা যাত্রার ভাষা রীতি - যাত্রার অভিনেতা অভিনেত্রীরা বেশিরভাগই স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত গ্রামের মানুষ হওয়ায় তাদের ভাষাভঙ্গি উচ্চারণে আঞ্চলিক প্রভাব স্পষ্ট। তবে পালাকারেরা পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাদের রচিত বেহুলা, লক্ষিন্দর, কদ্রু কশ্যপ, সনকা চাঁদ ইত্যাদি চরিত্রের সংলাপে মার্জিত ভাষাভঙ্গী অনুকরণের প্রয়াস দেখা যায়। এই প্রয়াস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হয় না। ফলে কোথাও কোথাও গুরুচণ্ডালি দোষে দুষ্ট হয় ভাষা। যেমন জন্ম পালায় কদ্রুর প্রথম সংলাপ –

আজ আমি কিবা বস্তু করিনু ভক্ষণ এই পাতাল মাঝারে। আমি যে আর সহ্য করতে পারছিনা। আমার কণ্ঠ সদা যায় জ্বলিয়া...

এই রকম সাধু চলিত মিশ্র সংলাপ সমগ্র যাত্রাপালার নানা জায়গা জুড়ে রয়েছে। প্রাচীন কাহিনিকে আজকের সঙ্গে জুড়তে সব দলের সব চরিত্রেই 'আজ' শব্দটির বহুল প্রয়োগ লক্ষিত হয়। ভাসান পালায় সনকার একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি –

আজ আমার সন্তানেরে তুমি সুখে রেখো ঠাকুর। ...তাইতো আজ আমার খোকা কোথায় ...আজ আমার খোকাকে ডেকে জিজ্ঞেস করি তার এক সপ্তাহের মধ্যে বিবাহে মত আছে কিনা...

নিম্নবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি ভাঁড় জাতীয় চরিত্রের অভিনেতারা (দাই বুড়ি, দ্বারিক, গদাই পাল, ঘটক, পুরোহিত, উত্তমার স্বামী, নয়াবাজারের দোকানদার ইত্যাদি) নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবহৃত আঞ্চলিক কথনরীতি অনুসরণ করেন। এদের সংলাপ স্বাভাবিক কারণেই একেবারে গ্রাম্য এবং মানানসই। দৃষ্টান্ত হিসাবে নয়া বাজারের ব্যবসায়ীদের কথোপকথনের অংশ বিশেষ তুলে ধরা যেতে পারে –

১মঃ দ্যাক, দার করিচিল, মাজে দ্যাকা অইচে, চাইচি , মেইর‍্যে মাতা ফেইট্যে দিইচে। (দেখ, ধার করেছিল, পথের মাঝে দেখা হয়েছে,মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে)

২য়ঃ ইওদি ইয়াশো টিয়াকা বাকি তাকে, দিএশো টাকা চায়, তোরে মাইবে নাকি আমায় মাইবে ? (যদি একশ টাকা বাকি থাকে, দেড়শ টাকা চায়, তোরে মারবে নাকি আমায় মারবে ?)

মনসা যাত্রায় মঞ্চায়িত লোকাচার - পূজা, সাধভক্ষণ, বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে মনসা যাত্রায় মঞ্চে সাড়ম্বরে পালিত হয় বেশ কিছু লোকাচার। যেমন যাত্রাপালার সূচনায় দেবীবন্দনা গান থেকে শুরু করে নানা উপলক্ষে দর্শকাসনের মহিলারা মাঙ্গলিক উলুধ্বনি ও শঙ্খ ধ্বনি করেন। মঞ্চে সনকার সাধ উপলক্ষে মায়েরা উপস্থিত হন সনকাকে আলতা ও সিঁদুর পরান। পাঁচটি ফল, পাঁচটি মিষ্টি, নতুন শাড়ি দিয়ে তাকে বরণ করেন। লক্ষিন্দরের বিবাহ যাত্রার সময় জল মিষ্টি, লোহার কাটারি, আতপ চাল, পান সুপারি, কলা, প্রদীপ, তেল হলুদ, ধান দূর্বায় সুসজ্জিত বরণডালা মাথায় পাঁচ জন এয়ো প্রদক্ষিণ করেন এবং বরণ করেন। এক জনের মাথায় থাকে জলপূর্ণ কলস, তাতে সিদুর দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা, কলসের মধ্যে সিঁদুর ছোঁয়ানো আমের পঞ্চপল্লব। এই এয়োরা কিন্তু দলের অভিনেতা বা অভিনেত্রী নন, এরা গ্রামের বধূ। আবার বধূবরণের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার হয় পানপাতা, জলঘটি, মাটির সরা, ফুল, কলা, তৈল প্রদীপ, আতপ চাল ইত্যাদি। এইভাবে বাঙ্গালির পারিবারিক লোকাচারের যাবতীয় খুঁটিনাটি মনসাযাত্রার দীর্ঘ পালা জুড়ে বর্তমান।

লোক বিশ্বাসের মঞ্চায়ন – লোহার বাসর ঘর নির্মাণ সম্পূর্ণ করে বিশ্বকর্মা চাঁদের ভবনে ফিরে এলে চাঁদ তাকে বাবলা গাছের প্রেতনীর হাত থেকে বাঁচতে উত্তরের পথে ফিরতে নিষেধ করে। চাঁদের মত পৌরুষবান ব্যক্তির পক্ষে প্রেতনীর ভয় পাওয়ার মত অসংগত ঘটনা পালাকারদের সংযোজন। রাতের অন্ধকারে বাবলা গাছে প্রেতনী প্রসঙ্গে গ্রামবাংলায় প্রচলিত লোকবিশ্বাসের প্রভাব স্পষ্ট।

পটের গান ও পালাগান - মনসামঙ্গল কাব্য থেকে লোকসংস্কৃতির প্রতিগ্রহণের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য মনসা যাত্রাপালায় প্রবহমান। আবার লোকসংস্কৃতির আর এক ভিন্ন আঙ্গিকের সঙ্গেও এই পালাগানের যোগাযোগ দেখা যায়। বাংলার পটুয়ারা দাবি করেন, যে তাদের সৃষ্টি একেবারেই মৌলিক। মনসার পট ও পটের গানও এর ব্যতিক্রম নয়। আবার যাত্রাপালায় গানের বা সুরের উৎস বিভিন্ন হলেও কিছু অংশ এদের মৌলিক সংযোজনও বটে। তাই যাত্রাপালায় শিল্পীর মুখে এবং পটুয়া পাড়ায় পটকারদের মুখের গানের অংশ যেখানে হুবহু মিলে যায় সেখানে মনসাসংস্কৃতির প্রতিগ্রহণের ধারা লোকসংস্কৃতির এক

আঙ্গিক থেকে অপর আঙ্গিকে যে প্রভাব ফেলে তাও স্পষ্ট হয়। পদ্ম সরোবরে স্নানের সময় বেহুলার পায়ের জল ছদ্মবেশী মনসার গায়ে লাগলে মনসা তাকে অভিশাপ দেয়। 'আদি ত্রিধারা গীতিনাট্য সংস্থা'য় এই দৃশ্যে মনসার মুখে যে গান শোনা যায়, পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়ার পটকারেরা মনসার পটের উক্ত দৃশ্যের ছবি দেখিয়ে সেই একই গান করেন –

(ও তুই কেন এলি সরোবরে বেহুলা সুন্দরী) ২ বার

(ও তোর পায়ের জল মোর গায়ে পড়িল আমি বিষহরী) ২ বার

(ও তোর বাসর ঘরে মরবে পতি হবি কড়্যে রাঁড়ী) ২ বার

(রানী চিত্রকরের গাওয়া)

আবার নেতা আর বেহুলার কাপড় কাচা দৃশ্যেও যাত্রার গান আর পটের গানের মিল লক্ষ্যনীয় –

নেতা ধোপানী বসন কাচে খারে আর জলে

বেহুলা বসন কাচে ঐ না গঙ্গার জলে

নেতার বসন হইল্য কাচুড়্যার ফুল

বেহুলার কাচা বসন সূর্য সমতুল ...

(একাদশী গায়েন / আদি ত্রিধারা যাত্রা সংস্থা / ১২নং জালাবেরিয়া, জয়নগর, দঃ ২৪ পরগণা)

জলে জঙ্গলে পূর্ণ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাকৃতিক কারণেই সাপের উপদ্রব বেশি । সেই কারণেই সেই সব অঞ্চলে ভয় থেকে ভক্তির সূত্রে মনসাপূজার চলও বেশি। মনসাযাত্রাও কিন্তু লোকমনোরঞ্জনের জন্য কেবল সখের আয়োজন নয়। এই পালাগান গ্রামের সরল মানুষদের ভক্তির সঙ্গে যুক্ত। তাই দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মনসা শীতলা বনবিবি কেন্দ্রিক ত্রি-ধারায় সমন্বিত যাত্রার দল অন্যান্য জেলার থেকে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। আবার এই তিন দেবীর সংস্কার এই জেলার লোকজীবনেও অধিক ক্রিয়াশীল। আর তাই এখানে সারা বছরই এই তিন দেবী কেন্দ্রিক যাত্রার আয়োজন করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত গ্রামবাসী। তবে তিন দেবীর মধ্যেও মনসার প্রভাব যে লোকসমাজে অধিকতর, তা জানা যায় বিভিন্ন যাত্রাদলের কাছ থেকে। মধ্যবিত্ত পরিবারেও এই যাত্রার ব্যবস্থা হয়।

কোনো কোনো পরিবারের অতীতের দারিদ্র্য আর মা মনসার আশীর্বাদে অবস্থার উন্নতির কথা জানা যায়। প্রতি বছর মনসা পূজার পরের দিন বা দু এক দিন পর যাত্রার দলের আমন্ত্রণ জানিয়ে মনসা যাত্রার ব্যবস্থা করা হয় কোন কোন পরিবারে । আবার গ্রামের কিছু কিছু মনসামন্দিরেও বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন কোন মাঠ বা ফাঁকা জায়গায় আয়োজন করা হয় মনসাযাত্রার। হঠাৎ কোথাও সাপের উপদ্রব বেড়ে গেলে সেখানে মনসাপূজা ও মনসাযাত্রাপালার আয়োজন হয়। আবার যাত্রা পাঁচালীতে প্রচলিত মনসামঙ্গলের আখ্যান লোকমানসে এতটাই প্রভাব ফেলে যে অকালে সন্তান হারালে মা তার মনসাপূজা না করাকেই এই বিপর্যয়ের কারণ বলে মনে করেন এবং অপর সন্তানদের বিপন্মুক্ত জীবন কামনা করে তিনি বাড়িতে মনসা পূজা ও মনসার পালাগানের ব্যবস্থা করেন। এখানে যেন মঙ্গলকাব্যের সনেকার ভাবনা ওই মায়ের সংস্কারে বিশ্বাসে আচার আচরণে ক্রিয়াশীল। মনসার পালাগান বা মনসা যাত্রা মনসা সংস্কৃতির একটি প্রবহমান শিল্পরূপ, যা একদিকে বিবিধ লোকাচারে সম্পৃক্ত অন্যদিকে মনসামঙ্গল কাব্যের লোকজীবনে প্রতিগ্রহণের বিবিধ ধারায় সমন্বিত।

পালাকারদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনে উঠে আসা সুধার স্পর্শে কালনাগিনী যে সুধাদন্তের অধিকার পেয়েছিল, জোর করে তা তুলে নেয় মনসা এবং সেখানে ঢালে কালকূট বিষ। কারণ সুধাদন্তের কামড়ে লক্ষিন্দর অমর হয়ে যেত। কোন কোন দল কাঠের ডিঙ্গি বানিয়ে নিকটস্থ জলাশয়ে নিয়ে গিয়ে তার ওপর বেহুলা লক্ষিন্দরের ভাসান দেখান, সেই ভাসান পর্বের অভিনয় দেখতে মঞ্চ থেকে দর্শক ভিড় করে আসেন জলাশয়ের কাছে। তবে এরকম প্রদর্শন খুবই কম দেখা যায়। সাধারণত মঞ্চে দাঁড়িয়ে বেহুলা স্বামীর প্রতিরূপ কোন বস্তু হাতে নিয়ে ভেসে যাবার অভিনয় করেন। গ্রামে গঞ্জে ওঝা বা বৈদ্য কর্তৃক বিষ ঝাড়ার সময় মেয়েদের মাথার চুল খুলে রাখার যে প্রথা রয়েছে, সেই প্রথা অনুযায়ী মনসা যাত্রায়ও লক্ষিন্দরের বিষ তোলার সময় দলের পক্ষ থেকে উপস্থিত নারীদের চুল খুলে রাখার অনুরোধ করা হয় । মঞ্চে মনসা ঘট প্রতিষ্ঠা করে নতুন শাড়ি, ফল সহ পূজার যাবতীয় উপকরণাদি দিয়ে পূজা সম্পন্ন করা হয়। লোক প্রথা প্রত্যক্ষ প্রভাব রাখে পালাগানে। লোককথা, লোকাচার, লোকভাষা সর্বপরি লোকগানের

এক মস্ত বড় ভাণ্ডার মনসা সংস্কৃতির প্রতিগ্রহণের এই ধারায় ধরা আছে। লোক সাহিত্যের এক বৃহৎ চর্চার কেন্দ্র মনসাযাত্রার মত লোকযাত্রার বিস্তৃত ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ।

পুরাণ বা মঙ্গলকাব্য ব্যতিরেকে পালাকারদের স্বরচিত সংযোজিত 'নয়াবাজার পর্ব', 'গদাই পাচির বিয়ে' লোকসমাজে ভাসান পালাকে সর্বাধিক জনপ্রিয় করে তুলেছে। এক রাতের অনুষ্ঠানে কোন কোন দল ভাসান পালার শুরুতে জন্ম পালা থেকে মনসার জন্মবিবরণ খুব সংক্ষেপে পরিবেশন করেন। মনসাযাত্রার উপস্থাপন রীতি, ভাষা শৈলী, বহু বিচিত্র গানের ব্যবহার, মঞ্চে দৃশ্যায়িত লোকাচার ইত্যাদি সম্পর্কে উপরোক্ত বিশ্লেষণের দৃষ্টান্ত হিসাবে ভাসান পালার নির্বাচিত অংশের লেখ্যরূপ পরিশিষ্টে তুলে ধরা হল।

তথ্যসূত্র -

১) রামেশ্বর ভট্টাচার্য, শিবায়ন, শ্রী যোগিলাল হালদার সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃ.২১৫-২৪৪।

২) বেদ ব্যাস, শ্রী শ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটির, ২০১৮, পৃ.২১৩।

৩) বেদ ব্যাস, দেবীভাগবতম্, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৪১৮, পৃ.৯৭৯।

৪) কাশীরাম দাস, মহাভারত, শ্রী পূর্ণচন্দ্র শীল সম্পাদিত, অক্ষয় প্রেস, ১৩৩২ সাল,পৃ.৪৪।

৫) বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরান, শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, ২০০৯, পৃষ্ঠা ১৯৫।

৬) দ্বিজ বংশীদাস রায়, পদ্মাপুরাণ, শ্রী রামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স প্রকাশিত, বৈশাখ ১৩১৮, পৃষ্ঠা ৩৬০।

৭) জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, রত্নাবলী, ২০১০, পৃ.৮৩।

৮) বিপ্রদাস পিপলাই, মনসাবিজয়, মিহির চৌধুরী কামিল্যা সম্পাদিত, রাধাকৃষ্ণ প্রেস, জুলাই ২০১৬, পৃ.৯৬।

৯) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, অক্ষয় কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, ১৩৮৪, পৃ.১৩২।

তথ্যদাতা (পুরুষ)

১) নাম - সুব্রত সিংহ

বয়স – ২৮

পেশা – ‘মা দশভূজা সিংহবাহিনী গীতিনাট্য সংস্থা’ যাত্রাদলের অভিনেতা, এছাড়া চাষের কাজ করেন।

ঠিকানা – ধবলাট, প্রসাদপুর, সাগর ব্লক

২) নাম - রামপ্রসাদ নস্কর

বয়স – ৪০

পেশা – মনসার পাঁচালী ও যাত্রার পালাকার । ‘মা মনসা শীতলা যাত্রাসংস্থা’র দলমালিক। এছাড়া গাছ কাটার কাজ করেন।

ঠিকানা – গ্রাম- জলধাপা, পোঃ বনসুন্দরিয়া

৩) রাধাপদ রায়

বয়স – ৫৮

পেশা – মনসা, শীতলা, বনবিবির যাত্রা ও পাঁচালীকার, এছাড়া সবজির ব্যবসা করেন।

ঠিকানা – কাঁঠালবেরিয়া, পোঃ শঙ্করপুর, থানা – বারুইপুর

৪) নাম – নারায়ণ নস্কর

বয়স – ২৬

পেশা – মনসা যাত্রাদলের অভিনেতা, দিন মজুরের কাজও করেন।

ঠিকানা – গ্রাম- কেশবপুর, নস্করপাড়া, থানা – বারুইপুর

৫) পরিমল চক্রবর্তী

বয়স – ৫৮

পেশা- দক্ষিন চব্বিশ পরগণা শিল্পী সংসদের প্রাক্তন সম্পাদক, পাঁচালী, পালাগান, ইত্যাদি লোক সংস্কৃতির নানা ধারার সংগ্রাহক ও গবেষক। পাশাপাশি পৌরোহিত্যও করেন।

ঠিকানা – গ্রাম ও পোস্ট হোটোর, থানা মগরাহাট, দঃ ২৪ পরগণা।

৬) নাম - দিব্যেন্দু সরকার

বয়স – ১১

পেশা – আদি ত্রিধারা গীতি নাট্য সংস্থা (জয়নগর) দলের অভিনেতা

ঠিকানা – ১২ নং জালাবেরিয়া, জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

৭) খোকন মণ্ডল

বয়স – ৫৪

পেশা – আদি ত্রিধারা গীতি নাট্য সংস্থা (জয় নগর) দল মালিক, যন্ত্রী।

ঠিকানা – ১২ নং জালাবেরিয়া, জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

৮) অশোক সর্দার

বয়স - ৩২

পেশা - ইয়ামা বাজান, আদি ত্রিধারা গীতি নাট্য সংস্থা , জয়নগর।

ঠিকানা - ১২ নং জালাবেরিয়া, জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

৯) প্রবীর নস্কর

বয়স - ৫০

পেশা - অভিনেতা, আদি ত্রিধারা গীতি নাট্য সংস্থা , জয়নগর।

ঠিকানা - দেউল বাড়ি গ্রাম, কুলতলি থানা, দঃ চব্বিশ পরগণা।

১০) তুষার নস্কর

বয়স - ১২

পেশা - অভিনেতা, আদি ত্রিধারা গীতি নাট্য সংস্থা , জয়নগর।

ঠিকানা - জয়নগর, আঁটোসাঁট তলা, দঃ চব্বিশ পরগণা

১১) উৎপল নস্কর

বয়স - ২৫

পেশা - অভিনেতা, আদি ত্রিধারা গীতি নাট্য সংস্থা , জয়নগর।

ঠিকানা - গোপালগঞ্জ, কুলতলি থানা, ১২ নং জালাবেড়িয়া

১২) মুক্ত বৈদ্য

বয়স - ৩০

পেশা - অভিনেতা, আদি ত্রিধারা গীতি নাট্য সংস্থা , জয়নগর।

ঠিকানা - ১২ নং জালাবেরিয়া, জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

১৩) সত্য মণ্ডল

বয়স - ৩৫

পেশা - অভিনেতা, আদি ত্রিধারা গীতি নাট্য সংস্থা (জয়নগর), ভ্যান চালক।

ঠিকানা - দক্ষিণ বারাসাত, কেল্লা গ্রাম, দঃ চব্বিশ পরগণা

১৪) গয়ারাম সর্দার

বয়স - ৪৯

পেশা - দলমালিক, ডাবু শিব শক্তি ও ভাগ্য লক্ষ্মী অপেরা, এছাড়া চাষের কাজ করেন।

ঠিকানা - ডাবু, ক্যানিং, দঃ চব্বিশ পরগণা

১৫) অশোক সর্দার

বয়স - ৪৮

পেশা - অভিনয় (ডাবু শিব শক্তি ও ভাগ্য লক্ষ্মী অপেরা), চাষের কাজ।

ঠিকানা - ডাবু, ক্যানিং, দঃ চব্বিশ পরগণা

১৬) নবীন মাল

বয়স – ৩৫

পেশা - অভিনয় (ডাবু শিব শক্তি ও ভাগ্য লক্ষ্মী অপেরা), চাষের কাজ।

ঠিকানা – ডাবু, ক্যানিং, দঃ চব্বিশ পরগণা

১৭) গনেশ সর্দার

বয়স – ৪৮

পেশা - অভিনয় (ডাবু শিব শক্তি ও ভাগ্য লক্ষ্মী অপেরা), চাষের কাজ।

ঠিকানা – ডাবু, ক্যানিং, দঃ চব্বিশ পরগণা

১৮) পরিতোষ সর্দার

বয়স – ৪০

পেশা - অভিনয় (ডাবু শিব শক্তি ও ভাগ্য লক্ষ্মী অপেরা), চাষের কাজ।

ঠিকানা – ডাবু, ক্যানিং, দঃ চব্বিশ পরগণা

১৯) সুব্রত হাজারি

বয়স – ৪৫

পেশা – যন্ত্রী ও যাত্রার আলোক শিল্পী,(ডাবু শিব শক্তি ও ভাগ্য লক্ষ্মী অপেরা)।

ঠিকানা - ডাবু , ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগণা

২০) ভৃগুরাম সর্দার

বয়স – ৪৫

পেশা - অভিনয় (ডাবু শিব শক্তি ও ভাগ্য লক্ষ্মী অপেরা), চাষের কাজ।

ঠিকানা - ডাবু , ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগণা

২১) কেশব সাপুই

বয়স - ৪৮

পেশা - ইয়ামা বাদক,ডাবু শিব শক্তি ও ভাগ্য লক্ষ্মী অপেরা

ঠিকানা – বেলেখালি, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগণা

তথ্যদাতা (মহিলা)

২২) স্বপন মণ্ডল

বয়স – ৫০

পেশা – যাত্রা দলের মালিক, মা মনসা যাত্রা সংস্থা, জলধাপা, দঃ ২৪ পরগণা

ঠিকানা – মগরাহাট থানা, জলধাপা গ্রাম,দঃ ২৪ পরগণা

তথ্যদাতা মহিলা

১) নাম - কমলা সর্দার

বয়স – ৩০

পেশা – যাত্রাদলের অভিনেত্রী, এছাড়া চাষের কাজও করেন।

ঠিকানা – গ্রাম ডাবু, কানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

২) নাম - অর্চনা মাল

বয়স – ৩২

পেশা – যাত্রাদলের অভিনেত্রী, এছাড়া চাষের কাজও করেন।

ঠিকানা – গ্রাম ডাবু, কানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

৩) নাম – তাপসী নস্কর

বয়স – ১৬

ঠিকানা – কাশীনগর, থানা রায়দিঘী, দঃ ২৪ পরগণা

পেশা – যাত্রাদলের অভিনেত্রী

৪) একাদশী গায়েন

বয়স – ৪০

ঠিকানা - গ্রাম মধুসূদনপুর, জয়নগর, দঃ ২৪ পরগণা

পেশা – যাত্রাদলের অভিনেত্রী

৫) মৌসুমি সর্দার

বয়স – ৪৫

পেশা – অভিনয় (ডাবু শিব শক্তি ও ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরা), এছাড়া চাষের কাজ

ঠিকানা – ডাবু, ক্যানিং দঃ ২৪ পরগণা

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা নাটকে মনসা কাহিনির ব্যবহার

দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণ। আর মনসামঙ্গল কাব্যের মূল অবলম্বন চাঁদ মনসার দ্বন্দ্ব। স্বাভাবিকভাবেই সর্বাধিক জনপ্রিয় এই মঙ্গলকাব্যের কাহিনি সাহিত্যের অন্যান্য রূপের পাশাপাশি নাটকেও ব্যবহৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মাইলস্টোন শম্ভু মিত্রের চাঁদ বণিকের পালা। অনেক গবেষণা পত্রে এবং বহু বিদগ্ধ জন কর্তৃক বহু আলোচিত, বিশ্লেষিত হওয়ায় এই নাটকটি আর এ পর্বের নির্বাচিত নাটকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করছি না। নিম্নলিখিত নাটকগুলি অবলম্বনে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মনসামঙ্গলের প্রতিগ্রহণ তথা বিনির্মাণের ধারাটির পর্যালোচনা করা হবে -

- বেহুলা - হরনাথ বসু (১৯১০)
- চাঁদ সদাগর - মন্মথ রায় (১৯২৭)
- চাঁদ সদাগর(বেহুলা) - পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩০)
- মনসামঙ্গল - তারাশঙ্কর মুখার্জী (১৯৫৯)
- সওদাগরের নৌকা - অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৯)
- মনসাকথা - শেখর দেবরায় (২০০২)
- মনসামঙ্গল - উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় (২০১৮)

হরনাথ বসুর *বেহুলা* নাটক দলতন্ত্রের অবসানে কল্যাণী চেতনার এক জয়গাঁথা । ১৯১০ এ প্রকাশিত নাটক হরনাথ বসুর *বেহুলা* । সম্ভবত মনসামঙ্গল অবলম্বনে লেখা প্রথম নাটক এটি। নাট্যকারের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অভিনব মনন নাটকটিতে প্রকাশিত হয়। মঙ্গলকাব্যের চাঁদ মনসার সংঘাতকে আর্য অনার্যের তথা শিব শক্তির সংঘাতের প্রতীকী রূপে উপস্থাপনা করা হয় এ নাটকে। মনসা এ নাটকে মঙ্গলকাব্যের আদলে নয় পুরাণের আদলে নির্মিত দেবী। পাশাপাশি নাট্যকারের স্বকীয় কল্পনায় বেশ কিছু চরিত্র এবং ঘটনা যুক্ত হয়েছে নাটকটিতে, যা মনসামঙ্গলকে ছাপিয়ে একেবারে স্বতন্ত্র প্রতিবেশ গঠন

করলেও সামগ্রিকভাবে মূল কাহিনি ধারার সঙ্গে সুসামঞ্জস্য স্থাপন করেছে। বেহুলাকে এখানে বাঙালী নারীমাত্রেরই আদর্শ রূপে তুলে ধরা হয়েছে কেবলই তার সতীত্বের জন্য নয় উপরন্তু বীরাঙ্গনা বেহুলার স্নেহে মমতায় সহিষ্ণুতায় ক্ষমায় ঔদার্যে, সমগ্র জগতের প্রতি এক কল্যাণী চেতনায়।

মঙ্গলকাব্য দেবী বা দেবতার মাহাত্ম্যসূচক আখ্যান। ধর্মের টানে জাতিকে রক্ষা করার জন্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুকৌশলের অবলম্বন ছিল মধ্যযুগের বিস্তৃত পরিসরে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলি। ফলস্বরূপ গ্রন্থগুলির সাথে এক এমন এক লৌকিক বিশ্বাস তথা সংস্কার লোকসমাজে ক্রিয়াশীল হয় যে, এ আখ্যান পড়লে, শুনলে এমনকি ঘরে রাখলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। বলা বাহুল্য এই আখ্যানগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছিল মনসামঙ্গল। বিশ শতকের প্রথম দশকে হরনাথ বসু যখন মনসামঙ্গলের কাহিনি অবলম্বনে *বেহুলা* লিখলেন, মঙ্গলকাব্যের পাতায় আঁকা, যুগের প্রয়োজনে দেবীর অবক্ষয়িত রূপটি কিন্তু গ্রহণ করতে পারলেন না। নাটকের ভূমিকায় স্পষ্ট জানালেন, মহিমা এ দেবীকে খুঁজেছিল, দেবী মহিমাকে নয়। ইনি পুরাণের মনসা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যার আরাধনা করেছিলেন। জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ কালে নিজ পুত্র আস্তিকের মাধ্যমে দেবকুল ও নাগকুলকে রক্ষা করেছিলেন। এই মনসা শক্তি রূপিণী অম্বিকার সহচরী। উল্লেখ্য ২০১৮ - ২০১৯ এ কালার্স বাংলার মনসা ধারাবাহিকে মনসাকে দেবী চণ্ডীর শক্তির প্রকাশ রূপেই তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি শুম্ভ নিশুম্ভ বধ, রক্তবীজ সংহারের মত পৌরাণিক কাহিনিতেও দেবী চণ্ডীর শক্তির অঙ্গ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে মনসা। হরনাথ বসুর নাটকে বেহুলার মাধ্যমের অজ্ঞ নরকুলের কাছে শক্তি তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে। একই মহাশক্তির ভিন্ন প্রকাশ মনসা ও বেহুলা, এ তত্ত্ব শতাধিক বছর পূর্বেকার নাটকে যেমন ছিল, তেমনই একুশ শতকের ধারাবাহিকেও দুর্গা মনসার অভেদ তত্ত্ব রূপায়িত হয়েছে। আবার লোকসংস্কৃতির আঙিনায় পূজা পার্বণ উৎসবে মনসা চণ্ডী মিলেমিশে গেছে। এই সাংস্কৃতিক সমন্বয় বাঙালির চেতনায় মনসার দৃঢ় অবস্থানের নিরিখে গভীর তাৎপর্যবাহী।

মনসামঙ্গলের কাহিনিকে যে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রতিস্থাপিত করেছেন নাট্যকার তা এই রূপ - এ নাটকে নাগ অর্থে সাপ নয় এক অনার্য জাতিবিশেষ। নাগকন্যা মনিয়া এখানে

মঙ্গলকাব্যের মনসার প্রতিভূ। ছোটবেলায় হারিয়ে যাওয়া অনার্য মেয়েটি গুরুর শিক্ষায় সুশিক্ষিত, মার্জিত, সংযত উদার হয়ে ওঠে এবং নিজ গুণে মণিভদ্রা নামে নাগকুলের অধিশ্বরী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বণিক শ্রেষ্ঠ চন্দ্রধর একনিষ্ঠ শৈব এবং প্রবল নাগবিদ্বেষী। নাগেরা তার কাছে অস্পৃশ্য এবং ঘৃণ্য। ফলে তাদের ধ্বংস করতে সে সর্বদা উদ্যত। অপরপক্ষে চন্দ্রধরের এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তি দিতে তৈরি হয় মনসার সেবিকা মণিভদ্রা। চন্দ্রনাথের মন্দির ধ্বংস করে তার অটল দম্ভ চূর্ণ করতে চায় সে। বন্দী চন্দ্রধর পুত্র লক্ষীন্দ্রের প্রতি মণিভদ্রা প্রনয়াসক্ত হলে ঘটনাস্রোত ভিন্ন বাঁক নেয়। চম্পাবাসী চরম অপমান করলেও মণিভদ্রা লক্ষীন্দ্রের অনুরোধে তাকে কোনরূপ শাস্তি না দিয়েই ছেড়ে দেয়। কিন্ত অনার্য অস্পৃশ্যা বলে লক্ষীন্দ্র তাকে প্রত্যাখ্যান করলে তার সংযমের বাঁধ ভাঙে। তার শিক্ষা, উদারতা হারিয়ে যায় অপমানের প্রতিশোধ স্পৃহার চরম গভীরতায়। এতদিন পর্যন্ত চাঁদ বণিক যেভাবে নির্বিচারে নাগকুল ধ্বংস করার নিজের কাছে করা প্রতিজ্ঞা পালন করছিলেন, এবার সেভাবেই নরবলির আয়োজন করে আর্যদের শেষ করার নেশায় উন্মত্ত হয় মণিভদ্রা। এভাবেই বেহুলা লক্ষিন্দরের সঙ্গে মণিভদ্রাকে জুড়ে হরনাথ বসু ত্রিকোণ প্রেমের অভিনব কাহিনি নির্মাণ করেছেন নাটকে। সেইসঙ্গে মণিভদ্রা আর চাঁদ বণিকের সংঘাতে আর্য অনার্য সংঘাতকে তুলে ধরা হয়েছে মনসামঙ্গলের প্রেক্ষাপটে।

এই সংঘাত কেবল সমাজের উচ্চ শিখরের দুই ব্যক্তি কেন্দ্রিক ছিল না, সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যেও একই ভাবে এই বিভাজন কার্যকরী ছিল। মণিভদ্রা সৈন্যদের হাতে বন্দী চম্পাবাসী যেভাবে তাকে ডাকিনী, দানবী, প্রেতনি, অসভ্য, বর্বর, শয়তানি ইত্যাদি সম্বোধনে অপমান করেছে, তাদের পোশাক আচার আচরণ নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে, তাতে সাধারণ মানুষের মনে অনার্যের প্রতি প্রবল ঘৃণার চরম প্রকাশ দেখা যায়। চন্দ্রধরের একান্ত অনুগত ভৃত্য নেড়া প্রভুর জীবনে বিপর্যয়ের জন্য সাপের দেবী মনসার অপর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হলেও জীবন বাঁচাতে তাকে বশ করার মন্ত্র শিখতে চায়। আবার চম্পা নগরের জনৈক বৃদ্ধ ও তার পৌত্র জনার্দনের কথোপকথনে স্পষ্ট হয় অনার্য নাগেদের সম্পর্কে ভীতি তথা বিদ্রোহ। যারা তাদের ইষ্টদেবতা চন্দ্রনাথের মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চায়, অন্ধ বৃদ্ধের মন বার বার চায় তাদের বিরুদ্ধে তরবারি তুলতে, তাদের উপযুক্ত শাস্তি

দিতে। নাটকের শেষে অবশ্য আর্য অনার্যের সমন্বয় ঘটলে নাগদের কাঁধে চেপেই জনার্দন শক্তিরূপিণী বেহুলার দর্শন করতে গাঙ্গুরের ঘাটে যায়। এভাবেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের এক চিরায়িত রূপ এবং সাধারণ জনসমাজে তার ভয়াবহ প্রভাব, প্রাণনাশের ভয়ে সাধারণ মানুষের দল বদলের চেনা ছবি ও জাতি ধর্ম বা দল নির্বিশেষে মানবসমাজের কাঙ্ক্ষিত সমন্বয়ের রূপ মনসামঙ্গলের প্রেক্ষিতে তুলে ধরেন নাট্যকার।

বেহুলা নাটকে প্রতিষ্ঠিত মনসা আর বেহুলার অভেদতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি নারীর শক্তিমত্তা ও কল্যাণী চেতনার সঙ্গে যুক্ত। দেবকুল হোক বা মানবকুল সতীত্বে দুই নারীই এক। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবীভাগবত পুরাণে মনসার জীবনের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে সেখানে দেখা যায়, স্বামীর কল্যাণ চিন্তায় নিজের বিপদ হবে জেনেও মনসা নিদ্রিত স্বামীকে জাগিয়েছিল। পরিণামে পেয়েছিল আজীবনের একাকীত্ব। এখানেই হরনাথ বসু মনসাকে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা রূপে তুলে ধরে তারই আলোকে বেহুলাকে আলোকিত করেছেন। স্বামীকে হারিয়ে মনসা তার পুত্রকে সুশিক্ষিত করে তোলেন। মায়ের নির্দেশেই আস্তিক জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের নিবারণ করে দেবকুল ও নাগকুলকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। *বেহুলা* নাটকে বেহুলাও চন্দ্রধরের হাতে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বালক মরিয়ম প্রভৃতি নাগ বংশোদ্ভূত অনার্যদের মাতৃস্নেহে রক্ষা করে। এখানেই নারীর স্বাভাবিক মাতৃত্ববোধে, সামগ্রিক কল্যাণ চেতনায় পুরাণের মনসা আর নাটকের বেহুলা মিলেমিশে যায়।

বেহুলা নাটকের ভূমিকা অংশে নাট্যকার মনসামঙ্গলের প্রতি তার যে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন সেখানে পুরাণ ও মহাভারতের প্রভাবের উল্লেখ পাই। মহাভারতের জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ আর নাটকের চন্দ্রধরের নাগজাতি ধ্বংস করার প্রয়াস - দুটি সমান্তরাল ঘটনা। আবার আস্তিকের মধ্যস্থতায় জনমেজয়ের কঠিন সংকল্প ত্যাগ - এই ঘটনার প্রতীকী রূপেই বেহুলা নাটকে আস্তিকের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। নাটকে আস্তিক শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া মনিয়াকে সাহিত্য অলংকার রাজনীতি শিখিয়েছে। আদরে স্নেহে মমতায় নাগকন্যাকে তাদের কুলস্বভাব ভুলিয়ে সুসভ্য মার্জিত করে তুলেছে। তাকে জ্ঞান গৌরব মহত্ত্ব উদারতা ধর্মবৃত্তি সমাজবন্ধনের সুশিক্ষা দিয়ে প্রতিষ্ঠা তথা উত্তরণের

পথ দেখিয়েছে সে। প্রেমে অচরিতার্থ হয়ে প্রতিহিংসার পথে পা বাড়ালে সে পথ থেকে তাকে ফেরাতে সচেষ্ট হয়েছে। আবার নাটকের পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে মাতৃ শক্তির মহত্ত্ব তথা শিব শক্তির অভেদ তত্ত্ব সত্যের আলোকে চাঁদের সামনে তুলে ধরে পুরাণ ও মহাভারতের সমন্বয়বাদীর ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করেছে।

মনসামঙ্গলের মূল কাহিনিতে বিবাদের অবসানে চাঁদের মনসা পূজার যে চেনা ছবি রয়েছে, তা এ নাটকে পাই না। এখানে চাঁদের অন্তঃচেতনার বিবর্তন ঘটে দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। প্রথমত, কালিদহে প্রবল ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত অবস্থায় মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে সে বাঁচার জন্য শবদেহকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়। এখানেই তার প্রথম ও প্রধান মানস বিবর্তন ঘটে। জগতে কোনো কিছুই উপেক্ষণীয় নয় এই বোধের উদয় হলে অনার্য তথা নাগদের প্রতি অমানবিক আচরণের জন্য অনুতপ্ত হয় সে। জগতে কেবল শিবই সত্য - চন্দ্রধরের সারা জীবনের এই অটল বিশ্বাস দ্বিধার সম্মুখীন হয় এবং ভেঙে পড়ে। উপেক্ষিতা মণিভদ্রার প্রতি স্নেহাদ্র হয় তার অন্তর। বিশ্বের কোন জীবকে অবেলা করেই যে বিশ্বপতি শিবের সেবা সফল হতে পারে না নিজ জীবন অভিজ্ঞতায় সে সত্য পরিস্ফুট হয় চন্দ্রধর বণিকের চেতনায়। অভিনব প্রেক্ষিতে চাঁদের এই মানস বিবর্তনের দৃশ্যে পরিস্ফুট হয় ট্রাজেডি প্রসঙ্গে অ্যারিস্টেটল কথিত *purguation of imotions* এর তত্ত্ব। চাঁদের সঙ্গে ভাবমোক্ষণ বা চিত্তশুদ্ধি ঘটে দর্শকেরও। কালিদহে উন্মত্ত ঝড় ঝঞ্ঝার কবল থেকে শবদেহ আশ্রয় করে বেঁচে ফেরার অভিজ্ঞতা তার জ্ঞানচক্ষুর উদ্বোধন ঘটায়, তার সারাজীবনের অটল সংস্কারের প্রাচীর টলে যায়। এতদিন যাকে অস্পৃশ্যা বলে ঘৃণা করত, সেই মণিভদ্রাই চন্দ্রধরের চোখে দেবী বলে প্রতিভাত হয়। এভাবেই মনসামঙ্গলের এক অভিনব ভাষ্য রচিত হয় *বেহুলা* নাটকে।

দ্বিতীয়ত, গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে চলা বেহুলার অটুট পতিভক্তি যা চন্দ্রধরের কাছে অলৌকিক শক্তিমত্তার প্রকাশ বলে মনে হয়। যে মণিভদ্রা লক্ষ্মীন্দ্রের মৃত্যুর কারণ, তাকেই বেহুলা প্রতিশ্রুতি দেয় স্বামী প্রাণ ফিরে পেলে স্বামীর কাছে সে অনুরোধ করবে সে যেন মণিভদ্রাকে তার হৃদয়ে স্থান দেয়। বেহুলার এই মহত্ত্ব, এই আত্মত্যাগ, শুভবোধ চন্দ্রধরের কাছে মাতৃশক্তির প্রতি অপার নির্ভরশীলতার কারণ স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। পাশাপাশি বেহুলার

অনন্ত করুণা মণিভদ্রার প্রতিহিংসাপরায়ণ হৃদয়কেও বদলে দেয়। নিজের কৃতকর্মের জন্য চরম অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে সে তার আরাধ্যা দেবীর কাছে লক্ষীন্দ্রের প্রাণ ভিক্ষা চায়। বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রধরের মানসপটে শিবের সঙ্গে শক্তির মাহাত্ম্য স্থাপিত হয়।

এ নাটক মনসার মঙ্গল গাঁথা নয়, বরং বেহুলার মঙ্গল আখ্যান, যে বেহুলার মত নারী কল্যাণী তো বটেই সেই সঙ্গে বুদ্ধিমতী এবং নির্ভীক। ছদ্মবেশী বেহুলা দুর্গম দুরারোহ পথে পার্বত্য খাদের ওপর দিয়ে দড়ি বেয়ে উঠে যেভাবে নাগপর্বতে বন্দী লক্ষীন্দ্রকে উদ্ধার করে, তাতে তার সাহসিকতা বুদ্ধিমত্তা তথা বীরত্ব এক অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছে মঙ্গলকাব্যের কাহিনিতে। হরনাথ বসু তার নাটকটি উৎসর্গ করেন বঙ্গবধূদের উদ্দেশ্যে। মঙ্গলকাব্য বাঙালির নিজস্ব সম্পদ আর বেহুলা বাংলার ঘরের মেয়ে। নাটকে বেহুলার জীবনের মূল মন্ত্র আর্তের সেবা তথা সকল জীবে প্রেম। সেই প্রেমই পতিপ্রেমকে অবলম্বন করে অসাধ্য সাধন করে। অম্বিকা, মনসা, বেহুলা থেকে সাধারণ বঙ্গনারী সকলেই একাকার মহাশক্তির প্রকাশ রূপে। এই কল্যাণী চেতনা বাংলার নারীদের মাধ্যমে জগতের মঙ্গল করুক, এই বার্তাই নাট্যকার দিতে চেয়েছেন নাটকটির মাধ্যমে। শুভবোধের জাগরণে মানবতার আর্তি নাটকে যেভাবে অসাম্য, বিভেদের অবসান ঘটিয়েছে, শতাব্দী পেরিয়ে আজকের সমাজেও তা সমানভাবে কাঙ্ক্ষিত।

আবার আর্য অনার্যের সংঘাতের অবসান হয় মানবিক শুভবুদ্ধির উদ্বোধনে। নাটকের শেষে লক্ষীন্দ্রের সঙ্গে চন্দ্রধর তার আরেক পুত্রকেও ফিরে পায়, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বন্দী করলেও মণিভদ্রা মমতায় যাকে মারতে পারে নি। চম্পাবাসী বৃদ্ধ ও তার পৌত্র জনার্দন মাতৃ আরাধনায় একসাথে চলে নাগেদের সঙ্গে। সাধারণ মানুষের মনেও ভেদাভেদের প্রাচীর ভাঙে। এভাবেই মনসামঙ্গলের প্রেক্ষাপটে সমাজের কাঙ্ক্ষিত সাম্যের রূপরেখা এঁকেছেন নাট্যকার।

হরনাথ বসুর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি এ নাটকে বেশ কিছু মৌলিক অংশ জুড়ে দিয়েছে, যা মনসামঙ্গলে ছিল না। প্রতিটি মৌলিক সংযোজনই মূল কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতি বজায়

রেখেছে সেই সঙ্গে সমাজ জীবনের কিছু চিরন্তন সত্যকে তুলে ধরেছে। ঘটক ও ভট্টাচার্য সমাজের সেইসব স্বার্থপর মুনাফা লোভী মেরুদণ্ডহীন শ্রেণির প্রতিনিধি যারা নিজেদের ভৈরবী সিদ্ধ ইত্যাদি তকমা দিয়ে তাবিজ কবচ দিয়ে মানুষের জীবন চক্র বদলে দেবার দায়িত্ব নেয় এবং মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বোকা বানিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করে। অর্থবানদের ফাঁদে ফেলতে পারলে মুনাফাও বড় অঙ্কের হয়। নাটকে এদের লক্ষ্য ছিল বেহুলার পিতা সাধু বণিক। নেড়া আর বিন্দির প্রবল ঝগড়া অশান্তির মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা নিম্নবিত্তের গার্হস্থ্য জীবনকে সামনে আনে। আবার যে প্রৌঢ় পুরোহিতের দায়িত্বে নিজের স্ত্রীকে রেখে নেড়া মনিবকে খুঁজতে যায়, সেই পুরোহিতই বিন্দিকে প্রণয় প্রস্তাব দিয়ে বসে। মুনাফালোভী ভণ্ড পুরোহিত দক্ষিণা ভালো না দিলে পূজার ফল পাওয়া যায় না, একথা বলে পূজা পাঠের আগেই নেড়ার কাছ থেকে তার স্ত্রীর জন্য কেনা সখের মুক্ত আদায় করে। সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা সম্মানের সুযোগে এই পুরোহিতের মত দুশ্চরিত্র লোকেদের নৈতিক অধঃপতন, মূল্যবোধের অবক্ষয় তথা ধর্মের নামে ভণ্ডামির যথার্থ উদাহরণ উঠে আসে নাটকে। ভোজনরসিক নেড়া প্রচুর ফল খাওয়ার লোভে শিবরাত্রির উপবাস করতে চায়, কিন্তু খিদের জ্বালায় সে উপবাস ভাঙতে বাধ্য হয়, আবার এই নেড়াই দিনের পর দিন না খেয়ে মনিবের খোঁজ পাওয়ার জন্য ঘুরে বেড়ায়। ছোট থেকে নিজের হাতে লালিত লক্ষ্মীন্দ্রের সর্প দংশনে মৃত্যুর পর নেড়ার ইচ্ছে করে সাপের দেবীকে শেষ করে দিতে। নেড়ার উত্তম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ মিশ্রিত দুর্বল ভাষারীতি, ধর্মভীরু স্বভাব, আস্তিকস্য মুনের্মাতা ... ইত্যাদি মন্ত্রের বিকৃত উচ্চারণ "আস্তাকুঁড়ে মোনার মাতা ভাঙ্গা বাঁশে যথা তথা / জ্বর বিকারে পেত্নী পেলে মনসার পায়ে গরুড় গরুড়", নাটকে তাকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছে। পাশাপাশি তার প্রভুভক্তি, মনিব পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল হৃদয়, মনসার প্রতি ভক্তিহীন মন্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতা, সব মিলিয়ে ক্ষমতাবানের লড়াইয়ের মাঝে সাধারণ মানুষের বাঁচার আকুতির মত আবহমান সত্যকে তুলে ধরেছে নেড়ার মত চরিত্র।

মনসামঙ্গলের কাহিনির প্রেক্ষাপটে এ নাটকের কাহিনি চাঁদের মানস বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সমাজে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাকে অবলম্বন করে বিবর্তিত হয়েছে। চাঁদ মনসার সরাসরি বিবাদ এখানে নেই তাই মণিভদ্রা, বেহুলা, লক্ষ্মীন্দ্র, চাঁদ, আস্তিক এরাই নাটকের মুখ্য

চরিত্র রূপে কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, আর মরিয়ম, নেড়া চম্পাবাসী বৃদ্ধ ও তার পৌত্র, ঘটক ভট্টাচার্য এরা উপস্থাপিত হয়েছে গৌণ চরিত্র হিসেবে। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করায় চরিত্রে ভিন্ন ভিন্ন বাকরীতির ব্যবহার সংলাপকে করেছে জীবন্ত। মঙ্গলকাব্য থেকে বেরিয়ে এসে কোথাও অরণ্যচারী, কোথাও বিত্তশীল, কোথাও বা নিম্নবিত্তের যাপনকে তুলে ধরা হয়েছে বাস্তবসম্মত পরিবেশ অবলম্বনে। চাঁদ আর মণিভদ্রা এই দুই প্রতিপক্ষকে কেন্দ্র করে আর্য অনার্যের যে সংঘাত তা সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যেও সমান ভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। চম্পাবাসীরা এই ভেদবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েই মণিভদ্রাকে চরম অপমান করে। আবার ধর্মীয় সংঘাতের প্রেক্ষাপটে অন্ধ বৃদ্ধ চন্দ্রনাথের মন্দির ভাঙার প্রতিক্রিয়ায় মণিভদ্রাকে মারতে অস্ত্র তুলে নিতে চায়। পাশাপাশি বেহুলা সকল ভেদবুদ্ধির বাইরে সমগ্র বিশ্বের প্রতি এক কল্যাণী চেতনা থেকে নাগ বালক মরিয়ম সহ নাগ বংশোদ্ভূত অনার্যদের রক্ষা করে। এভাবেই হরনাথ বসুর *বেহুলা* নাটকে মঙ্গলকাব্যের প্রেক্ষাপটে নাটকীয় উপাদানগুলির যথাযথ প্রয়োগ ঘটেছে।

রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য এক মাসেরও কম সময়ে মন্মথ রায় *চাঁদ সদাগর* নাটকটি লেখেন। আর্ট থিয়েটার পরিচালিত মনমোহন থিয়েটারে ১৯২৭ এর ১৪ই সেপ্টেম্বর নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। অস্তিত্বের সঙ্কটে জর্জরিত মানুষের অসহায়তা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, নিরুপায় হিংস্রতা, অপরাধবোধ, হীনমন্যতা, স্নেহ, করুণা সব মিলিয়ে এ নাটকের মনসা সাধারণভাবে মনসামঙ্গল কাব্য ধারার দেবী চরিত্রের থেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র। অন্ধ সংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ চাঁদের উগ্র পৌরুষও মনসামঙ্গলের চেনা ছকের বাইরে এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। পাশাপাশি বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহকে কেন্দ্র করে যুক্ত হয়েছে এক নতুন আখ্যান, যা সরাসরি প্রভাবিত করেছে পরবর্তীকালে মনসামঙ্গল কেন্দ্রিক নির্মিত চলচ্চিত্রকে।

মন্মথ রায়ের চাঁদ সদাগর নাটকে দম্ভের জড়ত্ব কাটিয়ে আত্মনিবেদনেই মুক্তির পথ দেখানো হয়েছে। মনসামঙ্গলের এক অভিনব ভাষ্য তুলে ধরেছেন নাট্যকার মন্মথ রায় তার *চাঁদ সদাগর* নাটকে। নাটকে, *অহঙ্কার পতনের মূল* -মানব জীবনের এই চরম সত্য নিজ জীবনে ধারণ করেছেন চাঁদ বণিক। আত্মম্ভরিতা এবং সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত

মানুষের জীবনে স্বাভাবিক ভাবেই নেমে আসে একের পর এক বিপর্যয়। শেষ অবধি ব্রহ্মজ্ঞানের জাগরণ হলে অপসৃত হয় অজ্ঞানতার অন্ধকার। পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন তথা যথার্থ ভক্তির মধ্যে সে খুঁজে পায় শান্তির সন্ধান। মানবজীবনের এই সাধারণ সত্যের রূপকেই মন্মথ রায় মনসামঙ্গল কাব্যের নাট্যরূপ নির্মাণ করেছেন।

মনসামঙ্গল কাব্যধারায় মনসার অস্তিত্বের সঙ্কটের কথা আছে। তার প্রতিটি হিংস্র পদক্ষেপের প্রেক্ষাপটে এই সঙ্কটের অবস্থান সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মনসামঙ্গলের সাহিত্যিক বিনির্মাণে এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ গড়ে উঠেছে। শম্ভু মিত্রের *চাঁদ বণিকের পালায়* হিংস্র মনসা সমাজের ভয়াবহ অন্ধকার রূপে প্রতিভাত হয়েছে, সেখানে মনসার জীবনের বঞ্চনার আদৌ কোনও স্থান নেই। আবার রূপক সাহা *তরিতাপুরাণ* উপন্যাসে এ যুগের মনসা, ভাগ্যবিড়ম্বিত তরিতাকেই শিক্ষা, একাগ্রতা, মেধা মনন, দিয়ে নিজের ভাগ্য জয়ের কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল করে এঁকেছেন। চাঁদ সদাগর নাটকে মন্মথ রায় মনসা চরিত্রটিকে করুণার প্রতিমূর্তি করেই গড়ে তুলেছেন। তার যাবতীয় অন্যায়, যাবতীয় হিংস্রতা, সব যেন নিষ্ঠুর নিয়তির পরিণাম। এ নাটকের পরতে পরতে রয়েছে মনসার প্রতিশোধস্পৃহার প্রেক্ষাপট।

মন্মথ রায়ের *চাঁদ সদাগর* নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই আস্তিকের প্রশ্নের উত্তরে মনসার সংলাপে উঠে আসে তার ভাগ্য বিড়ম্বিত অভিশপ্ত জীবনের কথা। যেখানে সে মাতৃগর্ভ বঞ্চিতা, বিমাতার অত্যাচারে নির্যাতিতা। গর্ভাবস্থায় স্বামীসঙ্গ হারানোর অসহায়তা, দেবকন্যা হয়েও দেবী না হওয়ার অমর্যাদার যন্ত্রণা ব্যক্ত করছে সন্তানের কাছে। অভিশপ্ত জীবনের বিরুদ্ধে, পিতার বিরুদ্ধে, স্বামীর বিরুদ্ধে, নিজের জন্মের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে তৎপর হয় সে। ফলে কেবল পূজা প্রার্থনার কারণেই যখন মহাজ্ঞানে বলীয়ান চাঁদ সৈন্য সামন্ত নিয়ে মনসার বিরুদ্ধে যুদ্ধে এগিয়ে আসে, তখন মনসা আত্মরক্ষার্থে কূটকৌশলে মহাজ্ঞান হরণে এক প্রকার বাধ্য হয়। আবার দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে চাঁদ পৃথিবী জুড়ে মনসার পূজাঘট পদলাঞ্ছিত করার অপযশ প্রচার করতে করতে হাজির হয় চন্দ্রকেতুর রাজ্যের সামনে। এই রাজ্যেই একমাত্র মনসার পূজা প্রচলিত ছিল। সুতরাং চাঁদের প্রভাবে যদি সে পূজাও বন্ধ হয় তাহলে মনসা সম্পূর্ণভাবে মানবসমাজে বহিষ্কৃতা হবেন। মনসা

চাঁদের বাণিজ্য তরীর সামনে পাষাণস্তুপ তৈরি করেন। চাঁদ কামান দিয়ে সে পাষাণ ধ্বংস করেন। এই পরাজয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আস্তিক আর মনসার মনে হয়েছে, তাদের অভিশপ্ত জীবন অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। কিন্তু দেবকন্যা হওয়ায় মনসার মৃত্যু নেই। মনসার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, একের পর এক অবমাননায় জীবনের প্রতি চরম ক্লান্তির বহিঃপ্রকাশ মঙ্গলকাব্যের চেনা ছকের বাইরে সাধারণ মানুষের বিপর্যস্ত জীবনের হাহাকারকে তুলে ধরে নাটকে।

চাঁদকে কোনও ভাবেই চন্দ্রকেতুর কাছে পৌঁছতে দেওয়া যাবে না, সুতরাং নেতার পরামর্শে কালিদহে মনসা সৃষ্টি করেন ভয়ঙ্কর তুফান। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে চাঁদের বাণিজ্য তরীর ভরাডুবি, সেই সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয় চাঁদ। এই সময় মনসার সংলাপটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যেখানে মনসা বলছেন তার পূজার দরকার নেই, চাঁদকে বাঁচাতেই হবে। যে মানব তার নামে বার বার থুৎকার করে, বাধ্য হয়ে তার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করলেও, এ নাটকের মনসা কিন্তু মনসামঙ্গলের দেবীর মত তাকে নিজ স্বার্থে বাঁচায় নি, বরং তার দ্বারা চাঁদ বিপর্যস্ত হয়েছে, এই গ্লানি তাকে অত্যন্ত পীড়িত করেছে। এ যেন সন্তানের সমাদরে বঞ্চিত এক অতৃপ্ত মাতৃহৃদয়, বাধ্য হয়ে শাস্তি দিলেও যে মা স্নেহে মমতায় সন্তানের ব্যাথায় আকুল হয়েছে।

একই ভাবে কালু সর্দারকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে গিয়ে বিবেকদংশন তথা আত্মগ্লানির যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন মনসা। বিবাহ রাত্রে স্বামীকে হারিয়ে নিদারুণ কষ্টে বেহুলা যখন মৃত লক্ষিন্দরকে নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে চলেছে, তার খিদে তেষ্টা, পথের নানা প্রতিকূলতা, সব মিলিয়ে তার যন্ত্রণার প্রতিটি স্তর মনসার হৃদয়ে অনুশোচনার জ্বালাকে তীব্র করেছে। তাই স্বর্গসভায় বেহুলার নাচে দেবগণ খুশি হলেও তার মনবাঞ্ছা পূরণে এগিয়ে আসে মনসা। সেখানেও মনসামঙ্গলের দেবীর মত সে চাঁদ কর্তৃক নিজ পূজা আদায়ের শর্ত দেয়নি, বরং চাঁদ পূজা না করলেও তিনি যে বেহুলার দুঃখ দূর করবেন তা ব্যক্ত করেন এবং লক্ষিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেন। এভাবেই চাঁদ সদাগর নাটকে মন্মথ রায়ের স্বতন্ত্র ভাবনায় মঙ্গলকাব্যের ক্রূর মনসা স্নেহে করুণায় বঞ্চনায় গ্লানিতে এক কোমলহৃদয়া মায়ের রূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

চাঁদ মনসার বিবাদই মনসামঙ্গলের মূল বিষয়। চাঁদ শৈব। সে তার ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তিতে অচল, তাই অন্য কারো ভক্ত সে কিছুতেই হবে না। ভক্তের একাগ্রতাকে টলাতে পারে না সন্তান স্নেহ। মঙ্গলকাব্যের এই চাঁদ পরবর্তীকালের সাহিত্যিক বিনির্মাণে প্রায় সর্বত্রই সুউচ্চ আসন পেয়েছে। তার মত উন্নতশির পুরুষের কৃপার পরেই নির্ভর করে দেবতার যাবতীয় মহিমা। এ নাটকে চাঁদ কেবল নারী দেবতা বলে পূজা প্রার্থী মনসাকে অপমান করে, তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে ব্যঙ্গ ক'রে (চণ্ডীর আঘাতে বাঁ চোখের দৃষ্টি হারিয়েছিলেন বলে চাঁদ তাকে কানি বলে অপমান করত) নিজের ঔদ্ধত্য ও অমানবিকতার পরিচয় দেয়। আবার এই চাঁদ যখন ছদ্মবেশী মনসার রূপে মুগ্ধ হয়ে মহাজ্ঞান হারায়, আবার সর্বস্বান্ত অবস্থায়ও নটীবাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা করে, তার চারিত্রিক অসঙ্গতি প্রমাণ করে যে দেবতার প্রতি একাগ্রমনা হলেও স্ত্রীর প্রতি তিনি একাগ্র নন। এমনকি স্ত্রীর ধর্মপালনের স্বাধীনতাকে পদলাঞ্ছিত করে যে উদ্যম আনন্দ চাঁদ অনুভব করে, তাতে সে আদর্শ পুরুষের বিপরীতে অবস্থানকারী এক উগ্র, স্বেচ্ছাচারী , দাম্ভিক এক অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এক হীন মানব বলেই সে প্রতিভাত হয়। মন্মথ রায় চাঁদের এই দম্ভ আর অজ্ঞানতাকেই মূলত তার যাবতীয় বিপর্যয়ের মূল বলে তুলে ধরেছেন তার নাটকে।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় আস্তিক মনসার পূজা প্রার্থনার প্রস্তাব নিয়ে চাঁদের কাছে গেলে সে থুৎকার দিয়ে তাকে বিতাড়িত করে। সেই সঙ্গে চম্পক নগরে মনসা পূজা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এবং মহাজ্ঞানের অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে দুর্বল জেনেও মনসা তথা নাগকুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। একদিকে ক্ষমতার আস্ফালন অন্যদিকে উগ্র আধিপত্যবাদ চাঁদের এ হেন আচরণে ধরা পড়ে। আবার তরুণীর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তাকে নিজ মহলে নিয়ে আসার জন্য উন্মাদপ্রায় চাঁদ কামুক প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই হারায় মহাজ্ঞান। ছদ্মবেশে মনসা কর্তৃক চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করা, মনসামঙ্গলের পরিচিত ঘটনা। তবে নাটকে দেখা যায় চাঁদের সর্পবিদ্বেষকে কাজে লাগিয়েই মনসা তরুণীর ছদ্মবেশে মায়াযুদ্ধে মহাজ্ঞান হরণ করছে। কালিদহ তীরে বৃহদাকায় অজগরের হাত থেকে তরুণীকে উদ্ধার করে চাঁদ তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং জলের গভীরে ঐ তরুণীর

মৃত পিতাকে বাঁচানোর মিথ্যা গল্পে বিশ্বাস করে তার হাতে তুলে দেয় মহাজ্ঞান। কামের প্রণোদনায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে চাঁদ নিজের স্খলন পতনকে ত্বরান্বিত করে। অথচ ধন্বন্তরির মুমূর্ষ অবস্থায় সেই স্খলন স্বীকার করার মত সৎসাহসও দেখা যায় না তার মধ্যে। মাথার মুকুট ছিঁড়ে ফেলতে ফেলতে সে মহাজ্ঞান খোঁজার অভিনয় করে তখন। এমনকি নেড়া যখন সর্পদংশনে নিহত চাঁদের ছয় পুত্রকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য ধন্বন্তরির কাছে করুণ আবেদন করে, তখনও চাঁদের কাছে পুত্রদের প্রাণরক্ষা অপেক্ষা মনসার সঙ্গে বিবাদই মুখ্য ছিল। সে নিজের পুত্র অপেক্ষা ধন্বন্তরিকে বাঁচানো বেশি প্রয়োজন বলে ব্যক্ত করে কারণ মনসার বিরুদ্ধে লড়তে হলে ধন্বন্তরি তার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে সনকার আনা মনসার পূজাঘট পদলাঞ্ছিত করার উল্লাস দিকে দিকে ঘোষণা করে মনসার অপযশ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই সে সপ্ততরী নিয়ে বাণিজ্য যাত্রা করে। ফলস্বরূপ কালিদহে তার বাণিজ্যতরীর ভরাডুবি হয়। আর শেষ অবধি স্ত্রী সনকাকেই যখন মনসা পূজা করা থেকে আটকাতে পারে না, তখন তার রাজ্যেও মনসা পূজা করার বিরুদ্ধ আইন শিথিল হয়ে যায়। তার অহং সর্বতোভাবে পরাভূত হয়।

এই কামুক, কাপুরুষ, নিষ্ঠুর, অহং সর্বস্ব চাঁদ কীভাবে ভক্তির পরাকাষ্ঠা হতে পারে, তা নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়। শেষ অবধি যে ব্রাহ্মণ এসে চাঁদের অজ্ঞানতার, মূর্খতার, দম্ভের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন, তিনি তো চাঁদের সুপ্ত চৈতন্যেরই প্রতীক। প্রকৃত আত্মনিবেদনের পথে চাঁদের বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার নিজের অহঙ্কার। সেই অহংকারই তার কাছে শিব হয়ে উঠেছিল। সারা জীবন সে মহাদেবের প্রতিমার সামনে অহংপূজা করেছিল বলেই মহাদেবের শিরোভূষণ সাপকে ধ্বংস করার জন্য সে মত্ত হয়ে উঠেছিল। মহাদেবের কন্যাকে থুৎকার করে মহাদেবের পূজা যে অসম্পূর্ণ সাতটি পুত্র হারিয়েও চাঁদ তা বোঝেনি। অহঙ্কার আর অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত হলে প্রকৃত ভক্তির জাগরণ হয়। সেই ভক্তিতেই মানবের মুক্তি। এই তত্ত্বের আলোকেই মন্মথ রায়ের চাঁদ সদাগর মঙ্গলকাব্যের চেনা কাহিনি ধারাকে ভেঙে বিশিষ্ট হয়েছে।

এ নাটকের বেহুলা মোটামুটিভাবে মনসামঙ্গলের অনুগামী হলেও তার শিল্পীসত্তা, সতীত্বের আদর্শকে বরণ করার পাশাপাশি নাটকে প্রথমাবধি তার এক রোখা জেদ চরিত্রটিকে

জীবন্ত করেছে। লক্ষিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে চম্পক নগরে ফেরার পর সে শ্বশুরের কাছে মনসা পূজা করার প্রার্থনা করেনি শর্ত দিয়েছে, যে মনসা পূজা না করলে তারা পুনরায় স্বর্গে ফিরে যাবে। দৃঢ়চেতা তো বটেই অসম্ভবকে সম্ভব করার বুদ্ধিমত্তা ও কুশলতায় এখানেই এ নাটকের বেহুলার স্বাতন্ত্র্য তথা বিশিষ্টতা।

মন্মথ রায়ের *চাঁদ সদাগর* পরবর্তীকালের মনসামঙ্গল কেন্দ্রিক সিনেমাগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। ১৯২৭ এ লেখা এই নাটকটি অবলম্বনে ১৯৩৪ এ প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় বাংলা সিনেমা *চাঁদ সওদাগর* মুক্তি পায়। ধীরাজ ভট্টাচার্য, অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলির মত বিদগ্ধ অভিনেতারা এই সিনেমায় অভিনয় করেন। মন্মথ রায়ের নাটকে মনসামঙ্গলের কাহিনিতে যে ময়ূর-পর্বের অভিনব সংযোজন ঘটেছে, পরবর্তীকালের এই ধারায় সিনেমায় তার প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রাসঙ্গিক ভাবে নাটকের মৌলিক কাহিনি অংশ সূত্রাকারে তুলে ধরা যাক -

সায়বেনের নিছনিনগরে ইন্দ্রপূজা উপলক্ষে নৃত্য আরতিতে বেহুলার আপত্তি, শর্ত হিসাবে ময়ূর এবং হাতির দাঁতের সিঁদুরকৌটো চাওয়ায় তার অটল অনমনীয় মানসিকতার প্রকাশ ... সায়ের রাজ্যে সাপ মারা নিষিদ্ধ এবং অপরাধীর মৃত্যুদণ্ডের আইনের প্রচলন ... লক্ষিন্দরের ময়ূর কর্তৃক নিছনি নগরের সাপের মৃত্যু ... সায় ও চাঁদের বন্ধুত্ব এবং উভয়ের মধ্যে বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহের পূর্ব প্রতিশ্রুতি ... ছয়পুত্রহারা চাঁদ সনকার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সায় কর্তৃক লক্ষিন্দরের মৃত্যুদণ্ড লাঘব ও মুক্তি ... লক্ষিন্দরের কাছ থেকে তার ময়ূর পেয়ে আনন্দে বেহুলার নাচ ... খরার দেশে অঝোরে বৃষ্টি ... বেহুলাকে দেখে লক্ষিন্দরের মুগ্ধতা অথচ মনসার তথা সাপের দেশের নারীর সান্নিধ্যে অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আতঙ্ক - এই দুই এর টানাপোড়েনে তার বিপর্যস্ত হৃদয় ... বাধ্য হয়ে লোহার বাসরে ছিদ্র করে কালু সর্দারের অসহায় অনুশোচনা, লক্ষিন্দরকে বাঁচানোর প্রয়াস ...

উপরে সূত্রাকারে উল্লিখিত এই ঘটনা সমূহ প্রায় হুবহু দেখানো হয়ে ১৯৬০ এ জাহির রায়হান নির্দেশিত *বেহুলা* সিনেমায়। আবার মন্মথ রায়ের নাটকে সতী, সীতা আর সাবিত্রী সংস্কৃত সাহিত্যের এই তিন নারীর সতীত্বের আদর্শে বেহুলা উদ্বুদ্ধ হয়েছে, বিশেষত

সাবিত্রীর আদর্শেই মৃত স্বামীকে বাঁচাতে দৃঢ় পণ গ্রহণ করেছে। জাহির রায়হানের *বেহুলা* সিনেমায় *চাঁদ সদাগর* নাটকের বেহুলার মৃত স্বামীর সঙ্গে ভেসে যাওয়ার পূর্বে চাঁদের সঙ্গে কথোপকথন অংশটি একেবারে সংলাপ সহ সরাসরি বসানো হয়েছে। পাশাপাশি ২০১০ এ মুক্তি পাওয়া মনোজ কুমারের সতী বেহুলা সিনেমায় সাবিত্রির কাহিনির মোড়কেই মনসামঙ্গলের কাহিনিকে তুলে ধরার মধ্যেও রয়েছে বর্তমান আলোচ্য নাটকটির পরোক্ষ প্রভাব।

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের *চাঁদ সদাগর (বেহুলা)* নাটকের মূল বিষয় বাধ্যতামূলক সমঝোতায় উগ্র একনায়কতন্ত্রের অবসান। মনসামঙ্গলের কাব্যকাহিনি অবলম্বনে মূলের বিশেষ কিছু রদবদল না ঘটিয়ে পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৩০ এ। মনসামঙ্গলের চাঁদ বণিকের দুর্দমনীয় পৌরুষ এ নাটকে উগ্র একনায়কতন্ত্রে পর্যবসিত। প্রতিপক্ষ কূটনীতিবিদ ও প্রচণ্ড শক্তিশালী হওয়ায় সে উগ্রতা শেষ অবধি টিকিয়ে রাখা কার্যত অসম্ভব হয়। একের পর এক বিপর্যয়ের কবলে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে অস্তিত্বের শেষ অবলম্বন টুকুও বিধ্বস্ত হলে ইষ্ট দেবতাই ভক্তের প্রতিপক্ষের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের সূত্রটুকু ধরিয়ে দিয়ে সমঝোতার পথ দেখায়। এই সমঝোতার পথে চাঁদ হৃতসর্বস্ব ফিরে পায়, পাশাপাশি অবসান হয় তার একনায়কতন্ত্রের দীর্ঘ অধ্যায়ের।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ হাজরার প্রতিষ্ঠিত শান্তি অপেরা পার্টিতে পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের *চাঁদ সদাগর (বেহুলা)* নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। পরবর্তী কালে জোড়াসাঁকোর পাল ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি থেকে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে নাটকটি প্রকাশিত হয়। *চাঁদ সদাগর(বেহুলা)* নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় মনসামঙ্গল কাহিনি কেন্দ্রিক অভিনয় যোগ্য নাটকের অভাব দূর করার প্রয়াস থেকেই এই নাটক রচনার কথা লেখেন। যদিও ইতিপূর্বে মন্মথ রায়ের লেখা *চাঁদ সদাগর* নাটক শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রচেষ্টায় ১৯২৭ এ মহাসমারোহে মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। মনসামঙ্গল কাব্য অনুযায়ী স্বর্গের নর্তকী ঊষা মনসার পূজা প্রচারের মাধ্যম হিসাবে মর্ত্যে বেহুলা রূপে জন্ম নেন। বেহুলাও নৃত্যশিল্পী। স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে দেবতাদের মুগ্ধ করে নিজের নৃত্যকলায়।

চাঁদ সদাগর (বেহুলা) নাটকে প্রথমাবধি চাঁদের সর্বগ্রাসী একনায়কতন্ত্রের পরিচয় রয়েছে। প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায় সমগ্র পৃথিবীর সাপ ধ্বংস করে পৃথিবীকে সাপ মুক্ত করতে চায় চাঁদ, যাতে সাপের ভয়ে ভীত মানুষেরা আর মনসাপূজা না করে এবং পৃথিবীময় চাঁদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। মহাদেবের আশীর্বাদ, অর্জিত মহাজ্ঞান ও ধন্বন্তরির ক্ষমতা এই তিনের বলে বলীয়ান হয়ে চাঁদ নিজেকে পৃথিবীর অধীশ্বর বলে মনে করতে থাকে। সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের ওপর জারি করে নিজের তৈরি কঠোর আইনি নিষেধাজ্ঞা - রাজাজ্ঞা অমান্য করে কেউ মনসা পূজা করলে তার প্রাণদণ্ড হবে। জালু মালুর গৃহে মনসা পূজা হচ্ছে খবর পেয়ে চাঁদ সেখানে গিয়ে তাদের মনসা ঘট তো চূর্ণ করে তাদের গ্রেপ্তার করে ক্ষান্ত হন না, উপরন্তু নিজের জয় জয়কার করতে আদেশ দেন । কেউ রাজ ভয়ে ভীত হয়ে কেউ বা স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে মনসা পূজা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং চাঁদের জয়ধ্বনি করতে থাকে।

আমরা জানি যে মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিও তুর্কী আক্রমণোত্তর এক বিশেষ আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হয়েছিল। সেখানেও ক্ষমতাবানের অত্যাচারে সাধারণ হিন্দুর ভয় ভীতি, উচ্চপদ তথা স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ, মুসলিম ধর্মান্তকরণের অন্যতম কারণ ছিল। পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা নাটকে চাঁদের একনায়কতন্ত্রে মঙ্গলকাব্য রচনার সেই বিশেষ প্রেক্ষিতের ছায়াপাত প্রত্যক্ষ হয়।

নাটকে চাঁদের একনায়কতন্ত্রের যোগ্য জবাব দিতে তৈরি হয় মনসা। অতঃপর নেতার ষড়যন্ত্র ধনা মনার বারংবার নির্বুদ্ধিতায় ধন্বন্তরির মৃত্যু, জালু মালুর মনসা পূজা, চাঁদের পদাঘাতে সনকার পূজাঘট ভাঙা, বাণিজ্য যাত্রা, কালিদহে চাঁদের বাণিজ্য তরী নিমজ্জন, লোহার বাসরে লক্ষিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু, বেহুলার মৃত স্বামীকে নিয়ে কলার ভেলায় অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া, নৃত্যে দেবকুলের মনোরঞ্জন করে স্বামীর প্রাণোদ্ধার, হৃতসর্বস্ব ফিরে পেয়ে বাধ্য হয়ে চাঁদ কর্তৃক মনসা পূজা করার কাহিনি মনসামঙ্গলের চেনা খাতে বয়ে গেছে।

মনসার দিক থেকে যুদ্ধ জয়ের যে গল্প, নাটকে তা প্রায় সম্পূর্ণই মনসামঙ্গল অনুসারী। কোথাও কোথাও সামান্য রদ বদল ছাড়া বিশেষত্ব তেমন কিছু নেই। যেমন, পদ্মার ছদ্মবেশে চাঁদ বণিকের মহাজ্ঞান হরণ বৃত্তান্ত - এ কাহিনি বিজয়গুপ্ত[১], কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ[২], দ্বিজ বংশীদাস[৩], বিপ্রদাস বিপলাই[৪], জগজ্জীবন ঘোষাল[৫] - এদের সকলের মনসামঙ্গলে পাওয়া যায়। কিন্তু পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে পদ্মার স্থানে নেতা ছদ্মবেশে মহাজ্ঞান হরণ করে। ধন্বন্তরিকে মারার জন্যও পদ্মার ছদ্মবেশ ধরার প্রসঙ্গ রয়েছে নানা কবির মনসামঙ্গলে। বিজয়গুপ্তের[৬] কাব্যে ধন্বন্তরিকে মারতে পদ্মা প্রথমে মালিনী, তারপর গোয়ালিনী বেশ ধরেছিল। কেতকাদাসের[৭] কাব্যে কমলার সঙ্গে সখীত্ব পাতিয়ে শ্বেতমাছি রূপ ধরে কৌশলে জেনেছিল ধন্বন্তরির বধের উপায়। জগজ্জীবন ঘোষালের[৮] কাব্যেও ধন্বন্তরিকে বধ করতে মনসা নিজেই একবার গোয়ালিনী, একবার শ্যালিকা, শেষে ধন্বন্তরির স্ত্রীর বেশ ধরে। বিপ্রদাস পিপলাই[৯]এর কাব্যেও মনসা মালিনী ও পরে ছদ্মবেশে কমলার সঙ্গে সখীত্ব পাতিয়ে ধন্বন্তরির মারণ কৌশল জেনেছিল মনসা। কিন্তু বর্তমান আলোচ্য নাটকে ধন্বন্তরিকে বধ করতে নেতাই গোয়ালিনী বেশ ধরেছিল। এ নাটকে কোন ঘটনাই সরাসরি মনসা ঘটায়নি। চাঁদের বিরুদ্ধে যাবতীয় পদক্ষেপে নেতার বুদ্ধি ও সেই মত কার্যসাধনে নেতাকেই অবতীর্ণ হতে দেখা যায় । এমনকি মনসামঙ্গলে উল্লিখিত কেশাই কামার বা বিশ্বকর্মা যাকে মনসা লোহার বাসর ঘরে ছিদ্র করতে বাধ্য করেছিল, এ নাটকে তাকে নেতা সুন্দরীর ছদ্মবেশে কাম উন্মাদনায় বশীভূত করে কার্যসিদ্ধি করে। মনসার কেবল চালিকা শক্তি নয় বরং নেতাই এ নাটকে চাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে।

কালিদহে চাঁদের বাণিজ্য তরীর ভরাডুবি, এবং সর্বস্বান্ত অবস্থায় একের পর এক প্রতিকূলতার মধ্যে তার অস্তিত্বের লড়াই টিকিয়ে রাখার কাহিনি মনসামঙ্গলগুলিতে পাই। এ নাটকে দেখানো হয়েছে কোনও রকমে জীবন বাঁচিয়ে সমুদ্র কুলে উঠে উলঙ্গ চাঁদ পল্লীর রমণীদের কাছে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র চাইছে, এবং চরম হেনস্থার শিকার হচ্ছে। মৃত স্বামীকে নিয়ে সমুদ্রে ভাসমান বেহুলাকে দেখে তাকে ভোগ করার কুমতলবে সর্দার ও গোদার নিজেদের মধ্যে লড়াই ও অঙ্গহানি হওয়ার ঘটনা, মূলকে একটু বদলে রূপায়িত

করা হয়েছে নাটকে। একদিকে সততা তথা সতীত্বের তেজ আর অন্যদিকে অধর্মের অবশ্য বিনাশের মত নৈতিক আদর্শ এভাবেই তুলে ধরেছেন নাট্যকার। আর একটি বিশেষত্ব এ নাটকে দেখা যায়, যেখানে বেহুলার কাতর নৃত্যে আদ্র দেবী চণ্ডীর হৃদয়ে মনসার জন্য সহানুভূতি তথা সন্তান স্নেহ জাগে। তিনি ছুটে গিয়ে মনসাকে তার মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় দেন। চাঁদের পূজা প্রাপ্তির পাশাপাশি আজন্ম মাতৃ স্নেহ বঞ্চিত মনসার কাছে মায়ের স্নেহ তথা সন্তান হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়াও কিছু কম ছিল না।

এ নাটকে নেড়াকে দেখা যায় মনিবের অনুগত হয়ে মনসার নামে কুকথা বললেও পরে আবার দেবীর কাছে ক্ষমা চাইছে। জীবন ও জীবিকার জন্য সাধারণ মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা হারানোর দিকটি নেড়া চরিত্রে ধরা দেয়। আবার মা মনসার পূজা করলে সংসারের দারিদ্র্য ঘুচবে, এরকম স্বপ্ন দেখে জালু মালুর মা লখিয়া ভয় পায় অর্থবান হলে যৌথ পরিবারে ভাঙন ঘটতে পারে, স্বার্থপর হয়ে যেতে পারে তার পরিবারের সকলে। দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও শান্তিপূর্ণ সংসার তথা সন্তানদের পারস্পরিক ভালবাসা এক সাধারণ নারীর কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ লখিয়ার আপাত হাস্যকর আচরণে কৌশলে সে বিষয়টির প্রকাশ ঘটিয়েছেন নাট্যকার।

নাটকের শেষে বেহুলা চাঁদের হারানো ধন জন সব ফিরিয়ে আনলেও চাঁদ তার অনুরোধে মনসা পূজা করতে রাজি হয় না। শিব আবির্ভূত হয়ে চাঁদকে মনসা পূজা করতে নির্দেশ দেন, কারণ দেবী যে তারই কন্যা। চাঁদও হঠাৎই ভক্তিযুক্ত হয়ে বাম হাতে পূজা করার অনুমতি চেয়ে নেন দেবীর কাছে। মন্মথ রায়ের চাঁদ সদাগর নাটকে ব্রাহ্মণ বেশী শিব এসে চাঁদের অজ্ঞানতা দূর করে তাকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে মহাদেবের নির্দেশে চাঁদের মনসা পূজায় মন্মথ রায়ের নাট্যদৃশ্যেরই প্রভাব স্পষ্ট। পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের *চাঁদ সদাগর (বেহুলা)* নাটকে বেহুলা এক সাপুড়ের কাছে সাপের নাচ শিখতে চাইলে, সাপুড়ে কালিয়া নামের একটি সাপ তাকে দিয়ে যায়। ঘটনাক্রমে লক্ষিন্দরের ময়ূর ওই সাপটিকে খেয়ে ফেলে। কালিয়ার মৃত্যুতে সাপের নাচ শিখতে আগ্রহী বেহুলাকে লখিন্দর ময়ূর নাচ শেখার পরামর্শ দেয়। বেহুলা লক্ষিন্দরের কাছে তার ময়ূরটি চাইলে সে দিতে স্বীকৃত হয়। বেহুলার এই ময়ূর নাচ শেখার প্রসঙ্গ

মন্মথ রায়ের নাটকে অন্যতম প্রধান ঘটনা হিসেবে রূপায়িত হয়েছিল। এক্ষেত্রে পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে মন্মথ রায়ের নাটকের প্রভাব স্পষ্ট।

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে এই দৃশ্য অনেকগুলি প্রশ্ন চিহ্ন উদ্রেক করে পাঠক হৃদয়ে। মনসা যে শিব কন্যা, পরম জ্ঞানী চাঁদ সদাগর কি তা জানতেন না ? যে মানুষটি কালিদহে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েও মনসাকে থুৎকার করেছিল, তার হৃদয়ে হঠাৎই দেবীর প্রতি ভক্তি জেগে উঠল কিভাবে? আসলে এই নাটকে যে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উগ্র বাসনা চাঁদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল, তা ততদিনে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের আক্রমণে ভূলুণ্ঠিত। উপরন্তু চাঁদ মনসার বিবাদে জগত সংসারে সাধারণ মানুষের মনে দৈবী বিশ্বাসের প্রতি উৎপন্ন হয়েছে সংশয়। সুতরাং কন্যাকে জগত সংসারে বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠা দিতে এবং সকল জগতের দৈবী বিশ্বাস রক্ষার স্বার্থে দেবাদিদেব ভক্তের একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটালেন। চাঁদের মনসাপূজা সেই কূটনৈতিক রফা যার মাধ্যমে শিব ভক্ত ও কন্যা উভয়ের আনুগত্যই রক্ষা করতে পেরেছিলেন, সর্বোপরি জগতবাসীর সামনে ভক্তির মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এভাবেই নাটকে বিশেষ কিছু অভিনবত্ব না এনে মনসামঙ্গলের চেনা চরিত্র অবলম্বনে চেনা বিষয়কে নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে মঙ্গলকাব্যের পরিচিত পরিবেশেই তুলে ধরেছেন নাট্যকার।

তারাশঙ্কর মুখার্জির *মনসামঙ্গল* নাটকে পালাগানের মোড়কে নাটকে মনসামঙ্গলের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। সচদেব পুস্তকালয় থেকে ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত মনসামঙ্গল কাহিনি কেন্দ্রিক একটি নাটক পাওয়া যায়। বইটির কোনও শিরোনাম পত্র পাওয়া যায়নি, যেখানে নাটকটির নাম এবং নাট্যকারের নামের উল্লেখ রয়েছে। তবে Digital library of India থেকে প্রাপ্ত তথ্য সূত্রে উল্লিখিত নাটকটির নাম মনসামঙ্গল, এবং নাট্যকার তারাশঙ্কর মুখার্জি। নাটকটির কাহিনি মনসামঙ্গল অনুযায়ী গতানুগতিক, তেমন কিছু বিশেষত্ব নেই। তবে গ্রাম বাংলায় প্রচলিত মনসার পালাগানের আদলে, লোকবিশ্বাস, লোকজীবনে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা তথা লোকসংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব একেবারে সহজ একরৈখিক সংলাপে তুলে ধরা হয়েছে নাটকটিতে।

মনসামঙ্গলের গতানুগতিক কাহিনিতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মনসা নানাবিধ ষড়যন্ত্রে সামিল হয়েছে। এ নাটকে শিবই বার বার নিজ কন্যাকে ছলনাময়ী হবার শিক্ষা দিচ্ছে। এমনকি চাঁদকে পর্যুদস্ত করতে নাকাল মনসা শিবের শরণাপন্ন হলে মহাদেব পরোক্ষে একনিষ্ঠ ভক্ত চাঁদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে ছলনায় তার মহাজ্ঞান হরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেভাবে শিব নিজ কন্যাকে লড়াই জিততে সাহায্য করেছে, তা দেব চরিত্রের শিথিলতাকে তুলে ধরে। এ নাটকে বারবার চাঁদের কাছে পূজা প্রার্থনা প্রসঙ্গে মনসার ওপর শিবের অভিশাপের উল্লেখ রয়েছে, যদিও শিবের অভিশাপের কারণ উল্লেখ করা হয়নি। যে কারণেই হোক দেবসভায় কন্যাকে অভিশাপ দিয়ে শিব সকলের সামনে নিজের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বজায় রেখেছেন। অথচ আড়ালে মেয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্বে তাকে শিখিয়েছেন ছলনায় ভক্তকে হীনবল করার কূটনীতি। মেয়েকে প্রতিষ্ঠিত করতে ভক্তের জীবন সর্বস্বান্ত করার মত দুর্নীতিপরায়ণ শিব চরিত্রে ধরা দেয় সমাজের স্বার্থপর মুখোশধারী ক্ষমতাবান শ্রেণি।

আবার মনসার বিবাহ সভায় চন্দ্রধর বণিকের উপস্থিতি কাহিনিতে অভিনবত্ব আনলেও পাঠকের সামনে প্রশ্নচিহ্ন রাখে। বেহুলাকে যে দেবসভায় পৌঁছানোর অসাধ্য সাধন করতে দীর্ঘ কাল কলার ভেলায় ভাসতে হয়, নাটকের শুরুতেই কেবল একনিষ্ঠ ভক্ত বলেই মানব হয়ে চাঁদের সেই দেবসভায় উপস্থিতি কাহিনি বুনটের অসঙ্গতিকেই তুলে ধরে। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে হঠাৎই দৃশ্যপট বদলে দুলালী, হেলুনাথ, ফেলুনাথ, ছাবিলি, লহনা, ফেলুরাম ইত্যাদি চরিত্রের আগমন ঘটে, নাট্য কাহিনির সঙ্গে যাদের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। এদের সংলাপে জানা যায় *সতী বেহুলা* নাটক অভিনয়ের জন্য কোনও একটি গ্রামে জনসমাগম হওয়ার কথা। পাঠককে বুঝে নিতে হয় যে সেই ভিড়ের কারণ যে নাটকাভিনয়, তাই প্রথম অঙ্ক থেকে চলছে। পারম্পর্যহীন নাট্য কাহিনিতে বিষয়টি স্পষ্টভাবে রূপায়িত হয়নি। প্রথমত এতখানি নাটক অগ্রসর হওয়ার পর কেবলমাত্র পালাগানকে বোঝাতে গ্রাম্য দর্শকদের চরিত্র হিসেবে তুলে ধরা একটু খাপছাড়া লাগে। আর দ্বিতীয়ত পালাগান চলাকালীন বা শেষ হবার পর বা আর কোথাও এই দর্শকদের

প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়নি। ফলে দর্শক চরিত্রগুলি কাহিনিতে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে এবং কার্যত একটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের কয়েকটি সংখ্যামাত্রে পরিণত হয়েছে।

নাটকের শুরুতেই চাঁদ বণিকের পূর্ব জন্মের আখ্যান রয়েছে যেখানে মায়ার বাঁধন কাটাতে চাইলেও তপস্বী জীবনে দুটি পাখির ছানার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছেন পদ্মশঙ্খ মুনি। ঘটনাক্রমে পাখি দুটি সাপের শিকারে পরিণত হলে শোকার্ত মুনি পরজন্মে নাগহন্তা হওয়ার আশীর্বাদ চেয়ে মৃত্যু বরণ করেন। দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মপুরাণে এ আখ্যান পাওয়া যায়, কেবল মুনির নাম পণ্ডুসখা থেকে বদলে নাটকে পদ্মশঙ্খ করা হয়েছে। আবার কলার ভেলায় মৃত স্বামীকে নিয়ে ভাসার জন্য বেহুলাকে যে সকল কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, সেখানে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের প্রভাব প্রত্যক্ষ। যদিও নারায়ণ দেবের কাব্যে লক্ষিন্দরকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনার পর সনকার নির্দেশে বেহুলার সতীত্বের পরীক্ষা নিয়েছিল চাঁদ। আবার নাগবালকদের মুখে চন্দ্রধর ও শঙ্কর গারুড়ীর অত্যাচারে তাদের বিপর্যস্ত হওয়ার কথায়, নগরে মনসা পূজা নিষিদ্ধ ও নিষেধের অবহেলায় কঠোর শাস্তি ঘোষণায় চাঁদের একনায়কতন্ত্রে যথাক্রমে মন্মথ রায় ও পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের *চাঁদ সদাগর (বেহুলা)* নামের নাটক দুটির মতই মনসামঙ্গলের গতানুগতিক ছাঁচ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমাবধি নাটকের উপস্থাপন রীতিতে রয়েছে মনসার পালাগানের আদল। পালাগানে সংলাপ অপেক্ষা গানের স্থান বেশি। এ নাটকেও প্রায় প্রতিটি সংলাপের সঙ্গে পালাগানের মতই সহজ কথায় রচিত গান জুড়ে আছে। বিনোদ ওঝার বিষ ঝাড়ার গান আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পালাগানে লক্ষিন্দরকে প্রাণ ফিরিয়ে দেবার জন্য মনসার বিষ তোলার গানের মিল লক্ষ্যনীয়। গ্রামবাংলায় সাপের কামড়ের প্রতিকার স্বরূপ মন্ত্র তন্ত্র ঝাড় ফুক এর ওপর যে লোক বিশ্বাস, তার প্রতিফলন ঘটেছে নাটকে। লখিন্দরকে সাপে কামড়ানোর পর বেহুলা ঝাড়ন মন্ত্রে তাকে সুস্থ করার চেষ্টা করে। অলক্ষ্যে মনসার চাপান মন্ত্রের সঙ্গে চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দেবীর মন্ত্র মানবীর মন্ত্রকে হারায়। অতঃপর বেহুলা বিনোদ ওঝাকে স্মরণ করে। বিনোদ ওঝা মনসামঙ্গলের ধন্বন্তরির আদলে গড়া চরিত্র। ধন্বন্তরি থাকলে চাঁদকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে না, তাই কৌশলে তাকে হত্যা করেছিল মনসা।

বর্তমান আলোচ্য নাটকেও বিনোদ ওঝার শক্তি সম্পর্কে অবগত হয়ে তার মন্ত্রের পুঁথি ছলনায় ছিনিয়ে নেয় সে। ফলে লখিন্দরকে বাঁচাতে তার ঝাড় ফুক কোনও কাজে লাগে না। এই প্রসঙ্গে আরেকটি লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ্য। বিনোদ ওঝার শক্তি পরীক্ষা করতে মনসা একটি শাল গাছে বাণ মারে। ওঝা তার মন্ত্র শক্তি দিয়ে গাছটিকে আবার বাঁচিয়ে দেয়। যাদু, মারণ, বশীকরণ, তাবিজ করা বা বাণ মারা - এই শব্দগুলো, কালো যাদু বা black magic বা চলতি কথায় তুকতাক নামে পরিচিত। কারো ক্ষতি করার জন্য অলৌকিক ক্ষমতাবলে শক্তি প্রয়োগ করাকে কালো যাদু বলে। হিন্দু তন্ত্র সাধনায় এর চর্চা হয়। লোকসমাজে এই তুকতাকের দৃঢ়বদ্ধ সংস্কারকেই মনসার বাণ মারা প্রসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে নাটকে।

মনসামঙ্গল কাব্যধারা, সেই কাব্য কাহিনি অবলম্বনে লেখা নাটক, লোকসমাজে প্রচলিত মনসার পালাগান, লোকাচার, লোক বিশ্বাস, লোকসঙ্গীত সব মিলিয়ে এক সার্বিক মনসাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির এক ব্যপ্ত রূপ তথা সামগ্রিক চেতনা তারাশঙ্কর মুখার্জির মনসামঙ্গল নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধরা আছে।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় *সওদাগরের নৌকা* নাটকে অন্তবিহীন পথে চলমান জীবনের জয়গান গেয়েছেন। ১৯৬৩ সাল নাগাদ নাট্যকার অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন মৌলিক নাটক সওদাগরের নৌকা। নাটকটি বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ এ। ১৯৭৬ এর ৩০এ অক্টোবর নান্দীকারের প্রযোজনায় প্রথম অভিনয় হয়। প্রসন্নর ভূমিকায় অভিনয় করেন স্বয়ং নাট্যকার। মনসামঙ্গলের প্রত্যক্ষ বিনির্মাণ না হলেও জীবনের অন্তহীন চলমানতার চিরন্তন ভাবসত্য বহনকারী এ নাটকে মঙ্গলকাব্যের চাঁদ বণিকের জীবন যেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায় বারবার আভাসিত হয়। প্রসন্ন সতী কালো আশার জীবন আবর্তে ধরা দেয় কখনো শিব পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবন, কখনো চাঁদ মনসার বিবাদ ও সমঝোতার ছবি।

নাটকের শুরুতেই যাত্রাভিনেতা প্রসন্নর সংলাপে মনসামঙ্গলের চাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেখা যায়, যখন সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তার ঘরে ঢুকতে অপারগতার কথা বলে। স্ত্রীর কথা মত মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকলেও সে জানায় এভাবে ঢুকতে তার *বড়ো লাগে* ।

যে অপরিসীম জীবনযন্ত্রণা অতিক্রম করে পরাজিত আত্মমর্যাদাবোধের গ্লানিসহ মনসামঙ্গলের চাঁদ মনসা পূজা করতে বাধ্য হয়েছিল, প্রসন্নর এই সংলাপ তারই প্রতীকী। চাঁদ সদাগরের চরিত্রে অভিনয় করতে করতে তার পৌরুষের সাথে একাত্ম প্রসন্নর জীবনবোধ এভাবেই ব্যক্ত হয়। যৌবনে রাতের পর রাত মহিষাসুর পালায় রক্তাসুর, হরিশচন্দ্র পালার চণ্ডাল বা মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের মত চরিত্রে সদর্পে অভিনয় করে খ্যাতনামা শিল্পী প্রসন্ন অর্জন করেছিল চাঁদ বণিকের মতই অর্থ সম্মান প্রতিপত্তি । সন্তান জন্মানোর আনন্দে দাইকে রুপোর টাকা বকশিস দেওয়ায় সেই প্রতাপেরই প্রকাশ। অথচ চাঁদের বাণিজ্য তরী ভরাডুবির মতই প্রসন্নও একদিন সর্বহারা হয়। কালিদহে বিপর্যস্ত সর্বস্বান্ত চাঁদ বণিকের মতই প্রসন্ন আটক হয় পাগলা গারদে।

প্রসন্নর সঙ্গী, মঞ্চে বেহুলা চরিত্রের অভিনেতা হরিসাধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় প্রসন্নর অতীতের সেই গৌরবময় অধ্যায়কে আঁকড়ে থাকার আর্তি। অর্থ প্রতিপত্তি হারিয়ে চরম বিপন্নতার মধ্যেও যৌবনের অর্জিত গৌরব আর সর্বস্বান্ত জীবনের গ্লানি - এই দুইয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বে এই অধ্যায় চাঁদের একনিষ্ঠ শৈব জীবনের প্রতীকী। একই অন্তর্দ্বন্দ্বে শৈব চাঁদ মনসা পূজার গ্লানিকে কিছুতেই স্বীকার করতে পারছিল না। সাধনের মৃত্যুর পরই প্রসন্ন নিজের অহঙ্কারের সীমাবদ্ধতাকে অনুধাবন করতে পারে এবং নবযুগ অপেরার দলমালিক কালীকৃষ্ণ বাবুর অনুরোধে সে সামান্য মজুরিতে এক কালের মঞ্চ কাঁপানো নায়ক চাঁদ সদাগর থেকে কমিক গোদামালোর চরিত্রে অভিনয় করতে রাজি হয়ে যায়। প্রসন্ন উপলব্ধি করে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইটা চালিয়ে যাওয়াই জীবন। তার উপার্জনেই তার হৃদয়ের লক্ষ্মী সতী সংসারে সম্মান পাবে। না হলে কালোর অপমান হয়ত ফিরে ফিরে আসবে। সওদাগরের নৌকা আমাদের জীবন তরণীর প্রতীকী, যেখানে টিকে থাকতে হলে প্রয়োজনে চাঁদের মনসা পূজার মত প্রসন্নকে গোদা মালোর চরিত্রে অভিনয়ের করতে হয়।

উগ্র কালোর পদাঘাতে নিপীড়িত প্রসন্নই আবার মনসামঙ্গলের মনসার প্রতিনিধি স্থানীয়। প্রসন্নর শিক্ষা, প্রতিভা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, গভীর জীবনানুভবের কাব্যময় আত্মিক অভিব্যক্তি - এসবের পাশাপাশি আর্থিক অনটনের কবলে বিপর্যস্ত জীবন, দেবী হয়েও মনসার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানবের ওপর চূড়ান্ত নির্ভরশীলতার প্রতিচ্ছবি । বিবাহের পর একমাত্র ছেলে

কালো যদি অসহায় বাবা মায়ের দায় দায়িত্ব না নেয়, এই নিরাপত্তার অভাব থেকেই প্রসন্ন ছেলের বিয়ে ভাঙতে চায়। প্রসন্ন কালোর পছন্দ করা মেয়ে আশাকে সেই জন্যই বার বার জিজ্ঞেস করেছিল, বিয়ের পর কালো তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেবে তো? এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় পাগলের বংশে মেয়ে বিয়ে দিতে বারণ করেছিল আশার মাকে, ফলস্বরূপ শুরু হয়েছিল আশার অন্যত্র বিয়ের উদ্যোগ এবং কালোর নির্মম প্রহারের শিকার হতে হয়েছিল তাকে। মনসামঙ্গলের মনসার মধ্যেও এই একই নিরাপত্তার অভাব ক্রিয়াশীল ছিল। এখানে অস্তিত্বের সঙ্কটে প্রসন্ন আর মনসা এক হয়ে যায়, কালোর কাছে প্রসন্ন আর সন্তান স্নেহে চাঁদের কাছে মনসার আর্তির বিষয়ও ছিল একই। বাধ্য হয়ে অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে প্রসন্ন আর মনসা দুজনেই ছলনার পথ নেয় এবং পরিণামে প্রসন্ন পায় শারীরিক নিদারুণ নির্যাতন আর মনসা পেয়েছিলো চরম ঘৃণা, থুৎকার, তথা পূজাঘটে পদাঘাত (কোনও কোনও কাব্যে হেতালের বাড়ি)। সুতরাং মনসাই অস্তিত্বের সংকটে নিমজ্জিত মানবের প্রতিনিধি হয়ে ছায়া ফেলে প্রসন্ন চরিত্রের একাংশে।

প্রসন্ন আর কালো মনসামঙ্গলের চাঁদ বণিকের দুই রূপ। প্রসন্নর শিল্পীসত্তার আলোর বিপরীতে অবস্থান করে তারই আত্মজ কালো। কালো মনসামঙ্গলের চাঁদের অহং, তার উগ্রতার প্রতীকী হয়ে রূপায়িত হয় নাটকে। স্বপ্ন আর বাস্তবের সংঘাতে দ্বিধাবিভক্তহৃদয় হতাশাগ্রস্ত যে সাধারণ মানুষ দুঃখ ভুলতে মদ্যাসক্ত হয়, প্রচণ্ড পরিশ্রমে সংসারের অভাব দূর করতে চায়, ভালোবাসা হারানোর ভয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে পিতাকে প্রহার করে বসে, আবার সম্বিত ফিরতেই গভীর অনুশোচনার গ্লানিতে অস্থির হয়, বার বার ক্ষমা চেয়েও যে গ্লানি থেকে মুক্ত হতে পারেনা, কালো চাঁদের অহংকার, উগ্রতাকে ছাপিয়ে সার্বিকভাবে দোষে গুনে ভালোবাসায় শ্রদ্ধায় অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে হাহাকারে সর্বকালের বিশ্বমানবের প্রতিনিধি হয়ে দেখা দেয় নাটকে।

এ নাটকের আশা বেহুলার প্রতিনিধি স্থানীয় একটি চরিত্র, যে আর্থিক অনটনকে জয় করে আত্মিক সঙ্কটে নিমজ্জিত মানুষগুলিকে একসূত্রে বেঁধে রাখতে চায়। মনসামঙ্গলের বেহুলার মত *সওদাগরের নৌকার* আশা কোনও অসম্ভবকে সম্ভব করেনি তবে বেহুলার মত সেও কঠিন পরিস্থিতি জয় করার মানসিক দৃঢ়তা রাখে। প্রসন্ন মুকুন্দপুরে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে

ফিরে আসতে দেরী হলে উদ্বিগ্ন সতীকে আশ্বস্ত করেছে সে। এই সময় সতী ও আশার কথোপকথনে আশার সংসারের প্রতি কল্যাণী চেতনার প্রকাশ দেখা যায়, তার আলোয় সুস্থ সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধতে পারে সতী। প্রেমে, দার্ঢ্যে, শুভবুদ্ধির আলোকে বেহুলার চরিত্র বৈশিষ্ট নিয়ে এ নাটকে এসেছে আশা। বলা ভালো, কেবল মনসামঙ্গল বা বেহুলা প্রসঙ্গ ব্যতিরেকেও, নাটকের আশা দুঃখ দারিদ্র্য হতাশার কবলে নিমজ্জিত সকল সাধারণ মানুষের মনের সেই আশার প্রতিরূপ, যার শক্তিতে বলীয়ান হয়েই প্রতিবন্ধকতা পূর্ণ জীবন যুদ্ধে এগিয়ে চলা যায়।

আবার শিব পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবন, দুঃখ দারিদ্র্য, গভীর প্রেম, একাত্মতার ছায়াপাত ঘটেছে প্রসন্ন আর সতীর দাম্পত্যে। চাঁদ বণিকের পুরুষত্বের দম্ভ কখনো সনকাকে যথার্থ সম্মান দেয়নি। কিন্তু প্রসন্ন শত দুঃখেও স্ত্রীকে হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসায় ভরিয়ে রেখেছে। তাই প্রসন্ন সতীর দাম্পত্য সম্পর্কে চাঁদ সনকা নয় উঠে এসেছে শিব সতীর নিবিড় ভালোবাসা তথা পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রতিচ্ছবি। অভিনয়ের রাতেই রঙ মাখা মুখে দলবল নিয়ে প্রসন্ন যখন বিয়ে করতে আসে তা ছিল শিবের বিবাহযাত্রার মতই পারিপাট্যহীন, সরল নির্ভেজাল, চেতনার মাধুর্যে চির সুন্দর। তাই তো সতী প্রসন্নর কাছে একাধারে জননী, জায়া, কন্যা হয়ে তার অবলম্বন স্বরূপ হয়েছে। নাটকের সতী যাত্রা অভিনেতাকে ভালোবেসেছে, বিয়ের পর স্বামীর সুদিন দুর্দিনে নিজেকে ভুলে কেবল তাকে আঁকড়ে বেঁচে থেকেছে। পৌরাণিক সতী স্বামীর গৌরব প্রতিষ্ঠিত করতে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। পৌরাণিক আখ্যানে তার উজ্জ্বল মহিমা ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রভাব রেখেছে, তার সতীত্ব নারীদের অনুপ্রাণিত করেছে। নাটকের সতী ব্যাপক অর্থে তাই সুদিন দুর্দিনে আজীবন স্বামীকে আগলে রাখতে সচেষ্ট সকল ভারতীয় নারীর প্রতিনিধি।

মনসামঙ্গল মধ্যযুগের আখ্যান কাব্য। তবে, দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও শিব পার্বতীর মত প্রসন্ন আর সতীর গভীর দাম্পত্য প্রেম চির নবীন তথা চিরন্তন। আবার চাঁদের প্রতাপ, অহংকার, উগ্রতা, জীবনে বার বার ক্ষমতাশালীর হাতে নিপীড়িত হতে হতেও বেঁচে থাকার আকুতি, প্রয়োজনে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন পথ ত্যাগ করে নতুন গড়ে ওঠা সাধারণ পথে এগিয়ে যাওয়া - এই সবটুকু চরিত্রে ধারণ করে জীবন নৌকায় এগিয়ে চলেছে আবহমান কাল ধরে শত

সহস্র প্রসন্নেরা। কালোর অন্তর্দ্বন্দ্ব, দ্বিধা বিভক্ত সত্তার অসহায় যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে তার পাপ বোধের হাহাকারে, পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনায় ভিন্ন মাত্রা পায়। দায়িত্বশীলা আশার দৃঢ়ভাবে সংসারকে বেঁধে রাখার আশ্বাসে, সর্বোপরি প্রসন্নর নবযুগ অপেরায় যুক্ত হয়ে উত্তরবঙ্গে পাড়ি দেওয়ায় এ নাটকে মনসামঙ্গলের উপসংহার নতুন তাৎপর্যে ফিরে আসে। চাঁদের মনসা পূজা, আর প্রসন্নর গোদা মালোর চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বেরিয়ে পড়ায় কেবল হেরে যাওয়া, আর সমঝোতার ছবি তুলে ধরে না বরং প্রসন্নর গান হয়ে ওঠে হারতে হারতেও জেতার স্বপ্ন নিয়ে বাঁচা সকল মানবের জীবনের গান।

শেখর দেবরায়ের *মনসাকথা* নাটকে মনসামঙ্গলের কাহিনি বহুমাত্রিক তাৎপর্যে উপস্থাপিত হয়েছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্য পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল। চাঁদ মনসার বিবাদ এই বিস্তৃত কাব্যধারার মূল বিষয় হলেও আধুনিক সাহিত্যে বিনির্মাণের ধারায় এর নানাবিধ তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। এই অধ্যায়ে আলোচিত নাটকগুলিতেও মনসামঙ্গলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন নাট্যকারের পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গেছে। দক্ষিণ আসাম বা বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট মনসাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি 'ওঝার গান'এর আদলে নাট্যকার অভিনেতা শেখর দেবরায়ের 'মনসাকথা'য় (প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০২) একাধারে বহুমাত্রিক তাৎপর্যের প্রতিফলন দেখা যায়। জাতিভেদ, আর্য অনার্য সংঘাত, ধর্মীয় মৌলবাদ, পুঁজিবাদ, উগ্র পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা, শ্রেণি সংগ্রাম ইত্যাদি বহুবিধ তাত্ত্বিক ভাবনা এক কৃত্রিম উপভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে নাটকে।

নাটকে দেখা যায় মনসামঙ্গলের ভাষাতেই চাঁদ মনসাকে *লঘুজাতি কানী* বলে ঘৃণা প্রকাশ করে। লঘু জাতি বলতে এখানে নাগ বংশকে বোঝানো হয়েছে। প্রাচীন ভারতে রচিত সাহিত্যে নাগ আর সাপ কিন্তু একার্থবাচক ছিল না। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতে নাগ জাতির উল্লেখ আছে, যারা বিষবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এরা চিকিৎসা বিদ্যায় এবং আত্মরক্ষায় বিষের সুচারু প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ত করেছিল। এরা মাথায় ধারণ করত সাপের ফণা চিহ্নিত মুকুট। বিষবিদ্যা এবং সাপের ফণা চিহ্নিত মুকুট থেকেই কালে কালে সাপ আর নাগ একার্থবাচক হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। *মনসাকথায়* দেবী মনসা চাঁদের সঙ্গে প্রাথমিক ভাবে সংঘাতে অবতীর্ণ হতে চাননি। চাঁদের গালিগালাজ, অপমান সহ্য

করেও তাকে ধৈর্য সহকারে বুঝিয়েছেন সে যেন নাগদের মনসা পূজায় বাঁধা না দেয়। সকলের হিত সাধনেই, সমাজের প্রকৃত মঙ্গল, একনায়কতন্ত্রের কুটিলতায় সর্বনাশ অনিবার্য। সমাজপতি হিসেবে চাঁদের কর্তব্য সকলের ধর্ম কর্মের প্রতি সমানুভূতি সহমর্মিতা বজায় রাখা। নাগেরা মাথায় সাপের ফণা ধারণ করে, এই চিহ্ন টুকু ছাড়া নাগ আর মনুষ্যে কোনও প্রভেদ নেই।

স্পষ্টত জাতিভেদের বিরুদ্ধে এখানে সোচ্চার হয়েছেন মনসা। আদিম জাতি বলে নাগেরা তুচ্ছ হতে পারে না, তাদেরও ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। বেশভূষা বা আচার আচরণ শিক্ষা দীক্ষায় পার্থক্য হলেও মানবতার সূত্রে সকলেই সমান - এই সাম্যবাদের আর্তিও প্রকাশ পেয়েছে মনসার বয়ানে। পাশাপাশি মনসার প্রতিবাদে এসেছে চাঁদ বণিকের ধর্মীয় মৌলবাদের বিরোধিতা তথা শাসক শোষিতের দ্বন্দ্ব তথা পুঁজিবাদী শ্রেণির দুর্নীতির ব্যাখ্যা। মাঝিমাল্লার মত সাধারণ মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রমে ডিঙ্গা বায়, ফলে চাঁদের মত বণিকের দিনে দিনে অর্থ প্রতিপত্তি বাড়াতে থাকে। অথচ যাদের পরিশ্রমে ধন সম্পত্তি উত্তরোত্তর বাড়ে, তাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নেই। লঘুজাতির পরিশ্রমের পুঁজি করায়ত্ত করতে কোনও বাঁধা নেই, কিন্তু তার দেবতা অস্পৃশ্য ঘৃণ্য বলে ধিক্কৃত হয়। চিরকাল মাথা নত করে কোন জাতি থাকেনি, আর্থিক সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তিতে পিছিয়ে থাকা নিম্নবর্গের মানুষগুলিও ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য চাঁদের মত ক্ষমতাবানের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে। এভাবেই শেখর দেবরায়ের নাটকে চাঁদের আর্যত্বের উগ্র অহঙ্কার, চরম একনায়কতন্ত্রী মনোভাবের বিরুদ্ধে ঘোষিত হয়েছে মনসার শ্রেণী সংগ্রামের আহ্বান ।

চাঁদ মনসার পূজাঘট ভাঙলে সনকা আর মাঝিমাল্লাদের কথোপকথনে ধরা পড়েছে বণিক মালিক শ্রেণির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের বঞ্চনা তথা ক্ষোভের কথা। বণিক আগমনের আগে জলে জঙ্গলে পূর্ণ দেশে শিক্ষা দীক্ষা হীন সাধারণ মানুষেরা সহজ সরল জীবন যাপন করত। বণিকরা এসে তাদের জীবনকে বদলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখাল। সাধারণ মানুষেরাও তাদের নির্দেশ মত প্রাণপাত করে পরিশ্রম করতে লাগল। কিন্তু তাদের দুঃখ দারিদ্র্য ঘুচল না। উপরন্তু এই সাধারণ মানুষগুলির ধর্ম পালনের ওপর জারি হল কড়া নিষেধাজ্ঞা। মালিকের বিরুদ্ধাচরণ করলে পেতে হবে কঠিন দণ্ড। কেবল স্বধর্ম পালনে

দণ্ডাজ্ঞা নয়, নিজ ধর্মের বিরোধিতা করতে হবে মালিকের কথা মত। অর্থাৎ পথেঘাটে সাপ দেখেও কেউ যদি তাকে না মারে, সে চাঁদের শত্রু বলে বিবেচিত হবে। চাঁদের নির্দেশ মত সাপ মেরে দেখালে সে পাবে বিশেষ পুরস্কার। অর্থাৎ কখনও ভয় কখনও লোভ দেখিয়ে, যেন তেন প্রকারেণ চাঁদ নিজের কায়েমী স্বার্থকে বহাল রাখতে চেয়েছে। উল্লেখ্য নাটকে চাঁদের চেহারার যে বর্ণনা রয়েছে, তা এই রকম - পূর্ণিমার চাঁদের মত তার উজ্জ্বল রঙ, দীঘল শরীর, চোখে বুদ্ধিমত্তার আলো, ব্যক্তিত্বে বলিষ্ঠতা। এ বর্ণনা তো আর্যের সুঠাম দেহাবয়বকেই চিহ্নিত করে। মাঝিদের কথায় বণিকদের আগমন ঘটে উত্তর দিক থেকে। ব্যবসার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চার দিকের জেল্লা দেওয়া ঘরবাড়ি, আর্যদের আগমন এবং নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার সূত্রপাতকেই নির্দেশিত করে। অর্থাৎ মালিক শ্রমিক সংঘাতের বিষয়টি আর্য অনার্য সংঘাতের প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয়েছে এ নাটকে।

মাঝি মাল্লাদের ধর্ম পালনে চাঁদের নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে গায়েনের কথায় উঠে আসে সভ্যতার উন্মেষ থেকে আবহমান কালের মানুষের কাছে ধর্ম সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা। বিশাল বটগাছের মতই ধর্ম এবং সংস্কৃতি জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত মানুষকে শান্তির আশ্রয় দেয়। প্রতিটি জাতির মানুষের অন্তরেই জন্মের পর থেকে তার নিজ নিজ ধর্ম আচার আচরণ তথা সংস্কৃতির বীজ উপ্ত হয়। পরের চাপিয়ে দেওয়া ধর্মাচার মানুষকে তার পরিচিত জীবনবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। ফলে, বিচ্ছিন্ন অন্তরাত্মার অতৃপ্তি নিয়ে সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়। সোচ্চার হয় নিজ ধর্ম সংস্কৃতি রক্ষার সম্মিলিত বিদ্রোহে। 'মনসাকথা'য় মনসার নেতৃত্বে মাঝিমাল্লাদের সংগ্রামে সেই বিদ্রোহেরই প্রকাশ।

এই নাটকের বেহুলা কেবল সতীত্বের গৌরবে অসাধ্য সাধনকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং সে বীরাঙ্গনা। যে চম্পাইবাসীদের স্পষ্টই জানিয়েছিল, যারা বিষ দেয়, বিষ তোলার বা বিষ হরণের বিদ্যাও তারা জানে, সুতরাং সমাজপতি শ্বশুর চাঁদ বণিকের আপত্তি সত্ত্বেও সে স্বামীর মরদেহ নিয়ে উজানে ভাসবে। ধন জন ফিরিয়ে আনতে পারলেই বেহুলা ফিরবে, নয়তো এই গাঙুরের জলেই সে প্রাণ বিসর্জন দেবে। নাগ লোকে পৌঁছে মাতা সম্বোধনে মনসার কাছে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইলে দেবী জানান, যে চাঁদ নাগবংশ উচ্ছেদ করতে চায়, নারী যার কাছে মূল্যহীন, অবজ্ঞার পাত্রী তার দম্ভের বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত মনসাও

লড়াই থেকে সরে যাবেন না। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বেহুলা মনসার কাছে প্রশ্ন তোলে, চম্পকের মাঝি মাল্লারা মনে প্রাণে মনসার উপাসক হয়ে কোনও শান্তি কি পেয়েছে? বাণিজ্য জাহাজ বোঝাই করে ধন সম্পদ বয়ে আনলেও সে সম্পদে কেবল চাঁদের অধিকার। লক্ষিন্দরকে বাঁচিয়ে দিলেই চাঁদের এই একাধিপত্য খর্ব করা সম্ভব। লক্ষিন্দর বাঁচলে চম্পকবাসীর সামনে মনসার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন আর দেবীর উপাসনার জন্য মাঝি মাল্লাদের লুকোচুরির দরকার হবে না, চাঁদও মনসা পূজা করতে বাধ্য হবে। যে মেয়ে মনের জোরে দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে পারে, নাগকুলের দাবি দাওয়া আদায়ের স্বপ্নও তার মত নির্ভরযোগ্য মেয়ের হাতে নিশ্চিন্তে দেওয়া যায় - একথা ভেবেই নেতা ও মনসা বেহুলার প্রার্থনা পূরণ করেন। এভাবেই বেহুলা কাতর প্রার্থনায় নয় বরং বীরত্বে ও বুদ্ধিমত্তায় নিজ জয় অর্জন করে। উদ্ধার করে স্বামী, ছয় ভাসুর, শঙ্খ ওঝা সহ চোদ্দ ডিঙা মধুকর। আগত ভবিষ্যতে পিছিয়ে পড়া জনজাতির শিক্ষায় সম্মানে সামাজিক অবস্থানে সমানাধিকারের স্বপ্নও একদিন বেহুলার প্রতিনিধিত্বে পূর্ণতা পাবে, এই বিশেষ তাৎপর্যেই এ নাটকে বেহুলার স্বাতন্ত্র্য তথা বিশিষ্টতা।

মনসাকথা গ্রন্থের ভূমিকায় *মঞ্চ নির্মাণ* শীর্ষক রচনায় নাট্যকার বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি *ওঝার গান* এর প্রসঙ্গ এনেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার মত দক্ষিণ আসামেও মনসামঙ্গল নৃত্যগীত সহ পরিবেশিত হয়। কোথাও সে পরিবেশন একক অভিনয় কোথাও বা দলগত অভিনয়ে সমৃদ্ধ। তবে সর্বত্রই থাকে যন্ত্রীদের উপস্থিতি। নাচ গান সহকারে একক অভিনয়ে উপস্থাপিত বরাক উপত্যকার মনসামঙ্গল গান *ওঝার গান* নামে পরিচিত। নাট্যকার ওঝার গানের উপস্থাপনায় বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র পাখোয়াজ এর ব্যবহারের কথাও বলেছেন। *মনসাকথা* নাটকটি সামগ্রিকভাবে এই *ওঝার গান* এর আদলেই রচিত। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের মনসা যাত্রার মত এখানেও গায়েন, বায়েন, দোহার সবাই মিলিতভাবে সূচনার বন্দনা গানে অংশগ্রহণ করেন। কবি, ঔপন্যাসিক অমিতাভ দেব চৌধুরীর লেখা থেকে জানা যায়, শিলচরের জেলা গ্রন্থাগার মঞ্চে আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় নাট্যকার শেখর দেবরায় মনসাকথা নাটকটি একক অভিনয় দক্ষতায় গায়েন, কথক, সহ অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। পাণ্ডুলিপি

অবস্থায় নাটকটি আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশে মঞ্চস্থ হওয়ার কথা জানা যায় নাট্যকারের লেখা থেকে। *ওঝার গান* লোকসংস্কৃতির এক স্বতন্ত্র শৈলী। আর ওঝার গানের মোড়কে লোকভাষায় উপস্থাপিত মনসামঙ্গল কাহিনি বিষয়ক নাটক সুচারু সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের পরিচায়ক।

মনসামঙ্গলের ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যে দিয়ে এক উগ্র পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, পুঁজিবাদী মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার আদায়ের লড়াই, জাতিভেদের বিরোধিতা, সাম্যবাদ তথা প্রকৃত সমাজতন্ত্র গঠনের লড়াই - এই বহুমাত্রিক তাৎপর্য একাধারে রূপায়িত হয়েছে শেখর দেবরায়ের মনসাকথায়।

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের *মনসামঙ্গল* নাটকে মনসার কাহিনিতে যুক্তিতেই দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আলোচিত মনসামঙ্গল কেন্দ্রিক নাটকে বেহুলার সতীত্বের জয়গান পাই সর্বত্র। হরনাথ বসুর নাটকের শিরোনাম *বেহুলা* (১৯১০), পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের নাম *চাঁদ সদাগর (বেহুলা)* (১৯৩০)। আবার মনসামঙ্গলের কাহিনি নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্রেও বেহুলাই মুখ্য নামচরিত্র রূপে উপস্থিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে। জাহির রায়হানের *বেহুলা* (১৯৬৬), অমল দত্তের *বেহুলা লখিন্দর* (১৯৭৭) মনোজকুমারের *সতী বেহুলা* (২০১০) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আবার স্টার জলসার বাংলা ধারাবাহিকেও *বেহুলা* (২০১০)র অসাধ্যসাধনের কাহিনি। চাঁদ বণিকের পৌরুষ তো বটেই, বাঙালীর কাছে আসলে মনসামঙ্গল বেহুলার স্বামী বাঁচানোর গান বলেই জনপ্রিয়। বাঙালির কাছে স্বামীর ও সংসারের কল্যাণে নারীর ভূমিকা, নারীর সতীত্বের সংস্কার এতখানি গাঢ় বলেই বাঙালীর সংস্কৃতি জগত ঘিরে থাকে বেহুলা।

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের *মনসামঙ্গল* নাটক ২০১৬ সালে প্রকাশ ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় নান্দীপট থেকে প্রথম অভিনয় হয়, নাটকটি ধানসিড়ি থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ ২০১৮'র জানুয়ারি। মুদ্রিত পাঠের ভূমিকায় নাট্যকার লিখছেন, *এ নাটক বেহুলারই নাটক* । নাটকের শেষেও সূত্রধরের সংলাপে রয়েছে মনসামঙ্গল না হয়ে বেহুলামঙ্গল নামের সম্ভাব্য যথার্থতা প্রসঙ্গ। উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে সাবিত্রির আদর্শে সতীত্বের জোরে অসম্ভবকে

সম্ভব করার এতকালের গতানুগতিক ছককে ভাঙা হয়েছে। এ নাটকে শিব বা ইন্দ্র নয় নিজের স্বাধীন যুক্তি বুদ্ধিকেই বেহুলা দেবত্বের আসনে বসিয়েছে এবং জয় অর্জন করেছে। এখানেই তার বিশিষ্টতা। চাঁদ ও মনসা দুই এরই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে সমর্থ হয়েছে সে। ফলে নাটকের শেষে চাঁদ মনসার মিলন হয়েছে আন্তরিক। এভাবেই সম্পূর্ণ নতুন রূপে আধুনিকা বেহুলাকে আমরা পেয়েছি। মধ্যযুগের কাব্য কাহিনি আধুনিকত্ব পেয়েছে এই যুক্তিবাদী বুদ্ধিমতী বেহুলাকে অবলম্বন করে।

ইউরোপে প্রচলিত প্রাচীন গল্প কাহিনি অবলম্বনে আধুনিক নাটক নির্মাণের প্রবণতা বিশিষ্ট নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে আকৃষ্ট করে প্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী কাহিনি পুনর্নির্মাণ করার দিকে। সেইমতই বাংলাদেশের প্রাচ্যদর্শনের আধারস্বরূপ মঙ্গলকাব্যকে বেছে নেন নাটককার। প্রথমেই সর্বাধিক জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্য মনসামঙ্গলের কাহিনি আশ্রয়ে *মনসামঙ্গল* নাটক লেখেন। পরবর্তী কালে লেখেন *বিদ্যাসুন্দর* (বহুরূপী নাট্যপত্রে প্রকাশিত)। বর্তমানে ধর্মমঙ্গলের কাহিনি নিয়েও নাটক লেখার কথাও জানিয়েছেন নাট্যকার। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মূল কাহিনি অনুসারে *মনসামঙ্গল* নাটকটি লিখলেও নিজ বক্তব্য পরিবেশনের মৌলিকতায় এতদিনকার চেনা ছককে ভেঙেছেন তিনি, এবং নিঃসন্দেহে উৎকর্ষের নতুন স্তর ছুঁয়েছেন। নাট্যকারের কথায় বহু কবির হাতে লেখা হলেও মনসামঙ্গলের সাধারণ কাহিনির মধ্যে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যার জন্যই মধ্যযুগের এ কাব্য বার বার নানা ভাবে ও রূপে বাঙালির জীবনে ফিরে ফিরে আসে। যেমন দেবকন্যা হয়েও যে মনসা ব্রাত্য, এর মধ্যেও লুকিয়ে আছে প্রান্তিকরণের রাজনীতি। অথবা রাজনৈতিক দলাদলির কারণে সাধারণ মানুষের চরম বিপর্যয়ের প্রতিফলন মনসামঙ্গলের বেহুলার জীবন। পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের বহু মর্যাদাপূর্ণ উৎসব উপলক্ষে নান্দীপট প্রযোজিত প্রকাশ ভট্টাচার্য পরিচালিত উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা *মনসামঙ্গল* নাটকটির অভিনয় ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি উৎসবের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন - *Bharat Rang Mahotsob by National School of Drama (2017), National Theatre Festival of Karnataka, Rang Sangam - A National Theatre Festival by*

Sangeet Natak Academy (New Delhi), Bahirbanga Natyotsob by Govt of West Bengal & Paschimbanga Natya Academy (Mumbai) ।

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় তার *মনসামঙ্গল* এর ভূমিকায় নাটকের প্রধান উৎস কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে নাট্যকার স্বকীয় কল্পনায় চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে অনেক বেশি মানবিক। সুগায়ক চাঁদ বণিক ক্ষমতার উগ্র আস্ফালনে মনসার সঙ্গে বিবাদে হারিয়ে ফেলে তার সুকণ্ঠ। যে চাঁদ চ্যাংমুড়িকানি বলে সর্বদা মনসার প্রতি ঘৃণার প্রকাশ করেছে, সম্পদ বোঝাই বাণিজ্য তরীর ভরাডুবিতেও মনসা পূজা না করার নিজ প্রতিজ্ঞায় যে অটল ছিল, সাত পুত্রের প্রাণ গেলেও মনসার কাছে যে মাথা নত করেনি, সুকণ্ঠ হারিয়ে সে হাহাকার করেছে, দেবী সম্বোধনে মনসার কাছে কাতর আর্তি জানিয়েছে, প্রাণের বিনিময়েও তিনি যেন তার সুর ফিরিয়ে দেন। মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের মতই এ নাটকের চাঁদ কামুক, নিজের কামোত্তেজনায় যে হারায় মহাজ্ঞান। তবে ছদ্মবেশী মনসার সামনে নিজের ছয় পুত্রকে বলি দেওয়ার এবং স্ত্রী সনকাকে দাসী করে রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় কেবল হিতাহিত জ্ঞান হারানো নয় বরং চাঁদকে নৃশংস হিংস্র বর্বরোচিত মনোভাবের করে তুলেছেন নাট্যকার। এ হেন চাঁদের মুখে সুর হারানোর হাহাকার, এবং জীবনের বিনিময়েও সুর ফিরিয়ে দেবার আর্তি, তার শিল্পী সত্তার প্রতি চরম মমত্বের প্রকাশ। পাশাপাশি শিল্পের প্রতি চাঁদের এই দুর্বলতা তাকে অনেক বেশী মানবিক করেছে।

কেতকাদাসের কাব্য সহ অধিকাংশ মনসামঙ্গলেই লক্ষিন্দরের মৃত্যুর জন্য সনকা মনসার বিরোধিতাকারী নিজ স্বামীকেই দায়ী করেছে। উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের মনসামঙ্গলে সনকা নিজ কনিষ্ঠ সন্তানের মৃত্যুতে পাগলিনী প্রায় হয়ে বেহুলাকেই তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী করে তাকে চুল ধরে প্রহার করেছে, সঙ্গে পিশাচিনী, খণ্ড কপালিনী ইত্যাদি বলে অকথ্য ভাষায় চলেছে গালিগালাজ। আবার বেহুলা তাকে যখন লক্ষিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনবে বলে আশ্বস্ত করেছে, সন্তানকে ফিরে পাবার আশায় তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাকে প্রহারের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে এবং পুত্রবধূর কাছে ক্ষমা চেয়েছে সনকা। শেষ সন্তানকেও হারিয়ে ফেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে এ হেন আচরণ নাটকের সনকাকে অনেক বেশি জীবন্ত ও মানবিক করে তুলেছে।

নাটকের আর এক মা অমলার কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। বাসর রাতে স্বামীর মৃত্যুর মত মর্মান্তিক ঘটনায় মেয়ের প্রতি সহানুভূতি দেখায়নি সে। বরং শ্বশুর বাড়িতে থেকে বৈধব্যের নির্যাতন সহ্য করার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় মনে করেছেন অমলা। তাই মেয়েকে বিষ দিয়ে নিজেও বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছেন তিনি। বিধবা নারীকে যে সামাজিক ও পারিবারিক নানারূপ নির্যাতনের শিকার হতে হয় আবহমান কাল ধরে, অমলার সংলাপে যেমন তারই প্রকাশ তেমনই কন্যার জীবনের এই বিপর্যয় সাময়িকভাবে তার নিজেরও বেঁচে থাকার ইচ্ছেকে নিঃশেষ করেছে, তাও প্রকাশিত হয়। কেতকাদাসের কাব্যে আছে বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে জলে ভাসার পর তার মা অমলার নির্দেশে তার ভাইয়েরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল। লক্ষিন্দরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উজানি নগরে খবর পৌঁছে যাওয়া মধ্যযুগে সহজ ছিল না। কিন্তু আজ প্রযুক্তির অগ্রগতিতে তা সম্ভব। তাই আজকের নাটকে জামাইয়ের মৃত্যু হতেই, খবর পেয়ে ছুটে আসে সায় আর অমলা। কিন্তু বিধবা নারীর পারিবারিক অবস্থান কিন্তু প্রায় একই থেকে যায়। তাই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মায়ের প্রতিক্রিয়ায় সন্তান সহ মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। এভাবেই গতানুগতিক ছক ভেঙে নাটকের অমলা অনেক বেশি বাস্তব হয়ে উঠেছে।

অধিকাংশ মনসামঙ্গলেই পাই লোহার বাসর ঘরে লক্ষিন্দরের আসঙ্গলিপ্সা এবং বেহুলার সংযমের কাহিনি। এ নাটকে এক্ষেত্রেও ছক ভেঙেছেন নাট্যকার। এ নাটকে রয়েছে বেহুলার রতিকামনা প্রসঙ্গ। উল্টোদিকে মৃত্যুভয়ে ভীত লক্ষিন্দর তার কামনায় সাড়া দিতে পারে না। লোহার বদ্ধ ঘরের মধ্যে অবস্থানকালে তার শারীরিক ধর্মও যেন অবরুদ্ধ হয়েছে। তাই সে বেহুলার কাছে গান শুনতে চায়, চায় কোনভাবে বেঁচে থেকে রাতটি কাটিয়ে দিতে। এখানেও লক্ষিন্দরের আচরণ মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিকতাকে ছাপিয়ে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত হয়েছে। কারণ বেহুলা জানত, হয়ত তাকে স্বামীর মৃত্যুর মত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। স্নানের ঘাটে বুড়ি ছদ্মবেশী মনসার অভিশাপেও সে ইঙ্গিত ছিল। লোহার কলাই সিদ্ধ করে যাকে নিজের ক্ষমতার প্রমাণ দিতে হয়েছিল, সে আসন্ন জীবনের জন্য সব রকম ভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিল। জীবনের সব রং সে যে আস্বাদন করতে চাইবে, এটাই তো স্বাভাবিক। আবার লক্ষিন্দর জানত পিতার সঙ্গে

মনসার বিরোধিতার জন্য বাসর রাতে তার সর্প দংশনে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। সুতরাং বিবাহ সুখে সে সুখী হতে পারে না। বাঁচার জন্য দিশেহারা অন্তর নিয়ে সে কোনও প্রকারে আতঙ্কের রাতটা পার করতে চেয়েছে। সুতরাং নাট্যকারের তুলিতে বেহুলা লক্ষিন্দর দুই চরিত্রের এই যে বদল তা অত্যন্ত সঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের *মনসামঙ্গল* এ বাস্তবসম্মত উপরোক্ত অভিনবত্বের দিকগুলি ছাড়াও দু'একটি সীমাবদ্ধতাও চোখে পড়ে। যেমন চাঁদ ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর বাণিজ্যে যাচ্ছেন। বহু বছর সফল ভাবে বাণিজ্য করার পর তার বাণিজ্য তরীর ভরাডুবি হয়েছে কালিদহে। সর্বস্বান্ত হয়ে সে চম্পকনগরে ফিরছে। ওদিকে চাঁদের অনুপস্থিতিতে সনকা আর্থিক দুর্দশায় পড়ে। চাঁদ ফিরে আসার পর তার অবস্থা ফেরাতে বন্ধু ধন্বন্তরি ওঝা সাহায্য করে। নিজের সমস্ত বিত্ত দিয়ে তিনি বন্ধুকে সাহায্য করেন, নতুন করে ব্যবসা শুরু করে জীবনে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেন। চাঁদও ঋণ হিসেবে তা গ্রহণ করে। অতঃপর ধন্বন্তরির প্রস্তাবেই বেহুলার সঙ্গে লক্ষিন্দরের বিবাহ দিচ্ছেন চাঁদ। মনসামঙ্গলে ধন্বন্তরি মনসার ধ্বংস করা চাঁদের বন উদ্ধার করে, তার পুত্রদের জীবন ফিরিয়ে, চাঁদকে বারবার বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিল বলেই তার মৃত্যু মনসার কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। নাটকেও চাঁদ মহাজ্ঞান এবং ধন্বন্তরি এই দুই অস্ত্রের জোরেই বলীয়ান ছিল। কিন্তু নাটকে ধন্বন্তরির মৃত্যু প্রসঙ্গ নেই। উপরন্তু লক্ষিন্দরের বিবাহকালেও সে জীবিত। এখানে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে চাঁদের প্রথম ছয় সন্তান যখন সাপের বিষের প্রভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন ধন্বন্তরি তাদের প্রাণ বাঁচালো না কেন? বেঁচে থাকা সত্ত্বেও লক্ষিন্দরকে সাপে কামড়ালে ধন্বন্তরি তাকে বাঁচাবার কোনও চেষ্টা করলনা, এটা কীভাবে সম্ভব ? কালিদহে সর্বস্বান্ত চাঁদকে বিত্ত দিয়ে সাহায্য এবং ধন্বন্তরির মধ্যস্থতায় বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহ নাট্যকারের সংযোজিত এই দুটি দিক নাটকের বুনটকে কিছুটা দুর্বল করেছে, কাহিনি সংস্থাপনের পারম্পর্য এতে বিঘ্নিত হয়েছে।

আর একটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়, যদিও এক্ষেত্রে নাট্যকার কেবল বিষয়টির মূলের অনুসরণ করেছেন। চাঁদ বেহুলাকে লোহার কলাই সিদ্ধ করতে দিয়ে বলেছিল এই প্রথা তাদের বংশগত। বেহুলা অসাধ্য সাধন করেছিল মনসার আশীর্বাদে। বেহুলা অদ্বিতীয়া,

আর পাঁচজন মেয়ে যা পারে না, বেহুলা তা পারে, সে দেবীর আশীর্বাদেই হোক অথবা তার বুদ্ধিমত্তা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জোরেই হোক। তাই তার হাতে লোহার কলাই সিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু পারিবারিক প্রথা যদি হয়, সনকা এবং তার প্রথম ছয় পুত্রবধূর ক্ষেত্রেও একই পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকার কথা। এবং এও নিশ্চিত যে তারা কেউই সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হবে না। তাহলে এদের বিবাহ কী করে সম্ভব হল ? আবার মনসামঙ্গলেই আছে সনকা লোহার বাসর ঘর দেখতে গিয়ে যে লোহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরো পান এবং সেগুলই আঁচলে বেঁধে নিয়ে আসেন, এবং চাঁদের কাছে দিয়ে বেহুলাকে পরীক্ষা নিতে বলেন। তাহলে কীভাবে লোহার কলাই সিদ্ধ করার প্রথা বংশগত হল ? একটি সম্ভাবনা এরকম হতে পারে, বেহুলাকে পরীক্ষা করার জন্য চাঁদ লোহার কলাই সিদ্ধ করা যে বংশগত প্রথা, এরকম বলে মিথ্যা ফাঁদ পেতেছিল। সেক্ষেত্রেও চাঁদ চরিত্রের ক্ষুদ্রতাই প্রতিপন্ন হয়। মনসার সঙ্গে চাঁদের বিবাদের ফলস্বরূপ লক্ষিন্দরের জীবন সংশয় উপস্থিত হচ্ছে এবং সেখানে কোনভাবেই যার দায় নেই সেই বেহুলার ক্ষমতা পরীক্ষা করে ছেলের প্রাণ বাঁচাতে তাকে পরোক্ষে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানেও ক্ষমতাবানের রাজনৈতিক চক্রান্তই প্রতিপন্ন হয়।

এ নাটকের অনন্যতা বেহুলায়। মৃত স্বামীকে নিয়ে কলার ভেলায় ভাসার সময় দুবরাজপুর, নবখণ্ড, বাঁকা দামোদর পার হয়ে গাংপুরে এসে তার মান্দাসের বাঁশের গজাল খুলে যায়। ভেলা প্রায় দুখণ্ড হবার মুখে বেহুলা আপ্রাণ চেষ্টা করে কোনোক্রমে সেটিকে ঠিক করে। হাঙ্গর, কুমীর ইত্যাদি জলজন্তুরা বেহুলার চারপাশে ভাসতে থাকে। উপরন্তু জোঁক মৃতদেহকে বেড়ে ধরে। জোঁক ছাড়ালেও ছাড়তে চায় না, মৃতদেহের মাংসে লুকায়। মৃত দেহ পচে ফুলে উঠতে থাকে, দুর্গন্ধ ছড়ায়। কিন্তু এত প্রতিকূলতার মধ্যেও এ নাটকে বেহুলা মাথা নত করে না। মা মনসার কাছে সে দয়া ভিক্ষা করে না, বরং যুদ্ধ করার সামর্থ্য চায়।

নাটকে দেখা যায় কলার ভেলায় ভেসে যাওয়ার সময় মৃত লক্ষিন্দর বেহুলার সঙ্গে কথা বলে, এও বেহুলার একান্ত ইচ্ছারই কাল্পনিক প্রকাশ। জলপথে একাকি নারী দেখে গোদা যখন বেহুলার কাছে প্রণয় প্রার্থনা করছে, তখন বেহুলার সংলাপে নারীর অসহায়ত্বের

সুযোগসন্ধানী পুরুষ সমাজের বিকৃত কামনার প্রতি তীব্র ধিক্কার তথা আত্মরক্ষার জন্য প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। বেহুলা একই লালসার সম্মুখীন হয়েছে নারকেলডাঙা বৈদ্যপুরে এক বৈদ্যের কুৎসিত প্রস্তাবে। যেখানে বৈদ্য তার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেবার বিনিময়ে তিন দিন তিন রাত বেহুলার সঙ্গ প্রার্থনা করেছেন। বৈদ্যের প্রস্তাব নস্যাৎ করে বেহুলা এগিয়ে যায় নিজ লক্ষ্যে। এই সময় বেহুলার মুখে যে সংলাপ বসিয়েছেন নাট্যকার তা এ নাটকের প্রাণস্বরূপ। বেহুলার দৃঢ় বিশ্বাস যে সে তার প্রেমিক স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলবে। কারণ মৃত্যু নয় তার কাছে জীবন মহামূল্যবান। যে ভাগ্যদেবতা মানুষকে বিষ দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত করতে পারে, তিনিই ত্রাতার ভূমিকা নিয়ে মানুষকে জীবন দিতে পারেন। ভণ্ড বৈদ্যের চক্রান্তের ফাঁদে পড়ার মত মূর্খ সে নয়। বিনা কারণে লখাইএর মৃত্যু হয়েছে, তাই তার জীবনের অধিকার বেহুলার ন্যায্য পাওনা। মনসা বা শিব বেহুলার কেউ নয়। বেহুলার বা তার স্বামীর মরণ বাঁচন নিয়ে তাদের উদ্বেগের তো কোনো কারণ নেই। যে দেবতা মানুষকে মেরে মানুষের শাসন করে সেই দেবতার মুখে বেহুলা থুৎকার করে। এখানে স্পষ্টত যে শাসক শ্রেণি নিজের নিজের এবং তাদের দলের প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য অকারণে সাধারণ মানুষকে চরম মূল্যে ব্যবহার করে তাদের অন্যায় অমানুষিকতার প্রতি ধিক্কার জানিয়েছে বেহুলা।

স্বর্গে দেবতাদের তুষ্ট করতে বেহুলা নৃত্যকলা প্রদর্শনের মাধ্যমে অনায়াসে নিজের যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে চায়। এবং সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হলেও দেবতারা যখন বেহুলার ইচ্ছাপূরণ করতে তার ইন্দ্রপূজা শিবপূজা প্রভৃতি আনুগত্যের হিসাব চান, বেহুলা ইন্দ্রের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির প্রতিবাদ করে এবং যারা সাধারণকে ঠকিয়ে দেবত্ব অর্জন করেছে, তাদের দুর্বুদ্ধি তথা কুমতলবের প্রতিও ধিক্কার জানায়। এখানেই বেহুলা অনন্যা এত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে স্বর্গে পৌঁছেও সে স্বামীর প্রাণ ফেরাতে মিথ্যা তোষামোদের আশ্রয় নেয় নি। বরং লক্ষিন্দরের প্রাণ ফিরে পাওয়ার যে ন্যায্য অধিকার তার আছে, দেবতাদের সমক্ষে দৃঢ় কণ্ঠে সে ঘোষণা করেছে।

প্রাথমিকভাবে মনসা নিজের প্রতি আনা অভিযোগ অস্বীকার করতে চেয়েছে, এবং বেহুলাকে তার পায়ে ধরে কাঁদতে আদেশ দিয়েছে। মনসার প্রার্থনায় শিবও কন্যাকে

সমর্থন করে একই আদেশ করেছে। কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব বা মনসা কোন ক্ষমতাশালীর আদেশেই বেহুলা তাদের সামনে নতমস্তক হয়নি। সে চেয়েছে ন্যায় বিচার। বিনা অপরাধে লক্ষিন্দরের মৃত্যুর ন্যায়বিচার। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রের আহ্বানে আসা সাপেদের মধ্যে কালনাগিনির কাটা লেজ, বেহুলার আনা লেজের সঙ্গে জুড়ে যায়। বেহুলার সত্য প্রমাণের সামনে দাঁড়িয়ে মনসা বাধ্য হয় নিজের অপরাধ স্বীকার করতে। বেহুলা বোঝায় বিষ প্রয়োগ করে প্রাণের নিবেদন জাগানো সম্ভব নয়, জোর করে যা পাওয়া যায় তা আনুগত্য, পূজা নয়। বেহুলা ঘোষণা করে মনসার নির্দেশে তাকে দেবী বলতে পারে সে, তার অন্যায়কে ন্যায় বলতে পারে, কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে তার নাম করে থুৎকার করে বেহুলা। একেই হয়তো লোক দেখানো আনুগত্য বলে, যা কখনোই অন্তরের পূজা নয়। বেহুলার সংলাপে রয়েছে একদিকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যেও সত্যের জয়গান, অন্যদিকে ক্ষমতাশালী শ্রেণির পদলেহনকারী মুখোশধারী তোষামুদে শ্রেণির প্রতি ব্যাঙ্গের প্রকাশ।

বেহুলা, মনসার চরিত্রের সীমাবদ্ধতাকে নিজের যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে তুলে ধরে। ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে মনসা যেভাবে চাঁদের সন্তানদের একে একে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে তাতে কেবল দুর্বল মানুষের প্রতি সবলের অন্যায় আক্রোশই প্রকটিত হয়েছে। দেবীত্ব মমতা দিয়ে ভালবাসা দিয়ে অর্জন করা যায় অন্যায় আঘাত দিয়ে নয়। নিজের দুর্বলতা বুঝতে পেরে বেহুলার সামনে নত মস্তক হয় মনসা, প্রাণ ফেরায় লক্ষিন্দরের। শুধু তাই নয়, দেবতাদের চরিত্র অনুধাবন করে বেহুলা বুঝেছে, যে দেবকন্যা হয়েও মনসা যে দেবলোকে আসন পায় না, এখানে প্রত্যক্ষ রয়েছে এক প্রান্তিকরণের রাজনীতি। তাই সাধারণের মধ্যেই মনসা নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে, দেবসভায় নয়। তার যুক্তি মনসা বুঝেছে, এবং সাদরে গ্রহণ করেছ। তাইতো বেহুলার আহ্বানে সে স্বর্গ ত্যাগ করে তাদের সঙ্গে মানবলোকে এসেছে। এখানেই বেহুলা অদ্বিতীয়া। মনসার মত ক্রূর দেবীকেও নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছে সে।

যোগিনীর বেশে চাঁদকেও উপলব্ধি করিয়েছে তার শিব পূজার নামে কেবল আমিত্বের অন্তঃসারশূন্য দম্ভ সম্পর্কে। মানুষেরা মান্য করে তাই কেউ দেবতা হতে পারে। তাই তার শক্তি মানুষকেই আঘাত করে। চাঁদের হৃদয়েও ভালবাসা নেই কেবল অহং আছে। আবার

মনসার ক্ষেত্রেও তাই। দুজনেই অন্যের ওপর কেবল নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। বাম হাতের দুটি ফুলেই যে দেবী হারানো সবটুকু ফিরিয়ে দেন, তার প্রতি একটু ভালোবাসা রাখলে ক্ষতি নেই। বেহুলার মধ্যস্থতায় চাঁদ মনসার বিবাদ মেটে। মনসামঙ্গলের গতানুগতিক ছকের বাইরে এ মিলন আন্তরিক। এখানে কোনো জোর করে আদায় করা সমঝোতার সূত্র ক্রিয়াশীল নয়। বরং চাঁদ ও মনসা দুইয়েরই মানস বিবর্তনে এ মিলন আন্তরিক। আর এই বিবর্তনের সবটুকু কৃতিত্ব বেহুলার। তাই তো এ নাটক বেহুলার নাটক হয়ে থাকে। নাট্যকারের লেখনী আশ্রয়ে মনসামঙ্গলের মত ত্রিপদীতে সূত্রধরের শেষ সংলাপে বেহুলার এই জয়গাঁথায় যুক্তিতেই দেবত্ব অর্পিত হয় -

নতুন ত্রিপদী লিখি নতুন কাহিনি শিখি

চাঁদ মনসাতে হল ভাব

বেহুলার হয় যদি নারীর মহিমা অতি

জগজনে বুঝো এই মাপ।

'আমি আমি' ভাব ছাড়ো শুদ্ধ ভালোবাসা গড়ো

যুক্তিরে মানহ দেবতা

ক্ষেমানন্দে পূজি আমি উজ্জ্বল নামেতে

হল শেষ এই নাট্যকথা ।

মনসার সাপেদের বিষের অস্তিত্বও বহাল রইল জনকল্যাণের কাজে। সাপের বিষ মানুষকে মারতে নয়, মানুষকে বাঁচাতে ওষুধ তৈরির কাজে ব্যবহার হবে, নাটকের শেষে মনসার এই উক্তি, তার প্রকৃত দেবীত্বের পথ প্রশস্ত করে। আর সেই পথেই অ্যান্টি ভেনাম সিরামের ওপর গবেষণায় সাফল্য নিয়ে নতুন রূপে রূপক সাহার তরিতাপুরাণ উপন্যাসে ফিরে আসে মনসা।

তথ্যসূত্র

১) হরনাথ বসু, বেহুলা, প্রকাশকাল ২০১০, Digital Library of India।

২) পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়, চাঁদ সদাগর(বেহুলা), পাল ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৩০।

৩) মন্মথ রায়, চাঁদ সদাগর, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯৩০।

৪) তারাশঙ্কর মুখার্জী, মনসামঙ্গল, ১৯৫৯, Digital Library of India।

৫) অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সওদাগরের নৌকা, সম্পাদনা কৌশিক রায় চৌধুরী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৪।

৬) শেখর দেবরায় , মনসাকথা, নব চন্দনা প্রকাশনী, ২০১২।

৭) উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, তিনটি উজ্জ্বল নাটক, ধানসিঁড়ি, ২০১৮।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা চলচ্চিত্রে মনসা কাহিনীর প্রতিগ্রহণ

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথমযুগ থেকেই এর সঙ্গে পৌরাণিক ধর্মীয় কাহিনির যোগ। নির্বাক চলচ্চিত্রের প্রাথমিক পর্বে রুস্তমজি ধোতিওয়ালার পরিচালনায় *সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্র* (১৯১৭), *বিল্বমঙ্গল* (১৯১৯), *মহাভারত* (১৯২০), জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বিষ্ণু অবতার* (১৯২১), *ধ্রুবচরিত্র* (১৯২১), *মা দুর্গা* (১৯২১), *নল দময়ন্তী* (১৯২১), ইত্যাদি অজস্র পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র পাই। চলচ্চিত্রে শব্দ ব্যাবহারের যুগে এসেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। এই যুগের প্রাথমিক পর্বে পাই প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় *প্রহ্লাদ* (১৯৩১), জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় *বিষ্ণুমায়া (কংসবধ)* (১৯৩২), নরেশ মিত্র পরিচালিত *সীতা, সাবিত্রী,* জ্যোতিষ মুখার্জি পরিচালিত *সাবিত্রী,* অমর চৌধুরী পরিচালিত *রাধাকৃষ্ণ,* ইত্যাদি ধর্মীয় কাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্র। এই পথেই মধ্যযুগের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে রচিত মনসামঙ্গলের জনপ্রিয় কাহিনিকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রের বিনির্মাণ হয়।

বাংলায় মনসাকাহিনি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের চলন দুটি স্বতন্ত্র ধারায় -

১) মনসামঙ্গলের মূল কাহিনিই চলচ্চিত্রের আধার, আর

২) কোন একটি পারিবারিক বা সামাজিক কাহিনিতে দেবী মনসার মাহাত্ম্য প্রচার।

বাংলা ছাড়াও হিন্দি সহ নানা প্রাদেশিক ভাষার চলচ্চিত্রে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন সর্পকন্যার আখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। *নাগিনা* (১৯৮৬), *নাচে নাগিন গলি গলি* (১৯৯০), *নাগিন* (১৯৮৯), *নাগ-নাগিন* (১৯৮৯), *বিষকন্যা* (১৯৯১), *শেষনাগ* (১৯৯০) - এরকম কিছু জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমা। অন্যায়, অনাচার, প্রতিশোধ, নাগকন্যার বীণ বাজানো - ইত্যাদি এই ধারার চলচ্চিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। দুই বাংলায় এই উভয় ধারার চলচ্চিত্রের নির্মাণ

বিনির্মাণের ধারায় দ্বিতীয় ক্ষেত্রের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্যনীয়। বাংলা চলচ্চিত্রে মনসামঙ্গল তথা সর্পসংস্কৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত চলচ্চিত্রগুলি নির্বাচন করা হল।

- চাঁদ সওদাগর, পরিচালনা প্রফুল্ল ঘোষ (১৯৩৪)
- বেহুলা, পরিচালনা জাহির রায়হান (১৯৬৬)
- বেহুলা লক্ষিন্দর, পরিচালনা অমল দত্ত (১৯৭৭)
- মনসাকন্যা, পরিচালনা সুজিত গুহ (১৯৯১)
- নাগপঞ্চমী, পরিচালনা বিজয় ভাস্কর (১৯৯৪)
- মনসা আমার মা,পরিচালনা বিজয় ভাস্কর (২০০৪)
- সতী বেহুলা, পরিচালনা মনোজ কুমার (২০১০)

মন্মথ রায়ের লেখা পৌরাণিক নাটক *চাঁদ সদাগর* অবলম্বনে ১৯৩৪ এ প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় *চাঁদ সওদাগর* সিনেমাটি নির্মিত হয়। এই সিনেমায় ধীরাজ ভট্টাচার্য লক্ষিন্দর চরিত্রে, অহীন্দ্র চৌধুরী চাঁদ সদাগর চরিত্রে, দেববালা মনসা চরিত্রে, নীহারবালা নেতা ধোপানী চরিত্রে এবং শেফালিকা দেবী বেহুলা চরিত্রে অভিনয় করেন। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে চলচ্চিত্রটি দেখার সুযোগ নেই, তাই এর নিবিড় বিশ্লেষণ করা গেল না। তবে, সম্ভবত এটিই মনসামঙ্গলের কাহিনি নিয়ে গঠিত প্রথম চলচ্চিত্র।

মনসামঙ্গলের করুণ রসাত্মক জনপ্রিয় কাহিনি অবলম্বনে বিশিষ্ট সাহিত্যিক জাহির রায়হানের নির্দেশনায় ১৯৬৬ সালে মুক্তিপায় *বেহুলা* চলচ্চিত্রটি। চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় আমজাদ হোসেন। এই সিনেমায় বেহুলা ও লক্ষিন্দর চরিত্রে অভিনয় করেন কোহিনূর আক্তার সুচন্দা এবং আব্দুর রজ্জাক আর মনসা চরিত্রে সুমিতা দেবী। সিনেমাটি সেই সময় চরম জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্যিক সাফল্য পায়। চাঁদ বণিক আর মনসার বিবাদ এ সিনেমাতে নেহাতই সামান্য ভূমিকা নিয়েছে। অপরপক্ষে বেহুলার প্রেম, দৃঢ়তা, তথা অসাধ্য সাধনই হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্রের কাহিনির আধার।

সিনেমাটির শুরুতে দর্শকের সামনে যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে পদ্মাপুরাণের প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিহিত। বেহুলা সেখানে সকল সংসারী মানুষের প্রতীক। আর গাঙুর হল

সংসার সমুদ্র। বিড়ম্বিত ললাট লিখনকে মুছে নিজের হাতে বেহুলা পরেছে সৌভাগ্যের দৃপ্ত জয়টিকা। যে ব্যক্তি বেহুলার মত শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আশাকে সম্বল করে মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে জীবন যুদ্ধে তারই জয় হয়। বেহুলা লক্ষিন্দরের কাহিনি বা মনসামঙ্গল দেবতার নয় মানুষেরই জয়গাঁথা। *বেহুলা* সিনেমায় মনসামঙ্গলের কাহিনিকে যে অভিনব আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে তা নিম্নরূপ –

বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহ পূর্ব প্রেমের আখ্যান মনসামঙ্গলে নেই। বরং মনসার পালাগানে বিস্তৃতভাবে এই প্রেম সম্পর্কিত নতুন আখ্যান জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা লোকসমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। মনসামঙ্গল নিয়ে তৈরি প্রায় প্রতিটি বাংলা চলচ্চিত্রেই দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য এই প্রেমপর্ব জুড়ে দেওয়া হয়েছে। জাহির রায়হানের বেহুলায় যেভাবে বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহ পূর্ব প্রেম চিত্রায়িত করা হয়েছে, তা এইরকম- প্রিয় ময়ূরকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষিন্দর মৃগয়া করতে আসে মিছরিপুরে। পদ্মপুরাণের উজানিনগর, এ সিনেমায় মিছরিপুর। এই ময়ূরটি একটি সাপকে মারলে সাপের দেবী মনসা ক্রুদ্ধ হয়। মিছরিপুর মনসা দেবীর সাধনার রাজ্য, রাজা সায় তাই অপরাধীকে ধরে আনার নির্দেশ দেন। কিন্তু বন্ধুপুত্র লক্ষিন্দরের পরিচয় পেয়ে তিনি তাকে পরম সমাদরে অভিবাদন করেন এবং স্বাগত জানান। অতঃপর সায়ের গৃহে অবস্থানকালে বেহুলার সঙ্গে লক্ষিন্দরের প্রণয় সূচিত হয়।

মনসা সাপের দেবী। আর সাপ ময়ূরের খাবার। সুতরাং সাপের সঙ্গে ময়ূরের খাদ্য - খাদক সম্পর্ককে আশ্রয় করে মনসামঙ্গলের কাহিনিতে ময়ূর আখ্যান যুক্ত হয়েছে। মন্মথ রায় তার *চাঁদ সদাগর* নাটকে প্রথম এই ময়ূর প্রসঙ্গ কাহিনিসূত্রে যুক্ত করেন। পরবর্তী নাটক ও চলচ্চিত্রে মন্মথ রায়ের নাটকের প্রভাবেই ময়ূর আখ্যান যুক্ত হয়েছে। জাহির রায়হানের চলচ্চিত্রেও সেই প্রভাব স্পষ্ট।

মনসামঙ্গল ব্যতিরেকে লক্ষিন্দরের সর্প দংশনের এক ভিন্ন প্রেক্ষাপট সূচিত হয়েছে এই সিনেমায়। বেহুলা লক্ষিন্দরের কাছে তার প্রিয় ময়ূরটি চাইলে লক্ষিন্দর তাকে শর্ত দেয় ময়ূর নাচ শেখার এবং শর্তানুসারে আর কোন শিক্ষক না পেয়ে লক্ষিন্দরের কাছেই বেহুলা

ময়ূর নাচ শেখে। প্রাথমিক ভাবে লক্ষিন্দরের ময়ূর মিছরিপুরে সাপ মেরেছিল বলে ইতিপূর্বেই দেবী ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এবার বেহুলার ময়ূরনাচ শেখায় যার পর নাই কুপিত হন দেবী। তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে বেহুলাকে এ নাচ শিখতে বারণ করেন। বেহুলা এ আদেশ মানতে অস্বীকৃত হলে ক্রুদ্ধ মনসা তাকে বিবাহ রাত্রে স্বামীর সর্প দংশনে মৃত্যুর অভিশাপ দেয়। লক্ষিন্দরের সর্পদংশনে ছিল মনসার দুটি উদ্দেশ্য পূরণ। ইতিপূর্বে পারিবারিক বিদ্বেষের সূত্রে মনসাকে ঘৃণা করে বলে যে ঔদ্ধত্য লক্ষিন্দরের আচরণে প্রকাশ পেয়েছিল, তার সমুচিত শিক্ষা দেওয়া, পাশাপাশি অবাধ্য বেহুলাকেও নিয়ন্ত্রণ করা। ফলে মনসার ষড়যন্ত্রে বিশ্বকর্মা কারিগর কর্তৃক লোহার বাসর ঘরে প্রবেশপথ নির্মাণ, এবং কালনাগিনীর দংশনে লক্ষিন্দরের মৃত্যু। চাঁদের নির্দেশে বিশ্বকর্মার লোহার বাসর ঘর গড়ার পর থেকে কাহিনি চলেছে মনসামঙ্গলের চেনা খাতে। কিন্তু চাঁদের কাছে মনসার পূজা আদায়ের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বেহুলার ময়ূর নাচ শেখার ফলে মনসার অভিশাপে লক্ষিন্দরের মৃত্যুর ঘটনা মনসামঙ্গলের চেনা ছকের বাইরে এক অভিনব প্রেক্ষাপট রূপায়িত করেছে সিনেমায়। পূর্বেই উল্লিখিত এই সংযোজনে মন্মথ রায়ের নাটকের প্রভাব স্পষ্ট।

সিনেমায় মূল কাহিনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্বকর্মার পরিবারিক জীবন চিত্রায়িত হয়েছে। মনসামঙ্গলের সব কবিই মনসার কোপ থেকে পুত্রের প্রাণ বাঁচাতে চাঁদের লোহার বাসর ঘর নির্মাণের কথা বলেছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে বিশ্বকর্মা কর্তৃক লোহার বাসর ঘর নির্মাণের কথা পাই[১] । জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে বিশ্বকর্মা বেঁধেছিল পাথরের ঘর বা *মেড় ঘর*[২]। দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে কেশাই কামারের লোহার মাঞ্জস নির্মাণের কথা পাই[৩],নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণেও লোহার গৃহ গড়েছিল কেসাই কামার[৪]। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে তারাপতি কর্মকার কর্তৃক লোহার বাসর ঘর নির্মাণের কথা রয়েছে[৫]। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে শিল্পকার গড়েছিল সোনার মন্দির[৬]। *বেহুলা* চলচ্চিত্রে মঙ্গলকাব্য অনুসারে বিশ্বকর্মার লোহার বাসর নির্মাণের প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু একই সঙ্গে বিশু কামারের পারিবারিক জীবনের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে এই সিনেমায়, যা মঙ্গলকাব্যের ঘটনায় অভিনব সংযোজন। সিনেমায় দেখানো হয়েছে বিশ্বকর্মা ঘরজামাই। সংসারে তার নিত্য অভাব। ফলে দিবারাত্র পত্নীর লাঞ্ছনায় দিন কাটে তার। এই প্রসঙ্গে

বিশু আর তার স্ত্রীর গাওয়া একটি গানের মাধ্যমে কৌতুক রসের আমদানি করা হয়েছে সিনেমায়। যেখানে বিশু বলছে, আলতা, আয়না প্রভৃতি মনোহারি জিনিস দিয়ে, আম জাম কলা খাইয়েও সে বৌ এর মন পায় না, উল্টে সে কাকের মত কা কা করে মারতে আসে তাকে। ফলে বিশু কামারের দুঃখে প্রাণ ফাটে। বিশুর স্ত্রী কমলি তাকে ঘরে ঢুকতে দেয় না, গানের কথায় স্বামীকে সে মিনসে, বুড়ো পাঠা, পোড়ার মুখো বলে গালি দেয়, এবং সর্বদাই ঝাঁটার বাড়ি মারতে উদ্যত হয়ে থাকে। প্রথমাবধি করুণ রসের কাহিনিতে এ হেন সংযোজন দর্শকদের কিছুটা কৌতুক রসের বাতাবরণে বিনোদনের জন্যই তৈরি। তবে বিশুর জীবনের পরবর্তী কাহিনির গাম্ভীর্য সমগ্র আখ্যানের সঙ্গে এই সংযোজিত অধ্যায়ের সুসঙ্গতি স্থাপন করেছে।

মনসার কথা মত লোহার বাসর ঘরে ছিদ্র রাখতে বিশ্বকর্মা যে প্রথমে রাজি হয়নি, তাকে ভয় দেখিয়ে এ কাজে বাধ্য করা হয়েছিল এ ঘটনা মঙ্গলকাব্য অনুসারী। বেহুলা সিনেমায় দেখানো হয়েছে যে বিশ্বকর্মাকে রাজি করতে মনসা তার বাড়িতে অনেকগুলি বিষধর সাপ পাঠায়। নিজের সন্তানদের বাঁচাতে বিশ্বকর্মা মনসার নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়। কিন্তু অনুতাপ আর অসহায়তায় অন্তরে ছটফট করতে থাকে সে। শেষে আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হয়ে নিজের পরিবার বা সন্তানদের নিরাপত্তাকে তুচ্ছ করে লক্ষিন্দরের প্রাণ বাঁচাতে তার বিবাহস্থলে ছুটে যায়। অঘটন ঘটার আগে লোহার ঘরে ছিদ্র থাকার কথা চাঁদকে জানাতে চায় সে। অতঃপর মনসার কোপে সে বাকশক্তি হারিয়ে চাঁদের কাছে এসে বাসর ঘরে ছিদ্রের কথা বোঝাতে চাইলে, মদ্যপ ভেবে চাঁদ তাকে বিয়ের আসর থেকে বের করে দেয়। বিশ্বকর্মার নৈতিক মূল্যবোধ, তার অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হৃদয়ের অসহায়তা, ক্ষমতাবানের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে ব্যর্থ প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ সব মিলিয়ে মনসামঙ্গলের অনুসারী ভাবকেই কাহিনিসূত্রে গেঁথে বিস্তৃতভাবে নিপুণতার সঙ্গে এ সিনেমায় তুলে ধরা হয়েছে।

বেহুলা সিনেমায় সায়বেনে ও তার স্ত্রী অমলার কথোপকথনে উঠে আসে চাঁদ ও মনসার বিবাদের প্রসঙ্গ। সেই কথাসূত্রেই উঠে আসে মনসার কোপে চাঁদের ছ'টি পুত্রের মৃত্যু, তার মহাজ্ঞান হরণ, ধন্বন্তরির মৃত্যু, সপ্তডিঙা মধুকরের ভরাডুবি, কালিদহে চাঁদের সর্বস্বান্ত

হওয়ার প্রসঙ্গ। মনসামঙ্গলের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির সিনেমায় কোন প্রত্যক্ষ উপস্থাপন নেই, কেবল সায়বেনে ও অমলার আলোচনায় উল্লেখমাত্র করা হয়েছে।

বেহুলা আর লক্ষিন্দরের বিয়ে ভাঙতে মনসা তৎপর হয়ে ষড়যন্ত্র করছে, এ ঘটনা কোন মনসামঙ্গল কাব্যে আমরা পাই না, বরং বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহই ছিল মনসার অভীষ্ট সিদ্ধির হাতিয়ার। অপরদিকে *বেহুলা* চলচ্চিত্রে দেখানো হয়, সায় বেনের রাজ্য মিছরিপুরে দেবী মনসার আরাধনা হত। তাই লক্ষিন্দরের প্রতি বেহুলার অনুরক্তি, তার কাছ থেকে ময়ূর নাচ শেখা মনসা একেবারেই মেনে নিতে পারেনি। ফলে স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে বেহুলাকে ময়ূর নাচ শিখতে নিষেধ করেন মনসা। এ ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সঙ্গে ভক্তরাজ্যের সম্পর্ক তৈরিতে দেবীর অপমানবোধ ক্রিয়াশীল ছিল। এই জন্যই বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহ ভাঙ্গার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন মনসা। মনসার ষড়যন্ত্রে ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী বেহুলার কাছে গিয়ে তৃষ্ণার জল চায়। বেহুলা তাকে জল দিলে সেই সুযোগে সে কৌশলে বেহুলাকে তার ললাট লিখনে আসন্ন ভবিষ্যতের নিদারুণ পরিণতির কথা বলে শঙ্কিত করে তোলে। ইতিপূর্বে মনসার অভিশাপে বিবাহ রাত্রে স্বামীর সাপের কামড়ে মৃত্যুর ভাবনায় বেহুলা সন্ত্রস্ত, বিষণ্ণ ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই ছদ্ম সন্ন্যাসীর কাছে এই বিপদ থেকে মুক্তির উপায় জানতে চাইলে তিনি বেহুলাকে অমাবস্যার রাতে শ্মশানে এক তান্ত্রিকের কাছে যেতে বলেন। প্রসাদ ভেবে তান্ত্রিকের দেওয়া সুরা মেশানো তরল পান করে বেহুলা অচেতন হয়ে যায়। বেহুলার সুরাপান ও শ্মশানে রাত কাটানোর খবর ছড়িয়ে পড়লে, চাঁদ বণিক অসতী কন্যার সঙ্গে নিজ পুত্রের বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হন। মনসা নিজের চক্রান্তে প্রাথমিক ভাবে সফল হন। বলা বাহুল্য এ কাহিনি মনসামঙ্গলের কাহিনী ধারায় একেবারে ভিন্নধর্মী।

সতীত্বের প্রমাণ দিতে বেহুলার অগ্নিপরীক্ষার কাহিনি, এ সিনেমার সংযোজন। মনসার ষড়যন্ত্রে অসতী অপবাদে লক্ষিন্দরের সঙ্গে বেহুলার বিবাহ সমন্ধ ভাঙতে বসলে দৃঢ়চেতা বেহুলা নিজেই তার সতীত্বের পরীক্ষার কথা বলেন। ফলত অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন কবির মনসামঙ্গলে চাঁদের দেওয়া লোহার কলাই সিদ্ধ করে বেহুলার সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার কথা রয়েছে। কোথাও আবার মরা শোল মাছ বেঁচে উঠেছে বেহুলার হাতে। নারায়ণদেবের মনসামঙ্গলে স্বামীকে নিয়ে স্বর্গ থেকে ফেরার পর বেহুলার সতীত্বের

প্রমাণের জন্য ভয়াবহ সব পরীক্ষার আয়োজন করতে দেখা যায়। *বেহুলা* সিনেমায় শ্মশানে অচেতন বেহুলাকে অসতী সন্দেহে চাঁদ নিজ পুত্রের সঙ্গে তার বিবাহে অসম্মত হয়, ফলত বেহুলা নিজেই পরীক্ষা দিয়ে সতীত্ব প্রমাণ করতে এগিয়ে আসে। অগ্নিপরীক্ষার দৃশ্যে নেপথ্য সঙ্গীত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সীতার জন্য রামের অসহায় আর্তি ভরা বেদনার গান। গানের কথায় শ্রীরাম কেঁদে কেঁদে সীতাকে ফিরে আসতে আহ্বান করছেন। রাজকন্যা রাজকুলবধূ সীতাকে সতী জেনেও অগ্নিপরীক্ষা নিতে হয়েছিল। অভিমানিনী জনক দুহিতা চলছেন, সোনার দেউলে মঙ্গলধ্বনি বাজছে। অমানবিক নিষ্ঠুর সমাজ বিধানের সামনে যুগে যুগে নারীদের শুচিতার পরীক্ষা দিতে হয়। এখানেই রামায়ণের সীতা আর চলচ্চিত্রের বেহুলা এক হয়ে যায়। গানটি নিঃসন্দেহে কাহিনির করুণ রসের আবহে এক স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করে।

স্বর্গসভায় বেহুলার ময়ূর নাচের প্রদর্শন এ সিনেমার অনন্য সংযোজন। বেহুলা নৃত্যবিদ্যায় পারদর্শী ছিল, একথা মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষিন্দরের কাছে বেহুলার ময়ূর নাচ শেখা, এবং স্বর্গসভায় দেবতাদের সামনে সেই নাচের প্রদর্শন, সাপ আর ময়ূরের বিবাদ সূত্রে এ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা *বেহুলা* সিনেমার অভিনব আয়োজন।

মনসামঙ্গলের প্রায় সব কবির কাব্যেই নেতাকে মনসার যাবতীয় ষড়যন্ত্রের পরামর্শদাতা হিসেবেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু *বেহুলা* সিনেমায় নেতার কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। বেহুলার অদৃষ্টের বিপর্যয়কে আটকাতে সে বার বার সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু মনসার একরোখা জেদি স্বভাবের সামনে সে কখনই নিজ বক্তব্যকে কার্যকর করতে পারেনি। বেহুলা, লক্ষিন্দরের কাছে ময়ূর নাচ শিখছে দেখে মনসা যখন ক্রোধে ফেটে পড়ে, নেতা তখন বেহুলার প্রতি স্নেহে মনসাকে শান্ত করতে প্রয়াসী হয় এবং নিজে গিয়ে অবুঝ বেহুলাকে বুঝিয়ে এ হেন কাজ করা থেকে বিরত রাখতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু মনসার উগ্রতার সামনে নেতার সহিষ্ণুতা হার মানে। আবার কালনাগিনী লক্ষিন্দরকে দংশন করার জন্য যখন পথে বেরিয়েছে তখন নেতা তার পথ আটকায়, এবং তাকে দংশনে বিরত থাকতে অনুরোধ জানায়। যদিও শেষ রক্ষা করতে পেরে ওঠেনা। কালনাগিনীও মনসার আজ্ঞাবাহী রূপে তার দায়বদ্ধতার কথা জানায়। নাগলোকে মনসার একাধিপত্য তথা

নেতার গুরুত্বহীনতা প্রকাশিত হয় সিনেমার পর্দায়। মনসামঙ্গলে নেতাই মনসার যাবতীয় কর্মের নিয়ন্ত্রক ছিল, কিন্তু *বেহুলা* সিনেমায় স্বতন্ত্রভাবে রূপায়িত নেতা চরিত্রটি ২০১৭-১৮ তে স্টার জলসা চ্যানেলের জনপ্রিয় ধারাবাহিক ভূমিকন্যার নেত্রা চরিত্রটিকে মনে করিয়ে দেয়। এখানেও একালের মনসা তরিতা নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় পথ চলেছে, নেত্রার পরামর্শ মত নয়। আবার সোনি টি.ভি. তে প্রচারিত হিন্দি ধারাবাহিক *বিঘ্নহর্তা গনেশ* (২০১৭- ২০১৯) এ নেতাই নেই, মনসাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন, প্রথমপূজ্য গনেশ এবং নাগমাতা কদ্রু। মনসার পরামর্শদাতা হিসাবে মঙ্গলকাব্যের কাহিনি নিয়ন্ত্রণে এক্ষেত্রে ছোট ও বড় পর্দায় উপস্থাপিত কাহিনিতে নেতার ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে।

বেহুলা চলচ্চিত্রে মর্ত্যের একটি সাধারণ মেয়ে হয়ে স্বর্গের দেবতাদের ধর্মাধর্ম তথা ন্যায় অন্যায়ের বিচারের দাবিতে ক্ষমতাশালী দেবদেবীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে বেহুলা। দেবসভায় সে কাতর আবেদনে স্বামীর প্রাণ ফেরায় নি, দেবতাদের শর্ত অনুযায়ী নৃত্য পরিবেশন করেনি। বরং দৃপ্ত কণ্ঠে জানিয়েছে, দেবতাদের খুশি করার উপায় তার জানা আছে এবং যে ময়ূর নাচ শেখার অপরাধে সে অভিশপ্ত হয়েছিল, সেই নৃত্যের পরিবেশনেই দেবতাদের মন জয় করেছে। দেবতার বিরুদ্ধে তার অনমনীয় বিদ্রোহ এভাবেই জয়যুক্ত হয়েছে। চাঁদের প্রসঙ্গে দেবকুলকে এক প্রকার শিক্ষা দিয়েই সে বুঝিয়েছে, ভক্তি জোর পূর্বক আদায় করা যায় না। চাঁদ এর অনমনীয় পৌরুষও বেহুলার প্রতি স্নেহের কাছে মাথা নুইয়েছে। বিদ্রোহে, প্রতিবাদে, যুক্তিতে, অর্জনে তাই মনসামঙ্গলের হয়েও জাহির রায়হানের সিনেমার বেহুলা আরও বলিষ্ঠ রূপে প্রকাশিত।

বেহুলা আদ্যন্ত গানে ভরা একটি চলচ্চিত্র। দু ঘণ্টার এই সিনেমায় রয়েছে মোট তেরোটি গান। সাধারণত যে কোন সিনেমার তুলনায় এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিতে গান রয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। ঘটনার প্রতিটি বাঁকেই পাওয়া যায় এক বা একাধিক গান। সিনেমায় প্রথম গানটি, *ও বেউলা সুন্দরি ও বেউলা নাচনী* বেহুলার সখীদের গাওয়া। নদীর জলে স্নানরত বেহুলাকে ঘিরে সখীদের আনন্দের অভিব্যক্তি। গানের কথায়, সদ্য যুবতী বেহুলার দেহ সৌন্দর্যের কথা নানা উপমায় তুলে ধরা হয়েছে। কখনও তার ঝলমলে চুল সম্পর্কে মেঘভরা আকাশে হেসে যাওয়া বিদ্যুতের তুলনা, কখনও বা কালো চোখের সঙ্গে ধারালো

বটির তুলনা করা হয়েছে আর এই সৌন্দর্যের কথা দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ার কথা। পরের গানটিও বেহুলার সখীদের গাওয়া। এটি বেহুলা লক্ষিন্দরের প্রেম পর্বের সূচনায় ব্যবহৃত। লক্ষিন্দরকে খুঁজতে নদী তীরে আসে বেহুলা। এই সময় সখীরা তার কলসিটি লুকিয়ে ফেলে। বেহুলা কিছুক্ষণ পরে কলসি খুঁজতে গেলে, সখীরা তাদের প্রেমের প্রেক্ষাপটে রাধাকৃষ্ণের যমুনার কুলে প্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এই গানটি গায়। কৃষ্ণপ্রেমে আকুল রাধা পিতলের কলসি নিয়ে যমুনায় যায়। যমুনার কালো জল ভরা প্রসঙ্গে সেই প্রেমের বিকাশ। কলসি যদি কৃষ্ণ হত, তাহলে তাকে গলার মালা করত রাধিকা, তার সঙ্গেই প্রেমরঙ্গে সদাসর্বদা মজত সে। কলসির স্পর্শেই অঙ্গ জুড়াত রাধার। এইভাবে *হায়রে পিতলের কলসি, তোরে লইয়া যাব যমুনায়* গানটিতে রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রেমের প্রেক্ষাপটে বেহুলা লক্ষিন্দরের মানবিক প্রেমের ভাষ্য রচিত হয়েছে।

তৃতীয় গানটি বেহুলা ও লক্ষিন্দরের গাওয়া দ্বৈত সঙ্গীত। প্রেমে তাদের হৃদয় নেচে উঠেছে, প্রাণ বীণায় সেই প্রেমের মূর্ছনা। দু'জোড়া চাতক সম চোখে বইছে প্রেমের ধারা, দুটি মন পাগল প্রায় ... ... ইত্যাদি কথায় *নাচে মন ধিনা ধিনা* গানটি তাদের একে অপরের প্রতি হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ স্বরূপ। চতুর্থ আর পঞ্চম গান দুটি বিশ্বকর্মা আর তার স্ত্রীর অম্ল মধুর দাম্পত্য সম্পর্কের কৌতুকরস মণ্ডিত প্রকাশ। *সীতা, ফিরে আয়, ফিরে আয়* এইরূপ ষষ্ঠ গানটি বেহুলার অগ্নিপরীক্ষার প্রেক্ষাপটে সীতার অগ্নিপরীক্ষায় ব্যাথাতুর রামের হৃদয় বেদনার আবহে করুণ রসের গান। সপ্তম গানটি বিশ্বকর্মার লোহার বাসর গড়ার আনন্দে গাওয়া – *বাসর বান্ধিলাম বান্ধিলাম লোহার বাসর ঘর* ইত্যাদি। লক্ষিন্দরের বিবাহ উপলক্ষে রাজ্যের সকলকে নিমন্ত্রণ করেন চাঁদ। চাঁদের কর্মচারী ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে নিমন্ত্রণের সময় আনন্দে গায় *সোনার লখাই টোপর পইরেছে...* এই গানটি। গানের কথায় রয়েছে লখাই বেহুলার বিবাহ প্রস্তুতির কথা, চাঁদের লোহার বাসর গড়ার প্রসঙ্গ, আবার অতিথি আপ্যায়নের ভোজন তালিকায় রকমারি মণ্ডা মিঠাই, হাজার গণ্ডা রুই, কাতলা, পাঁঠার ঝোলের উল্লেখ। নবম গানটি বেহুলার বিবাহের দিন এয়োদের গাওয়া। এগানের কথায় এসেছে বেহুলার সাজসজ্জা প্রসঙ্গ, চন্দন হলুদ মাখিয়ে তাকে গরুর দুধে স্নান করানো,

চোখে কাজল দেওয়া ... আবার দেশের সেরা কুটুম এসে সোনার বরণ বেহুলাকে নিয়ে যাবার কথা ইত্যাদি।

টান টান উত্তেজনাপূর্ণ বেহুলা লক্ষিন্দরের বাসর রাতের ঘটনা প্রবাহ দশম আর একাদশ গানদুটিতে তুলে ধরা হয়েছে। গানই এখানে সংলাপ, ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যম। লক্ষিন্দর বাসর রাতে বেহুলার সঙ্গে মিলিত হতে চাইলে সে তাতে আপত্তি জানায় দশম গানে। দ্বিতীয়া তৃতীয়া আর মঙ্গলবারে প্রথম মিলন অনুচিত। তাই এই তিন দিন ধৈর্য ধরতে সে স্বামীকে অনুরোধ করে। প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ্য যে বিজয়গুপ্ত, দ্বিজ বংশীদাস, বিপ্রদাস পিপলাই, জগজ্জীবন ঘোষাল, এদের সকলের কাব্যেই লোহার বাসর ঘরে লক্ষিন্দরের রতি প্রার্থনা আর বেহুলার সংযমের প্রসঙ্গ রয়েছে। নারায়ণদেবের পুঁথিটি মাঝখানে খণ্ডিত হওয়ায় লোহার ঘরে বাসর রাতের বিবরণ পাওয়া যায় না। আবার কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে বাসর রাতে পাশা খেলার ঘটনা থাকলেও লক্ষিন্দরের দেহ মিলনের প্রার্থনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ সেখানে নেই।

প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ করা যায় যে, মনসাপালার কবিগান বা কবিঝাঁপানে দেহতত্ত্বের নিরিখে বিষয়টিকে রূপক তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করা হয়। সেখানে বলা হয়, লক্ষিন্দরের এই অসংযমই তার মৃত্যুর কারণ। আর বেহুলার বুদ্ধিমত্তা তথা সংযমই তার জয়ের প্রতীক। আবার বর্তমান আলোচ্য সিনেমায় শুরুতেই পদ্মাপুরাণের সমগ্র আখ্যানকেই রূপক বলা হয়েছে – কারণ সেখানে বলা হয়েছে পদ্মাপুরাণ দেবতার নয়, দুঃখ কষ্টে নিমজ্জিত সংসারী মানুষের কাহিনি। এ দিক থেকে মনসাপালার কবিগানের ব্যাখ্যার সঙ্গে *বেহুলা* সিনেমায় উপস্থাপিত তাত্ত্বিক রূপের মিল পাওয়া যায়।

একাদশ গানটি একাধারে গান ও কবিতা। বাসর রাতে শঙ্খিনী নাগ লক্ষিন্দরকে দংশন করতে আসলে বেহুলা তার কাছে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে কাতর অনুরোধ করে। একই সঙ্গে বিষধর সাপের কবল থেকে ঘুমন্ত স্বামীকে বাঁচাবার প্রাণপণ প্রয়াসে রত বেহুলার একদিকে আতঙ্ক আর অপরদিকে সঙ্কল্পে দৃঢ়তা - সব মিলিয়ে সে নিজের অবস্থা বর্ণনা করেছে গানের মাঝে মাঝে তিনবার চার পংক্তির অন্তমিল যুক্ত কবিতায়। গানের কথায়

বেহুলা নিজের অন্তরের ব্যাথা জানায় নিষ্ঠুর নাগকে, জানায় পতিই নারীর ধর্ম কর্ম তথা জীবনের আলো। আর কবিতা অংশে বেহুলা চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী রেখে স্বামীকে বাঁচাবার দৃঢ় সঙ্কল্প নেয়। বাটি ভরা দুধ দিয়ে, ভাই সম্বোধনে তাকে নানা ভাবে প্রশংসার কথা রয়েছে কবিতায়। কবিতা অংশগুলি মঙ্গলকাব্যের পয়ারের আদলে রচিত। সাপের সঙ্গে সমন্ধ পাতিয়ে তাকে দুধ খাইয়ে কৌশলে তাড়াবার ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্য প্রভাব চোখে পড়ে –

বাটি ভরা দুগ্ধ আমি দিলাম তোমায়
তাহারে করিয়া পান লও গো বিদায়
সর্প ওরে সর্প তুমি সর্প মোর ভাই
তোমার তুলনা সর্প পৃথিবীতে নাই

[বেহুলা চলচ্চিত্রে একাদশ গানের মধ্যে ব্যবহৃত কবিতার তৃতীয় অংশ]

কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে বেহুলা রাতের তিন প্রহরে তিন নাগ বন্দী করেছিল একই কৌশলে –

কপাটের আড়ে দেখি ভুকল ভুজঙ্গ।
চমকিত বেহুলার বহিল তরঙ্গ।।
ব্যাথিত হইয়া বলে মধুর বচনে।
কাঞ্চনের বাটি দিল কাঁচা দুগ্ধ সনে।।
বেহুলা কহিল কে দাদা আইলে ত।
এতদিনে জানিলাম বাপের আছে পো।।[৭]

পরের গানটি লক্ষিন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলার বিয়ের সাজ একে একে খুলে ফেলার সময় নেপথ্যে পরিবেশিত হয়েছে। গানটির কথায় রয়েছে শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় নানা আভরণে বেহুলার সাজ সজ্জার কথা। গহনা খোলার প্রেক্ষিতে গহনা পরার গান আসলে ব্যর্থ সাজগোজকেই ব্যঞ্জিত করে। একই সাথে করুণ রসের মর্মান্তিক বেদনার আবহ তৈরি করে। সিনেমার শেষ গানটি বেহুলার মৃত স্বামী সহ কলার ভেলায় ভাসার সময়কার নেপথ্য সঙ্গীত। বিধির বিধানে বেহুলার ভাগ্য বিপর্যয়ের কথাই গানে তুলে ধরা হয়েছে।

বেহুলা চলচ্চিত্রে শীর্ষভাগ জুড়ে ব্যবহৃত তেরোটি গান কখনও ঘটনা প্রবাহের মাধ্যম রূপে, কখনও আবেগ ঘন প্রেমের উচ্ছাসে, কৌতুক তথা হাস্যরসের উপস্থাপনে, গানের মধ্যে কবিতার ব্যবহারে, সর্বোপরি মর্মান্তিক বেদনার আবহ তৈরি করে সিনেমাটিকে করে তুলেছে আদ্যন্ত গীতিময় । মধ্যযুগে মনসামঙ্গল পাঠ তথা গানের যে চল ছিল, তার প্রভাবেই আবহমান কাল ধরে চলে আসা মনসাকেন্দ্রিক লোকযাত্রা, রয়ানী, কবি ঝাঁপান ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির বহুমুখী ধারা নানাবিধ বিবর্তন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গানে গানে ভরে আছে। জাহির রায়হানের *বেহুলা* চলচ্চিত্রেও এই ব্যাপ্ত মনসাসংস্কৃতির গীতিময়তার বৈশিষ্ট্য সুচারুভাবে ধরা আছে।

জাহির রায়হানের চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রশংসক ছিলেন সমকালীন সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিনহা প্রমুখ বাংলা সিনেমার প্রথম সারির নির্মাতাগণ।*বেহুলা* চলচ্চিত্রের কয়েকটি অনন্য সাধারণ দৃশ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য - নদীতে গলা অবধি জলে চারপাশের সখীদের হাতের পারস্পরিক শৃঙ্খলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বেহুলা – *ও বেহুলা সুন্দরী* গানের দৃশ্য। অথবা প্রজ্জ্বলিত প্রদীপে সুসজ্জিত লোহার বাসর ঘর... লক্ষিন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলার আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে সারিবদ্ধভাবে পর পর সেই প্রদীপ সমূহ নিভে যাওয়া ও অন্ধকার নেমে আসার দৃশ্য। আবার বৎসরাধিক কাল বেহুলার কলার ভেলায় ভেসে যাওয়ার দৃশ্যটি, যেখানে ভাসমান কলার ভেলা প্রবল স্রোতে টালমাটাল, খোলা চুলে বিধ্বস্ত অবস্থায় তার ওপর ভেসে চলেছে বেহুলা। শ্বাপদ সঙ্কুল যাত্রাপথ, তার ওপর কখনো কখনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় - এরই মধ্যে দিয়েই দেখানো হচ্ছে দিন রাতের আবর্তন, সব মিলিয়ে এক কুশলী অনবদ্য উপস্থাপনা। পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে আসা উন্নত গ্রাফিক্স তথা আধুনিক প্রযুক্তির নানাবিধ ব্যবহারের যুগেও সাদা কালো যুগের এ সিনেমা নিজস্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল।

মনসা কথার প্রতিগ্রহণের ধারায় জাহির রায়হান নির্দেশিত *বেহুলা* চলচ্চিত্রের আঙ্গিনায় সফল বিনির্মাণ। পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এসে এর বাণিজ্যিক সাফল্যের কথা স্মরণ করেন নায়িকা সুচন্দা এবং নায়ক রজ্জাক। নায়ক নায়িকা এই সিনেমায় এতটাই দর্শকের ভালবাসা পেয়েছিলেন, যে তাদের ফিল্ম-কেরিয়ার নিয়ে আর ঘুরে দাঁড়াতে হয়নি। সেই

জনপ্রিয়তার কারণেই সমকালীন প্রযোজকেরা যে কোন অর্থের বিনিময়ে সুচন্দা আর রজ্জাকের জুটিকে দিয়ে কাজ করাতে চাইতেন। স্বাভাবিক কারণেই মনসাকাহিনি কেন্দ্রিক এ পর্যন্ত পাওয়া সবগুলি চলচ্চিত্রেই *বেহুলার* প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের গল্প বার বার সিনেমায় ফিরে এসেছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের মতই এই চলচ্চিত্রে বিনির্মাণের যে ধারা, তাও পুচ্ছানুসারিতার কবল থেকে মুক্ত হতে পারে নি। জাহির রায়হানের *বেহুলা* পরবর্তী কালে মনসামঙ্গলের কাহিনি নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রে স্পষ্ট প্রভাব রেখেছে।

১৯৭৭ এ অমল দত্তের নির্দেশনায় মুক্তিপায় *বেহুলা লখীন্দর* চলচ্চিত্রটি। অভিনয়ে ছিলেন মহুয়া রায়চৌধুরী, অভি ভট্টাচার্য, সুব্রতা চ্যাটার্জী, তরুণকুমার, কালি ব্যানার্জী, সুখেন দাস প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালনায় সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতি হোমচৌধুরী, শ্যামল মিত্র এবং অনিতা মজুমদার। এই চলচ্চিত্রে মনসামঙ্গলের মূল কাহিনিকেই বিশেষ কিছু রদ বদল না করে বিনির্মাণ করা হয়।

বেহুলা লখীন্দর চলচ্চিত্রে চাঁদ কর্তৃক মনসার পূজাঘট ভাঙা, মনসার ষড়যন্ত্র ও চাঁদের উদ্যান লণ্ডভণ্ড, কমলার সঙ্গে সখীত্ব এবং ধন্বন্তরির মৃত্যু, কালিদহে চাঁদের সপ্তডিঙা ভরাডুবি- এই সকল আনুষঙ্গিক ঘটনাই মনসামঙ্গলের অনুসরণে রূপায়িত করা হয়েছে। তবে মনসামঙ্গল কাব্যধারায় চাঁদ মনসার বিবাদের মূল ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই সিনেমার কাহিনিতে কিছু অভিনবত্ব দেখা যায় -

পাতালপুরীতে মনসার জন্মের ভিন্ন প্রেক্ষাপট – অধিকাংশ মনসামঙ্গলকাব্য অনুসারে শিব রতি পদ্মের মৃণাল বেয়ে পাতালে পৌঁছালে নাগলোকে তা অবয়বপ্রাপ্ত হয়, এবং অসাধারণ রূপবতী এক কন্যার সেখানে আবির্ভাব হয়। তিনিই মনসা। অমল দত্ত পরিচালিত *বেহুলা লখীন্দর* এ দেখানো হয় মনসার ষড়যন্ত্রে স্বর্গসভায় ঊষা অনিরুদ্ধকে এক বার নয় মানব কল্যাণে সাত বার মর্ত্যে জন্মানোর অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল, যার শেষ জন্মে তারা পাবে বেহুলা লক্ষিন্দর রূপ। ঊষা অনিরুদ্ধের বিরুদ্ধে মনসার ষড়যন্ত্রের ফল স্বরূপ পিতা মহাদেব কর্তৃক শাস্তি বিধান এবং তারই ফলে পাতালপুরীতে কশ্যপ আর কদ্রুর সন্তান

রূপে মনসার দ্বিতীয়বার জন্মানোর বিষয়টিও অভিনব কৌশলে উপস্থাপন করা হয়েছে এই চলচ্চিত্রে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ[৮] ও দেবীভাগবত[৯] এ কশ্যপ ও কদ্রুর কন্যা মনসার প্রসঙ্গ রয়েছে। মহাভারতে [১০] কদ্রুর প্রসব করা ডিম থেকে জাত সহস্র নাগের ভগিনী জরতকারীর প্রসঙ্গ পাই। আবার বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকযাত্রার পরিবেশনায়ও শিব রতি পান করে কদ্রুর গর্ভে মনসার জন্মানোর প্রসঙ্গ রয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন সূত্রে কশ্যপ আর কদ্রুর সঙ্গে মনসার যে সম্পর্কের রসায়ন বঙ্গদেশে প্রচলিত তারই প্রভাবে চলচ্চিত্রে বিষয়টি এসেছে। নিরপরাধী ঊষা অনিরুদ্ধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী নিজ কন্যাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার মধ্যে দিয়ে চলচ্চিত্রে মহাদেবকে ন্যায়পরায়ন বিচারক হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। আবার ঊষা অনিরুদ্ধের সাত বার জন্ম নেওয়া এবং শিবের অভিশাপে মনসার দ্বিতীয়বার জন্মের কাহিনি এ সিনেমার নিজস্ব সংযোজন, কোন মনসামঙ্গলকাব্যে এরূপ দেখা যায় না।

চাঁদের বাণিজ্যযাত্রার কারণ স্বরূপ ধন্বন্তরি ওঝার মৃত্যু – চাঁদ বণিক শ্রেষ্ঠ আর তাই চাঁদের হাতের পূজা পেলে মনসা সম্ভ্রান্ত সমাজে সহজেই নিজ আসন পাকা করতে পারবেন। মনসার চাঁদের কাছে পূজা চাওয়ার মূল কারণ এখানেই। এ হেন বণিক শিরোমণি চাঁদ যে কোন পরিস্থিতিতেই নিজের বাণিজ্য চালিয়ে যেতে চাইবেন এটাই স্বাভাবিক। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর পাঁচ মাসের গর্ভবতী সোনেকাকে রেখে চাঁদ দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্যে যাচ্ছেন। কারণ হিসেবে বলছেন বণিকের ধর্মই বাণিজ্য, আর ঘরে বসে পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি শেষ করা অনুচিত[১১]। নারায়ণদেব[১২] আর কেতকাদাসের[১৩] কাব্যেও বাণিজ্য ধর্মের প্রতি অন্তরের তাগিদ থেকেই ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর বাণিজ্যে যাচ্ছেন চাঁদ। আবার জীবন মৈত্র[১৪] ও জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে[১৫] ছয় পুত্রের মৃত্যুশোকে অস্থির চাঁদ বাণিজ্য করতে যাচ্ছেন। বিপ্রদাস পিপলাই একটু অন্যভাবে দেখিয়েছেন[১৬] - মনসা শিব বেশে চাঁদের স্বপ্নে এসে তাকে অনুপাম পাটনে বাণিজ্য করতে নির্দেশ দেন। সেখানে মহাদেব স্বয়ং যাচ্ছেন, আর চাঁদ যদি সেখানে যায়, তাহলে সে ফিরে পাবে ধন্বন্তরি, ধনা মনা, সহ নিজের ছয় পুত্র। সুতরাং ছদ্মবেশী মনসার নির্দেশকে ইষ্ট দেবতা মহেশ্বরের আদেশ ভেবে, স্বপ্নাদেশ পালন করতে চাঁদ বাণিজ্যে যান। *বেহুলা লখিন্দর* সিনেমায় আমরা

মঙ্গলকাব্যের থেকে একটু পালটে নিয়ে বিষয়টি পরিবেশন করতে দেখি। এখানে দেখা যায় ছয় পুত্রের মৃত্যুতেও চাঁদ নিজ ধর্মে কর্মে অটল ছিলেন, কিন্তু বন্ধু ধন্বন্তরি ওঝার মৃত্যুকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। তার দাহ কর্মের সময় চাঁদকে অত্যন্ত অস্থির হয়ে হাহাকার করতে দেখা যায়। বন্ধুর মৃত্যু শোক ভুলতেই সে সপ্তডিঙা ডিঙ্গা মধুকর সহ বাণিজ্য যাত্রা করেন। এ ঘটনায় ধন্বন্তরি চরিত্রটি চাঁদের কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা প্রমাণ হয়। কারণ ছয় পুত্রের মৃত্যু অপেক্ষা এই মৃত্যুটি চাঁদকে বিচলিত করেছিল বেশি। আমরা জানি ধন্বন্তরি ছিল মনসার সঙ্গে বিবাদে চাঁদের অন্যতম হাতিয়ার। ইতিপূর্বে মনসা চাঁদের সুপারি বন ধ্বংস করলে, ধন্বন্তরির কৌশলে তা আবার বাঁচিয়ে দেন। এমনকি মনসার কোপে সর্প দংশনে চাঁদের প্রচুর কর্মচারীর মৃত্যু হলে ধন্বন্তরি তাদের জীবন ফিরিয়ে দেন। সুতরাং ধন্বন্তরির মৃত্যু ছিল চাঁদের কাছে মস্ত বড় বিপর্যয়। যে বিপর্যয়ের বেদনা ভুলতে এবং আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজ কর্মের মধ্যে দিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে চাঁদ বাণিজ্যে যাত্রা করেন। এভাবেই মনসামঙ্গল কাব্যকাহিনির হুবহু রূপায়ণ না করেও মূল ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই কাহিনিকে উপস্থাপন করা হয়েছে এই চলচ্চিত্রে।

লক্ষিন্দরের উজানি নগরে বাণিজ্য – *বেহুলা লখিন্দর* সিনেমায় আমরা দেখি চাঁদের নির্দেশে লক্ষিন্দর ব্যাবসা করতে যাচ্ছেন উজানি নগর। সেখানে দেশ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা মণি মাণিক্যের বিক্রয় করা হচ্ছে। এখানেই সখীদের সঙ্গে লঙ্কা থেকে আনা হীরে খুঁজতে আসছেন বেহুলা। বেহুলা লক্ষিন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তাদের স্মৃতিতে ভেসে আসে সাত জন্ম আগের স্বর্গের যুগল নৃত্যের আবছা স্মৃতি। বিবাহ পূর্ব প্রেম এ সিনেমায় দেখানো না হলেও বেহুলা লক্ষিন্দরের একে অপরের প্রতি মুগ্ধতার প্রকাশ দেখানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গ কোন মনসামঙ্গল কাব্যে নেই, ইতিপূর্বে মুক্তিপ্রাপ্ত জাহির রায়হানের *বেহুলা* সিনেমায় লক্ষিন্দরের সায় বেনের রাজ্য মিছরিপুরে বাণিজ্য করতে যাওয়ার প্রসঙ্গ ছিল। তবে অমল দত্তের *বেহুলা লখীন্দর* চলচ্চিত্রে বিস্তৃতভাবে বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে।

শতদল ও মহাবল প্রসঙ্গ - লক্ষিন্দরের দুই বন্ধু শতদল আর মহাবল এ সিনেমার জন্য সৃষ্টি দুটি চরিত্র। এরা লক্ষিন্দরের সঙ্গে ব্যাবসা করতে উজানি নগর আসে, সেখানে বাঘের কবলে পড়লে লক্ষিন্দর সাহসিকতার পরিচয় দেয় এবং তীর দিয়ে বাঘকে ঘায়েল করে বন্ধুদের বাঁচায়। অতঃপর বেহুলাকে প্রথম দেখার পর তার প্রতি মুগ্ধ লক্ষিন্দরের প্রেমে ইন্ধন যোগায় দুই বন্ধু। লক্ষিন্দরকে নায়কোচিত গৌরব দিতে এই সহায়ক চরিত্রগুলি আনা হয়েছে সিনেমায়।

লক্ষিন্দরের ভবিষ্যৎ গণনাকারী দৈবজ্ঞ প্রসঙ্গ – *বেহুলা লক্ষিন্দর* সিনেমায় দেখানো হয়েছে যে লক্ষিন্দরের বিবাহের পূর্বে চাঁদ নিজ গৃহে দৈবজ্ঞ ডেকে পুত্রের ভাগ্য গণনা করান। দৈবজ্ঞ স্পষ্ট জানান লক্ষিন্দরের বিবাহে অশুভ যোগের কথা। সুতরাং চাঁদ তার বিবাহে অসম্মত হন। সনেকার একান্ত অনুরোধে চাঁদ পুত্রের বিবাহে রাজি হন। এ প্রসঙ্গও মনসামঙ্গল কাব্য ব্যতিরেকে সিনেমার নিজস্ব সংযোজন। পরবর্তী কালে চাঁদ যে নিজ পুত্রের সুরক্ষার জন্য অতিরিক্ত সতর্ক হন, এবং লোহার বাসর নির্মাণ করেন, তা পূর্বে দেখানো দৈবজ্ঞ প্রসঙ্গের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দৈবজ্ঞ কর্তৃক ভাগ্যগণনার বিষয়টি পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র বা টেলি ধারাবাহিকে একটি সাধারণ বিষয়। জাহির রায়হানের *বেহুলা* সিনেমায় মনসার ষড়যন্ত্রে ছদ্মবেশী দৈবজ্ঞ বেহুলাকে ভুল পথে পরিচালিত করে। স্টার জলসার *বেহুলা* (২০১০ - ২০১১) ধারাবাহিকে দেখানো হয়েছে। সোনি টিভি চ্যানেলের *বিঘ্নহর্তা গনেশ* (২০১৭ - ২০২১) ধারাবাহিকে উপস্থাপিত মনসা কাহিনিতে গনেশ মনসাকে সাহায্য করতে গজানন মহারাজ ছদ্মবেশে বেহুলার ভাগ্য গণনা করেছে। আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কৌতূহল থেকে একুশ শতকেও জ্যোতির্বিদের কাছে যান বহু মানুষ। ভৈরবী সিদ্ধ ইত্যাদি নামে বড় বড় ব্যানারে নিজ ক্ষমতা সম্পর্কে আত্মপ্রচার করেন ভবিষ্যৎবেত্তা এই সকল মানুষেরা। আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে তাবিচ, কবচ ইত্যাদি দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে সামাজিক বিশ্বাস, সংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে সিনেমা সিরিয়ালের কাহিনিসূত্রে।

চাঁদের সামনে বেহুলার নৃত্য – বিবাহের জন্য পাত্রী দেখতে এসে তাকে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার রীতি এ দেশে প্রাচীন। মনসামঙ্গল কাব্যে যা নেই এ সিনেমায় সমকালের

সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সেই রীতিকে তুলে ধরা হয়েছে। সিনেমায় দেখা যাচ্ছে যে সায় বেনে গৃহে শিক্ষক রেখে বেহুলাকে ছোট থেকে নাচে গানে পারদর্শী করে তুলছেন। মেয়ের বিবাহের বয়স হলে তিনি চিন্তিত যে তার কন্যাটির কদর বুঝবে এমন শ্বশুর বাড়ি কীভাবে খুঁজবেন তিনি, এবং চিরকালের অসহায় পিতার মতই সায় কন্যার নাচ গানের প্রতিভা বিয়ের পর বাঁধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করছেন। অতঃপর সায়ের গৃহে চাঁদ বণিকের পাত্রী দেখতে আসা, এবং বেহুলার নাচ গানে দক্ষতার কথা জেনে নটরাজ শিবের প্রসঙ্গে নৃত্য শিল্পের প্রশংসা, বেহুলার পরিবেশিত সঙ্গীত ও নৃত্যে চাঁদের মুগ্ধ হওয়ার দৃশ্য এ সিনেমার মৌলিক সংযোজন। মনসামঙ্গল অনুযায়ী পরবর্তীকালে দেবসভায় নৃত্য পরিবেশন করে স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়ার ঘটনার সঙ্গে বেহুলার ছোটবেলা থেকে নাচ শেখার প্রসঙ্গ কাহিনির বিন্যাসকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে।

বেহুলা কর্তৃক সীতা সাবিত্রীর আখ্যান পড়ার প্রসঙ্গ – মধ্যযুগের বিস্তৃত পরিসরে প্রায় দু'শ বছর ধরে নানা কবির হাতে রচিত হয়েছে মনসামঙ্গল । এই সময়কালের মধ্যে অন্যদিকে চলেছে সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদের ধারা। মঙ্গলকাব্য বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ। সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত যখন বাংলায় অনুবাদ হয়েছে, তখন সেখানে প্রভাব ফেলেছে বঙ্গ সংস্কৃতি। উল্টোদিকে মঙ্গলকাব্যে অনুবাদের কাব্যের কিছু কিছু প্রভাব দেখা যায়। যেমন মনসামঙ্গল কাব্যে কালিদহে চাঁদের বাণিজ্য তরী নিমজ্জনে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ[১৭],জগজ্জীবন ঘোষাল[১৮], নারায়ণ দেব[১৯], বিপ্রদাস পিপলাই[২০], দ্বিজ বংশীদাস[২১] প্রমুখ কবি মনসার সহায়ক হিসেবে রামায়ণের হনুমানের প্রসঙ্গ এনেছেন। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর তাদের মরদেহ কৌশলে তাড়কা রাক্ষসীর কাছে গচ্ছিত রাখে মনসা[২২]। আবার নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে সীতার মতই সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয় বেহুলাকে। পর পর তিনটি পরীক্ষায় জয়লাভ করার পর অগ্নি পরীক্ষার জন্য বেহুলাকে গালাগৃহে প্রবেশ করিয়ে তেল ঘি দিয়ে সেই গৃহ জ্বালিয়ে দেবার ঘটনা এবং মনসার আশীর্বাদে লক্ষিন্দর সহ বেহুলার স্বর্গে গমন – সব মিলিয়ে রামায়ণের সীতার কাহিনির প্রতক্ষ্য প্রভাব চোখে পড়ে নারায়ণ দেবের কাব্যে[২৩]। কবিও সনেকার জবানিতে লেখেন রাম *সীতাকে লইয়া যায় রে !* বার বার পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া সীতা শেষবার

নিজ দেহ ত্যাগ করে মানবিকতা বর্জিত আচারসর্বস্ব সমাজ ব্যাবস্থার সামনে যেভাবে চরম প্রতিবাদ করেছিলবেহুলার স্বর্গারোহণেও সেই একই প্রতিবাদ ব্যঞ্জিত হয়। *বেহুলা লখিন্দর* সিনেমাতে দেখা যায় বেহুলা তার মা অমলাকে রামায়ণের সীতা এবং মহাভারতের সাবিত্রীর আখ্যান[২৪] পড়ে শোনাচ্ছেন। আর এই সতী নারীদের আখ্যান শুনে অশ্রুসিক্ত হচ্ছেন অমলা। পরবর্তীকালে বেহুলার অসম্ভব কে সম্ভব করার দৃঢ় লড়াই, আর সতীত্বের পরাকাষ্ঠা হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে সীতা ও সাবিত্রীর মত নারীদের অনুপ্রেরণা কাহিনিকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে।

পদ্মার নারায়ণ সাধনা – এ সিনেমার অন্যতম সংযোজন পদ্মাবতীর নারায়ণ সাধনা। সাঁতালি পর্বতে লোহার বাসর ঘরে বেহুলা লক্ষিন্দরের অবস্থান কালে পুত্রের নিরাপত্তার জন্য বাইরেও অতিরিক্ত সতর্কতার ব্যবস্থা করেন চন্দ্রধর বণিক। লোক লস্কর, বৈদ্য, তান্ত্রিক সহ তিনি নিজে বাসর ঘরের পাহারার জন্য বহাল হন। উপরন্তু বাসর ঘরের বাইরে আগুনের বেষ্টনী তৈরি করা হয়, যাতে পদ্মার পাঠানো সাপেরা সেখানে প্রবেশের পথ না পায়। নিজ লক্ষ্য সাধনে নিরুপায় হয়ে পদ্মাবতী নারায়ণ সাধনা করেন। নারায়ণের আশীর্বাদে ঝড় ঝঞ্ঝা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরু হয়। পিছু হটতে বাধ্য হয় চাঁদের লোকজন, ভেঙে পড়ে বাসর ঘরের বাইরের নিরাপত্তা বলয়। পদ্মা নিজ কাজে সফল হয়। পদ্মার নারায়ণ সাধনা এবং তার আনুষঙ্গিক চাঁদ কর্তৃক বাসরঘরের বাইরে নিরাপত্তা বেষ্টনীর আয়োজনের কাহিনি কোন মনসামঙ্গলে পাওয়া যায় না। কাহিনির এ অংশ একেবারেই সিনেমার জন্য তৈরি।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ[২৫] ও দেবীভাগবতে[২৬]শ্রীকৃষ্ণের মনসাপূজার প্রসঙ্গ রয়েছে। আবার বিষ্ণুর প্রতি অত্যন্ত ভক্তি থাকায়, দেবী মনসার অপর নাম বৈষ্ণবী। মনসা কৃষ্ণের ধ্যান ও স্তব মন্ত্র জানতেন এবং এবং তার পুরশ্চর্য্যাক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। এই দেবী তিন যুগ ব্যাপী আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণের প্রীতিকামনায় নিবিষ্ট মনে তপস্যা করে তার দর্শন লাভ করেন, এবং তার কাছ থেকে সংসারে পূজিতা হবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পূজিতা হয়েছিলেন। সুতরাং সিনেমায় যে মনসার নারায়ণ পূজা প্রসঙ্গ এসেছে, সেখানে পুরাণের প্রভাব স্পষ্ট। নারায়ণের

আশীর্বাদ প্রাপ্ত এবং স্বয়ং নারায়ণ কর্তৃক পূজিতা দেবী যে প্রয়োজনে তার সাধনা করবেন, এবং অনুগ্রহ লাভ করবেন এ তো পুরাণ পরম্পরায় খুব স্বাভাবিক ঘটনা।

বেহুলার তিন পরীক্ষা –*বেহুলা লখিন্দর* সিনেমায় দেখানো হয়, মৃত স্বামীর সঙ্গে কলার ভেলায় ভাসার শর্ত হিসেবে বেহুলাকে সমাজপতিদের দেওয়া তিনটি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তাকে প্রথমে তুলা দণ্ডে স্থাপন করা হয়, এবং উল্টোদিকের পাল্লায় নির্দিষ্ট মাপের তুলার চেয়ে বেহুলা হাল্কা প্রমাণিত হলে সে এই পরীক্ষায় জয়ী হয়। দ্বিতীয় পরীক্ষায় সমাজপতিদের সামনে কাঁটার ওপর নাচতে হয় বেহুলাকে। যদিও বেহুলার ধরিত্রীর আরাধনার ফলে চারিদিক থেকে ফোটা ফুল এসে সেই কাঁটার ওপর ফুলের আস্তরণ তৈরি হয় এবং দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও সে জয়যুক্ত হয়। তৃতীয় দফায় বেহুলার জন্য অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করা হয়। এবং সে পরীক্ষায়ও সে জয়ী হয়। হঠাৎই বর্ষা এসে আগুন নিভে যায়। ইতিপূর্বে লোহার কলাই সিদ্ধ করে সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার ঘটনা মনসামঙ্গল অনুসারী। আবার নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে চাঁদ কর্তৃক মনসা পূজার পর, ইতিপূর্বে ছয় মাস কলার ভেলায় ভেসে চলায় বেহুলার সতীত্ব সম্পর্কে সনকার মনে প্রশ্ন চিহ্ন জাগে এবং চাঁদের নির্দেশে শুরু হয় বেহুলার একের পর এক পরীক্ষা। সাপের মাথা থেকে মণি কেড়ে আনা, ধারালো সাঁকোয় হেঁটে অঙ্গারের মধ্যে থেকে সোনা খুঁজে পাওয়া, হাত পা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দিলে সেখান থেকে বেঁচে ফেরার মত পরীক্ষাগুলিতে জয়লাভ করার পর অগ্নি পরীক্ষার জন্য বেহুলাকে গালা গৃহে প্রবেশ করিয়ে তেল ঘি দিয়ে তা জ্বালিয়ে দেবার ঘটনা সেখানে পাই। বর্তমান আলোচ্য সিনেমায় অনুষঙ্গ বদলে গেলেও পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রায় একই। ফলে মনসাকাহিনির বিনির্মাণ প্রায় মূলানুগ হয়েছে, আবার নির্মাতাদের লোকমনোরঞ্জনের চাহিদা পূরণেও নারীর নানা পরীক্ষার মত বিষয়গুলি সহায়ক হয়েছে।

প্রাসঙ্গিকভাবে বেহুলার দ্বিতীয় পরীক্ষাটির প্রসঙ্গে লোকযাত্রার মনসাপালার একটি দৃশ্যের উল্লেখ করছি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কোন কোন দলে বেহুলার কাচের ওপর নাচ মঞ্চস্থ করা হয়। স্বর্গের দেবতাদের সামনে কাচের ওপর নেচে নিজেকে প্রমাণ করে বেহুলা।

সিনেমার মত ক্যামেরার কৌশলে এ দৃশ্য চিত্রায়ণের সুযোগ লোকশিল্পীদের নেই। ফলে শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করে লোকশিল্পীরা তাদের শিল্পের প্রতি পরম মমতার পরিচয় দেন।

উপরুক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও বেহুলার কলার ভেলায় ভাসার সময় গোদা তাকে দেখে কামার্ত হলে উচিত শিক্ষা দিতে মনসার গোদাকে জলে ফেলে দেওয়া, অথবা ফুলসাজে সজ্জিতা নেতার চাঁদকে মোহিত করার প্রসঙ্গও এ সিনেমায় মনসামঙ্গল কাহিনি ধারাকে কিছুটা পরিবর্তিত করে উপস্থাপিত হয়েছে।

গানের আধিক্য – সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় দু'ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের এই সিনেমায় রয়েছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, শ্যামল মিত্র প্রমুখ প্রথিতযশা শিল্পীদের গাওয়া দশটি গান। সিনেমার প্রথম গানটি অমল পালের গাওয়া দেবী মনসার বন্দনা গান। এই গানটি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের বন্দনা অংশ প্রভাবিত। গানের প্রথম দুটি কলি যেন পদ্মাপুরাণেরই ভাষ্য –

বন্দিলাম বন্দিলাম মাগো যত্নে দিয়া ঘা
হংসাসনে অধিষ্ঠিতা জগত গৌরী মা

[বেহুলা লখিন্দর / ১৯৭৭]

পাশাপাশি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে পাই –

বন্দিলাম বন্দিলাম মাগো যত্নে দিয়া ঘা
অবধান কর গো জগত গৌরী মা[২৭]

গানের কথায় নাগমাতা বিষহরী মনসার পরিচয়, পিতা স্বামী পুত্রের কথা এসেছে। মনসা পূজার দিন মনসামঙ্গল পাঠের যে রীতি উত্তর চব্বিশ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বর্ধমান, জলপাইগুড়ি – প্রভৃতি বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত আছে, তারই রূপায়ণ ঘটেছে এই গানটিতে। সেই মত একজন মূল গায়ক গানটি গেয়েছেন এবং সহযোগীরা গেয়েছেন ধুয়া। স্পষ্টত চলচ্চিত্রে তথা মার্জিত সংস্কৃতিতে লোকসংস্কৃতির প্রভাব তুলে ধরেছে এই গানটি।

মনসার প্রতি শিবের পাতালবাসের প্রেক্ষিতে সিনেমায় নারদের গাওয়া শিবমাহাত্ম্য বিষয়ক গান *জয় নিত্য সত্য শিব সুন্দর*। এই চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক সন্তোষ মুখার্জী গানটি গেয়েছেন। গানের কথায় এসেছে সাগরমন্থন কালে শিবের বিষপান, শিব কর্তৃক পাতাল নির্মাণ প্রসঙ্গ, সেই সঙ্গে শিবের মানস কন্যা ঊনকোটি নাগমাতা বিষহরী পদ্মার কথা আর ত্রিলোকবাসীর প্রতি করুণা রাশি বর্ষণকারী পতিতের জগদীশ্বর স্বরূপ শিবের জয়গান। সিনেমার শুরুতে পরপর দুটি গানে মনসা এবং শিবের বন্দনায় মঙ্গলকাব্যের দেববন্দনা অংশের ছাঁচ লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয় গানটি অনিতা মজুমদারের গাওয়া সিনেমায় নেতার ওপর চিত্রায়িত। ফুলসাজে সজ্জিতা নেতা চাঁদকে কামোত্তেজনায় ভোলাতে চটুল দেহ বিভঙ্গ সহযোগে গাইছে *আমি সজনী সেজেছি মধু রজনীতে*। মঙ্গলকাব্যের কাহিনি ধারায় এ এক ব্যাতিক্রমও বটে। মহাজ্ঞান হরণের জন্য নাগ আভরণ খুলে গলায় পারিজাত মালা পরে মনসার নটী সাজার প্রসঙ্গ বিজয়গুপ্তের কাব্যে রয়েছে। আবার কেতকাদাসের মনসামঙ্গলেও একই প্রসঙ্গ পাই। নেতার নটী বেশ ধারণ ও চাঁদকে পথভ্রষ্ট করার দৃশ্যায়ণ দেখানো হয়েছে *বেহুলা লক্ষিন্দর* সিনেমায়। মনসামঙ্গল কাব্যধারায় নেতা সব সময় লক্ষ্য পূরণে মনসাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছে, প্রয়োজনে সে যে সক্রিয়ভাবে তাকে সাহায্য করবে, এ ঘটনা স্বাভাবিক। বরং মনসার মর্যাদা রক্ষার নিরিখে নেতার এ হেন কার্য সুসঙ্গতও বটে।

বেহুলা লক্ষিন্দর ছায়াছবিতে চতুর্থ গান *সপ্তডিঙা ভাসাইলাম রে* চাঁদ বণিকের বাণিজ্য যাত্রার সময় গাওয়া। গানটি গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ইষ্টদেবতা শিবের নামে জয়ধ্বনি করে চাঁদ জীবনের সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে পাড়ি দিয়েছেন সপ্তডিঙা নিয়ে। সমুদ্রযাত্রার নানা বিবরণ উঠে এসেছে গানের কথায়। দিন রাত্রি ক্রমাগত বয়ে যায়, সেই সাথে চলে বৈঠার অবিরাম ওঠা নামা। দূরে দূরে অচেনা গ্রাম দেখা যায়, উজান স্রোতে ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও ডিঙা এগিয়ে চলে। মহাদেবের সঙ্গে মা গঙ্গাকেও এই দুর্গম পথ পার করে দেবার প্রার্থনা করেছেন চাঁদ বণিক। মনসামঙ্গলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা *চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা* হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য গায়ন শৈলীতে তুলে ধরা হয়েছে সিনেমায়।

লক্ষিন্দরের বন্ধুদের গাওয়া *আমাদের লখার হবে বিয়ে* গানটি কৌতুকরসে ভরপুর। চাঁদ আর সনকা পুত্রের বিবাহের জন্য মনস্থির করলে লক্ষিন্দরের বন্ধুরা আসন্ন বিবাহের আনন্দে উৎসাহে গানটি গায়। গানের কথায় এসেছে ঘটক চূড়ামণির পাত্রী খোঁজা প্রসঙ্গ। সেই সঙ্গে উজানি নগরে বেহুলার সঙ্গে প্রথমবার দেখা হওয়ার পর থেকে তার প্রতি লক্ষিন্দরের অনুরক্ত হবার কথা। মনসামঙ্গল আদ্যন্ত করুণ রসের কাব্য। হাস্য কৌতুকের কোন স্থান নেই এখানে। কিন্তু সিনেমায় বাণিজ্যিক কারণেই দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য নানা বিধ আয়োজন দরকার হয়। ফলে শ্যামল মিত্রের গাওয়া এই গানটি কৌতুক রসের আমদানি করে ছায়াছবির কাহিনিতে একেবারে স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করেছে।

সায়বেনের বাড়িতে পাত্রী নির্বাচনের জন্য এসে চাঁদ বেহুলার নৃত্য গীতের পারদর্শিতা সম্পর্কে অবগত হয় এবং পিতার নির্দেশে (অরুন্ধতী হোমচৌধুরীর কণ্ঠে গাওয়া) *রিনি ঝিনি বাজে কিঙ্কিনি* গানটিতে বেহুলা তার নৃত্য শৈলী প্রদর্শন করে। বেহুলা নাচে পারদর্শী ছিলেন, স্বর্গে দেবতাদের এই শিল্পেই তুষ্ট করে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি করেন তিনি। সুতরাং সায় বেনের বাড়িতে শিক্ষক রেখে কন্যাকে নাচ শেখানো, এবং চাঁদের সামনে বেহুলার নাচ গান প্রসঙ্গ সিনেমার জন্য তৈরি হলেও মনসামঙ্গলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে।

চলচ্চিত্রের সপ্তম ও অষ্টম গানদুটি সমাজপতিদের পরীক্ষার সামনে অসহায় বেহুলার দেবতাদের নিকট কাতর আর্তির বহিঃপ্রকাশ। *জাগো দেবগণ, জাগো বরুণ পবন* শীর্ষক সপ্তম গানটিতে কাঁটার ওপর বেহুলার নাচের কঠিন পরীক্ষার সময় স্বয়ং নটরাজ স্বর্গ থেকে নেমে এসে বেহুলার কায়ায় প্রবেশ করেন এবং তার তাণ্ডব উপস্থাপন করেন। এ যেন পৃথিবীবাসীর অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে মহাদেবের বিদ্রোহের অভিব্যক্তি। সমাজপতিদের এ হেন পরীক্ষা এবং বেহুলার শরীরে মহাদেবের নৃত্য দুইই চলচ্চিত্রের কাহিনিতে অভিনবত্ব আনে, সেদিক থেকে এ গানটিও বিশেষ গুরুত্ব রাখে।

ওগো দুখহরা, মাগো বসুন্ধরা গানটিতে অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে বেহুলা মাতা বসুন্ধরাকে আহ্বান করেন এবং জানকীর মত বক্ষে ধারণ করার প্রার্থনা করেন। নবম গান *জগতগৌরী মাগো জগতগৌরী মা...*। এই গানে মৃত স্বামীকে নিয়ে অকূল সমুদ্রে

পাড়ি দেওয়া বেহুলা জগতগৌরি মনসার কাছে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছেন, বিপদসঙ্কুল ভয়াবহ সুদূর যাত্রাপথ পার হয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। আর সিনেমার শেষ গানে দেবসভায় উপস্থিত বেহুলা দেবগণকে প্রণাম জানিয়ে তার ব্যথাভার মোচন করতে নৃত্যের তালে তালে আকুতি জানান।

প্রথিতযশা শিল্পীদের গাওয়া দশটি গান *বেহুলা লখিন্দর* সিনেমার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। কোথাও একটি গান দীর্ঘ সময়ের বাহক হয়েছে, কোথাও এনেছে অভিনবত্ব, কোথাও গুরুগম্ভীর পরিবেশ থেকে স্বস্তি দিতে এনেছে কৌতুক রস, কোথাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উপস্থাপনের মাধ্যম হয়েছে গান। সব মিলিয়ে মনসামঙ্গলের কাব্যধর্মীতার পরোক্ষ প্রভাব সিনেমার করেছে গীতিময়। মনসামঙ্গলের কাব্যধারার মূল কাহিনির বিশ্বস্ত রূপায়ণ আমরা এই সিনেমায় পাই। আবার একই সাথে পূর্বে উল্লিখিত*বেহুলা* সিনেমার প্রভাব যেমন এখানে দেখা যায়, তেমনই আবার পরবর্তীকালে মুক্তিপ্রাপ্ত *সতী বেহুলা* সিনেমায় এর প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষণীয়।

২০১০ সালে মনোজকুমারের নির্দেশনায়, নির্মলা সিনহার প্রযোজনায় *সতী বেহুলা* সিনেমাটি মুক্তি পায়। সিনেমাটিতে সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন উদয় নারায়ণ সিং, অখিলেশকুমার আর কমল প্রধান। গীতিকার আশোক শেরপুরি, শায়েদ মহম্মদ আহমেদ। সিনেমার গানগুলি গেয়েছেন উদিত নারায়ণ, সাধনা সরগম, সুরেশ ওয়াদকর, সনু কক্কর, তৃপ্তি শাক্য ও উদয় সিনহা। মূল চরিত্রে অভিনয় করেন হেমা মালিনী, ভাগ্যশ্রী, রাজেশ শর্মা, শ্বেতা মিশ্র, অর্পিতা মুখার্জী প্রমুখ। চাঁদ মনসার বিবাদের প্রচলিত কাহিনীকে নতুন মোড়কে পরিবেশন করা হয় এই সিনেমায়।

পরিবেশন রীতিতে অভিনবত্ব – নারীর সতীত্বের দৃষ্টান্ত রূপে সাবিত্রীর নাম এ দেশে বহু পরিচিত। *সতী বেহুলা* চলচ্চিত্রে সাবিত্রী সত্যবানের আখ্যানের মধ্যেই বেহুলার সতীত্বের জয়গাঁথা তথা মনসাকাহিনিকে তুলে ধরা হয়েছ। অসুস্থ স্বামী সত্যবানকে প্রবোধ দিতেই বেহুলার দুঃসাধ্য সাধনের কথা বিবৃত হয়েছে সাবিত্রীর জবানিতে। মনসামঙ্গলের কাহিনির

বিনির্মাণের ধারায় এই সিনেমাটিতে অভিনব রীতিতে সাবিত্রীর কাহিনির মোড়কে বেহুলার কাহিনিকে তুলে ধরা হয়েছে।

সাবিত্রী সত্যবানের আখ্যান সংযোজনে অসঙ্গতি - মহাভারতের বনপর্বে সাবিত্রী সত্যবানের আখ্যান[২৮]রয়েছে। সাবিত্রীর সতীত্বের মহিমা সেই সূত্রেই ভারতবর্ষে সুপরিচিত। মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে রামায়ণের কাহিনি শুনে সীতার দুঃখে আদ্র হয় দ্রৌপদীর মন। মুনি পাঞ্চালীকে সতী সাবিত্রীর সঙ্গে তুলনা করলে যুধিষ্ঠির তার বিবরণ জানতে চান। মার্কণ্ডেয় মুনির মুখে বর্ণিত সাবিত্রীর আখ্যান এই রকম – মদ্র দেশের রাজা অশ্বপতি শিব সাধনার দ্বারা রূপে গুণে অনন্যা এক কন্যা সন্তান লাভ করেন। এই কন্যাই সাবিত্রী। ওদিকে অবন্তীর রাজা দ্যুমৎসেন রাজ্য হারিয়ে সপরিবার বনবাসে ছিলেন। দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানের রূপ দেখে সাবিত্রী প্রনয়াসক্ত হয়ে পিতামাতাকে তার বিবাহ ইচ্ছা জানান। স্বল্পায়ু বনবাসী জেনেও দৃঢ়চেতা সাবিত্রী সত্যবানকে পতিরূপে বরণ করেন। অনতিকাল পরেই সত্যবানের মৃত্যু হয়। যমরাজকে ধর্মকথা শুনিয়ে সাবিত্রী তাকে সন্তুষ্ট করে তার আশীর্বাদে অপুত্রক পিতার পুত্র, অন্ধ শ্বশুরের চোখের জ্যোতি, হারানো রাজ্য ফেরত পাওয়ার বরপ্রাপ্ত হন। সবশেষে সাবিত্রী সত্যবানের শত পুত্রের জননী হবার আশীর্বাদ পান ধর্মরাজের কাছ থেকে এবং সেই আশীর্বাদ কার্যকর করতে যম নিজেই সত্যবানের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন।

আগেই উল্লেখ করেছি *সতী বেহুলা* সিনেমায় সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনীর মধ্যেই মনসামঙ্গলের কাহিনীকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে সাবিত্রীর যে আখ্যান দেখানো হয়েছে তা এই রকম - অসুস্থ স্বামীর জন্য জলাশয়ে জল আনতে গিয়ে সাবিত্রী কামার্ত এক পুরুষের খপ্পরে পড়ে। লোকটি তার বিকলাঙ্গ স্বামীকে নিয়ে ক্রমাগত ব্যঙ্গ ও তামাশা করতে থাকে এবং সাবিত্রীকে বিবাহ প্রস্তাব দেয়। কুরুচিকর পুরুষটির আসঙ্গলিপ্সার প্রস্তাবে সাবিত্রী তাকে ভর্ৎসনা করে এবং কোনক্রমে তার হাত থেকে রেহাই পায়। কামুক লোকটি সাবিত্রীকে তার স্বামীর প্রতিবন্ধকতা নিয়ে যে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছিল তা সত্যবানের কানে পৌঁছয় এবং ক্ষত বিক্ষত মন নিয়ে সে আত্মহত্যা করতে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাবিত্রী তার স্বামীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়। সত্যবানকে প্রবোধ দিতে সাবিত্রী

তাকে সতী বেহুলার আখ্যান শোনায়। অবশেষে সত্যবানের মৃত্যু হলে সাবিত্রী মৃতদেহ নিয়ে নিকটস্থ মনসা মন্দিরে যায়। মনসার বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেবার আর্তি করে সে, এমনকি স্বামীর প্রাণ ফিরে না পেলে মন্দিরেই আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সাবিত্রী ঝুলন্ত ঘণ্টায় মাথা ঠুকতে ঠুকতে রক্তাক্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। অতঃপর মা মনসার আশীর্বাদে সত্যবান জীবন ফিরে পায় এবং সুস্থ হয়ে ওঠে, সাবিত্রী সত্যবান পরিবারের সকলের সাথে সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে থাকেন।

মহাকাব্যের কাহিনির সঙ্গে তুলনায় পরিস্কার যে সত্যবানের সুস্থ হয়ে ওঠায় দেবী মনসার প্রভাব – এরকম কাহিনী পুরাণকে সমর্থন করে না। একেবারেই চলচ্চিত্রের জন্য নির্মিত এ এক ভিন্ন গল্প। যমরাজের বদলে মনসা সত্যবানের প্রাণ ফেরাচ্ছেন, এ কাহিনি আসলে বেহুলা লক্ষিন্দরের কাহিনির সঙ্গে সামঙ্গস্য রাখতে গিয়ে নব রূপে নির্মিত। যদিও গ্রামে গঞ্জে লোকমননে স্বামীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ, কঠিন লড়াই তথা সতীত্বের সংস্কার অত্যন্ত প্রভাবশালী। উপরন্তু যমরাজকে দেবতা হিসাবে পূজার চল বঙ্গদেশে একেবারেই নেই, আর মনসা তো নানা রূপে ও ভাবে এদেশে পূজিতা অতি প্রাচীন দেবী। ফলে মহাকাব্য সম্পর্কে অনেকাংশেই অনবগত গ্রামীণ দর্শক ভক্তিভরে সাবিত্রীর সতীত্বের অভিনব গল্প গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্য সফল হলেও সাবিত্রী সত্যবান নাম দুটিকে বাদ দিলে *সতী বেহুলায়* উপস্থাপিত এদের আখ্যান সম্পূর্ণ অপৌরাণিক, মনগড়া, আজগুবি সার্বিকভাবে মূলের বিকৃত নির্মাণ।

মনসাকাহিনির উপস্থাপনে সঙ্গতি অসঙ্গতির নানা দিক - সাবিত্রীর বিবরণের মাধ্যমে পরিবেশিত বেহুলার সতীত্বের কাহিনিই *সতী বেহুলা* সিনেমার অবলম্বন। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যগুলি অনুসারে একবিংশ শতকে তৈরি সিনেমায় স্বাভাবিক কারণেই কিছু পরিবর্তন সংযোজন বিয়োজন আসার কথা। এ সিনেমাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু আক্ষেপের কথা এই যে মনসামঙ্গলের বিনির্মাণ দেখাতে গিয়ে এ সিনেমায় মনসাই হয়ে গেছে অপ্রধান চরিত্র এবং চাঁদ মনসার বিবাদও সম্পূর্ণ কাহিনির নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেনি। ফলত এ আখ্যান হারিয়েছে পৌরাণিক গরিমা। সুতরাং *সতী বেহুলা* চলচ্চিত্রের জন্য মনসা

কাহিনির উপস্থাপনে যে অভিনবত্বগুলি এসেছে, তার সঙ্গতি অসঙ্গতি তথা সার্থকতা আর সীমাবদ্ধতা এই দুই দিক বর্তমান বিশ্লেষণের বিষয়।

মনসার তাণ্ডব - বেহুলা নৃত্য পটীয়সী, স্বামীকে বাঁচানোর জন্য সে স্বর্গের সভায় নৃত্য প্রদর্শন করে সমস্ত দেবকূলের মন জয় করেছিল, এ ঘটনা সব কবির মনসামঙ্গলেই রয়েছে। কিন্তু ক্রুদ্ধ মনসার তাণ্ডবে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জল স্থল ভেঙেচুরে তছনছ হওয়ার ঘটনা *সতী বেহুলা* চলচ্চিত্রের মৌলিক সংযোজন। সিনেমায় দেখানো হয় বিষহরের ষড়যন্ত্রে চাঁদ বণিকের সপ্তম সন্তান লক্ষিন্দরের মৃত্যুর পর সনকা স্বামীর থেকে লুকিয়ে মনসা ঘট স্থাপন করে তার পূজা করতে বসে। ঘটনাক্রমে চন্দ্রধর সেখানে উপস্থিত হন এবং রাগে ঘৃণায় মনসা ঘট পদলাঞ্ছিত করে ভেঙ্গে চূর্ণ চূর্ণ করে। এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ মনসা বিধ্বংসী তাণ্ডব শুরু করেন। দেবাদিদেব মহাদেবের তাণ্ডবের কথা হিন্দু পুরাণ স্বীকৃত। মনসার মধ্যেও পিতার মতই ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ এই শিল্পীসত্তার জাগরণ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এদিক থেকে সিনেমার এই সংযোজন যৌক্তিক পারম্পর্য বজায় রেখেছে।

বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহপূর্ব পরিচয় – এ সিনেমায় বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহপূর্ব পরিচয়ের যে ঘটনা দেখানো হয়েছে তা এই রকম - যুবতী বেহুলা গ্রামের পথে সখীদের সাথে কাঁখে জলপূর্ণ কলস নিয়ে যাবার সময় এক তৃষ্ণার্ত যুবক তাদের সামনে এসে জল প্রার্থনা করে। যুবকটি লক্ষিন্দর। বেহুলা তাকে জল দেবার সময় দুজনের দৃষ্টি বিনিময়ে একে অপরের প্রতি মুগ্ধতার প্রকাশ ঘটে। বেহুলা প্রনয়াসক্ত হয় , লক্ষিন্দরের কল্পনায় ভরে ওঠে তার হৃদয়। বেহুলার এই কল্পনাকে আশ্রয় করেই দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য নায়ক নায়িকার নাচ গানে ভরা প্রেম পর্ব তুলে ধরা হয়। কোন মনসামঙ্গলকাব্য এ হেন ঘটনার সমর্থন করেনা। বরং লোক সমাজে প্রচলিত মনসা যাত্রায় বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহ পূর্ব প্রেম পর্ব নিয়ে বিস্তৃত আয়োজন দেখা যায়। এক্ষেত্রে যাত্রা ও চলচ্চিত্র কেউ কারো দ্বারা প্রভাবিত নয়। লোকযাত্রা হোক বা চলচ্চিত্র নায়ক নায়িকার প্রেম পর্ব সব শ্রেণির সাধারণ দর্শকের কাছেই আকর্ষণের বিষয়। একই কারণে *সতী বেহুলায়* বেহুলা

লক্ষিন্দরের বিয়ের পরেও কল্পদৃশ্যের মাধ্যমে সমুদ্র তীরে নায়ক নায়িকার নাচ গানের দৃশ্য রূপায়িত করা হয়েছে সিনেমায়।

স্বর্গে বেহুলা আর উর্বশীর নৃত্য প্রতিযোগিতা – দেবসভায় বেহুলা নৃত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে দেবতাদের মন জয় করেছিলেন এবং স্বামীর পুনর্জীবন লাভের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন, একথা সকল মনসামঙ্গল কাব্যেই আছে। সিনেমায় বিষয়টিকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতেই ঊর্বশীর সঙ্গে বেহুলার নাচের প্রতিযোগিতা দেখানো হয়েছে। এই দৃশ্যটির অভিনব উপস্থাপনা সব দিক থেকেই প্রশংসনীয়। বেহুলার কণ্ঠে গানের কথায় রয়েছে নিয়তিবাদ, ঈশ্বরের হাতে খেলার পুতুলের মত ভব মঞ্চে মানুষের নেচে যাওয়ার কথা। বেহুলার গানে ক্ষমতাশালী শ্রেণির খামখেয়ালিতে সাধারণ মানুষের বিপর্যস্ত জীবনের কথা উঠে আসে। তাইতো বেহুলার মত নিরপরাধ নারী বাসর রাতেই স্বামীকে হারায়। কেবল প্রতিবাদ নয় বেহুলার গানে দেবতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর শোনা যায়। দেবতারা প্রতিশ্রুতি না রাখলে সব ছারখার করে দেওয়ার শপথ উচ্চারিত হয় বেহুলার গানের কথায়। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হার মানে ঊর্বশী। সমুদ্রে তোলপাড় করে প্রবল জলোচ্ছ্বাস। কঠিন পাহাড়ে ভাঙ্গন ধরে। স্বর্গ সভা দুলতে থাকে বেহুলার নাচের মধ্যে প্রকাশিত বিদ্রোহে। প্রকৃতির এই অস্থিরতা আসলে বেহুলার সতীত্বের সামনে স্বার্থপর ক্ষমতাশালী শ্রেণির ভঙ্গুর অবস্থানের প্রতীকী। বেহুলা হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের প্রতিভূ, আর কাঠগড়ায় সমস্ত দেবকূল যারা ক্ষমতাবান শ্রেণির প্রতিনিধি। *বাদ্যি বাজিয়ে ঘুঙরু সাজিয়ে* গানটির কথা সুর, বেহুলার চরিত্রে অর্পিতা মুখার্জীর অভিনয়, শ্রেণি বৈষম্যের প্রতীকী উপস্থাপনায় এই দৃশ্য সিনেমায় অনবদ্য হয়ে ওঠে।

মনসার বীণ বাজাবার প্রসঙ্গে লোকবিশ্বাস আর গতানুগতিকতা – সাপে কামড়ানো মানুষের দেহ থেকে সাপের বিষ বের করার জন্য গ্রাম বাংলায় এক সময় পর্যন্ত বৈদ্য বা বেদে বীণ বাজিয়ে সেই নির্দিষ্ট সাপকে ডাকার চেষ্টা করতেন। সাপ এসে নাকি নিজেই নিজের বিষ বের করে নিত, এমন সংস্কার বিশ্বাসে বাঁচতেন গ্রামের সাধারণ মানুষ। এ ঘটনার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই আমরা জানি। কিন্তু তা স্বত্বেও এই লোকবিশ্বাসকে অবলম্বন করে বাংলা হিন্দি প্রাদেশিক নানা ভাষায় তৈরি বহু সিনেমায় দর্শকদের সামনে টান টান

উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাহিনির বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। দুই বাংলায় জনপ্রিয় 'বেদের মেয়ে জোছনা' সিনেমায় অথবা 'মনসাকন্যা' বা 'নাগপঞ্চমী'র মত জনপ্রিয় বাংলা সিনেমায় কখনও নায়কের প্রাণ বাঁচাতে কখনও বা নারীরূপী সাপকে স্বরূপে ফেরাতে বীণ বাজাবার ঘটনা দেখানো হয়েছে। *সতী বেহুলা* সিনেমায় বেহুলার দৃঢ়তার সামনে হার মেনে লক্ষিন্দরের প্রাণ ফেরাতে মনসা নিজের হাতেই তুলে নিয়েছে বীণ। এ দৃশ্য কোন মনসামঙ্গল কাব্যে নেই। লোকবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই দৃশ্য দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য গতানুগতিক ধারা অনুসারেই উপস্থাপিত হয়েছে।

বিষহর চরিত্রের সংযোজন এবং চলচ্চিত্রে মনসার প্রাধান্য হ্রাস – *সতীবেহুলা* চলচ্চিত্রে মনসামঙ্গলের কাহিনিতে যোগ করা হয়েছে বিষহর নামের একটি চরিত্র। বিষহরণের দেবী হওয়ায় মনসার অপর নাম বিষহরী। পাশাপাশি সাপের বিষ থেকে মুক্ত করার অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পন্ন তান্ত্রিক বিষহর চরিত্রটিকে মনসার প্রতিস্থানীয় করে আনা হয়েছে এই সিনেমায়। কাহিনিতে যেভাবে তার আধিপত্য মনসাকেও ছাপিয়ে গেছে তা এরকম - মনসা চাঁদকে পুত্র সম্বোধনে তার কাছে পূজা চাইতে এলে শৈব চাঁদ তাকে অপমান করে বিতাড়িত করে। ক্রুদ্ধ মনসা ছলনায় চাঁদের প্রাসাদের নিকটস্থ লোকেদের সাপের কামড়ে প্রাণ নিতে শুরু করে। সর্প দংশনে অচেতন মানুষদের প্রাণ বাঁচাতে কালির সাধক তান্ত্রিক বিষহরের শরণাপন্ন হয় চাঁদ। বিষহরের অলৌকিক ক্ষমতায় সাপের বিষের প্রভাব মুক্ত হয়ে আক্রান্তেরা সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ক্রুদ্ধ মনসা বিষহরের কাছে যান। বিষহর তুচ্ছ নারী বলে তাকে অপমান করে। মনসা তাকে অভিশাপ দিতে এলে নেতা ধোপানীর মধ্যস্থতায় বিষহর পদ্মাবতীর প্রকৃত পরিচয় জানতে পারেন, এবং অত্যন্ত লজ্জিত হন। বিষহর মনসার কাছে ক্ষমা চাইলে, চাঁদের দ্বারা মনসা পূজা করানোর শর্ত দেন দেবী। বিষহর সম্মত হয়। ওদিকে বিষহরের দুই শিষ্য এক নটীকে নিয়ে আমোদ প্রমোদের ইচ্ছায় তাকে সুরাপানে মত্ত গুরুর সামনে হাজির করে। ঠিক সেই সময় চাঁদ তার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবর্ণের বিবাহের বিষয়ে পরামর্শ নেওয়ার জন্য গুরু বিষহরের কাছে আসছিলেন। ক্ষণিকের দুর্বলতায় বিষহর ঐ নটীর সংসর্গে মশগুল হলে চাঁদ সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে এবং ঘৃণার সঙ্গে স্থানত্যাগ করে। চাঁদের কাছে বিষহর গুরুর সম্মান তো

হারায়ই, উপরন্তু পায় চরিত্রহীন নির্বংশ ইত্যাদি ধিক্কার। এখান থেকেই কাহিনিতে মনসার স্থান নেয় বিষহর। চাঁদ মনসার বিবাদ নয় চাঁদ আর বিষহরের বিবাদ নিয়ন্ত্রণ করে সম্পূর্ণ কাহিনিকে। চাঁদের অপমানের প্রতিশোধ নিতে তৎপর হয় বিষহর। তার ষড়যন্ত্রেই চাঁদের সন্তান ফুলশয্যার রাতে সাপের কামড়ে প্রাণ হারায়। বেহুলা লক্ষিন্দরের লোহার বাসর ঘরে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে ছিদ্র তৈরি করায় বিষহর, বিশ্বকর্মা প্রথমে নারাজ হলে তার পুত্রদের প্রাণ নাশের হুমকি দিয়ে বিষহর তাকে বাধ্য করেছিল নিজ স্বার্থে কাজে লাগাতে। কালনাগিনীকে পাঠিয়ে লক্ষিন্দরকে দংশন করানোও বিষহরের ষড়যন্ত্রের ফল। সুতরাং মর্ত্যলোকে নিজ পূজা প্রচারের জন্য যে ক্রুরতা মনসাকে অবলম্বন করতে হয়েছিল, তার সবটাই *সতী বেহুলায়* বিষহরের দ্বারা সম্পন্ন হয়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই পুরো সিনেমায় অনেকাংশে হ্রাস পায় মনসার উপস্থিতি, তার গুরুত্ব।

দেবী চণ্ডীর মহত্ব ও তন্ত্রসাধনার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা – মনসামঙ্গলের কাহিনিতে দেবী পার্বতী বা চণ্ডীর স্থান কতটুকু তা আমাদের সকলেরই জানা। মনসাকে প্রথম সাক্ষাতেই তিনি নির্মম ভাবে আহত করেন এবং তার বাঁ চোখটিকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেন। বিমাতা পার্বতীর হিংস্রতার প্রকাশ পরবর্তীকালেও দেখতে পাই যখন অষ্টনাগ জন্ম দেওয়ার পর ষড়যন্ত্র করে তিনি মনসার স্তন শুষ্ক করে দেন, যাতে সন্তান মায়ের দুধ না পায়। এ হেন পার্বতীকেই সতী বেহুলা সিনেমায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভুমিকায় তুলে ধরা হয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে চণ্ডীর সাধক বিষহরই এ গল্পে মনসার প্রতিস্থানীয় হয়ে অধিকাংশ ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বিষহরের সাধনায় প্রীত হয়ে চণ্ডী তার সামনে প্রকট হন এবং চণ্ডীর আশীর্বাদেই সে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষে পরিণত হয়। এবং এই শক্তির প্রয়োগ করেই বিষহর একে একে চাঁদের সাতজন সন্তানের সর্পদংশনের দ্বারা মৃত্যু ঘটায়। আবার লক্ষিন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলার প্রতি বিষহরের হিংস্র আসক্তি প্রকাশিত হলে ক্রুদ্ধ চণ্ডীর আবির্ভাব হয়, তার তাণ্ডবে স্বর্গ মর্ত্য পাতালে আলোড়ন হতে থাকে। দেবী নিজ হাতে ত্রিশূলে বধ করেন বিষহরকে। স্বর্গসভায় বেহুলার নৃত্য পরিবেশনের সময় দেবী চণ্ডী নেপথ্যে থেকে আশীর্বাদ করেন তাকে। এছাড়া সিনেমায় চণ্ডীর ভূমিকায় হেমা মালিনীর মত বড় মাপের অভিনেত্রীর দৃশ্যায়ন, তার বিদগ্ধ অভিনয় প্রতিভা, অসাধারণ নৃত্যশৈলী

সব মিলিয়ে তার উপস্থিতি বাকিদের ছাপিয়ে গেছে, এর ফলেও চণ্ডী চরিত্রটি অধিক গুরুত্ব লাভ করে স্বতন্ত্র তথা মহিমায় প্রকাশিত হয়েছে। ফলত মনসাকাহিনিতে মনসা হারিয়েছে কাঙ্ক্ষিত প্রাধান্য।

চাঁদ সদাগর চরিত্রে ভিন্ন মাত্রা - *সতী বেহুলা* সিনেমায় প্রতিপত্তিবান চাঁদ সদাগরকে দেখা যায় গ্রামের দুস্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের পা ধুয়ে তাদের অর্থ দান করছেন। অধিকাংশ মনসামঙ্গলের চাঁদের পৌরুষবান চরিত্রই প্রকাশিত। তার দানশীল সহানুভূতিশীল বিনয়ী চরিত্র সেভাবে মঙ্গলকাব্যে ধরা নেই। যদিও জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে চন্দ্রপতি সদাগরের *পুণ্য দান* করার প্রসঙ্গ উল্লিখিত[২৯]। তবুও সিনেমার উল্লিখিত দৃশ্যে তিনি অনেক বেশী শ্রদ্ধা, করুণা আর বিনয়ের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছেন। তার গুরুস্থানীয় কালীর সাধক বিষহরের এক নটীর সংসর্গের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তিনি তাকে অপমান করেন ও নিজের বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেন। এখানে তার ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্রবান রূপ তুলে ধরা হয়েছে। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে কিন্তু মনসার চক্রান্তে চাঁদের বাণিজ্যতরী ডুবে যাওয়ার পর সর্বস্বান্ত অবস্থায়ও সে নটী বাড়ি যেতে তৎপর হয়। এখানে মনসামঙ্গলের চন্দ্রধরের সাথে *সতী বেহুলা* সিনেমার চাঁদ বণিকের পার্থক্য দেখা যায়।

বেহুলার অগ্নিপরীক্ষার ঘটনাও চাঁদ চরিত্রের অসঙ্গতিকে প্রকাশ করে। যে চাঁদ বণিক ন্যায়নিষ্ঠ, ধার্মিক, পরম দয়ালু, তিনি কিভাবে পুত্রবধূ বেহুলার মৃত স্বামীর সাথে কলার ভেলায় ভাসার শর্ত হিসাবে সমাজের বিধানকে মেনে নেন এবং তাকে আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করেন – এ প্রশ্ন থেকেই যায়। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণেও ভিন্ন অনুষঙ্গে ভয়াবহ সব পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় বেহুলাকে। মনসাকাহিনির অপর একটি প্রতিগ্রহণের ধারা লোকযাত্রায়ও এই একই দৃশ্যে বেহুলার অগ্নিপরীক্ষার রূপায়ণ দেখা যায়। কাহিনিকে করুণ উপস্থাপনায় হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে নারীর জন্য এ জাতীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা ভারতীয় বিনোদনের জগতে এক অতি পরিচিত উপাদান। আর সেই সহজ উপকরণকে কাজে লাগাতে গিয়ে চাঁদ বণিকের দার্ঢ্যে চিড় ধরেছে, চরিত্রে এসেছে অসঙ্গতি।

চাঁদের বাণিজ্য তরী নিমজ্জনের কাহিনী রূপায়িত হয়নি- প্রচলিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে ছয় সন্তান হারাবার পর সনকার আপত্তি সত্ত্বেও চাঁদ বণিকের বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ রয়েছে। কিন্তু বর্তমান আলোচ্য বাংলা সিনেমাটিতে কোথাও চন্দ্রধর বণিকের বাণিজ্য যাত্রার চিত্রায়ণ নেই। কেবল সনকার মুখে একবার তার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবর্ণের বিবাহ প্রসঙ্গে স্বামীর বাণিজ্য যাত্রার কথা শোনা যায়। ফলে মনসামঙ্গল অনুযায়ী চাঁদ বণিকের সপ্ত ডিঙা (কোথাও বা চোদ্দ ডিঙ্গা) বাণিজ্য তরী কালিদহে নিমজ্জন ও সর্বস্বান্ত হবার প্রসঙ্গ সিনেমায় দেখা যায় না।

সিনেমার কাহিনির দুর্বল বুনট - মনসার পূজাঘট ভাঙার প্রসঙ্গে মনসামঙ্গল কাব্যগুলির সাথে এ সিনেমায় সময়ের ব্যবধান দেখানো হয়েছে। *সতী বেহুলা* সিনেমায় সাত পুত্র হারিয়ে ভগ্ন হৃদয় সনকা কালির সাধক বিষহরের পরামর্শে মনসা পূজার আয়োজন করলে, চাঁদ পদলাঞ্ছিত করে সে আয়োজন নষ্ট করে। ক্রুদ্ধ মনসার কাল নৃত্যে ত্রিভুবন আলোড়িত হয়, ভেঙে পড়ে চাঁদের প্রাসাদ, সর্বহারা ভিখারি চাঁদ সস্ত্রীক পথে নামে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের কাহিনীতে চাঁদ কর্তৃক মনসার পূজাঘট ভাঙার প্রসঙ্গ এসেছিল বেহুলা লক্ষিন্দরের জন্মের অনেক আগে। জালু মালুর মায়ের কাছে মা মনসার করুণার কথা শুনে সনকা নিজ ছয় পুত্রের কল্যান কামনায় মনসা পূজার আয়োজন করেছিল। দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে চন্দ্রধর সনকার মনসাপূজার কথা জানতে পারে স্বপ্নে মহামায়ার বিবরণে। হেতালের বাড়ি মেরে মনসার ঘট ভাঙতে মহামায়াই চাঁদকে নির্দেশ দেন। বিজয় গুপ্তের কাব্যে শিশুকাল থেকেই সনকা মনসার একনিষ্ঠ ভক্ত। চম্পক নগরে মনসাপূজা প্রচারিত হলে সেও দেবীর পূজার আয়োজন করে, এবং চাঁদ পদাঘাতে সমস্ত পূজা সরঞ্জাম নষ্ট করে। জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে সশরীরে দেবী পদ্মাবতী ভাই সম্বোধনে চাঁদের কাছে পূজা প্রার্থনা করলে হেতালের বাড়ি মেরে দেবীকে বিতাড়িত করেন চাঁদ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মোটামুটি মনসামঙ্গলের সব কাহিনীতেই চাঁদ বণিকের সঙ্গে মনসার বিবাদের সূত্রপাত রূপে মনসার পূজাঘট ভাঙা বা সশরীরে দেবীকে হেতালের লাঠি দিয়ে মারার প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু *সতী বেহুলা* সিনেমায় প্রথমাবধি মনসার পূজা করতে অস্বীকৃত চাঁদের সঙ্গে দেবীর বিবাদের প্রসঙ্গ থাকলেও মনসার পূজা-ঘট ভাঙার ঘটনা চিত্রায়িত

হয়েছে লক্ষিন্দরের মৃত্যুর পর। এবং এ ঘটনায় ও রয়েছে বিষহর চরিত্রটির প্রভাব। স্বামীর সঙ্গে চরম বিরোধ জেনেও পরিচারিকার পরামর্শে সনকা গোপনে হাজির হয় বিষহরের সাধনস্থলে। বিষহরের পরামর্শেই স্বামীর অনুপস্থিতিতে গৃহে মনসা পূজায় রত হয় সনকা। পূজাস্থলে চাঁদ উপস্থিত হয় এবং পদাঘাতে মনসার পূজা ঘট ভেঙ্গে দেয়। এখানে প্রশ্ন হল, লক্ষিন্দরের মৃত্যুর পর সনকা কেন মনসা পূজা করছেন? তিনি কি জানেন, তার মৃত সন্তানরা বেঁচে ফিরতে পারে? বেহুলা অসাধারণ, সে তার দৃঢ়তায় অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, স্বর্গলোক থেকে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু সনকা তো অতি সাধারণ একজন নারী, একজন মা। লক্ষিন্দরের জীবৎকাল পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে বিবাদে সনকার পরিবার তথা সন্তানদের যাতে হানি না হয়, সেই কামনায় একজন মা মনসা পূজার আয়োজন করলেন না, অথচ একে একে সাতজন সন্তানের মৃত্যুর পর তিনি সংসারের কল্যাণের জন্য মনসা পূজা করলেন। এখানে সনকার কোন্ কল্যাণ কামনা কার্যকর বোঝা যায় না। এ হেন ঘটনা কাহিনি গ্রন্থনে দুর্বলতাকেই স্পষ্ট করে।

মনসার চক্রান্তে কালিদহে চাঁদের বাণিজ্যতরী ভরাডুবির চরম দুরবস্থার কথা সকল মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে রয়েছে। সাগরে ভাসমান অবস্থায় কাক রূপে মনসার চাঁদকে ঠোকরানো, রান্না করে খেতে গেলে পাতে বর্জ্য ফেলে খাবার নষ্ট করা, শ্রীগোলা নগরে কুম্ভকারদের ভার বইতে গেলে বাঘ হয়ে পদ্মাবতীর ভয় দেখানো ও তার ফলে মাথার বোঝা মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে যাওয়া, কুম্ভকারদের হাতে মার খাওয়া, এমনকি পরনে ধুতি কেড়ে নেবার পর উলঙ্গ দেহে ভাগ্যান্বেষণ, চোরের অপবাদে মাথা নেড়া করে ঘোল ঢেলে তাকে বিতাড়িত করার ঘটনা জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে আমরা পাই[৩০]। আবার বিপ্রদাস পিপলাই[৩১] এর মনসাবিজয় কাব্যের *ডিঙাডুবি পালায়* খিদের জ্বালায় চাঁদের কাঠ বিক্রি, পড়ে থাকা কলাচোপা খাওয়া, ব্যাধেদের হাতে লাঞ্ছনা, চোরের কবলে দুর্ভোগ ইত্যাদি দুর্দশার চিত্র ধরা আছে। *সতী বেহুলা* সিনেমায় চাঁদের বাণিজ্য যাত্রার দৃশ্যায়ন নেই, ফলত বাণিজ্যতরী ডুবে যাওয়া এবং তার ফলে চাঁদের সর্বস্বান্ত হওয়ার প্রসঙ্গও নেই। সাত পুত্রের মৃত্যুর পর চাঁদের মনসা ঘট ভাঙা এবং হঠাৎই সস্ত্রীক ভিখারি দশা এখানে দেখানো হয়েছে। কিভাবে চাঁদ সম্পত্তি হারালো তার কোন কারণ নেই। আবার

বেহুলা লক্ষিন্দর স্বর্গ থেকে ফিরে রাস্তায় ভিখারি অবস্থায় চাঁদ আর সনকার সঙ্গে মিলিত হন। বেহুলা চাঁদকে মনসা পূজায় রাজি করালে চাঁদ নিজ মহলে পূজার আয়োজন করে। কিভাবে আবার সম্পত্তি ফেরত পেল তা বোঝা যায়না। হঠাৎই জীর্ণ বস্ত্র উধাও হয়ে রাজপোশাক পরে পূজায় বসা একেবারেই অসঙ্গত মনে হয়। যদি মনসার আশীর্বাদ এর পেছনে কার্যকরী ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়, তাও কার্য কারণ সূত্রে মেলেনা। কারণ সেক্ষেত্রে তা চাঁদের হাতে পূজা পাওয়ার পর ফলপ্রসূ হওয়ার কথা। ফলত সিনেমাটিতে কাহিনি গ্রন্থনে শৈথিল্য প্রকট হয়।

অসঙ্গত ও বিকৃত গানের ব্যবহার – *সতী বেহুলা* মূলত মধ্যযুগে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণ। কিন্তু একালের প্রেক্ষাপটে এ সিনেমায় যুক্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি গান। এই সিনেমায় ব্যবহৃত মোট গান সাতটি। সিনেমার শুরুতে রোগগ্রস্ত স্বামী সত্যবানকে নিয়ে কঠিন পথ চলছে সাবিত্রী। এই সময় *রাম নাম জপে মন রাম নাম* এই গানটি সাবিত্রি ও সত্যবানের কণ্ঠে গীত হয়েছে। সিনেমার কাহিনিতে আমরা দেখি সাবিত্রি মনসা ভক্ত, মনসার আশীর্বাদেই তার স্বামী সুস্থ হছে। কিন্তু মনসা দেবীর বন্দনার গান না ব্যবহার করে রামনাম জপ করা এবং রামের দয়া ভিক্ষা করা কাহিনির সঙ্গে কিছুটা অসঙ্গত মনে হয়। যদিও গানের প্রথম কলি বাদ দিলে আর কোথাও রামের প্রসঙ্গ নেই। সেখানে বেহুলার সতিত্বের আখ্যান শুনতে বলা হচ্ছে ধন্য দেশের ধন্য সব সতী নারীকে। দুঃখের জীবনের কঠিন বাস্তবতার কথা, স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বস্ততার কথা গানের কথায় এসেছে। একই ভাবে বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে যখন কলার ভেলায় ভাসতে শুরু করেন, তখনও তার প্রতিকূলতার প্রেক্ষাপটে নেপথ্য সঙ্গীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এই গানটি। অর্থাৎ সাবিত্রী ও বেহুলা দুজনেই কাহিনির মূলভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, মনসাভক্ত হয়েও নিজ নিজ স্বামীকে বাঁচাতে রামনাম জপ করছেন।

বেহুলা লক্ষিন্দরের প্রেম পর্বে দুটি রোম্যান্টিক গান সিনেমায় এসেছে। দুটিই কল্পদৃশ্যে রূপায়িত। একটি গান লক্ষিন্দরকে প্রথমবার দেখার পর বেহুলার কল্পনায় আর অপরটি বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহের পর তাদের দুজনের কল্পনায়। বেহুলার বিবাহের প্রাক্কালে তার বাবা মা পরিবার পরিজন ছেড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে নারীদের চিরকালীন বিচ্ছেদ যন্ত্রণা কথা

ব্যক্ত হয়েছে *বাবা মায়ের স্নেহে ঘেরা* গানটিতে। এছাড়া কৌতুকরসের উপস্থাপনে দুটি গান ব্যবহৃত হয়েছে। একটি বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহের পর কনের বাড়ির এঁয়োস্ত্রীদের লক্ষিন্দরকে নিয়ে করা রসিকতা প্রসঙ্গে। আর একটি বধূবরণের সময় নতুন স্ত্রী, শ্বশুরবাড়ি নিয়ে রসিকতা করে সনকার গাওয়া গান। বেহুলার বাড়িতে এঁয়োস্ত্রীদের নতুন জামাই এর সঙ্গে রসিকতা করার বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক, বাঙালি অনেক পরিবারেরই এ এক চেনা দৃশ্য। কিন্তু *জানি বিয়ে হয়েছে তোমার ও নটবর* এই গানে ছেলের বিবাহ নিয়ে মায়ের কৌতুক করার ঘটনা সনকা আর লক্ষিন্দর প্রসঙ্গে একেবারেই বেমানান লাগে। ইতিপূর্বে ফুলশয্যার রাতে যে মায়ের একে একে ছয়টি সন্তানের সর্পদংশনে মৃত্যু হয়েছে, তার পক্ষে সপ্তম সন্তানের বিবাহের পরের সময়টা অত্যন্ত উদ্বেগ আশঙ্কা ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক। ফলত সনকার মুখে কৌতুক রসের গান, ঘটনার পূর্বাপর কার্য কারণ সম্পর্ক রক্ষা করতে পারেনি।

কল্পিত চরিত্র বিষহরের কাহিনির রূপায়ণে সিনেমায় এসেছে একটি কুরুচিকর গান। এক ছলা কলা পটীয়সী নারী যে বিকৃত দেহ বিভঙ্গে পুরুষ সান্নিধ্যে অর্থ উপার্জন করে তার নাচের জন্য গানটি ব্যবহৃত হয়েছে। গানের কথা অত্যন্ত নিম্নরুচির। মনসামঙ্গলের মত একটি করুণ রসাত্মক আধ্যাত্মিক কাব্যকাহিনি, আধুনিক সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যেখানে কিছু পরিবর্তন খুব স্বাভাবিক হলেও *ভীষণ ব্যথা সারা অঙ্গে ও নাগর মালিশ করে দাও* এই গানটির কথা, গানের সঙ্গে ব্যবহৃত বিকৃত নাচের উপস্থাপনা একেবারেই অসঙ্গত। আসলে জোর করে আনা বিষহর চরিত্রকে কাহিনির অন্যতম নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় তুলে ধরতে গিয়ে সেই সূত্রেই আনুষঙ্গিক চরিত্র আর ঘটনার সন্নিবেশে এই কুরুচিকর গানটি ব্যবহৃত হয়েছে। ফলত মূল কাহিনির ভাব রসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি।

একবিংশ শতকে মনসাসংস্কৃতির প্রতিগ্রহণের ধারায় পৌরাণিক চরিত্র সাবিত্রি সত্যবান কেন্দ্রিক আজগুবি গল্পের মোড়কে *সতী বেহুলা* আমাদের সামনে যা তুলে ধরল, কাহিনি ও চরিত্রের দুর্বল বুনটে, কুরুচিকর গানের সংযোজনে, সর্বোপরি দেবী বিষহরীর প্রতিস্থানীয় পুরুষ চরিত্র বিষহরের সংযোজনে এবং মনসার প্রাধান্য হ্রাসে তা এককথায় মনসাকাহিনির বিকৃত বিনির্মাণ।

মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলির মতই মনসামঙ্গলের কাহিনি অবলম্বনে তৈরি সিনেমাগুলিতেও পুচ্ছানুসারিতা চোখে পড়ে। ১৯৬৬তে জাহির রায়হানের নির্দেশনায় মুক্তি পায় *বেহুলা*। পরবর্তীকালের এই পর্যায়ের সিনেমাগুলিতে এর অনুসরণ তথা প্রভাব স্পষ্ট। অমল দত্তের নির্দেশনায় ১৯৭৭এ মুক্তিপ্রাপ্ত *বেহুলা লক্ষিন্দর* বা ২০১০ এ মনোজকুমার নির্দেশিত *সতী বেহুলায় বেহুলার* প্রভাব নানা স্থানে চোখে পড়ে। *বেহুলা* (১৯৬৬) ছায়াছবিতে দুটি গান সহ বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহ পূর্ব প্রেম পর্ব বিস্তৃত ভাবে রূপায়িত হয়েছে। মনোজকুমার নির্দেশিত *সতী বেহুলা* সিনেমায়ও আমরা বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহ পূর্ব আলাপ ও প্রেমের দৃশ্যায়নের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। অবশ্য সেখানে একবার সাক্ষাতের পর অনুরক্ত বেহুলার মানস কল্পনার মাধ্যমে এ পর্বের আয়োজন করা হয়। লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ লোকযাত্রার মনসাপালায়ও বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহ পূর্ব প্রেম কেন্দ্রিক বিস্তৃত কাহিনি লক্ষ্য করা যায়। তবে এক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের প্রভাবে নয়, লোকমানসের স্বাভাবিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যস্বরূপ যাত্রাপালায় স্বতন্ত্র অধ্যায় রূপে বেহুলা লক্ষিন্দরের প্রেমপর্বের উপস্থাপন করে থাকেন পালাকারেরা।

সাপে নেউলে সম্পর্ক, এই প্রবাদটি আমাদের সকলেরই চেনা। সাপের দেবীর বিরোধিতা করবার জন্য তাই *বেহুলায়* এসেছে নায়কের ময়ূর পোষার প্রসঙ্গ। পরবর্তীকালে অমল দত্ত নির্দেশিত *বেহুলা লক্ষিন্দর* সিনেমায়ও লক্ষিন্দরের ময়ূর নিয়ে উজানি নগরে যাবার প্রসঙ্গ এসেছে। অবশ্য সেখানে ময়ূরকে লক্ষিন্দরের মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখানো হয়নি। উজানি নগরে ব্যাবসা করতে গেলে সেখানে লক্ষিন্দর সখের ময়ূরটি নিয়ে গিয়েছিল, এরকমটাই দেখানো হয়। তবে ময়ূর প্রসঙ্গে *বেহুলা* সিনেমার প্রভাব এক্ষেত্রে নিশ্চিত ছিল। এই প্রসঙ্গে এই সিনেমার চুয়াল্লিশ বছর পরে তৈরি মনোজকুমার নির্দেশিত *সতী বেহুলা* সিনেমার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।*সতী বেহুলায়* ও লক্ষিন্দরকে সাপে কাটার পেছনে চাঁদ মনসার বিবাদ নয় এক ভিন্ন কারণ তুলে ধরা হয়েছিল। সেখানে চাঁদ আর বিষহরের বিবাদ ছিল মূল কাহিনির নিয়ন্ত্রক। ফলে মনসা কাহিনি থেকে গুরুত্ব হারিয়েছিল মনসা। কিন্তু বেহুলা ময়ূর নাচ শেখার জন্য শাস্তি পাওয়ার ঘটনায় প্রেক্ষাপট বদলে গেলেও

মনসার নিয়ন্ত্রণ তথা গুরুত্ব একই থাকে। এখানেই *বেহুলার* ঘটনাক্রমের যাথার্থ্য বজায় থাকে, আর *সতী বেহুলার* কাহিনি বিন্যাসের অসঙ্গতি তথা বিকৃতি প্রকট হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বেহুলার অগ্নিপরীক্ষার কথা আমরা নারায়ণদেবের কাব্যে পাই, কিন্তু সেক্ষেত্রে বিষয়টি ঘটেছিল চাঁদ মনসার বিবাদ মেটার পর, কাহিনির শেষে। সিনেমায় প্রেক্ষিত বদলে নিয়ে এ ঘটনার রূপায়ণ ঘটেছে। আবার সিনেমার এই বদলে যাওয়া প্রেক্ষিত একে অপরকে প্রভাবিত করেছে। ১৯৭৭এ অমল দত্ত নির্দেশিত *বেহুলা লখীন্দর* সিনেমায় স্বামীর সঙ্গে কলার ভেলায় ভাসার শর্ত হিসাবে সমাজপতিদের প্রস্তাবে বেহুলার যে অগ্নিপরীক্ষা দেখানো হয়েছে, ২০১০ এ মনোজকুমার নির্দেশিত *সতী বেহুলা* সিনেমায়ও তার অবিকল অনুসরণ দেখি। একই ভাবে *বেহুলা লখীন্দর* এ সীতার অগ্নিপরীক্ষার প্রসঙ্গটি এসেছে চাঁদের সংলাপে, ১৯৬৬ র *বেহুলায়* তা ছিল নেপথ্য সঙ্গীতে। প্রথমটির প্রভাব পড়েছে দ্বিতীয়টিতে, আবার দ্বিতীয়টির প্রভাব পড়েছে তৃতীয়টিতে।

বেহুলা সিনেমায় আমরা দেখি লক্ষিন্দরের মৃত্যুর পর চাঁদ তাকে কলার ভেলায় ভাসাতে উদ্যোগ নিলে বেহুলা কান্নায় ভেঙে পড়ে। চাঁদ বেহুলাকে বোঝায় এটাই নিয়ম, কারণ জলের প্রভাবে অনেক সময় সাপের কামড়ে মৃত ব্যক্তিও বেঁচে ওঠে। একথা শুনে বেহুলা স্বামীর সঙ্গে ভেলায় ভাসতে বদ্ধ পরিকর হয়। মহাভারতের সাবিত্রীর আদর্শে অসম্ভবকে সম্ভব করে মৃত স্বামীর প্রাণ ফেরানোর কঠিন সঙ্কল্প নেয়। এই প্রসঙ্গে বেহুলার সংলাপ উল্লেখ্য - *আমি সেই সাবিত্রী ...আমি ওর সঙ্গে ভেসে যাব দূরে...বহু দূরে...সেই অমৃতের দেশে...সাবিত্রী ভয় পায়নি আমিও পাব না, সাবিত্রী কাঁদেনি, আমিও কাঁদবনা, আমি ওকে ফিরিয়ে আনবই* । পরবর্তীকালে *বেহুলা লক্ষিন্দর*এর বেহুলাকে দেখা যায় তার মাকে সাবিত্রীর আখ্যান পাঠ করে শোনাচ্ছেন। বিবাহের পূর্বেই সাবিত্রীর পাতিব্রত্যের আদর্শ তাকে প্রভাবিত করেছিল। আর *সতী বেহুলায়* তো সাবিত্রীর আখ্যানের মোড়কেই মনসা কাহিনিকে তুলে ধরা হয়েছে। সাবিত্রী তার অসুস্থ স্বামীকে বেহুলার আখ্যান শোনাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে সাবিত্রী প্রভাবিত হয়েছেন বেহুলার সতীত্বের দ্বারা। ১৯৭৭ এর *বেহুলা লখীন্দর* সিনেমায় দেখানো হয় পুত্রের প্রাণরক্ষায় অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য চাঁদ সাঁতালি পর্বতে লোহার বাসর ঘরের বাইরে লোক লস্কর বৈদ্য সাধু সন্ত সহ নিজেই পাহারায় ছিলেন,

তারা নানা ভাবে মনসার পাঠানো সাপদের বাসরঘরে প্রবেশের পথ রোধ করে। ২০১০ এর *সতী বেহুলায়* দেখানো হয়, চাঁদের পাঠানো সাধুরা বাসর ঘরের বাইরে থেকেই বেহুলা আর লক্ষিন্দরের শয্যার চারপাশে আগুনের বেড়াজাল তৈরি করে, কালনাগিনী অনেক চেষ্টা করেও সেই বেড়া অতিক্রম করতে না পেরে ফিরে যায়। একই দৃশ্য, কেবল প্রথমটিতে আগুনের বেড়াজাল ছিল বাসর ঘরের বাইরে , আর দ্বিতীয়টিতে এই বেড়াজাল বাসরঘরের মধ্যে। এ ক্ষেত্রে সতী বেহুলায় আগের সিনেমাটির কেবল প্রভাব নয়, সম্পূর্ণ নকল দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।

মনোজকুমার নির্দেশিত *সতী বেহুলায়* অমল দত্তের *বেহুলা লখীন্দর* সিনেমার সংলাপ কোথাও কোথাও একেবারে হুবহু নকল করা হয়েছে। যেমন *বেহুলা লখীন্দর* সিনেমায় চাঁদের কাছে মনসা পূজা প্রার্থনা করার যে সংলাপ –

মনসা – বাবা চন্দ্রধর, বাবা চন্দ্রধর...

চাঁদ – কে ?

মনসা – আমি জরৎকারু মুনির পত্নী ঋষি আস্তিকের জননী।

চাঁদ – ও , তো তোমার এক চোখ কানা কেন ?

মনসা – দেবী চণ্ডিকা বিল্বকণ্টকে আমার এক চোখ কানা করে দিয়েছিল।

চাঁদ – বটে !

মনসা – হ্যাঁ সওদাগর, তাই বাবা মহেশ্বর তার ভয়ে আমাকে সিজুয়া পর্বতে স্থানান্তরিত করেছে।

চাঁদ – সিজুয়া পর্বত ?

মনসা - সেখানে আমি ঊনকোটি নাগের মাতা।

চাঁদ – হুম, তাহলে তুমি বেদেনী ?

মনসা – না, আমি দেবী। তুমি আমায় পূজা দিলে আমি স্বর্গে স্থায়ী আসন লাভ করব।

চাঁদ – অসম্ভব। আমি দেবাদিদেব মহাদেবের উপাসক। মহাদেব ছাড়া আমি কারো পুজো করিনা।

দেখা যায় মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারার পুচ্ছানুসারিতা একালের মনসাকাহিনি কেন্দ্রিক সিনেমাতেও এভাবে বিস্ময়কর রূপে বহাল আছে। তবে এই ধারায় ১৯৬৬র জাহির রায়হানের বেহুলার আগের কোন সিনেমা এখন আর দেখার সুযোগ নেই, সুতরাং এ সিনেমায় আগের কোন চলচ্চিত্রের প্রভাব ছিল কিনা জানা যায় না। আর জাহির রায়হানের মত সুদক্ষ সাহিত্যিক চলচ্চিত্র পরিচালক এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ছায়াছবির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের সিনেমায় নকল করবেন, এ সম্ভাবনা কম। অমল দত্তের বেহুলা লখীন্দরএ *বেহুলা*র কয়েকটি প্রসঙ্গ উঠে এলেও মূলত মনসামঙ্গলের বিশ্বস্ত রূপায়ণে সিনেমার স্বকীয়তা বজায় থেকেছে। মনোজকুমারের *সতী বেহুলা* একদিকে অভিনবত্ব দেখাতে গিয়ে মনসার প্রতিস্থানীয় বিষহর চরিত্র এনে কাহিনীর মূল ভিত্তিকেই দুর্বল করেছে, আর অন্যদিকে পারম্পর্যহীন কাহিনি বিন্যাস, সংলাপে আগের সিনেমাগুলিকে নকল করে চলচ্চিত্রের মানকে করেছে নিম্নমুখী।

মনসাকাহিনি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় ধারা - এই ধারার চলচ্চিত্রে কোন সামাজিক বা পারিবারিক আখ্যানে দেবী মনসার সম্পূর্ণ প্রভাব তথা নিয়ন্ত্রণের ওপর আলোকপাত করা হয়। দুই বাংলায় এ হেন বহু চলচ্চিত্র পাওয়া যায়। মনসার মাহাত্ম্যসূচক এই সব কাহিনিতে কোথাও কোথাও পরোক্ষে মনসামঙ্গলের কাহিনি আর চরিত্রের আদল লক্ষ্য করা যায়। যে কোন দৈবী প্রভাবিত কাহিনির মত এখানেও দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন কাহিনির অবলম্বন হলেও ছায়াছবিতে মনসাকাহিনির এই দ্বিতীয় ধারায় কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। জনপ্রিয় যে তিনটি বাংলা চলচ্চিত্র এ প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা হবে, সেগুলি হল সুজিত গুহের *মনসা কন্যা* ও বিজয় ভাস্করের *নাগপঞ্চমী* এবং *মনসা আমার মা* । সাপ ও সাপের দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক এই সিনেমাগুলিতে কোথাও কোথাও পরোক্ষে মনসামঙ্গলের আদল দেখা যায়। উল্লিখিত তিনটি সিনেমায় মঙ্গলকাব্যের প্রভাব নিম্নরূপ।

মনসামঙ্গলের আদলে দেবীর আর এক বিজয়গাঁথা - ১৯৯১ সালে সুজিত গুহের পরিচালনায় মুক্তি পায় বাংলা ছায়াছবি *মনসাকন্যা* । এ কাহিনি অনেকাংশে মনসামঙ্গল প্রভাবিত। চাঁদ বণিকের মতই আর এক ধনী ব্যবসায়ী যদুনাথ মল্লিকের দর্পচূর্ণ হওয়া এ

কাহিনির মূল। চাঁদ ছিলেন শৈব, আর যদুনাথ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নাস্তিক। স্ত্রীর ইচ্ছেয় তিনি নিজের বাড়িতে মনসা মন্দির নির্মাণ করলেও দেবীর আরাধনা তথা ধর্মীয় আচার আচরণ তার কাছে কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। চাঁদ বণিকের মত অবিশ্বাসী যদুনাথ মনসার পূজাঘট ভাঙলে দেবীর কোপ গিয়ে বর্তায় তার ওপর। মনসামঙ্গলের কালনাগিনী এখানে কালনাগ। মনসার আদেশে কালনাগের কামড়ে হতচেতন যদুনাথের প্রাণ বাঁচান মনসার মানসকন্যা বাঁশরী। প্রাণ ফিরে পেয়ে অহংকারী যদুনাথ নিচু জাতির বৈদ্যকন্যা বাঁশরীকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। কাহিনির শেষে লক্ষিন্দরের মতই সর্পদংশনে মৃতপ্রায় যদুনাথের পুত্র সুমনের প্রাণ ফেরায় মনসাকন্যা বাঁশরী। বাঁশরী আর বেহুলা এখানে মিলে মিশে যায়। আর পুত্রের জীবন ফিরে পেয়ে যদুনাথের মনে মনসার প্রতি ভক্তি তথা বিশ্বাস জাগ্রত হয়, সেই সঙ্গে জাত্যাভিমানের সঙ্কীর্ণতা তথা সামাজিক ভেদ বিচারের আজন্ম লালিত সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে বৈদ্য কন্যা বাঁশরীকে পুত্রবধূ হিসাবে সানন্দে গ্রহণ করেন। যদুনাথের প্রার্থনায় মনসার আশীর্বাদে তার পূজার ভাঙা ঘট জোড়া লাগে। এভাবেই সিনেমার প্রয়োজনে রচিত হয় মনসামঙ্গলের নতুন ভাষ্য। যদুনাথের হৃদয়ে প্রকৃত মানবিকতা বোধের উদ্বোধনে ভক্তি এখানে তার অন্তঃচেতনার মুক্তির পথকে প্রশস্ত করে। তার মানস বিবর্তনে মধ্যযুগের মনসামঙ্গল আধুনিক প্রেক্ষিতে নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়।

নায়িকা চরিত্রে মনসার ছায়াপাত – *নাগপঞ্চমী*র মণি ও *মনসা আমার মা* এর ঈশ্বরী চরিত্রে মঙ্গলকাব্যের মনসার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। অযোনিসম্ভবা দেবী মনসা যেমন বাবা মায়ের স্নেহবঞ্চিত হয়ে পাতালে নাগলোকে শৈশব অতিবাহিত করেছিলেন, মণিও রাজেন্দ্র আর অম্বিকাকে হারিয়ে নাগেশ্বরী মাতার মন্দিরে পুরোহিত ও জঙ্গলের পশুপাখির ছত্রছায়ায় বড় হয়। বড় হয়ে প্রথমবার পিতার সামনে দাঁড়ালে শিব যেমন নিজ কন্যাকে চিনতে পারেন নি, এবং পরে চিনতে পারলেও দেবলোকে যোগ্য প্রতিষ্ঠা দেননি, তেমনি মণিও তার মামা দীনেশ চৌধুরী চিনতে পারে না, এবং এখান থেকেই শুরু হয় মনসার মতই মণির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। আবার মনসার প্রথম জীবনের নিপীড়ন, বঞ্চনা প্রতিফলন দেখা যায় *মনসা আমার মা* ছায়াছবিতে ঈশ্বরীর মধ্যে। মনসার মতই ঈশ্বরীর

পিতা মাতার নাম শিব পার্বতী (পার্বতী যদিও মনসার বিমাতা)। ঈশ্বরীর জন্মের সময় পার্বতীর মৃত্যু হয়। সুতরাং মনসার মতই ঈশ্বরীও মাতৃস্নেহ বঞ্চিত। বিমাতা পার্বতী কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছিল মনসা, আর শ্বশুরবাড়িতে শ্বাশুড়ি ননদদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিল ঈশ্বরী, মনসার মতই ঈশ্বরী ছিল স্বামীপ্রেম বঞ্চিতা। জরৎকারু মনসাকে ত্যাগ করেছিলেন, আর ঈশ্বরীর স্বামী তাকে সেভাবে গ্রহণই করেনি। এভাবেই পারিবারিক বা সামাজিক কাহিনিতে দেবী মনসার আশীর্বাদ ধন্য মেয়েটির পরবর্তীকালের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের প্রেক্ষাপটে মনসার অপ্রাপ্তি, বঞ্চনা, অবহেলার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়।

১৯৯৪ এ বিজয় ভাস্করের পরিচালনায় *নাগপঞ্চমী* ছায়াছবিটি মুক্তি পায়। এ সিনেমায় সরাসরি মনসা নামের উল্লেখ নেই। তবে নাগপঞ্চমী তিথিতে মনসা পূজার প্রচলন বঙ্গদেশে প্রাচীন। সিনেমায় উল্লিখিত দেবী নাগেশ্বরী (নাগের ঈশ্বরী) এবং দেবী মনসা যে অভিন্ন, তা নিশ্চিত। সিনেমার কাহিনিতে দেখা যায় ধনী চৌধুরী পরিবারের সন্তান দিনেশ চৌধুরী সম্পত্তির লোভে নিজের বোন অম্বিকাকে ষড়যন্ত্র করে খুন করে। ঘটনাক্রমে হারিয়ে যাওয়া অম্বিকার শিশুকন্যা দেবী নাগেশ্বরীর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ফিরে আসে এবং অলৌকিক ক্ষমতাবলে বলীয়ান হয়ে অপরাধীদের দমন করে। এই কাহিনির প্রভাবে একই পরিচালকের পরিচালনায় পরের বছর ১৯৯৫ এ *মনি নাগেশ্বরী* নামের একটি ওড়িয়া সিনেমা প্রকাশিত হয় যেটি পরবর্তীকালে বাংলায় ভাষান্তরিত হয়ে *মনসা আমার মা* নামে মুক্তি পায়। এই সিনেমার কাহিনিতে দেখা যায় – দক্ষিণ ২৪ পরগণার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে এক অতি সাধারণ পরিবারে মনসার আশীর্বাদে ঈশ্বরী নামে একটি কন্যা জন্মায়। যে বড় হয়ে ধনী পরিবারের পুত্রবধূ হয়। বিবাহিত জীবনে শ্বাশুড়ি ও ননদদের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করেও দেবী মনসার প্রতি তার নিষ্ঠা অবিচল থাকে। কিন্তু দুশ্চরিত্র হিংস্র স্বামীর লোভের কবলে অকালে প্রাণ হারায় সে। এরপর অলৌকিক ভাবে স্বয়ং মনসা ঈশ্বরীর কায়া অবলম্বন করে অন্যায়কারীদের শাস্তি দেন। এ কাহিনিতে স্পষ্টত *নাগপঞ্চমী*র প্রভাব চোখে পড়ে। মনসার মাহাত্ম্য প্রচারমূলক এই সিনেমাগুলিতে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট চোখে পড়ে -

নায়িকার প্রাধান্য – মনসার মাহাত্ম্যসূচক চলচ্চিত্রগুলিতে নায়িকাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। *মনসাকন্যার* বাঁশরি, *নাগপঞ্চমীর* মণি, বা *মনসা আমার মা* এর ঈশ্বরী এরা সকলেই দেবী মনসার আশীর্বাদধন্য। এমনকি কখনো কখনো এরা সাপেদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম। মনসাকন্যার বাঁশরী গান গেয়ে সাপের গতিপথ পাল্টে দেয়, আবার বিপদে পড়লে তার ডাকে সাপেরা দূর দূরান্ত থেকে ছুটে এসে শত্রু দমন করে। সাপের কামড়ে মৃতপ্রায় ব্যক্তির সামনে নাচ গানের মাধ্যমে এই নায়িকারা সকলেই দংশন করা সাপকে হাজির করার ক্ষমতা রাখে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, রূপক সাহার তরিতাপুরাণ উপন্যাস অবলম্বনে ২০১৮-১৯ সালে স্টার জলসা টি.ভি. চ্যানেলে প্রচারিত *ভূমিকন্যা* ধারাবাহিকের মুখ্য চরিত্র তরিতাও সাপের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারত। তরিতা সর্পবিদ্যাবিশারদ। তাই কোন অলৌকিকতা নয় তার শিক্ষাই তার দক্ষতার হাতিয়ার। এভাবেই ক্ষমতা একই থাকলেও অবাস্তবতার বদলে এসেছে বাস্তব প্রেক্ষিত।

সর্পদংশন ও বিষ তোলা প্রসঙ্গ– উল্লিখিত দ্বিতীয় ধারার প্রতিটি সিনেমাতেই নায়ক বা অন্যতম কেন্দ্রিয় চরিত্রকে সাপের ছোবলে মরণাপন্ন হতে দেখা যায়। নায়িকার আহ্বানে আবার সাপ ফিরে এসে আবার নিজের বিষ তুলে উক্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলে। কেবল বাংলা নয় হিন্দি, ওড়িয়া, প্রভৃতি নানা প্রাদেশিক ভাষায় তৈরি সিনেমায় যেখানে সাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় উপস্থাপিত হয়, এই একই ঘটনার রূপায়ণ চোখে পড়ে। একটা সময় পর্যন্ত গ্রামগঞ্জের লোকসমাজের অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস এক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। বর্তমানে অনেকাংশে লোকসমাজ এই ভুল ধারনা থেকে মুক্ত, সাপে কামড়ালে তারা রুগীকে হাসপাতালেই নিয়ে যায়। অথচ সিনেমায় দংশনকারী সাপ ফিরে এসে বিষ তোলার কাহিনির প্রচলন যেন অকথিত রীতি হয়ে উঠেছে। একদিকে অলৌকিকতা আর দৈবী মাহাত্ম্য আর অন্যদিকে টান টান উত্তেজনাপূর্ণ বিষ তোলার দৃশ্যে দর্শক মনোরঞ্জন তথা বাণিজ্যিক সাফল্যের জন্যই কাহিনিতে এরকম দৃশ্য সংযোজিত হচ্ছে।

তান্ত্রিক বা বৈদ্যদের বীণ বাজানো প্রসঙ্গ- সামাজিক বা পারিবারিক আখ্যান যেখানে সাপ তথা সাপের দেবীর প্রাধান্য থাকে, দেখা যাচ্ছে প্রতিটি সিনেমাতেই বীণ বাজাবার প্রসঙ্গ এসেছে। সাপুড়েরা সাপ খেলায় বীণ নামক বাদ্যটি ব্যবহার করে, সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয় সাপ বীণের শব্দ শুনে তালে তালে নাচছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা যায় সাপের শ্রবণ শক্তি অত্যন্ত দুর্বল। সাপুড়ের হাত ও শরীরের দোলার তালে তালে অবুঝ সাপ দুলতে থাকে। এই বিষয়টি বাংলা সাপের সিনেমার প্রতিটিতেই বাড়াবাড়ি রকম ভাবে তুলে ধরা হয়। *সতী বেহুলায়* মনসা বীণ বাজিয়ে সাপেদের ডেকেছিল, লক্ষিন্দরের বিষ তোলার জন্য। *মনসা কন্যায়* বাঁশরী যদুনাথকে বাঁচাতে বীণ বাজায়। *নাগপঞ্চমী* সিনেমায় তান্ত্রিক মণির মধ্যেকার সাপের সত্তাকে বাইরে আনতে বীণ বাজায়। *মনসা আমার মা* সিনেমায় ঈশ্বরীর মধ্যেকার মনসা দেবীকে জাগ্রত করতে তান্ত্রিক বীণ বাজায়। এভাবে ভিত্তিহীন অবাস্তব বিষয়টিকে সিনেমার পর্দায় তুলে ধরে প্রান্তবঙ্গীয় লোকসমাজে বীণ বাজিয়ে সাপের বিষ তোলার ভ্রান্ত ধারণাকে বদ্ধমূল করে চলেছে বাংলা সিনেমা।

মঙ্গলকাব্য দেবতার কাহিনি, অলৌকিকতা সেখানে থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই মনসামঙ্গলের চলচ্চিত্রে বিনির্মাণ যখন দেখি, তখন বেহুলার সশরীরে স্বর্গে যাওয়া, বা মনসা কর্তৃক মৃতদের প্রাণ ফেরানো নিয়ে দর্শক মনে কোন প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয় না। কিন্তু আধুনিক সামাজিক বা পারিবারিক কাহিনিতে যখন সাপের বিষে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করার প্রসঙ্গে ডাক্তার ও বৈদ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, এবং শেষ অবধি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক তার পিতাকে সুস্থ করার জন্য বৈদ্যের অপর ভরসা করে, বৈদ্যকন্যা মনসার আশীর্বাদধন্য হয়ে বীণ বাজিয়ে, নৃত্যগীতের মাধ্যমে যে সাপটি দংশন করেছে সেটিকে হাজির করে, সাপ বিষ তুলে আক্রান্তকে বাঁচায় (মনসাকন্যা), তখন সিনেমা সামাজিক কুসংস্কার তথা ক্ষতির কারণ হয়। আবার *ভূমিকন্যা* (স্টার জলসা) ধারাবাহিকে মনসা সংস্কৃতির এক নতুন ভাষ্য তুলে ধরা হয়। তাই মনসার প্রতি ভক্তি রেখেই তরিতা অ্যান্টি ভেনাম সিরাম দ্বারাই রোগীকে সুস্থ করে তোলার সচেতনতা লোকসমাজে ছড়িয়ে দেয়। এখানেই ধারাবাহিক, চলচ্চিত্রকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়,

কারণ তরিতার যে সাহসিকতা, যুক্তি বুদ্ধি শিক্ষার প্রেক্ষাপট, উদার মানবিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তা এখনো পর্যন্ত কোন মনসাসংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী কোন সিনেমায় দেখা যায় না।

মনসাকেন্দ্রিক বাংলা চলচ্চিত্রের দুটি স্বতন্ত্র ধারার যে বিশ্লেষণ করা হল, সেখানে আমরা দেখি যে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রাথমিক কাল থেকেই মনসামঙ্গলের বিনির্মাণ চলে আসছে। দুই বাংলায় সমান ভাবে এর ধারা প্রবহমান। বাণিজ্যিক কারণেই মনসামঙ্গলের কাহিনিকে নতুন নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন নির্মাতারা। কখনো তা আকর্ষণীয় হয়েছে, কখনো বা এসেছে অপসংস্কৃতি। আর মনসামঙ্গল ব্যতিরেকে মনসার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাহিনিগুলি মোটামুটি একই ছাঁচে ঢালা। সারাভারতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত সাপ আর সাপের দেবী কেন্দ্রিক সকল কাহিনিতেই এই সাধারণীকরণ চোখে পড়ে। চলচ্চিত্রের আদি পর্ব থেকে আজও মনসামঙ্গলের নিত্যনতুন বিনির্মাণ দর্শকের কাছে সমান আকর্ষণীয়। জাহির রায়হানের *বেহুলা* বা অমল দত্তের *বেহুলা লখীন্দর* চলচ্চিত্রের অত্যন্ত জনপ্রিয়তা এর প্রমাণ। আবার *সতী বেহুলার* বিকৃত বিনির্মাণ দর্শকের জনপ্রিয়তা পায়নি। পাশাপাশি যেসব সামাজিক আখ্যানে দেবী মনসার প্রাধান্য সূচীত হয়েছে তাও প্রান্তবঙ্গীয় লোকসমাজে কিছুটা প্রভাব ফেললেও সার্বিক ভাবে গতানুগতিকতা আর একঘেয়েমির উৎপাদন করেছে, ফলে বাণিজ্যিক সফলতাও পায়নি। ফলে এই ধারার চলচ্চিত্রের নির্মাণও একপ্রকার থমকে গেছে। তবে মনসাকাহিনির প্রতি দর্শকের চাহিদা ও আকর্ষণ যে আজও সমানভাবে রয়েছে, দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলে মনসামঙ্গলের কাহিনি কেন্দ্রিক ধারাবাহিকের সর্বাধিক টি. আর. পি তার প্রমাণ।

তথ্যসূত্র -

চলচ্চিত্র

১) সতীবেহুলা, পরিচালনা, মনোজকুমার, ২০১০,https//m.youtube.com, uploaded by Bengali Movies, Posted 28/08/2013।

২) বেহুলা, পরিচালনা জাহির রায়হান, ১৯৬৬,https//m.youtube.com, uploaded by Laser Vision, Posted 04/01/2018।

৩) বেহুলা লক্ষিন্দর, পরিচালনা অমল দত্ত, ১৯৭৭,Disney+Hotstar,1/07/20।

৪) মনসাকন্যা,পরিচালনা সুজিতগুহ, ১৯৯১, http//m.youtube.com,uploaded byAngel Digital, 10/01/2020।

৫) নাগপঞ্চমী, পরিচালনা বিজয় ভাস্কর, ১৯৯৪, http//m.youtube.com, uploaded byshemaroo Bengali, posted on 24/04/2017।

৬) মনি নাগেশ্বরী, পরিচালনা বিজয় ভাস্কর, ১৯৯৫, http//m.youtube.com, uploaded by speed oriya movie, published on 26/02/2015।

৭) মনসা আমার মা, পরিচালনা বিজয় ভাস্কর, http//m.youtube.com, uploaded by eskay Movies, published on 9/3/2017।

উইকিপিডিয়া

১) List of Bengali films, সৌজন্যে Google, ১১/৯/২০২০।

২) জাহির রায়হান, সৌজন্যে Google, ৩/৯/২০২০।

৩) রাজ্জাক, সৌজন্যে Google, ৩/৯/২০২০।

সংবাদপত্র

১) বাংলাদেশ প্রতিদিন, সাক্ষাৎকার, কোহিনূর আক্তার সুচন্দা, ১৯/০১/২০১৯।

২) বি বি সি নিউজ বাংলা, 'যেভাবে তিনি নায়করাজ হয়ে উঠলেন',২১/৮/২০১৭।

যাত্রাপালা

১) আদি ত্রিধারা গীতি নাট্য সংস্থা আয়োজিত 'মাতৃ পূজারী চাঁদ সওদাগর',২৯/১০/২০১৯, দক্ষিণ২৪ পরগণা দঃ বারাসাত, কেল্লা গ্রাম।

গ্রন্থ –

১) শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ ১৮৫।

২) জগজ্জীবন ঘোষাল,মনসামঙ্গল, সম্পাদনা অচিন্ত্য বিশ্বাস, রত্নাবলী, ২০১০, পৃ. ৯৮।

৩) দ্বিজ বংশীদাস,পদ্মাপুরাণ, অক্ষয় লাইব্রেরী, বৈশাখ ১৪২৫, পৃষ্ঠা ১৬৯।

৪) নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, শ্রী তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১,পৃ.৩০৫।

৫) বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০, পৃ.৩৪৮।

৬) বিপ্রদাস পিপলাই, মনসাবিজয়,ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা সম্পাদিত, মণ্ডল বুক হাউজ, ২০১৬, পৃ.১২৪।

৭) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, অক্ষয় কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, ১৩৪৮ সাল, পৃ.২৫৬।

৮) মহর্ষি বেদব্যাস, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ , সম্পাদনা সুবোধচন্দ্র মজুমদার, দেবসাহিত্যকুটীর, ২০১৮, পৃ. ২১৪।

৯) মহর্ষি বেদব্যাস, দেবীভাগবতম্, নবভারত পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৪১৮, পৃ. ১৮০।

১০) কাশীরাম দাস, মহাভারত, প্রকাশক পূর্ণচন্দ্র শীল, ১৩৩২ সাল, আদিপর্ব্ব, পৃষ্ঠা ৪০।

১১) বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,২০০৯, পৃ.২৩৭।

১২) নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ.১৮৪।

১৩) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, অক্ষয় কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, ১৩৪৮ সাল, পৃ.২২২।

১৪) শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা,কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ ১২৮।

১৫) জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল,অচিন্ত্য বিশাস সম্পাদিত, রত্নাবলি,২০১০, পৃ. ৬২।

১৬) বিপ্রদাস পিপলাই, মনসাবিজয়, মিহির চৌধুরী কামিল্যা সম্পাদিত, মণ্ডল বুক হাউজ, ২০১৬,পৃ. ৯৪- ৯৫।

১৭) শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ ১৫৯।

১৮) জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল,অচিন্ত্য বিশাস সম্পাদিত, রত্নাবলি,২০১০, পৃ. ৭৫।

১৯) নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ.২৪০।

২০) বিপ্রদাস পিপলাই, মনসাবিজয়, মিহির চৌধুরী কামিল্যা সম্পাদিত, মণ্ডল বুক হাউজ, ২০১৬,পৃ.১১১।

২১) দ্বিজ বংশীদাস, পদ্মাপুরাণ, অক্ষয় লাইব্রেরী, বৈশাখ ১৪২৫, পৃ.১৪০।

২২) জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশাস সম্পাদিত, রত্নাবলি,২০১০, পৃ. ৬১ ।

২৩) নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১,পৃ.৩৪০।

২৪) কাশীরাম দাস, মহাভারত, প্রকাশক পূর্ণচন্দ্র শীল, ১৩৩২ সাল,বনপর্ব্ব, পৃষ্ঠা ৪২৩।

২৫) মহর্ষি বেদব্যাস, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, সম্পাদনা সুবোধচন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটীর, ২০১৮, পৃ. ২১৪।

২৬) মহর্ষি বেদব্যাস, দেবীভাগবতম্, নবভারত পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৪১৮, পৃ. ১৮০।

২৭) বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃ.২।

২৮) কাশীরাম দাস, মহাভারত, প্রকাশক পূর্ণচন্দ্র শীল, ১৩৩২ সাল,আদিপর্ব্ব, পৃষ্ঠা ৪০।

২৯) জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশাস সম্পাদিত, রত্নাবলি,২০১০, পৃ. ৫৮।

৩০) জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশাস সম্পাদিত, রত্নাবলি,২০১০, পৃ. ৭৮ -৭৯।

৩১) বিপ্রদাস পিপলাই, মনসাবিজয়, মিহির চৌধুরী কামিল্যা সম্পাদিত, মণ্ডল বুক হাউজ, ২০১৬,পৃ.১১৪-১১৫।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা টেলিধারাবাহিকে মনসামঙ্গলের বিনির্মাণ

বাংলায় চলচ্চিত্র আর দূরদর্শনে সম্প্রচারিত ধারাবাহিক - এই দুইয়ের সূত্রপাতের ব্যবধান ছয় দশকের বেশি। বিশ শতকের আটের দশকে ভারতীয় তথা বাংলা দূরদর্শনে ধারাবাহিকের সম্প্রচার শুরু হয়। বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম পর্বে পৌরাণিক ও ধর্মীয় কাহিনির উপস্থাপনের যে আধিক্য ছিল ধারাবাহিকের প্রথম পর্বে কিন্তু তেমনটা দেখা যায় না। পরিবর্তিত জনরুচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলচ্চিত্রেও এই সময় আধ্যাত্মিক কাহিনি বিনির্মাণের প্রবণতা কমে আসে। ১৯৮৭-৮৮ তে জাতীয় চ্যানেলে রামানন্দ সাগরের *রামায়ণ* আর ১৯৮৮তে বি.আর.চোপড়ার *মহাভারত*-এর সর্ব ভারতীয় স্তরে জনপ্রিয়তা অবিসংবাদিত। বাংলায় সামাজিক রাজনৈতিক ঐতিহাসিক কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত প্রথম পর্বের ধারাবাহিকগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে *আদর্শ হিন্দু হোটেল,* সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে *সেই সময়,* জোছন দস্তিদার পরিচালিত *তেরো পার্বণ* বা ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত *বাহান্ন এপিসোড* বাংলা সিরিয়ালের প্রথম পর্বের এক একটি মাইলস্টোন। নয়ের দশকের শেষ দিকে ঐতিহাসিক কাহিনি নিয়ে তৈরি দুটি ধারাবাহিক অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় – রাণী রাসমণির জীবনী নিয়ে *রাজেশ্বরী,* আর চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন নিয়ে *মহাপ্রভু* । একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রথম সারির বাংলা চ্যানেলগুলির ধারাবাহিকে সামাজিক, পারিবারিক, কাহিনিগুলির একঘেয়েমি কাটাতেই দেবদেবীর আখ্যান তুলে ধরার প্রবণতা দেখা যায়। পৌরাণিক দেবতা কৃষ্ণ, শিব, কালি, শনি, দুর্গা বা অবতারকল্প চৈতন্য মহাপ্রভু, লোকনাথ, রামকৃষ্ণ, সারদা, সাধক বামাখ্যাপা এদের পাশাপাশি লৌকিক পৌরাণিক মিশ্রিত সংস্কৃতির ধারক বাহক দেবী মনসার কাহিনি নিয়েও তৈরি হয় ধারাবাহিক। যুগের সাথে সাথে দূরদর্শনে বিনোদনের ক্ষেত্রেও কিছু রদবদল ঘটে, উন্নত হয় গ্রাফিক্স। সমকালীন সমস্যা ধারাবাহিকের বিষয়কে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনই এ যাবত পর্যন্ত পৌরাণিক তথা ধর্মীয় কাহিনি অবলম্বনে বাংলা, হিন্দি সহ নানা প্রাদেশিক ভাষায় তৈরি ধারাবাহিকের

সমান্তরাল চলনও প্রত্যক্ষ হয়। মনসা সংস্কৃতির প্রতিগ্রহণের ধারায় মনসামঙ্গলের কাহিনি অবলম্বনে এ পর্যন্ত তিনটি বাংলা ধারাবাহিকের কথা জানা যায় -

- বেহুলা, স্টার জলসা (২০১০-২০১১)
- ভূমিকন্যা, স্টার জলসা (২০১৮ -১৯)
- মনসা, কালার্স বাংলা (২০১৮ -১৯)

২০১৮ সালের ২৯ এ জানুয়ারি কালার্স বাংলা চ্যানেলে শুরু হয় সুব্রত রায়ের প্রযোজনায় *মনসা* ধারাবাহিকটি। ৫১৭ টি পর্ব চলে বিস্তৃত মনসা কাহিনি। ধারাবাহিকের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে এই ধারাবাহিকটি মনসামঙ্গল কাব্য এবং অন্যান্য লোককাহিনি নির্ভর একটি নাটকীয় উপস্থাপনা, যা কেবলমাত্র বিনোদনের জন্য তৈরি। কর্তৃপক্ষ চিত্রিত ঘটনার কোনরূপ নির্ভুলতার দাবি করে না। ধারাবাহিকটিতে দেখা যায় দেবীভাগবতপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মনসা আখ্যান, মনসামঙ্গল কাব্যের মিশ্রণ তো ঘটেছেই তা ছাড়াও কেন্দ্রিয় চরিত্র মনসাকে প্রাধান্য দিতে বিভিন্ন পুরাণ উপপুরাণের কাহিনির সাথে সিরিয়ালের জন্য নির্মিত মনসার কল্পিত অবস্থানকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য, সোনি টিভিতে *বিঘ্নহর্তা শ্রী গণেশ* (২০১৭ - ২০২১) ধারাবাহিকে যেখানে মনসামঙ্গলের কাহিনি দেখানো হয়েছে, একইভাবে সেখানে কেন্দ্রিয় চরিত্র গনেশকে প্রাধান্য দিতে তাকে মনসার পরামর্শদাতা ও সহায়ক হিসেবে কাহিনিসূত্রে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবেই ধারাবাহিক নিজের মত করে বদলে নিচ্ছে পৌরাণিক কাহিনির বুনট। কালার্স বাংলার *মনসা* ধারাবাহিকে নানা সূত্র জুড়ে নির্মিত কাহিনির তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে যুক্ত হয়েছে, জগত সংসারের নারীদের অবহেলা, তাচ্ছিল্য, নির্যাতন, পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আত্মবিশ্বাসী নারীশক্তির জাগরণ তথা জয়ের রূপরেখা। ধারাবাহিকে কাহিনি বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে তিনটি পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে তা এইরকম -

১) মঙ্গলকাব্য, ও পুরাণের মনসা কাহিনির মেলবন্ধন -

২) সম্পূর্ণ মৌলিক কাহিনির সংযোজন -

৩) অজস্র পৌরাণিক কাহিনির সাথে মনসাকে সম্পর্কিত করে অভিনব উপস্থাপনা -

মনসা ধারাবাহিকে যেখানে মনসামঙ্গল ও পুরাণে বা মহাভারতে উল্লিখিত মনসাকাহিনিকে একত্রিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলি নিম্নরূপ -

মনসার জন্ম প্রসঙ্গ - *মনসা* ধারাবাহিকে দেখানো হয়েছে পাতালে জন্মের পর শিবের ঔরসজাত কন্যার নামকরণ করেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। নাগেশ্বরী, সর্পদেবী, বিভাবরী, জগতগৌরী, পদ্মাবতী, মনসা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন দেবী। অতঃপর নাগলোকে বড় হবার পর জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নিজ আশ্চর্য শক্তি তথা নিজ আত্মপরিচয় সম্পর্কে অবহিত হন মনসা এবং মর্ত্যে এসে কঠোর তপস্যায় শিবের সাক্ষাৎ লাভ করেন । প্রাথমিক দ্বিধা দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে শিব মনসাকে কন্যা হিসাবে স্বীকৃতি দেন। সেই সঙ্গে নাগলোককে রক্ষা করার জন্য কন্যা মনসাকে দেন জ্যোতির্ময় নাগমণি।

এই প্রসঙ্গে পুরাণ ও মনসামঙ্গলে যা পাই তা এইপ্রকার - ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও দেবীভাগবত পুরাণ মতে মনসা আদৌ শিবের ঔরসজাত কন্যা নন। পুরাণ অনুযায়ী একদা পৃথিবীতে সাপের উপদ্রব বৃদ্ধি পেলে, কশ্যপ মুনি ভীত হয়ে প্রজাহিতের জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে বেদোক্ত বীজ অনুসারে মন্ত্র সৃষ্টি করেন। ধ্যানকালে কশ্যপ মুনির মন থেকে উৎপন্ন হন ধ্যানমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা। মুনিতনয়া মনসা দেবী সহস্র বছর মহাদেবের কঠোর ধ্যান সাধনার দ্বারা তাকে তুষ্ট করেন। মহাদেব মনসাকে দিব্যজ্ঞানস্বরূপ বেদ অধ্যয়ন করান এবং আট অক্ষর গোপাল মন্ত্র দান করেন। জগৎপালনের ধ্যান মন্ত্র, বেদোক্ত পুরশ্চর্যাক্রম ও মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞানলাভ করেন। সুতরাং পুরাণ মতে মনসা কশ্যপ কন্যা, শিব শিষ্যা। সোনি টিভিতে দেখানো *বিঘ্নহর্তা শ্রী গণেশ* ধারাবাহিকে দেখানো মনসার জন্ম প্রসঙ্গ একেবারেই পুরাণ অনুসারী। অন্যদিকে শিবকন্যা মনসার কথা রয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে। বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, নারায়ণদেব, দ্বিজ বংশীদাস, জগজ্জীবন ঘোষাল - এদের সকলের কাব্যেই শিব বীর্যের পদ্মনাল বেয়ে পাতাল প্রবেশ, এবং সেই বীর্য থেকে অসাধারণ রূপবতী কন্যার জন্মের কথা পাই। তাহলে *মনসা* ধারাবাহিকে মনসার জন্ম প্রসঙ্গে যা দেখানো হল, তা মনসামঙ্গল অনুসারী। কিন্তু তপস্যায় শিবকে তুষ্ট করা ও তার কাছ থেকে বরলাভ করার কাহিনি পুরাণ অনুসারী।

ধারাবাহিকে উপস্থাপিত যে ঘটনাগুলি মনসামঙ্গল ও পৌরাণিক কাহিনিতে অভিনব সংযোজন এনেছে সেগুলি নিম্নরূপ -

চাঁদ মনসার বিবাদ প্রসঙ্গ - মনসামঙ্গলের মূল বিষয় চাঁদ মনসার বিবাদ। এই বিবাদের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মনসামঙ্গলকার বিভিন্ন ঘটনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। আবার এই সূত্রে *মনসা* ধারাবাহিকে এসেছে নতুন গল্প। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের কাব্যে ঈর্ষাপরায়ণ চণ্ডী চম্পকনগরের রাজা চাঁদোকে কুবুদ্ধি দেয়, মনসাকে দুষ্টমতী, দুরাচারী ইত্যাদি বলে তার পূজা থেকে সতত বিরত থাকতে বলেন। সনকা জালু মালুর গৃহে মনসা পূজা হতে দেখে তার মায়ের কাছ থেকে পূজা পদ্ধতি জেনে নিজ ঘরে ঘট প্রতিষ্ঠা করে মনসা পূজার ব্যবস্থা করে। হেতালের বাড়ি দিয়ে ঘট ভাঙে চাঁদ। এখান থেকেই চাঁদ মনসার বিবাদের সূত্রপাত।

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে চন্দ্রবংশের রাজা পণ্ডুসখা রাজপাট ত্যাগ করে ঈশ্বর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। একদা তিনি গঙ্গার তীরে বসে শিব শক্তির একাগ্র তপস্যা করছিলেন। সহসা তিনি দেখেন দুটি পাখির ছানা নদীর জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। কাতরচিত্ত মুনি সাঁতার কেটে তাদের উদ্ধার করেন এবং আশ্রমে নিয়ে তাদের প্রতিপালন করেন। হঠাৎ একদিন সাপে পাখির ছানা দুটিকে খেয়ে নেয়। শোকার্ত মুনি এই বলে মৃত্যুবরণ করে যে তিনি যেন নাগজাতির কাছে কখনো হার স্বীকার না করেন। মহাদেবের আশীর্বাদে চম্পকনগরে সাহ রাজার ছেলে কোটীশ্বরের ঘরে প্রবল পরাক্রমী, শিবভক্ত, নাগ বিদ্বেষী চান্দ বণিকের জন্ম হয়। বিজয়গুপ্তের কাব্যে আছে সনকার পূজাঘট ভেঙেই চাঁদ বিবাদের সূচনা করে। পূর্বজন্মের বিবাদের সূত্রে কোনো আখ্যান সেখানে নেই।

কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে আছে, সত্যযুগে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে কামধেনু পালন করতেন। একদিন সেই কামধেনু কৈলাসের রামতুলসীর পাতা খেলে মহাদেবের অভিশাপে তার মর্ত্যে জন্ম হয়। মর্ত্যে সে তৃষ্ণার্ত হয়ে সাগরের জল শোষণ করলে পুনরায় সাগরকে জলপূর্ণ করতেই সমুদ্র মন্থন হয়। মন্থনে সমুদ্র লক্ষ্মী, চন্দ্রদেব, ধন্বন্তরি, ঐরাবত,

পারিজাত, অমৃত ইত্যাদির সাথে মনসা পূজা প্রচারের হেতু অগ্নিসম চাঁদ বণিকের জন্ম হয়। জন্মমাত্র সে শিব পূজা করে মহাদেবের আশীর্বাদে ধনে মানে ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে।

মনসা ধারাবাহিকে দেখানো হয় শিবের ভক্ত চন্দ্রকিঙ্কর ছিলেন প্রবল নাগ বিদ্বেষী। ফলে নাগরাজ বাসুকির সঙ্গে একদিন তার প্রবল যুদ্ধ বাঁধে। মহাদেবের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ থামে। চন্দ্রকিঙ্কর সহস্র বছর মহাদেবের কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে আরাধ্য দেবতার কাছ থেকে হেতালের যষ্টি লাভ করে, যার বলে নাগেদের বিষ দুধে পরিণত হবে। মাতা পার্বতী ও মহাদেব বুঝতে পারেন একদিকে নাগকুলের রক্ষয়িত্রী মনসা, অন্যদিকে নাগদের চরম শত্রু চন্দ্রকিঙ্করের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিরোধ আসন্ন। তাই চণ্ডীর পরামর্শে শিব চন্দ্রকিঙ্করকে সংযমী হতে এবং অহেতুক নাগহত্যা না করার নির্দেশ দেন। কিন্তু ইন্দ্রদেব এই সুযোগে মনসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং চন্দ্রকিঙ্করের সামনে প্রমাণ করেন যে নাগেদের অত্যাচারে মর্ত্যবাসী অতিষ্ঠ। ফলে সে নাগেদের বিনাশে দৃঢ় সঙ্কল্প হয়। ঘটনাক্রমে মনসার পুত্র শঙ্খ নাগ চন্দ্রকিঙ্করের হাতে নিহত হলে এখান থেকেই চাঁদ মনসা বিবাদের সূত্রপাত হয়। ক্রুদ্ধ মনসা চন্দ্রকিঙ্করকে অভিশাপ দেয় পরবর্তী জন্মে সেও একই ভাবে পুত্রশোক পাবে। মনসার এই লড়াইকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন দেবী চণ্ডী। এভাবেই ধারাবাহিকে চাঁদ মনসা বিবাদের প্রেক্ষাপটে ইন্দ্রদেবের ষড়যন্ত্রের নতুন কাহিনি এসেছে।

সনকার পূর্ব পরিচয় প্রসঙ্গ - দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে চাঁদের স্ত্রী শলুকার পরিচয় দিতে গিয়ে কবি তাকে জাতিতে পদ্মিনী, পাঁচ ভাইয়ের বোন ও পরমাসুন্দরী বলেছেন[১]। কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে সনকা জালু মালুর মায়ের কাছ থেকে জেনেছিল কীভাবে মনসা পূজা করে তাদের পরিবারে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছিল, সে বৃত্তান্ত। অতঃপর সেও নিজ ঘরে পূজার আয়োজন করে, এবং চাঁদ মনসার পূজা ঘট হেতালের লাঠি দিয়ে ভাঙে[২]।

মনসা ধারাবাহিকে কাহিনি সূত্রে সনকার পূর্বপরিচয় যোগ করা হয়েছে, যা কোনো মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায় না। এখানে দেখানো হয়েছে হোসেনপুর গ্রামে মনসার ভক্ত যাত্রাবরের কন্যারূপে সনকার জন্ম হয়। ছোট থেকেই বাবা মায়ের সঙ্গে সনকা মনসার পূজা করত। ইতিপূর্বে ইন্দ্রের ষড়যন্ত্রে যাত্রাবরের বাড়ির পূজা বন্ধ করতে হোসেনপুরের

অধিকর্তা লেঠেল পাঠিয়েছিল। চাঁদ সদাগরের সঙ্গে বিয়ের শর্ত হিসাবে সনকাকে মনসা পূজা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। গরীব যাত্রাবর ও তার স্ত্রী মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই শর্ত মেনে নিলেও মনসা পূজা তারা বন্ধ করেনি। জনসমক্ষে স্থাপিত প্রতিমা ঘরের মধ্যে লুকিয়ে তারা পূজা করত। এভাবেই মনসার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে তার পরম ভক্তের সঙ্গে চরম বিরোধী চাঁদের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রথম থেকেই এক দ্বন্দের পটভূমি গড়ে তোলা হয়েছে। পরবর্তীকালে মনসা পূজার নিমিত্ত সনকার প্রস্তুত পূজাঘট চাঁদ কর্তৃক ভাঙার মনসামঙ্গলের কাহিনির সঙ্গে যা সাযুজ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

চাঁদের বাণিজ্যতরী নিমজ্জন প্রসঙ্গ - মনসামঙ্গলের কাহিনির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনসা কর্তৃক চাঁদের সপ্তডিঙা মধুকর নিমজ্জন। মনসা ধারাবাহিকে ইন্দ্র মনসার সংঘাতে, মনসামঙ্গলের ঘটনা ভিন্ন রূপে উপস্থাপনা করা হয়েছে। মনসার দেবীত্বের প্রধান বিরোধী এক্ষেত্রে ইন্দ্রদেব। কোন নীচ জাতির প্রতিনিধির স্বর্গের সিংহাসন লাভে তার চরম আপত্তি। চন্দ্রধরকে প্রাণে মারতে পারলে মনসা তথা নাগজাতির উত্তরণকে আটকানো সম্ভব। তাই ইন্দ্রদেব কিশোর বয়সেই আগ্নেয়গিরির আগুনে চন্দ্রধরকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করলেও মনসার প্রয়াসে তার জীবন রক্ষা পায়। ইন্দ্রের ষড়যন্ত্রেই অপস্মারের সাহায্যে চাঁদের সপ্তডিঙা মধুকর নিমজ্জিত হয়। মনসা বরং চাঁদকে পথের আগত ঝঞ্ঝা বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে তার হিতসাধন করার চেষ্টা করেছিল। ইন্দ্র আর মনসার বিবাদে বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চাঁদ বণিক। ধারাবাহিকের এ চলন মঙ্গলকাব্যের থেকে একেবারে ভিন্ন, এর গতি স্বচ্ছন্দ তথা উপস্থাপনা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চাঁদের বাড়িতে দুর্গাপূজা প্রসঙ্গ - এ ধারাবাহিকে মনসাকে নারীশক্তির জাগরণ তথা জয়ের প্রতীক রূপে তুলে ধরা হয়েছে। সনকার মনসাপূজা দেখে ক্রুদ্ধ চাঁদ তার পূজাঘট ভাঙে। দুর্ব্যবহার করে সনকার আনা অন্নের থালা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ফলস্বরূপ সে মনসা ও দেবী চণ্ডীর কোপের মুখে পড়ে। বাণিজ্যে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় বজরার কাঠ খুঁজে পায়না, সঙ্গী সাথীদের নিয়ে অনাহারে থাকতে হয়। শেষে মনসার অংশে জাত বনদেবীকে পূজা করে সে বিপন্মুক্ত হয় এবং গৃহে ফিরে সনকার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। স্ত্রী ও স্ত্রী দেবতাকে তুচ্ছ করার উপযুক্ত শাস্তি পায় সে। অতঃপরমনসা ও নেতা ছদ্মবেশে চম্পক

নগরের মহিলাদের একত্রিত করে চাঁদের বাড়িতেই দুর্গাপূজার আয়োজন করে। অন্যদিকে উজানি নগরে বেহুলাও একইসঙ্গে মনসা ও চণ্ডীর পূজা করে নারী শক্তি বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়। চাঁদের স্ত্রী দেবতা পূজা না করার দম্ভ সুকৌশলে ভাঙতে এবং সম্মিলিত নারী শক্তির জাগরণ ঘটাতে তার গৃহে দুর্গাপূজা করার এই অভিনব কাহিনি যুক্ত করা হয়েছে ধারাবাহিকে।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য ধারাবাহিকে বেহুলার বাড়িতে মনসা ও চণ্ডীর একত্রে পূজার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তার একটি বাস্তব রূপে বর্তমানে পাওয়া যায়। পশ্চিমবাংলার কিছু স্থানে মনসা ও চণ্ডীর সম্মিলিত পূজা হয়ে থাকে। যেমন হাওড়া জেলার ওয়াদিপুরের মনসা মাতার মন্দির, বর্ধমানের নারকেল ডাঙার জগতগৌরী মন্দির ইত্যাদি। সিরিয়ালের জন্য নির্মিত এই কাহিনিগুলি, আজগুবি বা মনগড়া নয়, বরং ক্ষমতাশালীর বিবাদে সাধারণের বিপর্যস্ত জীবন, জাতিগত ভেদবুদ্ধি, নারীর উত্তরণ - এসবের মধ্যে পশ্চিমবাংলার সমকালীন সমাজের প্রত্যক্ষ রূপ যেমন ধরা আছে, তেমনই ধর্ম সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মনসার যে বিচিত্র ভাবে ও রূপে অবস্থান ধারাবাহিকের কোথাও কোথাও তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

ধারাবাহিকের প্রয়োজনে পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের সংমিশ্রণে গঠিত কাহিনিগুলি নিম্নরূপ -

কাশীধামে শিবালয় নির্মাণ প্রসঙ্গ - শিবপুরাণ অনুযায়ী সৃষ্টির সূচনায় সনাতন পরমাত্মা থেকে পুরুষ ও প্রকৃতি আবির্ভূত হয়। পরমাত্মা তাদের তপস্যা ও সর্বোত্তম সৃষ্টির নির্দেশ দেন এবং তাদের অবস্থানের জন্য পাঁচ ক্রোশ ব্যাপী সুন্দর নগর নির্মাণ করে দেন। এই স্থানই কাশী। পুরুষের কঠোর তপস্যায় দেহ থেকে বিচিত্র জলরাশি নির্গত হলে তা দেখে বিষ্ণু আশ্চর্য হয়ে মাথা কাঁপান। এই কম্পনের ফলে বিষ্ণুর কান থেকে একটি মণি ভূপতিত হয়। যেখানে মণি পড়ল, সেখানেই নির্মিত হয় মণিকর্ণিকা তীর্থ। একবার অপভ্রংশ শব্দ উচ্চারণের জন্য শিব ব্রহ্মার শির ছেদন করেন। কিন্তু পাপের ভারস্বরূপ সেই কাটা মুণ্ড সবসময় শিবের পিঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকত। কিন্তু কাশীধামে আসামাত্র সেই মুণ্ড শিবের কাঁধ পিঠ থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। শিব উপলব্ধি করেন কাশীধামের

মাহাত্ম্যেই তার পাপের বিমোচন হয়েছে, তাই এই পুণ্য ভূমিতে তিনি বসবাস করতে থাকেন। সুতরাং এই কাশীধাম যেখানে দেবতার পাপ দূরীভূত হয়, তা মর্ত্যমানবের পক্ষে পুণ্যতীর্থ স্বরূপ। স্কন্দপুরাণে কাশী খণ্ডের ৩৯ অধ্যায়ের ৭৭ নং শ্লোকে রয়েছে, বিশ্বেশ্বর শিব নিজে মুক্তি ও পার্থিব সুখের জন্য এই অভিমুক্তেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করেন। বরুণা ও অসি নদীর সঙ্গমস্থল বারানসীর অন্য নাম *অভিমুক্ত* । আবার কাশ অর্থাৎ দীপ্তি বা প্রকাশ (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ)। তাই পরমপুরুষের প্রকাশ বা লীলাক্ষেত্র কাশী।

মনসা ধারাবাহিকে দেখানো হয়, দীর্ঘ তপস্যার শেষে শিব কৈলাসে ফিরেছেন। কিন্তু সেখানে দেবী পার্বতী, পুত্র কার্ত্তিক, গণেশের অনুপস্থিতিতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হলেন। মহাদেব দেখলেন সুরলোকে দেবগণ নৃত্য উপভোগ করছেন, ইন্দ্রের পাশে রয়েছেন শচী, নাগলোকে নাগরাজ বাসুকি তার সিংহাসনে উপবিষ্ট, কেবল কৈলাসে পার্বতীর অনুপস্থিতির শূন্যতা। অন্তরীক্ষে ত্রিশূল, ডমরু ছুঁড়ে, তাণ্ডবে মাতলেন শিব। কেঁপে উঠল ত্রিভুবন। স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে বইছে গঙ্গা। মর্ত্যে বারানসী তীরে শিব চণ্ডীর নূতন মিলন ক্ষেত্র নির্মাণে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে নির্দেশ দেন। তাদের আশীর্বাদেই বিশ্বকর্মা কর্তৃক তৈরি হল নতুন শিবালয়। রাজা দিবোদাস কঠোর সাধনায় মহাদেবকে কাশীধামে স্থিত হওয়ার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হলেন। শিব চণ্ডীর লীলাক্ষেত্র রূপ কাশী হয়ে উঠল দেবভূমি। ধারাবাহিকে দেখানো এ কাহিনিসূত্র পাওয়া যায় বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে -

পূর্বে বারাণসী ছিল রাজা দিবোদাস।
তাহারে ঘুচাইয়া শিব তথায় করে বাস ।।
পৃথিবী দুর্লভ স্থান সেই কাশীপুর।
তথায় বসতি করেন সৃষ্টির ঠাকুর।।
... ...
মনুষ্যের কিবা কথা দেবে বলে ভাল।
গৌরী লইয়া শিব তথা থাকেন চিরকাল।।[৩]

সুতরাং শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ইত্যাদি অনুযায়ী পুণ্যতীর্থ কাশীধামে মহাদেব শিবের অবস্থান প্রসঙ্গ, এবং বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে দিবোদাসের রাজ্য কাশীতে মহাদেব পার্বতীর অবস্থানের কথা পাওয়া গেলেও, শিব-পার্বতীর পুনর্মিলন উপলক্ষ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নির্দেশে বিশ্বকর্মার কাশী নির্মাণ এবং দিবোদাসের কঠোর তপস্যা, কাশীতে হরগৌরীর সংসারলীলায় মেতে ওঠার প্রসঙ্গ ধারাবাহিকের জন্য তৈরি। পুরাণ বা মঙ্গলকাব্যে এর উল্লেখ নেই।

মনসার জন্মপরিচয় প্রসঙ্গ - মনসামঙ্গলে মনসা শিবকন্যা। জন্মসূত্রে সে দেবী। কিন্তু পৃথিবীতে সাংসারিক মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠা পেতে তাকে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয়। মনসামঙ্গল মূলত দেবীর সেই বিজয়গাঁথা। আবার পুরাণের কশ্যপ কন্যা মনসা কিন্তু নিজগুণে নারায়ণ কর্তৃক পূজিতা। মহাভারতে নাগরাজ বাসুকির ভগ্নী জরৎকারী নিজ পুত্র আস্তিকের দ্বারা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ নিবারণ করে নাগকুল, দেবকুল, সহ জগতসংসারকে রক্ষা করেছিলেন। এ কাহিনি পুরাণ সূত্রে সমর্থিত। আবার কশ্যপ পত্নী কদ্রু ছিলেন নাগমাতা। তার সন্তান বাসুকি মনসাকে নিজ ভগিনীর সম্মান দিয়েছিলেন। সেই সূত্রে মনসা নাগেদের ভগ্নী। শিবকন্যা বা কশ্যপের মানসকন্যা কোনও সূত্রেই তিনি নাগ নন, নাগকুলের অধিষ্ঠাত্রী। এক্ষেত্রে নাগ ও সাপ সমার্থক। অথচ মঙ্গলকাব্যের কবিরা নাগমাতা মনসাকে নাগ রূপে তুলে ধরেছেন। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে মনসার কামড়ে চণ্ডীর হতচেতন হবার কথা পাই[৪]। জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে সাপ রূপে মনসার পার্বতীকে ঘায়েল করবার কথা আছে। বিপ্রদাস পিপলাইএর কাব্যে মনসার বিষদৃষ্টিতে চণ্ডিকা অচেতন হন[৫]। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যেও সাপ রূপে মনসা চণ্ডিকার পায়ে কামড়েছিলেন[৬]। *মনসা* ধারাবাহিকে মনসাকে নাগিনী রূপে তুলে ধরা হয়েছে। এবং এই নাগিনী পরিচয় অবলম্বনে ধারাবাহিকের প্রয়োজনে যুক্ত হয়েছে নানাবিধ কাহিনি।

মনসার মৃত সঞ্জীবনী অর্জন প্রসঙ্গে কাহিনি বিন্যাসে দুর্বলতা - *মনসা* ধারাবাহিকে দেখানো হয়েছে স্নেহের বশবর্তী হয়ে শিব মনসাকে কাশী তীর্থে অর্থাৎ শিবালয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু দেবী চণ্ডিকার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে তাকে ছদ্মবেশে মালিনী পরিচয়ে কিছুদিন আত্মগোপন করে সেখানে অবস্থান করতে বলেন। ইতিমধ্যে শিব ত্রিপুরাসুর বধের কাজে

ব্যস্ত থাকাকালীন দেবরাজ ইন্দ্র ষড়যন্ত্র করে ধনপতি কুবেরকে বাহন নেউল সহ শিবালয়ে পাঠান। নেউলের সামনে মনসা কিছুতেই নিজের নাগিনী রূপ গোপন করতে পারেনা। ফলে চণ্ডীর কাছে সে ছলনাময়ী, মিথ্যাবাদী রূপে প্রতিভাত হয়। অতঃপর চণ্ডী মনসা বিবাদ, মনসাকে চণ্ডীর যার পর নাই লাঞ্ছনা ও প্রহার, আত্মরক্ষার্থে ক্রুদ্ধ মনসার চণ্ডীকে দংশন করার কাহিনি একেবারে বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ অনুসারী। তবে স্বর্ণনেউলের সঙ্গে মনসার বিবাদ ধারাবাহিকের জন্য সৃষ্ট। এ রূপ গল্প বিস্তারের মাধ্যমে নানারূপ প্রতিকূলতার সম্মুখীন মনসার অসহায় করুণ অবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে ধারাবাহিকের কাঙ্ক্ষিত কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। মৃত চণ্ডীর প্রাণ ফেরাতে বাসুকির নির্দেশে মনসা গেছে শ্বেত পর্বতে নাগকেশর ফুল সংগ্রহ করতে। বরফের রাজ্যে সাপেদের অস্তিত্বের সংকট, উপরন্তু ইন্দ্রদেবের ষড়যন্ত্রে তুষার ঝড় ইত্যাদি প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে মনসা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছ থেকে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র নিয়ে নাগকেশর ফুলের সাহায্যে শেষ অবধি চণ্ডীর প্রাণ ফেরাতে সক্ষম হন।

সাপেরা শীতল রক্তের প্রাণী তাই বরফে ঘেরা আয়ারল্যান্ড ছাড়াও অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ, নিউজিল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশ, হাওয়াই এর মত শীতল অঞ্চলে সাপেরা থাকে না। বিশ্বের সপ্তম উচ্চতম বরফাচ্ছাদিত ধবলগিরিই শ্বেত পর্বত। নাগকেশর ফুল সংগ্রহ করতে এবং পরবর্তীকালে জরৎকারুর অত্যাচারে বাধ্য হয়ে মনসার শ্বেত পর্বতে অবস্থান তথা অস্তিত্ব বিপন্নতার চিত্রায়ন ধারাবাহিকে তুলে ধরা হয়েছে। জীবনের প্রতি পদে মনসাকে চরম প্রতিকূলতার সম্মুখীন করতেই শ্বেতপর্বত প্রসঙ্গ এসেছে। এভাবেই চাঁদের প্রতি নির্মমতার এক মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ধারাবাহিকে নির্মিত হয়েছে।

মহাভারতের আদি পর্বে অসুরগুরু শুক্রাচার্যের মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রের জ্ঞান এবং প্রয়োগের প্রসঙ্গ রয়েছে। আবার ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও দেবীভাগবতেও মনসার মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র জানার প্রসঙ্গ রয়েছে। মহাভারতে দেবাসুরের যুদ্ধে মৃত অসুরেরা শুক্রাচার্যের মন্ত্রবলে প্রাণ ফিরে পেত। দেবকুল শঙ্কিত হয়ে তাই দেবগুরু বৃহস্পতির ছেলে কচকে পাঠায় শুক্রাচার্যের কাছ থেকে মন্ত্র শিক্ষা করতে। কচ অসুরগুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সে পাঁচশো বছর কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে গুরুকে সবরকম সেবা করে তার কাছে নানাবিধ

শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। একদা উদ্ভুত পরিস্থিতির কবলে পড়ে কচ ও নিজ প্রাণ রক্ষার্থে শুক্রাচার্য তাকে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রের শিক্ষা দিতে বাধ্য হন।

ধারাবাহিকে দেখানো হয় আত্মরক্ষার্থে মনসা চণ্ডীর ওপর বিষ প্রয়োগ করলে, দেবী প্রাণ হারান। শুক্রাচার্যের মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রের সাহায্যে তার প্রাণ ফেরাতে সমর্থ হয়। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, শুক্রাচার্য মনসাকে মন্ত্র দিলেন কীভাবে? কচের কঠোর সাধনার পরেও তিনি এক প্রকার বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার জন্য তাকে মন্ত্র দিতে সম্মত হন। প্রথম সাক্ষাতেই মনসাকে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র দান করায় ধারাবাহিকের কাহিনি বিন্যাসের দুর্বলতা পরিস্ফুট হয়। কারণ মহামায়াকে বাঁচানোই তার উদ্দেশ্য হলে শুক্রাচার্য নিজে মন্ত্র প্রয়োগ করতে পারতেন।

ইন্দ্র মনসার দ্বন্দ্ব - এই ধারাবাহিকের মনসার প্রতি পদক্ষেপে ইন্দ্রদেবই হয়ে উঠেছেন তার প্রধান শত্রুপক্ষ। মনসা দেবী হলে নাগেরা দেবতাদের সমকক্ষ হয়ে উঠবে। সুতরাং ছলে বলে কৌশলে মনসাকে অপদস্ত করতে, তাকে শেষ করে দিতে উদ্যত হয় ইন্দ্রদেব। চণ্ডীকে বাঁচাতে না পারলে শিব রোষে ধ্বংস হবে সমগ্র নাগকুল। তাই মনসাকে আটকাতে শ্বেত পর্বতের গুহার অভ্যন্তরে অবস্থানকালে বাইরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, তীব্র তুষার ঝড়ের সৃষ্টি করেন তিনি। মনসার প্রতিপক্ষ না হলেও ইন্দ্রদেবের এ হেন উগ্রতার পরিচয় নানা পুরাণে পাওয়া যায়। সুতরাং সেই সূত্রে মনসার বিরুদ্ধতার নতুন কাহিনীও সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

বরফের দেশে সাপের অস্তিত্বের সঙ্কট প্রাকৃতিক সত্য, চণ্ডী মনসার বিবাদ মনসামঙ্গলের গুরুত্বপূর্ণ কাহিনি, অসুরগুরুর বিশেষ ক্ষমতার এবং ইন্দ্রদেবের স্বার্থপরতার পৌরাণিক প্রসঙ্গ মিলিয়ে এক কাহিনি সূত্রে গাঁথা হয়েছে ধারাবাহিকে।

মনসা চণ্ডীর বিবাদ মনসামঙ্গলে দীর্ঘায়িত হয়েছে। মনসার পরবর্তী জীবনেও সেই বিবাদের রেশ বারে বারে প্রভাব ফেলেছে। মনসার সন্তান জন্মাবার পর তার স্তন শুষ্ক করে দেওয়ায় চণ্ডীর ঈর্ষার নগ্ন প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এ ধারাবাহিকে চণ্ডীকে মনসার জীবনের সবচেয়ে বড় সহায়কের ভূমিকায় দেখা যায়। জীবনে বহু প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করার

জন্য মনসাকে সমর্থ হতে হবে, মনসাকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করার জন্যই চণ্ডী কিছু ক্ষেত্রে তাকে প্রত্যক্ষ সাহায্য করেন না। স্বামীর কন্যার প্রতি স্বাভাবিক রোষ মনসামঙ্গলের চণ্ডীকে করেছিল মানবিক। ধারাবাহিকে বিমাতা নয় জগতমাতা চণ্ডী অবহেলিত একটি কন্যাকে সন্তান স্নেহে আপন করেছেন। সেই সঙ্গে একজন নারী হিসাবে মনসার প্রতি হওয়া যাবতীয় অবহেলা, অপমানের প্রতিকারকল্পে সচেষ্টও হয়েছেন। মঙ্গলকাব্য থেকে এই স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী চণ্ডীকে অনেক বেশি উদার করলেও, চরিত্রটি মানবিক গুরুত্ব হারিয়েছে।

মনসার বিবাহ প্রসঙ্গে ধারাবাহিকে যে অভিনব কাহিনি সংযোজন করা হয়েছে তা এইরকম - শিব সাধনায় নিবিষ্ট মনসার কাছে ইন্দ্রদেবের নির্দেশে মহাতেজা মুনি জরৎকারুর ছদ্মবেশে আসেন কামদেব এবং তার তপস্যা ভঙ্গ করতে সমর্থ হন। এখান থেকেই মনসার হৃদয়ে জরৎকারুর জন্য প্রেমভাবের সূত্রপাত হয়। অতঃপর দেবী চণ্ডীর নির্দেশে জরৎকারুর মন জয় করার জন্য ব্রতচারিণী হয়ে তার আশ্রমে অবস্থান, তার শিষ্যদের সেবা করা, ইন্দ্রের ষড়যন্ত্রকে হারিয়ে দুর্বাসা ও তার শিষ্যদের পরিতুষ্ট করা, বিবাহের পূর্বে জরৎকারু কর্তৃক মনসার অগ্নিপরীক্ষা, বিবাহের পর জটাসুর ছলনায় মনসাকে স্পর্শ করলে শ্বেত পর্বতে মনসাকে পাঠানো, মনসার প্রাণসংশয়, শিবের ভর্ৎসনায় জরতকারুর অনুশোচনা, মনসাকে উদ্ধার, নাগলোকে মনসা ও জরৎকারুর বরণ উৎসব, শিবালয়ে মনসা ও জরৎকারুর শিব-চণ্ডী আরাধনা - এই সকল ঘটনাক্রম ধারাবাহিকের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে।

মহাভারতে জরৎকারু মুণি পূর্বজদের আত্মার মুক্তির জন্য নিজ নামের কন্যার সঙ্গে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বিপ্রদাস পিপলাইএর কাব্যেও একই বর্ণনা পাই। নাগরাজ বাসুকি তখন নিজের ভগিনী জরৎকারীর সঙ্গে তার বিবাহ দেন। জরৎকারীর সন্তান নাগজাতির দুর্দশা মুক্তির কারণ হবেন, একথা নাগেরা অবগত ছিলেন। মহাভারতে অবশ্য মনসা নামটি সরাসরি ব্যবহৃত হয় নি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও দেবীভাগবতে মনসা ও জরৎকারুর বিবাহ ও জরৎকারুর পত্নীত্যাগের বিবরণ রয়েছে। এই দুটি বিষয়কে সমন্বিত করে মনসা ধারাবাহিকে উপরোক্ত কাহিনি অংশ সংযোজিত করা হয়েছে।

জাতিগত ভেদবুদ্ধি ও উগ্র পুরুষতন্ত্র কীভাবে একটি সাধারণ মেয়ের সাধারণ স্বপ্নগুলির সামনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, কীভাবে প্রতি পদে পদে তাকে অপমান বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়, কীভাবে সে ভাগ্যকে জয় করার জন্য দৃঢ়চেতা হয়ে ওঠে, মনসার বিবাহ প্রসঙ্গে ধারাবাহিকের সংযোজিত অংশে সেই আবহমান সত্যই উঠে আসে।

আস্তিকের জন্ম প্রসঙ্গ - মঙ্গলকাব্যে কোথাও মনসাকে কেবল আস্তিক জননী হিসাবে দেখানো হয়েছে, আবার কোথাও মনসা আস্তিক সহ অষ্ট নাগের জন্ম দিয়েছেন। বিজয়গুপ্তের কাব্যে এ প্রসঙ্গে উত্তঙ্গমুনির অভিশাপের কাহিনি রয়েছে। নাগের নিয়ে যাওয়া রত্নকুণ্ডল উদ্ধার করতে তাকে পাতাললোকে যাবার পরিশ্রম করতে হয়েছিল। বিরক্ত মুনি অষ্টনাগকে গর্ভাবস্থায় যাবার অভিশাপ দেন। এই অষ্টনাগই মনসার গর্ভে জন্মান[৭]। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে জরৎকারুর আশীর্বাদে মনসার গর্ভে আস্তিকের জন্ম হয়। এখানে অষ্টনাগ প্রসঙ্গ নেই[৮]। জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলেও মনসার একমাত্র সন্তান আস্তিক প্রসঙ্গ এসেছে, তবে সে চতুর্মুখ। চারটি মুখ সম্ভবত তার পরম জ্ঞানী সত্তার প্রতীকী[৯]। বিপ্রদাসের মনসাবিজয় কাব্যেও মনসার একমাত্র সন্তান আস্তিক যে জন্মেজয়ের সর্পসত্র যজ্ঞ রোধ করেছিল[১০]। এই একই কাহিনি মহাভারতেও পাই। আবার পুরাণেও জরৎকারু মনসাকে পরম ধার্মিক, জিতেন্দ্রিয়, তেজস্বী শ্রেষ্ঠ যোগী ও জ্ঞানী পুত্রলাভের আশীর্বাদ দেন। গর্ভবতী অবস্থায় মনসার প্রতি মহাদেবের জ্ঞানবাক্যে গর্ভস্থ সন্তান জ্ঞানী হয়। জন্মানোর পর শিবের কাছ থেকে আস্তিক বহুতর শিক্ষা ও মহামৃত্যুঞ্জয় জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ নিবারণ করেন এবং দেবতা ও নাগকুল উভয়ের পক্ষে হিতসাধন করেন[১১,১২]।

এই প্রসঙ্গ ধারাবাহিকে যে অভিনব কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে, তা এইরূপ - জরৎকারু ত্যাগ করার পর মনসা বনবাসী হন এবং একটি গুহায় গর্ভস্থ সন্তানদের প্রতিপালন করতে থাকেন। নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে মনসার সন্তানদের জন্মের সময় উপস্থিত হলে মনসা শিবের নির্দেশে নাগলোকে যায়। সেখানে তার সাতজন নাগ সন্তান জন্মালেও অষ্টম সন্তানের জন্ম হয় না। এই অষ্টম সন্তানের জন্ম দিতে সে প্রথমে পিতা মহাদেবের কাছে আসে। তারপর মহাদেবের নির্দেশে কশ্যপ মুনি দারুক বনে পুত্রকামেষ্টী যজ্ঞ করেন। এই

যজ্ঞের ফলে আস্তিকের জন্ম হয়। শিক্ষার্জনে সে শৈশবেই গৃহত্যাগী হয়। পরবর্তীকালে নাগকুল রক্ষায় সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

বিজয়গুপ্তের কাব্য অনুযায়ী ধারাবাহিকে এসেছে মনসার অষ্টসন্তান প্রসঙ্গ। তবে এখানে অষ্টনাগ নয়, সাতটি নাগ আর এক মুনির জন্ম দিচ্ছে মনসা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে পুরাণ মতে পৃথিবীর মানুষের সর্পভয় দূর করার জন্য ব্রহ্মার নির্দেশে কশ্যপ মুনি বীজমন্ত্র সৃষ্টি করেন, তারই ধ্যানের প্রতিকৃতি রূপে মনসার জন্ম হয়।

মনসামঙ্গলে চাঁদ মনসার বিবাদে মনসা চাঁদকে শাস্তি দিতে চম্পকনগরবাসীর সাপের কামড়ে মৃত্যু, ফসল নষ্ট ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কাজে মেতে উঠেছিল। মনসা ধারাবাহিকে মনসাকে কুচক্রীরূপে তুলে ধরা হয়নি। নাগজাতির মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্বার্থপরতা, তক্ষকের সাথের মিলিত হয়ে ইন্দ্রের ষড়যন্ত্র মর্ত্যবাসীর দুর্গতির কারণ হয়েছিল। মনসা মর্ত্যবাসীর দুর্ভোগ দূর করতে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে, বারবার আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে মর্ত্যলোকের কল্যাণকর্মে নিযুক্ত থেকেছে। তাই শুধু অধিকার প্রতিষ্ঠা নয় কল্যাণকর্ম, আত্মত্যাগের মাধ্যমে তার দেবত্ব অর্জন সফল করে তুলেছে। মনসামঙ্গল থেকে এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী এখানে ধরা আছে।

মনসা ধারাবাহিকে বেশ কিছু পৌরাণিক কাহিনিতে মনসার যোগসূত্র স্থাপন করে নতুন রূপে তুলে ধরা হয়েছে -

বালখিল্য মুনির আখ্যান - মহাভারত অনুসারে কশ্যপ মুনি পুত্র লাভের জন্য মহাযজ্ঞ করলে, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব সকলে মিলে সেখানে সাহায্য করার জন্য অংশগ্রহণ করেন। ইন্দ্র যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় পর্বত প্রমাণ কাঠ সংগ্রহ করে আনার সময় দেখেন অঙ্গুষ্ঠ সমান ক্ষুদ্রাকার বালখিল্যরা একটি পলাশের পাতা মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পথে একটি গর্ত পার হতে না পেরে সবাই দাঁড়িয়ে আছেন। এই দৃশ্য দেখে অহংকারী ইন্দ্র মুনিদের নিয়ে উপহাস করে হাসতে লাগল। ক্রোধে মুনিরা দেবরাজ অপেক্ষা শতগুনে বলিষ্ঠ আর এক ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞ শুরু করে। ইন্দ্রের অনুরোধে ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে বালখিল্যদের নিবৃত্ত করেন। কশ্যপ ইন্দ্রের আচরণের জন্য তাকে ধিক্কার জানায় এবং

বালখিল্যদের আশস্ত করে বলেন তাদের প্রার্থনা অনুযায়ী এক পক্ষীন্দ্র জন্মাবে, যে ত্রিভুবন জয় করবে। সেইমত কশ্যপ পত্নী বিনতার গর্ভে মহাশক্তিশালী গরুড়ের জন্ম হয়। ইতিপূর্বে কদ্রু ছলনায় বিনতাকে নিজের দাসী করে রেখেছিলেন[১৩]। দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণেও একই বিবরণ পাই[১৪]।

ধারাবাহিকে এই ঘটনার মধ্যে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় মনসাকে আনা হয়েছে। ইন্দ্র কর্তৃক বালখিল্য মুনিকে অপমানের ঘটনা মহাভারত অনুযায়ীই নেওয়া হয়েছে। তবে এখানে একজন মুনিকেই বালখিল্য হিসাবে দেখানো হয়েছে। সেই সঙ্গে পুত্রের কামনায় কশ্যপ মুনির যজ্ঞের প্রেক্ষাপট ধারাবাহিকে নেই। এখানে বিনতা মনসার কাছে নিঃসন্তান হবার জন্য দুঃখ করেছে। ইন্দ্রের উপহাসে বালখিল্য মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্র পতনের জন্য যজ্ঞে বসে। ভীত ইন্দ্র ব্রহ্মার কমণ্ডলুর মধ্যে আত্মগোপন করে। এ ঘটনা মনসার দৃষ্টিগোচর হলে, মনসা ইন্দ্রপতনের ভয়াবহ প্রভাব থেকে ত্রিলোককে বাঁচাতে বালখিল্যের কাছে করজোড়ে মিনতি করে। মনসার প্রার্থনায় বালখিল্য মৃত্যুযজ্ঞ বন্ধ করে। মৃত্যু যজ্ঞের যাবতীয় ফল সাগ্রহে গ্রহণ করে মনসা। ত্রিলোক রক্ষার্থে তার অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয় আজীবনের দুর্ভোগ । বালখিল্যের নির্দেশে মৃত্যুযজ্ঞ থেকে উঠে আসা দুটি ডিম বিনতার কাছে পৌঁছে দেয় মনসা। পথে নাগমাতা কদ্রু ও দেবতাদের সৃষ্ট নানা প্রতিকূলতাকে বীরত্বের সঙ্গে জয় করে মনসা। এই ডিম থেকেই পরবর্তীকালে জন্ম নেবে অরুণ আর গরুড়। এই অরুণই পরবর্তীকালে সূর্যের সারথী হবেন আর মহাপরাক্রমশালী গরুড়, যিনি হবেন বিষ্ণুর বাহন।

এভাবেই মহাভারতের কাহিনির মধ্যে ধারাবাহিকের জন্য সৃষ্ট কাহিনিসূত্র অনুযায়ী মনসাকে এনে তাকে ত্রিজগতের রক্ষাকর্ত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তবে কদ্রুর ছলনায় বিনতার দাসত্ব লাভের ঘটনা মহাভারত অনুসারী। আবার অসম্পূর্ণ অবস্থায় অরুণের জন্মের কথা মহাভারতে থাকলেও সূর্যের কৃপায় তার সম্পূর্ণতা প্রাপ্তি, এবং সেই ঘটনায় মনসার প্রত্যক্ষ প্রভাবের মত ঘটনা ধারাবাহিকের জন্য তৈরি। তবে এভাবে কাহিনিতে মনসাকে যুক্ত করার জন্য এসেছে কার্যকারণগত নানা অসঙ্গতি। কারণ কশ্যপের পুত্র কামনায় যে যজ্ঞ তার প্রেক্ষাপট বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে বালখিল্যের যজ্ঞ থেকে উঠে

আসা ডিম্ব দুটির সঙ্গে কশ্যপ ও বিনতার সরাসরি যোগ নেই। তাহলে ওই ডিম দুটি থেকে যারা জন্ম নেবে, তারা কীভাবে কশ্যপ আর বিনতার সন্তান হল? এভাবে মনসাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে ধারাবাহিকের জন্য সৃষ্ট সংযোজিত ও পরিবর্তিত ঘটনায় কোথাও কোথাও দুর্বল কাহিনি বিন্যাস তথা অসঙ্গতি প্রত্যক্ষ হয়।

ত্রিপুরাসুর বধ প্রসঙ্গ - লিঙ্গপুরাণ[১৫] ও শিবপুরাণ[১৬] অনুসারে তারকাসুরের তিন পুত্র তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী মহা বলশালি, মহাত্মা হয়েও কঠোর তপস্যায় পিতামহ ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে। তারা ব্রহ্মার কাছ থেকে এই বর লাভ করেন যে তাদের নির্মিত পুরত্রয় একই বাণে বিদ্ধ করতে পারলেই কেবলমাত্র তাদের বধ করা সম্ভব হবে। তাদের নির্মিত এক একটি নগর বা পুর শত যোজন বিস্তৃত ছিল। তারকাক্ষের নগর ছিল সোনার তৈরি, কমলাক্ষের নগর হীরার আর বিদ্যুন্মালির নগর লোহার। পুরাণে এই তিনটি নগরের উন্নত ও সুপরিকল্পিত গঠনশৈলীর বিবরণ রয়েছে। নগরের দৈত্যেরা পাপ করলেও মহাদেবের অর্চনার মাধ্যমে সেই পাপ লাঘব হত। নারীরা ছিলেন সাধ্বী ও ধর্মপরায়ণা। ঘরে ঘরে বেদ অধ্যয়ন হত, খেলাধূলারও সুব্যবস্থা ছিল। দৈত্যকুলের তেজস্বিতায় দেবতারা শঙ্কিত হলে তারা বিষ্ণুদেবের শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুমায়ায় ত্রিপুর অনাচারে ভরে ওঠে, দৈত্যেরা বিধর্মী হয়, নারীরা স্বৈরিণী হয়ে ওঠে, লক্ষ্মী সেখান থেকে অন্তর্হিত হলে, অলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হয়। এমতাবস্থায় দেবতারা স্তব স্তুতি দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করে এবং মহাদেব কর্তৃক ত্রিপুরাসুর নিধন হয়।

মনসা ধারাবাহিকে দেখানো হয়েছে যে মনসা মহাদেবের কাছে কন্যার স্বীকৃতি এবং মহাশক্তিশালী নাগমণি অর্জনে সমর্থ হলে ইন্দ্রদেব ঈর্ষায় জর্জরিত হন। নাগজাতির ধ্বজা উড়িয়ে একটি কন্যা স্বর্গে স্থানলাভ করবে, এ সম্ভাবনায় তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং মহাদেবের সঙ্গে ত্রিপুরাসুরের যুদ্ধের সময় ষড়যন্ত্র করে মনসাকে যুদ্ধস্থলে পাঠান। বিদ্যুন্মালির অস্ত্রের আঘাতে হতচেতন মনসাকে নিয়ে যুদ্ধ প্রাঙ্গন ত্যাগ করেন মহাদেব। কন্যার প্রাণসংশয় উপস্থিত হলে তিনি শোকে ক্রোধে তাণ্ডবে মেতে ওঠেন। অতঃপর মহামায়া স্বামীকে শান্ত করেন এবং শিব কর্তৃক ত্রিপুরাসুর বধ সম্পন্ন হয়।

দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরাসুর বধের পৌরাণিক কাহিনিতে মনসাকে এনে উপস্থিত করা হচ্ছে। সামাজিক শ্রেনিবিন্যাস, ক্ষমতাশালীর অন্যায়, দুরাচার, দুর্বলকে শেষ করে দেবার জন্য নির্মম ক্রিয়াকলাপ সহ নগ্ন কুটনীতির বাস্তব প্রেক্ষাপটে ইন্দ্রদেবের ষড়যন্ত্র সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। সতীর বিরহে শিবের তাণ্ডবের কাহিনি পুরাণ স্বীকৃত। কিন্তু কন্যার অচেতন শরীর নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কৈলাসে ফিরে শিবের তাণ্ডব কাহিনিতে অভিনবত্ব এনেছে। মনসামঙ্গলের কাহিনির অবলম্বন কেবল চাঁদ ও মনসার বিবাদ, তাই ভক্ত আর কন্যার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়েছে মহাদেবকে। উপরন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবী চণ্ডীও মনসার প্রতি নির্দয় ছিলেন। ফলে স্নেহ বৎসল পিতৃহৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ (মনসার জন্য সিজুয়া পর্বতে পুরি নির্মাণ বা নেতি ধোপানীর জন্ম, মনসার সন্তানদের জন্য ক্ষীরোদ সাগর নির্মাণের কাহিনির মত দুএকটি ক্ষেত্র ব্যতীত) অপেক্ষাকৃত কম দেখতে পাওয়া যায়। এই ধারাবাহিকে মনসার প্রতিটি বিপদে শিব অস্থির হয়েছেন, তার দুঃখে কাতর হয়েছেন, কখনও জরৎকারু কখনও দেবী চণ্ডীকে তিরস্কার করেছেন আর ত্রিপুরাসুর বধ প্রসঙ্গে মনসার বিরহে শিবের তাণ্ডবে তার পিতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতার চরম প্রকাশ ঘটেছে।

বলির পাতালপ্রবেশ ও সমুদ্রমন্থন প্রসঙ্গ - মনসা ধারাবাহিক পৌরাণিক কাহিনিতে পূর্ণ। কখনও সরাসরি মনসাকে তুলে এনে সেই সব কাহিনিতে যুক্ত করা হয়েছে। কখনো বা কোনো চরিত্রের মুখে বিবৃত কাহিনিকে পরোক্ষে তুলে ধরা হয়েছে। মহামুনি কশ্যপের কাছে জরৎকারু বিবাহের বিষয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্বের কথা ব্যক্ত করলে মুনি তাকে আশ্বস্ত করেন। তিনি জরৎকারুকে বোঝান যে পূর্ব পুরুষদের মুক্তির হেতু বিবাহ করায় কোনো অন্যায় নেই। প্রয়োজনে ভগবানকেও ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ কর্তৃক বলিরাজার পাতাল প্রবেশের বৃত্তান্ত দেখানো হয় ধারাবাহিকে। স্বয়ং ভগবান ত্রিলোক রক্ষার্থে যদি ছলনা করতে পারেন, তাহলে জরৎকারুর ক্ষেত্রে কেবল বংশ রক্ষার্থে বিবাহে কোনো দোষ নেই।

পরবর্তীতে অবশ্য বলি রাজার প্রত্যক্ষ ভূমিকা দেখানো হয় ধারাবাহিকে। যেখানে তার জাগরণের কাল উপস্থিত হলে, অসুরমাতা দিতি ও শুক্রাচার্য তাকে জাগিয়ে তোলেন। এবং পুনরায় দৈত্যকুলের শক্তি বৃদ্ধি করে স্বর্গ দখলের জন্য প্রস্তুত হন বলি অসুর। যার ফল

স্বরূপ দেবাসুরের যুদ্ধ ও সমুদ্রমন্থন ঘটে। অন্যদিকে জরাসুর মনসার গর্ভের সন্তানদের ওপর জরা'র বিষ প্রয়োগ করলে, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে মনসাও কালকূট বিষ উদ্গীরণ করে। বিষের কবলে গর্ভস্থ সন্তানেরা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাদের প্রাণ সংশয় ঘটে। সন্তানদের বাঁচাতে তৎপর মনসা ছুটে যান বলি রাজার কাছে। রাজা কোনো প্রভাবশালী মুনির সাহায্যে স্বর্গের বিদ্যাধরীদের কাছ থেকে সন্তানক ফুল সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন। মনসা ঋষি দুর্বাসাকে সন্তানক পুস্প সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেয়। বিদ্যাধরীর কাছ থেকে নেওয়া সন্তানক পুষ্পমাল্য ইন্দ্রদেব তাচ্ছিল্যভরে পথে আসা একটি হাতির মাথায় ছুঁড়ে ফেলে। হাতি সেই মালা পদদলিত করলে দুর্বাসার অভিশাপে স্বর্গ শ্রীহীন হয়।

যজ্ঞাদি দ্বারা বলিরাজা পুনরায় অসীম বলশালী হয়ে উঠে স্বর্গ আক্রমণ ও জয় করেন। দেবতারা সব হারিয়ে ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। ওদিকে সন্তানক ফুল সংগ্রহে অপারগ মনসার কাছে তার মুমূর্ষু সন্তানদের বাঁচাতে একমাত্র উপায় সমুদ্র মন্থনের ফলে দেব বৈদ্য ধন্বন্তরির জাগরণ। বলিরাজার স্বর্গদখল, মনসার সন্তানদের জীবন সংশয়ের প্রেক্ষাপটে সমুদ্র মন্থনের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে।

বামন পুরাণ[১৭] অনুসারে দৈত্য রাজা বলি ও তার পুত্র বাণ দেবতাদের হারিয়ে ক্ষমতায় দশলোকের সেরা হয়ে ওঠে। বলি ইন্দ্রপদ গ্রহণ করে ও বাণ যমরাজের পদে আসীন হন। পিতামহ প্রহ্লাদ তখন বলিকে অকলঙ্ক হয়ে সকল প্রাণীর অভ্যুত্থানের জন্য কর্মসাধনের উপদেশ দেন। বলি তখন ন্যায়, করুণা ও ধর্মাচার দ্বারা ত্রিলোক পালন করতে লাগলেন। বলির ধর্মপালনে কলি ধর্ম বিচ্যুত হয়, এবং সত্যযুগের অভ্যুত্থান হয়। সত্যযুগের সূচনায় সোমবংশে ঋক্ষ নামে মহাবল রাজার পুত্র সম্বরণ বাল্যকাল থেকেই বিষ্ণু ভক্ত হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে সম্বরণপুত্র নৃপতি শ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় কুরু পৃথিবী পর্যটনের সময় পবিত্র অদ্বৈত বনে প্রবেশ করে। সেখানে ব্রহ্মার সমন্ত পঞ্চক নামক উত্তরবেদীকে নিজ ধর্ম পালনের যথাযথ ক্ষেত্র রূপে বিবেচনা করেন । নারায়ণের পরীক্ষায় সফল হয়ে কুরু তার কর্ষিত ক্ষেত্রে সকল দেবতাকে অধিষ্ঠিত করার বরপ্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে বলিরাজার দৃষ্টান্তে দৈত্যেরা সকলে যজ্ঞ করতে থাকে, ফলে সমস্ত সংসার দৈত্যময় হয়ে ওঠে। এবং ধার্মিক বলি তার পুণ্য কর্ম দ্বারা অজেয় হয়ে ওঠে। স্বর্গচ্যুত দেবতারা মাতা অদিতি, পিতা কশ্যপ

ও পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়। অতঃপর সকলের অভিলাসে নারায়ণ অদিতির গর্ভে বামন রূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রহ্লাদের আদেশে বলি নারায়ণের সাধনায় নিমগ্ন হয়। বামন অবতারে স্বয়ং নারায়ণ তার কাছে তিন পা জমি প্রার্থনা করলে, বলি তা দিতে সম্মত হয়। তখন জগন্ময় দিব্য রূপে নারায়ণ তাকে দর্শন দেন। প্রথম দু'পায়ে তিনি স্বর্গ ও মর্ত্যের সমুদায় অংশগ্রহণ করেন। ভগবান দর্শন সৌভাগ্যে আপ্লুত বলিরাজা তখন বিষ্ণুর তৃতীয় পা রাখার জন্য নিজ মস্তক এগিয়ে দেন। ভগবানের পাদস্পর্শে বলির পাতালপ্রবেশ ঘটে।

সুতরাং ধারাবাহিকে জরৎকারুকে বোঝাতে বলি রাজার পাতাল প্রবেশের যে কাহিনি দুর্বাসা মুনি বলেছে, তা পৌরাণিক। কিন্তু বলির জাগরণ ও দ্বিতীয়বার স্বর্গজয়ের কাহিনি অভিনব। আবার সন্তানক পুস্পমাল্য প্রসঙ্গে দুর্বাসা কর্তৃক ইন্দ্রদেবের অভিশাপগ্রস্ত হওয়া ও শ্রী ফেরাতে বিষ্ণুর পরামর্শে সমুদ্রমন্থনের কাহিনি পৌরাণিক। কিন্তু মনসার গর্ভস্ত সন্তানদের ওপর জরাসুরের বিষ প্রয়োগ, সন্তানদের জীবন বাঁচাতে বলি রাজার পরামর্শে, মনসার অনুরোধে দুর্বাসার সন্তানক ফুল সংগ্রহের কাহিনিও নতুন। ধন্বন্তরির জাগরণের জন্য মনসার বিষ্ণু স্তব ও সমুদ্র মন্থনকে তরান্বিত করার ঘটনা ধারাবাহিকের সংযোজন। আবার আসুরিক শক্তিকে মন্থনের কাজে ব্যবহার করার জন্য বলির সভায় দেবদূত হয়ে গেছে মনসা। মন্থনে উত্থিত হলাহল পান করার পর বিষ যাতে মহাদেবের শরীরে ছড়াতে না পারে, তার ব্যবস্থা করে মনসা। বিপ্রদাসের পদ্মাপুরাণ, জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলেও মন্থনের ফলে উত্থিত হলাহল পান করে মহাদেব অচেতন হলে, মনসা তার শরীর থেকে বিষ তুলে পিতাকে প্রাণে বাঁচান। ধারাবাহিকে মনসা চণ্ডীর সহায়তায় পিতার কণ্ঠদেশ স্পর্শ করে বিষের প্রভাবকে প্রতিহত করে। বিষহরী মনসা এভাবেই জগত কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এভাবেই পৌরাণিক কাহিনিতে মনসাকে যুক্ত করে দেবী হিসাবে তার গুরুত্বকে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি ধারাবাহিকের পরিসরও বেড়েছে।

গরুড়ের অমৃত আহরণ বৃত্তান্ত - মহাভারতের আদিপর্ব অনুসারে কদ্রু বিনতাকে নিজের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার শর্ত রূপে গরুড়ের কাছে নাগেদের জন্য অমৃতের দাবি করেছিল। মাকে মুক্ত করতে গরুড় স্বর্গের দেবতাদের পরাভূত করে অমৃত ছিনিয়ে এনে একটি

কুশাসনে রাখে। ইন্দ্র ছলনায় সেই সুধাভাণ্ড নিয়ে পালিয়ে যায়। কুশের ওপর পড়ে থাকা অমৃতের সম্ভাবনায় নাগেরা কুশ চাটতে থাকে, ফলে তাদের জিভ দ্বিখণ্ডিত হয়[১৮]। দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে গরুড়ের কুশপাত্রে আনা অমৃত নারায়ণ হরণ করেছিল। পাত্র চাটতে গিয়ে নাগেদের জিভ চিরে যায়[১৯]। ধারাবাহিকে দেখানো হয় মনসা কদ্রুর ষড়যন্ত্রে বন্দী বিনতাকে মুক্ত করে। বিনিময়ে কদ্রু মনসার কাছে নাগেদের জন্য মন্থনে উত্থিত অমৃত দাবি করে। ইতিপূর্বে নারায়ণের ছলনায় কেবলমাত্র দেবতারা অমৃতের অধিকার পেয়েছিল। কদ্রুর দাবি রাখতে মনসা বাধ্য হয়ে গরুড়কে স্বর্গে অমৃত ছিনিয়ে আনার জন্য পাঠান। পরের ঘটনা মহাভারত অনুসারী। এভাবে গরুড়ের অমৃত আহরণ বৃত্তান্তের সাথে মনসাকে যুক্ত করা হয়েছে ধারাবাহিকে।

বীরভদ্র ও নাগেদের সংঘাত - ধারাবাহিকে দেখানো হয়, মনসার বিবাহ উৎসবে কোনো নাগ যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেই জন্য চণ্ডীর নির্দেশে বীরভদ্র কে নিয়োগ করা হয়। বীরভদ্রের শক্তির সামনে হতবল নাগেরা মনসার বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে না পেরে ফিরে যায়। শিবকেশ থেকে বীরভদ্রের জন্মের কথা কালিকাপুরাণে[২০] পাই। সতীর প্রাণত্যাগের শোকে ক্রোধে মহাদেব তাণ্ডবে মেতে ওঠেন। তখন ভূতলে পতিত মহাদেবের কেশগুচ্ছ থেকে মহাতেজা বীরভদ্রের সৃষ্টি হয়। মহাদেবেরই তেজ থেকে জাত হওয়ায় সে অতি পরাক্রমী ছিল। শিবের নির্দেশে সে যজ্ঞ লন্ডভন্ড করে এমনকি দেবতারাও তার বীরত্বের কাছে হেরে যজ্ঞ স্থল ত্যাগ করেন ।

দেবতাদের ও মুনি ঋষিদের কাছে নাগেরা ঘৃণিত। জরৎকারু বিবাহ স্থলে কোনও নাগকে দেখলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করতে পারে, এই আশঙ্কায় চণ্ডী নাগেদের প্রবেশপথে বীরভদ্রকে নিযুক্ত করে। প্রয়োজনে বীরভদ্র শারীরিক প্রহারও করতে ছাড়েনা। দক্ষের সভায় শিব ব্রাত্য ছিল, আর শিবের কন্যার বিবাহে নাগেরা ব্রাত্য। একদিন যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে বীরভদ্রের জন্ম হয়েছিল, ধারাবাহিকে চণ্ডীর আদেশে সেই অন্যায়ের সহায়ক হয়ে ওঠে সে। ইন্দ্র, চণ্ডী, জরৎকারুর আচরণে সমাজের ক্ষমতাশালীর নগ্ন সংকীর্ণতার প্রকাশ দেখা যায়। জরৎকারু মনসার নাগ পরিচয় জানার পারলে এই সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েই মনসাকে আত্মপরীক্ষা দিতে হয়। এও তো ভারতের জাতীয় চরিত্রের নগ্ন চেহারার

উন্মোচন, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা সংবিধানে থাকলেও কত মানুষকে জাতপাতের ভেদবুদ্ধির শিকার হয়ে প্রাণ হারাতে হয়, সে হিসাব ক্ষমতাশালীকে কোনও ভাবে প্রভাবিত করে না। পুরাণ, মহাকাব্য যে ঘটনা সমর্থন করে না, সমাজের ঘৃণ্য বাস্তবতার নিরিখে তা আর অসঙ্গত মনে হয় না।

জটাসুর বধ - মনসা ধারাবাহিকে দেখানো হয় বিবাহ রাত্রে জরৎকারু মনসাকে সারারাত জেগে পদসেবা করতে আদেশ দেয়। মনসা অজ্ঞাতে ঘুমিয়ে পড়লে ক্রুদ্ধ জরৎকারু মনসাকে ত্যাগ করে শিবালয় থেকে বেরিয়ে যায়। ঘুম ভাঙলে সে স্বামীকে খুঁজতে দারুক বনে পৌঁছালে, দুষ্ট রাক্ষস জটাসুর জরৎকারুর ছদ্মবেশে মনসাকে অপবিত্র করতে উদ্যত হয়। ঘটনাস্থলে জরৎকারু পৌঁছোয় ও অসুরকে পাথরে পরিণত করে ও তাকে বধ করতে সচেষ্ট হয়। ঘটনাস্থলে বিষ্ণু উপস্থিত হন এবং জটাসুরের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়নি বলে জরৎকারুকে নিরস্ত করেন। পরবর্তীকালে ইন্দ্রদেব আবার জটাসুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে মনসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। শুক্রাচার্যের থেকে বরপ্রাপ্ত হয়ে জটাসুর শক্তিশালী হয়ে জরৎকারুকে বন্দী করেন। মহাদেব জরৎকারুকে উদ্ধার করেন এবং জটাসুরকে পাতালে প্রেরণ করেন।

মহাভারতের বনপর্বে ভীম কর্তৃক জটাসুর বধের কাহিনি রয়েছে[২১]। ভীম অর্জুনের অনুপস্থিতিতে সে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী নকুল ও সহদেবের ওপর আক্রমণ চালায় এবং শেষে ভীমের হাতে জটাসুর বধ হয়। ধারাবাহিকে জটাসুরের পাতাল প্রবেশের সময়ে, দ্বাপরে পবন দেবের অংশে কুন্তিপুত্র ভীমের পুত্রের হাতে তার মৃত্যু হবে বলে ভবিষ্যৎবাণী করে শিব। সুতরাং মহাভারতের কাহিনি সূত্রে মনসাকেন্দ্রিক কল্পকাহিনির সংযোজন করা হয়েছে এখানে। জটাসুর মনসার হাত ছুঁয়েছিল তাই স্বামীর নির্দেশে আগুনে পুড়িয়ে মনসাকে শুচিশুদ্ধ হতে হয়। অনুচিৎ জেনেও জগতকল্যাণে তার অনাগত সন্তানের বিশেষ ভূমিকা থাকায় সে স্বামীর নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়। ধারাবাহিকের জন্য তৈরি জটাসুরের নতুন কাহিনিতে মনসার ত্যাগ, তাঁর কল্যাণী ভাবমূর্তি একদিকে প্রকাশিত, অন্যদিকে মনসার মত সাধারণ নারীর স্বামীর প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা, সংসারজীবন যাপন করার

একান্ত কামনার বিপরীতে জরৎকারুর মত জ্ঞানী পুরুষের উগ্র দম্ভ, স্ত্রীর ওপর মানসিক শারীরিক নির্যাতনে নারীর বৈবাহিক জীবনের বাস্তব প্রতিকূলতাকে তুলে ধরা হয়েছে।

সতী অনসূয়া প্রসঙ্গ - ভাগবতপুরাণ অনুসারে কর্দ্দম মুনির নয় কন্যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন অনসূয়া। অত্রিমুনির সঙ্গে তার বিবাহ হয়। বায়ুপুরাণে তাঁকে দক্ষকন্যা বলা হয়েছে। বামনপুরাণেও প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞানুষ্ঠানে অত্রি ও অনসূয়াকে আমন্ত্রণ জানাবার প্রসঙ্গ রয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে অনুসূয়ার পাতিব্রত্যের মাহাত্ম্যে প্রীত হয়ে তার ইচ্ছানুযায়ী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যথাক্রমে সোম, এবং দত্তাত্রেয় ও দুর্বাসা রূপে তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগবত পুরাণেও অনসূয়ার এই তিন পুত্র লাভের প্রসঙ্গ আছে।

মনসা ধারাবাহিকে কর্ণাট অসুর বধের প্রয়োজনে দেবর্ষি নারদের পরিকল্পনা অনুযায়ী মনসার প্রয়াসে চন্দ্রদেব কর্তৃক অনুসূয়াকে প্রণয় নিবেদনের প্রসঙ্গ এসেছে। অনুসূয়ার অভিশাপে চন্দ্রদেব ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন এবং আকাশে প্রকট হবার ক্ষমতা হারান। ঘোর অমাবস্যায় দেবী চণ্ডীর মহাকালী রূপ জাগ্রত হয়। দুর্বৃত্ত কর্ণাট অসুর বিষ্ণুনাম জপ করার সময় মনসা তাকে সাপ রূপে বেঁধে আনে মহাকালীর সামনে। মহাকালী রূপে দেবী অগ্নিদেবকে মুখগহ্বরে ধারণ করে কর্ণাট অসুরের শরীরে অগ্নিবলয় নিক্ষেপ করে তাকে বধ করেন। জগত কল্যাণে মনসা চন্দ্রদেবকে সুস্থ করেন। চন্দ্রদেব দক্ষিণের যেখানে সাধনায় মগ্ন, তা মাধেরা অঞ্চল। মনসা নাগলোকে মহাদেবের আরাধনায় রত হলে মাধেরায় মহাদেব সোমেশ্বর রূপে এবং মাতা পার্বতী মাধেশ্বরী রূপে জাগ্রত হন। মহাদেব চন্দ্রদেবকে পুণরায় তার জটায় স্থান দেন এবং তার অভিশাপ খণ্ডন করেন। দেবী অনুসূয়াও অনুতপ্ত চন্দ্রদেবকে ক্ষমা করেন।

রামায়ণেও সতী অনসূয়ার কাছে সীতার আশ্রয় গ্রহণের প্রসঙ্গ রয়েছে। সুতরাং অনসূয়া সঞ্চিত পুণ্যের বলে যে শক্তি অর্জন করেছিলেন, একথা পুরাণ স্বীকৃত। স্কন্দপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রজাপতি ব্রহ্মার অত্রি ও অনসূয়ার প্রথম সন্তান চন্দ্রদেব রূপে জন্মের কথা আছে। আবার স্কন্দপুরাণ হরিবংশপুরাণ সহ একাধিক পুরাণে চন্দ্রের নানা কারণে অভিশপ্ত হওয়া ও মহাদেব কর্তৃক শাপমুক্তির কাহিনি রয়েছে। কিন্তু মনসার মধ্যস্থতা

করার বিষয়টি ধারাবাহিকের কাহিনিসূত্রে সংযোজিত। দেবী অনসূয়া, পুরাণ মতে যিনি চন্দ্রদেবের মা, তার প্রতি চন্দ্রদেবের অনুরাগ ও প্রেম প্রস্তাব একেবারে নতুন কথা, যা ধারাবাহিকে দেখা গেল। চণ্ডী কর্তৃক কর্ণাট অসুর বধের অভিনব কাহিনিও কৌশলে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আর সমগ্র ঘটনায় মনসার প্রভাব দেখিয়ে জগত কল্যাণে তার মহতী ভূমিকাকে তুলে ধরতেই এ হেন নবনির্মিত কাহিনির অবতারণা।

অন্ধকাসুর প্রসঙ্গ - মহাভারত ছাড়াও মৎস্য পুরাণ, বামন পুরাণ, শিব পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, কালিকাপুরাণে অন্ধকাসুরের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। মহাভারতে বিস্তারিত বিবরণ না থাকলেও শিবের সঙ্গে তার যুদ্ধের কথা বার বার উল্লিখিত হয়েছে। মৎস্যপুরাণে আছে প্রবল পরাক্রমশালী অন্ধকাসুর দেবী পার্বতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে হরণ করতে উদ্যত হলে মহাদেব পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। কিন্তু তার রক্তবিন্দু থেকে শত সহস্র অন্ধকাসুর জন্মালে, মহাদেব শত সহস্র মাতৃকা সৃষ্টি করেন, কিন্তু এদের সকলের রক্তপান সত্তেও অন্ধকাসুরের মৃত্যু হয়না। তখন ভগবান নৃসিংহ শুস্করেবতী নামক মাতৃকা সৃষ্টি করেন, ইনি রক্তপান করলে অন্ধকাসুর রক্তশূন্য হয় এবং মহাদেব তখন অন্ধকাসুর ও তার থেকে সৃষ্ট বাকি অন্ধকদের বধ করেন। মৃত্যুকালে অন্ধক শিবের আরাধনা করে তাকে তুষ্ট করলে, মহাদেব তাকে নিজ অনুচর নিযুক্ত করেন।

বামন পুরাণে আছে, কশ্যপপুত্র হিরণ্যাক্ষের পুত্র অন্ধকাসুর, তিনি প্রথমে অন্ধ ছিলেন, পরে হিরণ্যাক্ষের জীবৎকালেই তার চোখ ঠিক হয়ে যায়। প্রহ্লাদ দৈত্য দানবদের প্রতিপালনের ভার অন্ধকাসুরের হাতে দিয়ে বদরিকাশ্রমে চলে যান। রাজ্যলাভের পর অন্ধকাসুর সাধনায় মহাদেবকে তুষ্ট করে মহা পরাক্রমী হয়ে ওঠেন এবং স্বর্গ আক্রমণ করে দেবতাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন।

ধারাবাহিকে দেখানো হয়, নাগেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্বার্থপরতা, ষড়যন্ত্রে আয়ুস গ্রামে মনসার ভক্তরা প্রাণ হারায়। ভক্তের মৃত্যুতে মনসা যখন পীড়িত, বিচলিত, তখন নারদ মুনি মনসাকে জানান, মহাদেব এবং দেবীর এক নতুন লীলা জগত দেখবে, এবং সেই লীলায় অশুভ শক্তির উত্থান ঘটলে তা রোধ করতে মনসাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে।

ওদিকে শিব ত্রিলোক রক্ষাকারী, তিনি গঞ্জিকা সেবন করে কৈলাসে থাকেন, নিজের সংসার সম্পর্কে তিনি একেবারে উদাসীন। ঘরে রন্ধন উপযোগী কিছুই না থাকায় চণ্ডী যখন চিন্তিত, তখন ক্ষুধার্ত দেবর্ষি নারদ দেবী চণ্ডীর কাছে আহার প্রার্থনা করলে, দেবী তাকে আহার করাতে অসমর্থ হন। অতিথিকে আহার করাতে না পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে মন্দার পর্বতে এসে তপস্যারত মহাদেবের তৃতীয় নয়ন করতলে আচ্ছাদিত করেন। ফলে ত্রিলোক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। মহাদেবের শরীরের উত্তাপে পার্বতীর করতল থেকে একবিন্দু স্বেদ মাটিতে পড়ে এক সুদর্শন পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। এই সন্তানই জন্মান্ধ অন্ধক। অন্ধকারের তেজ থেকে সৃষ্ট এই শিশু জাগতিক পাপের আধারস্বরূপ তাই তাকে অসুরলোকে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন মহাদেব। কশ্যপ পুত্র হিরণ্যাক্ষ বহুদিন থেকে পুত্র কামনায় মহাদেবের সাধনা করছিলেন। মহাদেব অন্ধাসুরকে তার হাতে ন্যস্ত করেন। তার আসুরিক শক্তির বিকাশ হলে অসুরগুরু শুক্রাচার্যের উপস্থিতিতে তার অসুরলোকের রাজ্যাভিষেক হয়। তক্ষক ও কালীয় নাগের সঙ্গে মিলিত ষড়যন্ত্রে মনসাপুত্র খরিস অন্ধকাসুরের সঙ্গে সন্ধি করে এবং এদের সম্মিলীত আক্রমণে দেবতারা স্বর্গচ্যুত হয়। অন্ধকাসুর ও খরিস নাগ শক্তির দম্ভে ত্রিলোকবাসীকে অত্যাচারে উৎকণ্ঠিত করে তুললে ক্রুদ্ধ শিবের তাণ্ডব শুরু হয়। দেবী চণ্ডী উগ্রকালী রূপে অন্ধকাসুরের সংহার করেন। মনসাও নিজপুত্রকে দমন করে প্রকৃত দেবীর কর্তব্য পালন করেন। মৃত্যুকালে অন্ধক শিবের আরাধনা করে তাকে তুষ্ট করে এবং খরিস নিজ ভুল অনুধাবন করে আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হলে, পরবর্তী জীবনে তারা যথাক্রমে শিব ও মনসার কৃপায় মুনি হয়ে জগত কল্যানের কাজে নিয়োজিত হয়।

বামন পুরাণের হিরণাক্ষ পুত্র অন্ধক ধারাবাহিকে শিব পার্বতীর পুত্র এবং হিরণাক্ষ তার পালক পিতা। তার স্বর্গজয়ের কাহিনীও বামনপুরাণে আছে। আবার মৎস্যপুরাণ অনুসারে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে শিবের অনুচর হওয়ার ঘটনা এখানে দেখানো হয়েছে। কিন্তু দেবী চণ্ডীর উগ্রকালী রূপে অন্ধককে সংহার, মনসাপুত্র খরিস নাগের সঙ্গে অন্ধকের সন্ধি - এই ঘটনাগুলি ধারাবাহিকের অভিনব সংযোজন। মনসার দেবীত্বের পথকে কণ্টকময় করে তুলতে ধারাবাহিকে আদ্যান্ত মনসার প্রতি ইন্দ্রদেবের বিরূপতা ও তার বিরুদ্ধে নানা

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার কাহিনি ধারাবাহিকের জন্য নির্মিত হয়েছে। ইন্দ্রদেবের প্ররোচনায় নাগজাতির আধিপত্য পেতে তক্ষক নাগও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বিপথে চালিত করে মনসাপুত্র খরিস নাগকে। প্রবল মাতৃবিদ্বেষী খরিস হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আয়ুস গ্রামের নিরীহ মানুষদের হত্যালীলায় মেতে ওঠে। মা হয়েও অন্যায়কারী পুত্র অন্ধককে শাস্তি দিয়ে দেবী চণ্ডী সংসারে ন্যায়ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। একই ভাবে মনসাও খরিসের প্রতি সন্তানস্নেহে অন্ধ না হয়ে জগতের কল্যাণ হেতু তাকে বধ করে প্রকৃত দেবধর্ম পালন করেন। ধারাবাহিকে মনসার উত্তরণকে জগতের অবহেলিত নারীশক্তির উত্থান রূপে তুলে ধরা হয়েছে। জগতের হিতসাধনে মাতৃহৃদয়ের যন্ত্রণাদীর্ণ হাহাকার তুলে ধরাই এভাবে কাহিনি বিন্যাসের কারণ।

শাকম্ভরীর পূজা প্রসঙ্গ - মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও দেবীভাগবতে দেবী মহামায়ার শাকম্ভরী রূপের বর্ণনা রয়েছে। হিরণ্যাক্ষর বংশধর রুরুর পুত্র দুর্গমাসুরকে বধ করতে দেবী পার্বতী শাকম্ভরী রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মর্ত্যবাসী খরা দুর্ভিক্ষ অনাহারে জর্জরিত হলে দেবী নিজ দেহে শাক, ফল উৎপাদন করে পৃথিবীবাসীদের রক্ষা করেছিলেন। তাই দেবী শাকম্ভরী নামে পরিচিত। *মনসা* ধারাবাহিকে মনসা দেবীর স্তুতি করার মাধ্যমে দেবীর শাকম্ভরী রূপের জাগরণ ঘটান এবং মর্ত্যবাসীকে রক্ষা করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।

শুম্ভ নিশুম্ভ বধ প্রসঙ্গ - মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে ধারাবাহিকে এসেছে শুম্ভ নিশুম্ভ, ধূম্রলোচন, রক্তবীজ, চণ্ডমুণ্ড বধের প্রসঙ্গ।[২২] বামন পুরাণেও চণ্ড মুণ্ড ও শুম্ভ নিশুম্ভ বধের বৃত্তান্ত রয়েছে। ব্রহ্মার বরে শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভাই প্রচণ্ড বলশালী হয়ে উঠলে, ধূম্রলোচন, রক্তবীজ, চণ্ড মুণ্ড সহিত বীর অসুরেরা স্বর্গ আক্রমণ করে এবং দেবতাদের স্বর্গচ্যূত করে। দেবাসুরের যুদ্ধে মনসা মৃত সঞ্জীবনী দিয়ে দেবতাদের শক্তিকে অজেয় করে তুলতে পারে, এই আশঙ্কায় শুক্রাচার্যের নির্দেশে মণিকর্ণিকার ঘাট থেকে মনসাকে অপহরণ করে বন্দী করে অসুরেরা। একই সঙ্গে দেবতাদের প্রধান সহায় মহাদেবকে মানসিকভাবে দুর্বল করার পরিকল্পনাও অসুরদের ছিল। অসুরেরা মনসাকে নানা ভাবে নির্যাতন করে, আগুনে ক্ষত বিক্ষত করে, বিষাক্ত লতাগুল্মে বেষ্টিত করে, অতঃপর শুক্রাচার্য মনসাকে শৈশবে ফিরিয়ে দেয়, যাতে সে কোনও ভাবে দেবতাদের সহায়তা করতে না পারে। প্রবল

পরাক্রমশালী অসুরেরা মর্ত্যে মুনি ঋষিদের যজ্ঞ পণ্ড করে, মন্দির ধ্বংস করে, গণহত্যা চালায়। উপরন্তু নারী শুম্ভনিশুম্ভ তথা অসুরদের বিপদের কারণ হতে পারে এই সাবধানবাণী পেয়ে ত্রিলোকের সব নারীকে বন্দী করার নারকীয় উদ্যোগে মেতে ওঠে। দেবতাদের স্তুতিতে দশভূজার আবির্ভাব হয়।

অসুরমাতা বন্দী ঋষিপত্নী সহ সকল নারীকে হত্যার হুমকি দিলে, মনসা প্রতিবাদ করে এবং বন্দী নারীদের সঙ্গে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অসুরকুলকে দমন করার জন্য মহামায়া মায়া বিস্তার করলে মনসা তাকে সাহায্য করে। শুম্ভ দেবী চণ্ডীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে, দেবী অসুরদের যুদ্ধ প্রস্তাব দেন। শিষ্যদের বিপথ থেকে ফেরাতে গিয়ে তাদের ঔদ্ধত্যে বন্দী হয় শুক্রাচার্য। অসুরদের দুর্বল করতে পাতালে ঋষি যবনের বাড়বাগ্নি নিভিয়ে দেয় মনসা। ত্রিলোকের নারী শক্তির জাগরণের জন্য স্তব করে মনসা। যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী চণ্ডীর দেহ থেকে জাত কালিকা দাবানলে দগ্ধ হলে, স্তবরত মনসাও দগ্ধ হতে থাকে। এখানে চণ্ডী অংশে জাত নারী শক্তির সঙ্গে মনসার অভিন্নতা তুলে ধরা হয়েছে। তার স্তবের ফলেই ব্রহ্মার শক্তিতে ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুর শক্তিতে বৈষ্ণবী, শিবের শক্তি থেকে শিবা, যমের শক্তিতে যামী এবং মনসা অসুর দলনে দেবী মহামায়ার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। নারী শক্তির অবমাননার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা অম্বিকা পৃথিবীর সকল নারীর শক্তিমত্তার প্রতিভূ হয়ে ওঠে। একে একে ধূম্রলোচন, চণ্ড মুণ্ড, রক্ত বীজের মৃত্যু হয়। পশ্চিমের কাল করালী পর্বতমালায় প্রবেশ করে মনসা ধ্যান সাধনার দ্বারা নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে শুম্ভ নিশুম্ভ দলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

দেবী চণ্ডী কর্তৃক উপরোক্ত অসুর দলনের কাহিনি পুরাণ স্বীকৃত। কিন্তু মনসার মধ্যস্থতা তথা শক্তির নানা রূপে জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার কাহিনি ধারাবাহিকের সংযোজন। মনসার জন্ম যে জগত কল্যাণের জন্য, জগতে অবহেলিত নারী শক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য, এই দৃষ্টিকোণ থেকে ধারাবাহিকে অভিনবত্ব এনেছে পুরাণের বিনির্মাণ। অথচ বার বার ত্রিলোকের জন্য এই কল্যাণী ভূমিকা নেওয়া সত্ত্বেও দেবতারা কিন্তু কেবল নাগ পরিচয়ের কারণেই মনসাকে দেবীত্ব দিতে স্বীকৃত হন নি। ফলে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য, এবং প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরেও, মনসার আজীবন পদে পদে যে লড়াই, যুগে যুগে সমাজের

অনগ্রসর শ্রেণিতে প্রতিপালিত যে কোনও অনাথ মেয়ের লড়াইএর সাথে তা এক হয়ে যায়।

শিব কর্তৃক অপস্মার দমন বৃত্তান্ত - পুরাণ অনুসারে অপস্মার একজন বামনাকৃতির অতীব শক্তিশালী দৈত্য, যে আধ্যাত্মিক অজ্ঞতার প্রতীক। যেহেতু পৃথিবীতে জ্ঞান ও অজ্ঞান দুয়েরই সহাবস্থান, তাই অপস্মারের বিনাশ নেই। অপস্মারের মৃত্যু হলে, পৃথিবীতে জ্ঞান অর্জনের জন্য পরিশ্রম, অধ্যাবসায়ের কোনো গুরুত্ব থাকবে না। তাই তার বিনাশ নয় দমন প্রয়োজন। পৃথিবীকে রক্ষা করতে মহাদেব শিব নটরাজ মূর্তি ধারণ করে নাচের মাধ্যমে ডান পায়ের নীচে পিষ্ট করে অপস্মারকে দমন করেছিলেন।

সাম্প্রতিক গবেষণায় শিবের নটরাজ রূপকে পুরাণ এবং জ্ঞানের প্রসারণ ছাড়াও জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। অপস্মার এখানে একটি খরগোসাকৃতি বিশিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ (Constellation Lepus)। আর অগস্ত্য মুনি একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র (Canopus)। অপস্মার যদি সামনে এসে অগস্ত্যকে আড়াল করে, তাহলে প্রলয়ের সম্ভাবনা থাকে। মহাদেব এখানে নটরাজ রূপী কালপুরুষ (Orion), যিনি অপস্মারকে পায়ের নীচে দমন করে অজ্ঞতার কবল থেকে অগস্ত্যরূপ জ্ঞানের উজ্জ্বলতাকে মুক্ত করেন।[২৩]

পুরাণ ও জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত উপরোক্ত গবেষণা কর্মকে একত্রিত করে তার সঙ্গে মনসাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে বর্তমান আলোচিত ধারাবাহিকে। এখানে দেখানো হয়েছে যে গরুড়ের ভক্ত অপস্মার ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত ষড়যন্ত্রে চাঁদ বণিককে হত্যার চেষ্টা করে। মনসার জগত কল্যাণে দৃঢ় মনোভাব প্রত্যক্ষ করে অগস্ত্যমুনি তাকে সাহায্য করতে সম্মত হন এবং তাকে দেবীত্ব লাভের আশীর্বাদ দেন। চাঁদের বাণিজ্য যাত্রার পথের নিরাপত্তার জন্য অগস্ত্য বরুণ দেবকে নির্দেশ দিলে প্রথমে তিনি অসম্মত হন, উপরন্তু অগস্ত্য মুনিকে যার পর নাই অপমান করেন। অপমানিত মুনি ক্রোধে সমুদ্র শোষণ করতে উদ্যত হলেও মনসার শিবস্তবে তুষ্ট হয়ে তিনি উক্ত ভয়াবহ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হন। বরুণদেবের সাহায্যে মনসা বজরায় অপস্মারের বিছানো সর্পজাল ছেদ করতে সক্ষম হন। নানা প্রতিকূলতাকে জয় করে মনসা চাঁদকে চম্পক নগরে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন। অতঃপর চাঁদ বণিককে

জরাজীর্ণ করে অপস্মার। চণ্ডীসৃষ্ট মায়াদ্বীপে এনে মনসা অশ্বিনীকুমারের দেওয়া ওষধি ব্যবহার করে চন্দ্রধর বণিককে সুস্থ করে তোলে। এরপর যোগবলে অপস্মার চাঁদ বণিকের শরীরে অবস্থান করে তাকে অজ্ঞানতার, দম্ভের চূড়ান্ত পর্যায় নিয়ে যায়। পৃথিবীর মুনিঋষিদের অজ্ঞানতার বশ করে সে। তাদের দিয়ে যজ্ঞ করিয়ে অপস্মার যজ্ঞের আগুনে চাঁদকে আহুতি দিয়ে মহাদেবের ওপর নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে ত্রিজগতে অজ্ঞানতার সর্বগ্রাসী প্রভাব তৈরি করতে সচেষ্ট হন। অপস্মারের যজ্ঞের আগুন নীলবর্ণ ধারণ করে। অন্যদিকে শিব চাঁদ বণিকের অজ্ঞানতা দূর করে অপস্মারের কবল থেকে তাকে মুক্ত করে। মুনিবেশী শিবকে বাঘ দ্বারা আক্রমণ করলে, দেবী চণ্ডী প্রত্যক্ষ হয়ে বাঘটিকে প্রতিহত করে। মায়াবদ্ধ মুনি ঋষিদের মুক্ত করেন দেবী। অতঃপর ক্রুদ্ধ শিবের তাণ্ডব ও ডান পায়ের নীচে অপস্মারের দমন ।

এভাবেই অপস্মার দমনের পৌরাণিক কাহিনিতে মনসামঙ্গলের চাঁদ ও মনসাকে যুক্ত করে কাহিনিকে অভিনব রূপে গড়ে তোলা হয়েছে ধারাবাহিকে। এ প্রসঙ্গে চাঁদ মনসা বিবাদে নতুন মোড় এসেছে। চাঁদের দম্ভ ও অজ্ঞানতার কারণ হিসাবে অপস্মারকে ব্যবহার, চাঁদকে রক্ষা করতে মনসার নানাবিধ প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে মনসামঙ্গলের কাহিনিতে সংযোজিত ঘটনা সমূহের কার্যকারণ সম্পর্কের অভিনব বিন্যাস দেখা যায়।

ধারাবাহিকের প্রয়োজনে নতুন গান তৈরি করে কাহিনি সূত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। মনসামঙ্গল ছিল মূলত গেয়, তাই মঙ্গলকাব্যের কাহিনিতে নতুন গানের মিশ্রণ বিশেষ তাৎপর্যবাহী। চণ্ডী সৃষ্ট মায়াকাননে শিবের বীর্যপাত ও পদ্মনাল বেয়ে সেই বীর্য পাতালে প্রবেশ করে মনসার জন্মের কাহিনি মনসামঙ্গলের চেনা (বিজয় গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, মনসার জন্ম পালা)। তবে ধারাবাহিকের প্রয়োজনে এ কাহিনি উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে মঙ্গলকাব্যের পয়ারের আদলে গান রচিত গান -

তার ওপর মদন বাণে বিদ্ধ বেমালুম
মহাদেব মোহগ্রস্ত উড়ে গেল ঘুম
শরীরে অন্য টান, অন্য কলেবর

বিন্দু বিন্দু জ্যোতির পুঞ্জ, আলোর উৎসব
সে আলো ধারণ করে ক্ষুদ্র এক পাখি
অসহ্য আগুন স্রোত প্রাণ পেতে বাকি
আলো ধীরে নেমে এল পদ্মপাতা বেয়ে
পদ্মনাল ছুঁয়ে শেষে গভীর প্রবাহে
জলের অতলে নেমে মাটি স্পর্শ করে
নাগলোকে দেবকন্যা জন্ম নিল ধীরে

এভাবেই দূরদর্শনে প্রদর্শিত ধারাবাহিকের প্রয়োজনে মনসামঙ্গল কেন্দ্রিক কবিতা তথা গানের বিনির্মাণ হয়। এ প্রসঙ্গে *মনসা* ধারাবাহিকে শিব স্তুতির সময় মনসার গাওয়া গানটির উল্লেখ করা যাক -

হে পিতা পরম গুরু দাও সাড়া দাও
আমার এ আঁধার পথে প্রভাত সাজাও
দাও সাড়া দাও দাও সাড়া দাও
দিশাহীন বেরঙিন পৃথিবী আমার
আর কত একা হব তুমি বলে দাও, তুমি বলে দাও
দাও সাড়া দাও দাও বলে দাও
কে বোঝে আমার শোক, নেই পরিচয়
তুমিও ফেরালে শেষ হতে হয়, শেষ হতে হয়
একটু আমার দিকে পারো তো তাকাও
আর কত একা হব তুমি বলে দাও, তুমি বলে দাও
দাও সাড়া দাও ... ...

যে কঠোর তপস্যার প্রেক্ষাপটে এ গান উপস্থাপিত, তা পুরাণের কাহিনী সূত্রে গাঁথা। আবার পিতৃ সান্নিধ্যে আকুল মনসার যে আর্তি তা মনসামঙ্গলের। সেই সঙ্গে পিতামাতার সান্নিধ্য বঞ্চিত বিশ্বের সকল সন্তানের সর্বকালের অন্তর্বেদনার প্রকাশ।

ধারাবাহিকের ব্যাপ্ত প্রেক্ষিতে সীমিত ক্ষেত্রে লোকাচার ও লোকসংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মনসা ধারাবাহিকে দেখানো হয় নাগলোককে রক্ষা করতে মহাদেব নিজ কন্যা মনসাকে দেয় জ্যোতির্ময় নাগমণি। দেবতাদের সঙ্গে নাগেদের যুদ্ধে ঐ মণি ব্যবহার করে মনসা নাগলোককে রক্ষা করে। সাপের কামড়ে আক্রান্তর চিকিৎসায় এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার লোক সমাজে snake stone বা নাগমণির ব্যবহার প্রাচীন। ভারতীয় বহু সিনেমা সিরিয়ালে এর ব্যবহার রয়েছে। ১৯৮৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হরমেশ মালহোত্রা নির্দেশিত প্রযোজিত হিন্দি চলচ্চিত্র *নাগিনায়* (শ্রীদেবী, ঋষি কাপুর, অমরেশ পুরি, প্রেম চোপড়া প্রমুখ অভিনীত, লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল সুরারোপিত) নাগমণিকে মূল বিষয় হিসাবে দেখানো হয়। সিনেমাটি সে বছর বক্স অফিসের জনপ্রিয়তার নিরিখে সেরা দ্বিতীয় স্থানে ছিল। ২০১৮ সালে স্টার জলসা চ্যানেলে মুক্তিপ্রাপ্ত *ভূমিকন্যা* ধারাবাহিকেও নাগমণির অলৌকিক ক্ষমতার প্রসঙ্গ এসেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে সাপের কামড়ের চিকিৎসায় নাগমণির কোনও ভূমিকা নেই। সুতরাং আধুনিক মননের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে *ভূমিকন্যায়* সাপের মণি না হলেও বিশেষ রাসায়নিক প্রভাবযুক্ত পাথরের কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়টিকেই অভিনব কৌশলে *মনসা* ধারাবাহিকে তুলে ধরা হয়েছে। নাগমণি এখানে সাপের কামড়ের প্রতিষেধক হিসাবে সাধারণ মানুষকে বাঁচায় না, নাগজাতি অর্থাৎ বরং পিছিয়ে পড়া, অবলেলিত একটি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায় সহায়ক হয়। লোকসংস্কার এভাবে প্রভাবিত করে মার্জিত সমাজের বিনির্মাণকে আবার আর্থিক সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের ছবিও একই সাথে পরিস্ফুট হয়।

মনসা জরৎকারুর বিবাহে লোকাচার পালিত হতে দেখা যায়। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে[২৪], দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে,[২৫] বিপ্রদাস পিপলাই এর মনসামঙ্গলে,[২৬]মনসার বিবাহে অধিবাস, জল সওয়া, নান্দীমুখ, গায়ে হলুদ, স্ত্রী আচারের উল্লেখ পাই। জগজ্জীবন ঘোষের কাব্যে বিবাহের লোকাচারে সিঁদুরের ওপর নববধূর নাচের কথা উল্লিখিত। এছাড়া বেহুলা লখাই এর বিবাহে অধিবাস দ্রব্য পাঠানো, হর পার্বতীর বিবাহে *লগ্ন গাটি* নামক বর বধূকে বাঁধার প্রথার প্রসঙ্গ এসেছে। ধারাবাহিকে মনসা জরৎকারুর বিবাহে গায়ে হলুদ, বরের স্নানের পর তার স্নানের জল কনের স্নান জন্য পাঠানো, বর ও কনে দুয়েরই পা দিয়ে

তিনটি মাটির খুরি ফাটানো এবং সেই সঙ্গে *আইবুড়ো নাম খণ্ডালাম* তিন বার বলার মত লোকাচার তুলে ধরা হয়েছে।

মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর ও মনসার বিবাদ, কালার্স বাংলার মনসা ধারাবাহিকে ইন্দ্র মনসার বিবাদে পরিণত হয়েছে। মনসামঙ্গলের প্রেক্ষিতে নানা পৌরাণিক কাহিনির মেলবন্ধনে এই ধারাবাহিকে যে কাহিনি পরম্পরা গঠিত হয়েছে, তাতে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার তথা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই প্রধান। ক্ষমতাশালীর নগ্ন অপরাধের পাহাড় ক্ষমতাহীনকে জর্জরিত করলেও মনসার মত অত্যাচারিতেরা চালিয়ে যায় অবিরাম সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে ভাষা পায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের প্রান্তিক মানুষেরা। আবার সেই সংগ্রাম হয়ে ওঠে সমাজে, পরিবারে, সর্বত্র অবহেলিত নারীর। তাই সমগ্র ধারাবাহিকটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে উঠে আসে দেবতা বা মানব নির্বিশেষে নারীশক্তির প্রতিষ্ঠা এবং অনগ্রসর শ্রেণির লড়াই। শিবের থেকে নাগমণি অর্জন এবং দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে নাগদের পক্ষে নাগমণির ব্যবহার করে দেবতাদের পশ্চাদপসরণের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়ে বহু চক্রান্ত ও প্রতিকূলতাকে একে একে জয় করে শেষ পর্যন্ত মনসার দেবীত্ব অর্জন ও যাবতীয় কল্যাণকর্মের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে সেই সংগ্রামের জয়গাঁথা।

স্টার জালসা চ্যানেলে মনসামঙ্গলের কাহিনি অবলম্বনে *বেহুলা* ধারাবাহিকটি ১৫ই মার্চ ২০১০ থেকে ২১এ আগস্ট ২০১১ পর্যন্ত প্রায় দেড় বছর ব্যাপী দেখানো হয়। সৃজিত রায়ের পরিচালনায় শ্রীকান্ত মেহতা ও মহেন্দ্র সোনির প্রযোজনায় এই ধারাবাহিকের শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেন পায়েল দে, রূপাঞ্জনা মিত্র, চান্দ্রেয়ী ঘোষ, জুন মালিয়া, অর্ক মজুমদার, কুশল চক্রবর্তী প্রমুখ। মনসামঙ্গলের মূল কাহিনি এই ধারাবাহিকে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে। ধারাবাহিকের কাহিনির যে অভিনবত্ব দেখা যায়, তা এই রকম-

মূল কাহিনিতে ঊষার নিয়ন্ত্রণ – মনসামঙ্গলের কাহিনির মূল বিষয় চাঁদ মনসার বিবাদ এবং বিবাদের অবসানে মনসার দেবীত্ব অর্জন। মঙ্গলকাব্যে তাই কাহিনির চালিকা শক্তি মনসার কৌশল, প্রয়োজনে ষড়যন্ত্র। কিন্তু স্টার জলসার *বেহুলা* ধারাবাহিকে কাহিনির চালিকা শক্তি বেহুলা লক্ষিন্দরের প্রেম। প্রায় সকল কবির মনসামঙ্গলেই বেহুলা

লক্ষিন্দরের মর্ত্যে জন্মানোর যে প্রেক্ষাপট পাই তা এই রকম - মনসার ষড়যন্ত্র ও ঊষা অনিরুদ্ধের দেবসভায় নৃত্য প্রদর্শনকালে তালভঙ্গ এবং দেবতার অভিশাপে তাদের মানব জনমের বৃত্তান্ত। *বেহুলা* ধারাবাহিকে দেখানো হয় ষষ্ঠ পুত্র দুর্গাবরের মৃত্যুর পরও চাঁদ শিব পূজায় অনড় থেকে সনকার আয়োজিত মনসা পূজার ঘট পদলাঞ্ছিত করে ভেঙে ফেলে। চাঁদকে দুর্বল করতে পুনরায় তাকে পিতৃত্বের স্নেহের বাঁধনে বাঁধতে হবে। তাই মনসার ষড়যন্ত্রে দেবসভায় অনিরুদ্ধ ঊষার প্রতি কামাসক্ত হয়ে নাচের তালে বার বার ভুল করে। প্রকৃত সত্য না জেনেই শিব অনিরুদ্ধকে মর্ত্যে জন্ম নেবার অভিশাপ দিলে, মনসার চক্রান্ত সফল হয়।

বুদ্ধিমতী ঊষা মনসার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হয়। প্রেমিকের সঙ্গে আসন্ন বিরহ মেনে নিতে না পেরে সেও স্বেচ্ছায় মর্ত্যে জন্মানোর পরিকল্পনা নেয়। মনসাকে ডেকে পাঠিয়ে ঊষা নিজেকে মর্ত্যে পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। সে মনসাকে বোঝায় চাঁদের সপ্তম সন্তানেরও যদি সর্প দংশনে মৃত্যু হয়, তাহলে মনসার উদ্দেশ্য সফল হবে না। দেবী হওয়ার উদ্দেশ্যে তার যাবতীয় চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। একমাত্র ঊষাই মানব জন্ম পেলে মনসার ইষ্টসিদ্ধি হবে। সমস্ত দুর্গমতাকে অতিক্রম করে সে চাঁদকে মনসা পূজায় সম্মত করাবে। মনসার কাছে ঊষার প্রস্তাব মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ছিল না। সুতরাং মনসার ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত হয় ঊষার পরিকল্পনা। এমনকি পরিকল্পনা মাফিক মানব জন্মগ্রহণে ঊষা মহাদেবকেও রাজি করায়। মর্ত্যজীবন শোক দুঃখে পরিপূর্ণ জেনেও কেবল প্রেমের জন্যই ঊষা সেই দুঃখকে বরণ করে নেয়। দেবসভার একজন নর্তকী হয়ে সে মনসা এবং মহাদেবকে বিনম্র ভাবে নিজ প্রস্তাবে সম্মত করায়। মনসার প্রস্তাব অনুযায়ী অনিরুদ্ধকে চাঁদের পুত্র হিসেবে মর্ত্যে পাঠানোয় মহাদেব অস্বীকৃত হলে ঊষা তকে বোঝায় যে, অনিরুদ্ধের মর্ত্যে চাঁদের সন্তান হয়ে জন্মালে তা হবে ইষ্টদেবের প্রতি চাঁদ বণিকের একাগ্র ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ। বেহুলার যুক্তির সামনে মহাদেব নিজ সিদ্ধান্ত বদল করেন এবং চাঁদ সনকার সন্তান রূপে অনিরুদ্ধকে মর্ত্যে পাঠাতে সম্মত হন।

প্রেমিকা ঊষা এভাবেই তার বলিষ্ঠ মনন, যুক্তি, বুদ্ধি তথা আন্তরিক প্রেমের বলে বলীয়ান হয়ে ধারাবাহিকে মূল কাহিনির নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। স্বকীয় পরিকল্পনা মত দেবতাদের রাজি

করিয়ে ঊষার বেহুলা রূপে মর্ত্যে জন্মানোর কাহিনি বেহুলার গুরুত্ব বাড়াতে সিরিয়ালের জন্য তৈরি।

মায়া কুটিরে চাঁদ সনকার মিলন – *বেহুলা* ধারাবাহিকে চাঁদের ষষ্ঠ পুত্র দুর্গাবরের মৃত্যুর পর জ্যোতিষী সনকার পুনরায় পুত্র লাভের ললাট লিখন সম্পর্কে অবগত করান। মায়ার বন্ধনে আবার জড়ানো মানেই মনসার ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া, তাই যাতে সন্তান জন্মের কোন সম্ভাবনা না থাকে সেই জন্য চাঁদ সনকার সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক ত্যাগ করে। অপমানিত সনকা দুঃখে অভিমানে স্বামী গৃহ ত্যাগ করে পিতৃগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করে। পথে মনসার চক্রান্তে প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝার কবলে পড়ে সনকা। অনুশোচনায় দগ্ধ চাঁদ স্ত্রীকে নিরাপদে গৃহে ফিরিয়ে আনতে প্রয়াসী হয়। ওদিকে ঝড়ে গাছ ভেঙে সনকার পালকির ওপর পড়লে সে আহত হয়। চাঁদ রক্তাক্ত, অচেতন সনকাকে নিয়ে পৌঁছায় সন্নিকটস্থ একটি কুটিরে। প্রবল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিবেশে সনকাকে পরিচর্যা করতে গিয়ে চাঁদ স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হয়। মনসার সক্রিয়তায় অনিরুদ্ধের মানব জন্মের বীজ উপ্ত হয় সনকার গর্ভে। পরদিন সকালে চাঁদ মনসার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হয়ে আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হয়। মনসার চক্রান্ত বিফল করে দিতে চাঁদ আগত সন্তানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখার সিদ্ধান্ত নেন এবং বাণিজ্য যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। মনসার ষড়যন্ত্রে মায়াকুটিরে চাঁদ মনসার মিলনের প্রসঙ্গ মনসামঙ্গলে মেলে না, এ কাহিনি টেলি-ধারাবাহিকের জন্য তৈরি। স্বামী-স্ত্রীর মান অভিমান, প্রেম, বিরহ, মিলন ধারাবাহিকের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর অন্যতম উপায়স্বরূপ। এ হেন অভিনব সংযোজন একদিকে মূল কাহিনির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে, অন্যদিকে টি.আর.পি বাড়াতেও কার্যকর হয়েছে।

বেদিনী বেশী নেতার দ্বারা সনকার ভাগ্য গণনা – মায়াকুটির থেকে ফেরার সময় গর্ভবতী সনকার সামনে বেদিনীর ছদ্মবেশে নেতা হাজির হয়। সনকাকে সম্মোহিত করে সে তার আসন্ন ভরা সংসারের ছবি দেখায়। ছয় পুত্রের মৃত্যুতে শোকাতরা মা সনকার মনে আবার ভরা সংসারের স্বপ্ন জেগে ওঠে। বেদিনী রূপী নেতা সনকাকে মনসা পূজার নির্দেশ দেয়। আসন্ন সন্তানকে বাঁচাতে সনকা স্বামীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মনসা পূজা করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। বাণিজ্য যাত্রার জন্য প্রস্তুতিতে রত চাঁদ সনকার মনসা পূজার সঙ্কল্প শুনে

ঘোষণা করে তার ভিটেয় মনসার পূজা হলে সেখানে সে আর ফিরবে না। নেতার ছদ্মবেশে সনকাকে পুত্র পৌত্র সহ ভরা সংসারের ছবি দেখিয়ে সংসার জীবনের প্রতি পুনরায় আসক্ত করে তোলার ঘটনাও কোন মনসামঙ্গলের নয়, *বেহুলা* টেলি-ধারাবাহিকের জন্য তৈরি। মনসামঙ্গলের ঘটনাসূত্রে ধারাবাহিকে সুকৌশলে এরূপ অভিনব কাহিনি বুনে দেওয়া হয়েছে।

মনসার অন্তর্দ্বন্দ্ব, মিথ্যাচার – আসন্ন সন্তানের প্রতি যাতে দেবী মনসার কোপ নেমে না আসে, সেই প্রার্থনায় সনকা ছয় পুত্রবধূকে নিয়ে মনসা পূজা করতে বসে। কঠোর সাধনায় দেবী বাধ্য হন তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দর্শন দিতে। কিন্তু লক্ষিন্দরের নিরাপদ জীবনের আশীর্বাদ কী করে দেবেন মনসা, তাহলে তো তার যাবতীয় পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এখানেই ভক্তের আকুতি আর স্বার্থের দ্বন্দ্বে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন মনসা। ইতিপূর্বে স্বয়ং মহাদেব আবির্ভূত হয়ে মনসাকে ভক্তের আকুতি পূরণ করা যে দেবীর একান্ত কর্তব্য, তা বুঝিয়েছিলেন। কারণ যে দেবীত্ব লাভের জন্য মনসার এত লড়াই তা নিতান্তই অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে, যদি মনসা ভক্তকে রক্ষা না করেন। সুতরাং আবারও ছলের আশ্রয় নেন মনসা। সনকার মনকে বিক্ষিপ্ত করতে সে চাঁদ সদাগর সম্পর্কে এক মিথ্যে গল্প শোনায়। গল্প অনুসারে, মহাজ্ঞান থাকলে চাঁদ অনায়াসেই তার মৃত পুত্রদের রক্ষা করতে পারত, চারিত্রিক স্খলনে চাঁদ তা হারায়। একবার কোন দূর দেশে বাণিজ্য করতে গেলে ফুলের সাজে সজ্জিতা হয়ে মনসা তার সামনে এসে দাঁড়ায়। দেবীর অপরূপ দেহ সৌন্দর্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে চাঁদ তার সঙ্গে মিলিত হয়, কৌশলে মহাজ্ঞান মহামন্ত্র হরণ করে মনসা।

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সনকার সামনে দাঁড়িয়ে মনসা এই মিথ্যাচার করেছিল, তা সফল হয় না। স্বামীর চরিত্রস্খলন সম্পর্কে জেনে তার দীর্ঘদিনের বিশ্বাসে চিড় ধরে, হৃদয় ভেঙে যায় ঠিকই, কিন্তু আগত সন্তানের নিরাপত্তার আশীর্বাদ প্রার্থনার কথা সে ভোলেনা। সনকা ও তার ছয় পুত্রবধূর আকুতির সামনে মনসা আবার চরম দ্বন্দ্বে পড়ে। মনসা বার বার তাদের অন্য বর চাইতে অনুরোধ করলে সনকার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ মহামায়া তার বিবাহের আগে অবধি নিরাপত্তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। এই সুযোগে মনসা তাদের আশীর্বাদ দিয়ে কোনক্রমে পালিয়ে যান। মহামায়া সনকার আগত সন্তানকে কোনদিন বিয়ে না দিয়ে

নিরাপদ জীবনের পরিকল্পনা করে। ওদিকে মনসাও লক্ষিন্দরের অনিবার্য বিবাহ ও নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিকল্পনা করে। বিভিন্ন মনসামঙ্গলে মনসা কর্তৃক চাঁদের মহাজ্ঞান হরণের যে কাহিনি পাওয়া যায়, তাকেই *বেহুলা* ধারাবাহিকে সনকার মনে ভ্রান্ত ধারণা তৈরিতে মনসার বলা মিথ্যে গল্পের মোড়কে তুলে ধরা হয়েছে।

একই দিনে ছদ্মবেশী মনসার হাতে বেহুলা লক্ষিন্দরের জন্ম – বেহুলা লক্ষিন্দরই মনসার ভাগ্য জয়ের মাধ্যম। আর জন্ম মুহূর্তেই সেই উদ্দেশ্য স্মরণ করাতে মনসা নিজে ধাত্রী মায়ের ছদ্মবেশে একই দিনে সনকা ও অমলার প্রসব করান। এ কাহিনিও মনসামঙ্গল ব্যতিরেকে *বেহুলা* টেলি-ধারাবাহিকের নিজস্ব সংযোজন।

বাল্যে বেহুলা লক্ষিন্দরের সাক্ষাৎ - বাল্যে লক্ষিন্দর গুরুমহাশয়ের সঙ্গে উজানি নগর দেখতে এলে সেখানে বেহুলার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। যদিও দুষ্টু দুরন্ত বেহুলা ছেলেদের পোশাক প'রে, গোঁফ এঁকে নবাগত লক্ষিন্দরকে ভয় দেখায়, কিন্তু লখাই বাড়ি ফিরে এক অবোধ্য টান অনুভব করে তার প্রতি। বেহুলা ধারাবাহিকে দেখানো এদের বাল্য পরিচয়ের ঘটনা মনসামঙ্গলে নেই, তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ঐতিহ্যবাহী লোকযাত্রায় বাল্যে একই পাঠশালায় পাঠরত বেহুলা লক্ষিন্দরকে দেখা যায়।

জাতিস্মর বেহুলা - *বেহুলা* ধারাবাহিকে দেখানো হয় ছোট থেকেই নদীর প্রতি এক অচ্ছেদ্য টানে সে বার বার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পরবর্তীকালে তার বিড়ম্বিত ভাগ্য জয়ের সাথী জল যেন জন্ম থেকেই তাকে নিজের কাছে ডাকে। আর জলের তীরেই পূর্ব জন্মের শিল্পী সত্তা তার মধ্যে জেগে ওঠে। মনসার সহায়তায় সে নদীতীরে পায় ঊষার ঘুঙুর। আর সেই ঘুঙুর পরে আট বছরের বেহুলা আত্মবিস্মৃত হয়ে ঊষার মতই নৃত্যে মেতে ওঠে। বেহুলা নৃত্যে পটীয়সী। নাচই দেবসভায় তার ভাগ্য জয়ে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু বালিকা বয়সে পূর্ব জন্মের স্মৃতিতে আত্মবিস্মৃত হয়ে নাচে বিভোর হওয়ার গল্প ধারাবাহিকের সংযোজন।

মনসা পূজা করায় বণিক কুল থেকে সায় বণিকের নির্বাসন - বেহুলার মত তেজস্বী কন্যাকে গর্ভে ধারণ করে অমলার সঙ্গে নানাবিধ অলৌকিক ঘটনা ঘটতে থাকে, বিশেষত

সদ্যজাতা কন্যার মাথায় সাপে ফণা ধরলে, সায় বেনের মা সহ পরিবারের সকলের বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে এই কন্যা সন্তানের ওপর মা মনসার বিশেষ আশীর্বাদ আছে। তাই সায় ধুম ধাম করে নিজ গৃহে মনসা পূজার আয়োজন করে। কিন্তু এ ঘটনায় বণিক কুলের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দ্যাখা যায়। কারণ বণিক চূড়ামণি চাঁদ মনসার তীব্র বিদ্বেষী। তার অবর্তমানে তার অপছন্দের কাজ করে কেউ চাঁদের অপ্রিয় হতে রাজি নয়। সমস্ত বণিক সমাজ তাই সায়বেনের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে তার পরিবারকে নির্বাসিত করে। এ কাহিনিও মনসামঙ্গলে মেলে না, ধারাবাহিকের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ক্ষমতাশালীর কাছে অপ্রিয় হবার ভয়ে সমাজের তোষামুদে মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করেছে বণিক সমাজ। সেই সঙ্গে সায় বণিকের নির্বাসন, মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ তথা সামাজিক অপশাসনের চূড়ান্ত নিদর্শন।

বেহুলার বিয়ে ভাঙতে মনসার চক্রান্ত - আট বছরের সায় বেনে বেহুলার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হলে, মনসা দুশ্চিন্তায় পড়ে। লক্ষিন্দর ছাড়া অন্য কোথাও বিবাহ হলে মনসার উদ্দেশ্য সফল হবেনা। আর তাই যে কোন প্রকারে বিবাহ বন্ধ করতে হবে। ফলে মনসার চক্রান্তে পাত্র পক্ষের সামনে বেহুলার চরিত্রহীনতা প্রমাণিত হয়। ১৯৬৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জাহির রায়হানের পরিচালিত *বেহুলা* সিনেমায়ও মনসার ষড়যন্ত্রে বেহুলার চরিত্রহীনতা প্রমাণিত হয়েছিল। যদিও ভিন্ন কারণে সেখানে লক্ষিন্দরের সঙ্গে বিয়ে ভাঙাই ছিল মনসার উদ্দেশ্য।

সামাজিক কুসংস্কারের প্রতিফলন – *বেহুলা* ধারাবাহিকে চাঁদ-সনকার ছয় বিধবা পুত্রবধূর জীবনের যে অনুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা কুসংস্কারগ্রস্থ বাঙালি হিন্দু সমাজের নির্মমতার প্রতিফলন। চাঁদের ষষ্ঠ পুত্র দুর্গাবরের স্ত্রী সুধা স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে যখন উন্মাদপ্রায়, তখন কেটে নেওয়া হচ্ছে তার লম্বা চুল, গায়ে উঠছে সাদা থান। সদ্য যুবতী এই ছটি বিধবার খাবারে বাদ পড়ছে আমিষ। এদের সামনেই সনকা পরছে রঙিন শাড়ি, প্রচুর গয়না, তার খাবারের থালায় থাকবেই মাছের বড় টুকরো। এই নির্মমতা যেমন সনকাকে ব্যাথিত করছে, তেমনি শাশুড়ি মায়ের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে সাময়িকভাবে ঈর্ষান্বিত হচ্ছে তার পুত্রবধূরা। বিধবার পালনীয় আচারের নামে যে বিধি বিধান সমাজে প্রচলিত তা এক

প্রকার অত্যাচারের নামান্তর। মধ্যযুগের সমাজের নারীদের দুর্দশার চিত্র ধরা আছে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের পাতায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে চাঁদের পুত্রবধূদের যন্ত্রণার কথা কোন মনসামঙ্গলেই উঠে আসেনি। সেদিক থেকে *বেহুলায়* এই সংযোজন, সময়ের সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। দুঃখের কথা, সময়ের সঙ্গে অনেকাংশে এই কদর্যতা কমে এলেও গ্রামে শহরে বিধবার জন্য নানা বিধি নিষেধের চল আজও রয়ে গেছে। আর তারই বাস্তবনিষ্ঠ প্রতিফলন ঘটেছে ছোট পর্দায়।

মনসামঙ্গলের কাহিনি নিয়ে দেড় বছর ব্যাপী যে সিরিয়াল চলে তা টানার জন্য, কাহিনিকে নানা ভাবে সম্প্রসারিত করা এক প্রকার অনিবার্য হয়ে পড়ে। তার ওপর দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য উপস্থাপনায় অভিনবত্ব আনা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। আর চেনা গল্পকে ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশন করার প্রয়াসও দেখা যায় প্রথম সারির চ্যানেলে। স্টার জলসার *বেহুলা* এই সব কারণেই মনসামঙ্গলের চেনা গল্পকে নানা অভিনবত্বে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু পরিবর্তিত বা সিরিয়ালের জন্য লেখা সম্পূর্ণ মৌলিক ঘটনাংশ কোথাও বিকৃত মনে হয়নি, বরং মূল কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখায় সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। সেই সঙ্গে উন্নত গ্রাফিক্স এর ব্যবহার কলা কুশলীদের দক্ষ উপস্থাপনা সব মিলিয়ে *বেহুলা* ধারাবাহিককে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল। জনপ্রিয়তার কারণেই ধারাবাহিকটি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় আলাদা আলাদা চ্যানেলে দেখানো হয়। অসমীয়া ভাষায় ফোকাস হিফি চ্যানেলে ২০১৪ - ২০১৫ সালে *সতী বেউলা* নামে, হিন্দি ভাষায় সাহারা ওয়ান চ্যানেলে ১৪ই ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে *বেহুলা* নামে, স্টার বিজয় চ্যানেলে তামিল ভাষায় *মাঙ্গাইন সাবাথাম* নামে ২০১৬ সালের ২রা অক্টোবর থেকে দেখানো হয়।

স্টার জলসা চ্যানেলে *ভূমিকন্যা* ধারাবাহিকটি ২০১৮ সালের ৩০ এ জুলাই থেকে ২০১৯ সালের ২০ জানুয়ারী মোট ১৬২ টি পর্বে পরিবেশিত হয়। দূরদর্শনে ধারাবাহিকটির উপস্থাপনে যারা মুখ্য ভূমিকা নেন তাদের পরিচয় এইরূপ। নির্মাণ – অরিন্দম শীল, পরিচালনা – অরিন্দম দে, চিত্রনাট্য – কৌশিক ভট্টাচার্য, সংলাপ – পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, মূল কাহিনী – রূপক সাহা, সঙ্গীত – বিক্রম ঘোষ, চিত্রগ্রহণ – দীপ্যমান ভট্টাচার্য, সম্পাদনা – যীশু নাগ ও স্বপন বসু, পোশাক – অভিষেক রায়, কার্যনির্বাহী প্রযোজনা – নীলাঞ্জন,

শুভজিৎ (স্টার জলসা), প্রযোজনা – নাথিং বিয়ন্ড সিনেমা, অভিনয় – সোহিনী সরকার, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, কৌশিক সেন, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, রূপাঞ্জনা মিত্র, সুদীপ্তা চক্রবর্তী প্রমুখ। রূপক সাহার *তরিতা পুরাণ* উপন্যাসটি অবলম্বনে দূরদর্শনের জন্য ভূমিকন্যা ধারাবাহিকটির নির্মাণ হয়। একুশ শতকে সাহিত্যে ও অভিনয় শিল্পে মনসা কাহিনীর এরূপ ক্রমিক বিনির্মাণ নিঃসন্দেহে অভিনব।

মধ্যযুগে বিভিন্ন কবির হাতে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের মূল আখ্যান অবলম্বনে ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয় রূপক সাহার উপন্যাস *তরিতা পুরাণ* । উপন্যাসের ভূমিকা অংশে ঔপন্যাসিক লেখেন - *নারী শক্তির এই যুগে মনসা কাহিনীর নতুন বিশ্লেষণ প্রয়োজন*[২৭]। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যেই দেবী মনসার অতি ক্রূর রূপেরই চিত্রায়ন। ছলে বলে কৌশলে তিনি আপন স্বার্থ চরিতার্থ করেন। আবার লক্ষ্যনীয় যে মনসা কাহিনীর সাহিত্যিক বিনির্মাণের ধারায় চাঁদের পৌরুষ আর বেহুলার সতীত্বেরই জয় জয়কার। মনসার অস্তিত্বের সঙ্কট, পিতা, সৎ-মা, স্বামী, সকলের থেকে পাওয়া নিরন্তর অবহেলা, নিপীড়ন, নির্যাতনের দিকটি আশ্চর্যজনক ভাবে উপেক্ষিত। এ ক্ষেত্রে মাইলস্টোন রূপ শম্ভু মিত্রের *চাঁদ বণিকের পালায়* মনসা কেবল অন্ধকারের প্রতীক রূপেই রয়ে গেলেন। কালিদাস রায়ের বিখ্যাত কবিতা *চাঁদ সদাগরে* দেববিরোধী চন্দ্রধরের পৌরুষ বন্দনার পাশে মনসা কেবল ভক্তের কৃপা নির্ভর দেবী রূপে চিত্রিত হলেন। এই ধারায় রূপক সাহার *তরিতা পুরাণ* তথা অরিন্দম শীলের নির্মিত স্টার জলসার *ভূমিকন্যা* মনসাকথার অন্যতম ব্যাতিক্রমী বিনির্মাণ।

মনসামঙ্গল থেকে তরিতাপুরাণ - একুশ শতকে লেখা *তরিতা পুরাণ* উপন্যাসে মনসাকে দেবী নয় মানবী রূপে তুলে ধরেছেন রূপক সাহা। কিন্তু মানবী মনসা যিনি উপন্যাসে তরিতা, তার কৃতিত্ব, গৌরব, উদারতা কোন অংশে দেবী মনসা অপেক্ষা কম নয়। বরং মনসার দৈবী মহিমাকে ছাপিয়ে গেছে তরিতার মানবমহিমা। উপন্যাসে মনসামঙ্গল কাব্য-কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে একুশ শতকের প্রেক্ষাপটে। মঙ্গলকাব্যের দেব দেবী চরিত্রের হয়েছে মানবায়ণ। মনসামঙ্গলের দেবাদিদেব শিব, উপন্যাসে প্রবল ক্ষমতাশালী মহেশ্বরজি, ক্যানিং এর সাগর দ্বীপে তার আশ্রম হলেও দিল্লির মন্ত্রীমহলেও যার অত্যন্ত প্রভাব।

মহেশ্বরজির পত্নী উমা সতীনবিদ্বেষী নারী রূপেই উপন্যাসে চিত্রিতা। মঙ্গলকাব্যের চন্দ্রধর বণিক উপন্যাসে কয়েকশো কোটি টাকার মালিক ব্যাবসায়ী চন্দ্রভানু। মধ্যযুগের চাঁদ বণিকের সাত ছেলে হলেও যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চন্দ্রভানুর দুই ছেলে জয়গোপাল ও জয়ব্রত। এ যুগের জয়ব্রত ও তার স্ত্রী স্বাধীন ব্যাবসায়ী অহল্যাই মঙ্গলকাব্যের লক্ষ্মীন্দর আর বেহুলা। এছাড়া মনসার স্বামী জরৎকারু, উপন্যাসে জরৎকারু মিশ্র, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক। মঙ্গলকাব্যের মতই নেত্রা তরিতার সব কাজের পরামর্শদাত্রী, পথ প্রদর্শক। উপন্যাসের প্রয়োজনে এসেছে অঙ্কুশ ঊষসী কেন্দ্রিক উপকাহিনী যার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কোন যোগ নেই। এ অংশ রূপক সাহার মৌলিক সংযোজন। উপন্যাসে তরিতা অনাথাশ্রমে প্রতিপালিতা একটি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে, যে দেবী মনসার আশীর্বাদধন্যা আবার এ যুগের মনসার প্রতিনিধি। জন্মেই যে অবহেলায় সে পরিত্যক্ত হয়, ষোল বছর বয়সে প্রভাবশালী পিতার পরিচয় পাওয়ার পর বিমাতার যে নির্মম নির্যাতন সে সহ্য করতে বাধ্য হয়, উদ্ধত স্বামীর যে নিদারুণ অপমান তাকে সর্বস্বান্ত করে, সেই সকল বিপর্যয়ের সঙ্গে লড়াই করতে উচ্চ শিক্ষাকে হাতিয়ার রূপে গড়ে তোলে সে। প্রথমে জুলজি তার পর অফিওলজি নিয়ে পড়াশুনা করে সর্পবিশারদ হিসাবে সাফল্য অর্জন, অতঃপর অ্যান্টি ভেনম সিরাম তৈরি শিখতে বিদেশে পাড়ি দেওয়া। আমেরিকার মায়ামির সার্পেন্টেরিয়ামে সর্বোচ্চ দিন কাটিয়ে *স্নেক লেডি* নামে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে তার খ্যাতি। টিভি চ্যানেল থেকে উপার্জিত অর্থ সে জনসেবায় উৎসর্গ করে। সুন্দরবনের সাধারণ মানুষকে সাপের কামড়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে সাপের বিষরোধী অ্যান্টি ভেনম সিরাম তৈরির ল্যাবরেটরি গড়বার কাজে আত্মনিয়োগ করে। গ্রামের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মেয়েদের এই ল্যাবরেটরিতে কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলে, পুরুষ সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শেখায়। চন্দ্রভানুর সঙ্গে তার বিবাদের মূল কারণও তার উগ্র পৌরুষ যা নারীকে কেবল তুচ্ছ ভোগ্যপণ্য বলে মনে করে। দেবী মনসার আশীর্বাদধন্য তরিতা মনসা পূজা ও মনসা মেলা প্রচার, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মনসা-পালাগানের আসরের আয়োজন ইত্যাদির মাধ্যমে একদিকে ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে নিজ শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে ও সঙ্ঘবদ্ধ করে, অন্যদিকে চন্দ্রভানুর বিরুদ্ধে নিজ দলতন্ত্রকে মজবুত করে গড়ে তোলেন। অলৌকিক ভাবে সাতডিঙা ডোবানোর জায়গায়

কৌশলে নানাভাবে চন্দ্রভানুকে জব্দ করে তরিতা। মনসার নিজ অধিকারের লড়াইকে ছাপিয়ে তরিতা সার্বিকভাবে নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়াই চালিয়ে যায়। যে কোন অবস্থার মেয়ের সামনে তরিতা রাখে উত্তরণের এক উজ্জ্বল সমীকরণ। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বিদেশে বিলাস বহুল আরামের জীবনকে অনায়াসে ছেড়ে আসে সে। বিশ্বমানবতা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের দুর্দশা দূরীকরণে আত্মোৎসর্গ করার মাধ্যমে অতিক্রম করে মঙ্গলকাব্যের দেবীর সীমাবদ্ধতাকে।

তরিতাপুরাণ থেকে *ভূমিকন্যা* - *ভূমিকন্যা* নামটিই দেবী মনসা থেকে নারী তরিতার মানবায়ণের ব্যাঞ্জনাবাহী। যদিও এই মানবায়ণ হয়েছিল উপন্যাসের পাতায়। ঔপন্যাসিক তার নামকরণকে মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণের সমধর্মী করেছেন মধ্যযুগের নারীর অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে প্রতিনিধিত্বকারী মনসা-কাহিনীর নতুন বিশ্লেষণের জন্য। *তরিতা পুরাণ* উপন্যাসে মুখ্যমন্ত্রী অভিজিৎ চ্যাটার্জী তরিতার মধ্যে ভাল রাজনীতিবিদ হওয়ার সম্ভাবনা প্রতক্ষ করে তাকে *ডটার অফ দ্য সয়েল* বা *ভূমিকন্যা* বলে অভিহিত করেন। টেলি-ধারাবাহিকের তরিতাও নিজের মেধা, মনন, একাগ্রতার সমন্বয়ে গড়েছে আত্মপরিচয়, সমূহ সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকে উপেক্ষা করে প্রত্যন্ত গ্রামে ফিরে মাটির মানুষগুলোর কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ তার অদম্য সাহস, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বার বার সুন্দরগড়বাসীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার দৃষ্টান্তে তাকে দেবী বলে জয়ধ্বনি করলে, তরিতা এই সম্বোধনের বিরোধিতা করে নিজেকে ভূমিকন্যা বলে পরিচয় দিয়েছে। একদিকে ধারাবাহিকটিতে উপন্যাসের বহু অংশের পরিবর্তন, সংযোজন বিয়োজন করা হয়েছে, আবার মনসামঙ্গল কাব্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কও তৈরি হয়েছে কোথাও কোথাও। মনসামঙ্গলকাব্য, মনসার পাঁচালীসহ বিভিন্ন সূত্র থেকে নেওয়া মনসা স্তুতি আবহ সঙ্গীত রূপে ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় প্রতিটি পর্বে। দূরদর্শনে উপন্যাসের কাহিনীর কিছু রদ বদল হয়। *ভূমিকন্যায়* বদলে গেছে *তরিতা পুরাণ* এর স্থানিক প্রেক্ষাপটের নাম, যদিও স্থান বদলায়নি। শ্বাপদ সঙ্কুল ম্যানগ্রোভ অরণ্যপূর্ণ সুন্দরবন সিরিয়ালে হয়েছে সুন্দরগড়।

টেলি ধারাবাহিকে দুরাচারী চাঁদ – চাঁদ বণিকের প্রতিনিধি এলাকার ত্রাস চন্দ্রভানু কেবল নারী তথা নারী দেবতায় বিদ্বেষী অহংকারী পুরুষ নয়, নারী পাচার, মাদক ব্যাবসা, চোরা

চালান, ইত্যাদি কুকর্মের বেতাজ বাদশা। তার জীবনের মূল মন্ত্র 'একম এবম অদ্বিতীয়ম'। অনাথ আশ্রম সহ সুন্দরগড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস করে বিদেশী কায়দায় একটি প্রমোদনগরী বানাতে চায় সে। ধারাবাহিকের শুরুতেই চাঁদের কুকর্মের নমুনা মেলে। ব্যাবসার চুক্তি পাকা করার জন্য জিম সাহেবের খাতিরদারি জোরালো হওয়া চাই। সুতরাং নদীবক্ষে বিলাস বহুল লঞ্চে মদ আর সাহেবের চাহিদা অনুযায়ী একের পর এক নারীর জোগান দিতে থাকে চাঁদ। প্রয়োজনে নিকটস্থ অনাথ আশ্রম থেকে মেয়েদের জোর করে তুলে আনে চাঁদের পাঠানো দস্যু। এ বিবরণ উপন্যাস থেকে নেওয়া হয় নি। আবার মূলের মঙ্গলকাব্যগুলিতেও চন্দ্রধর বণিক এতটা দুর্নীতি পরায়ণ ছিল না। ধারাবাহিকে চাঁদ মৎসকন্যার গুজব রটিয়ে সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে একটি পুকুরের জলের তলায় বাক্সবোঝাই ড্রাগ চোরাচালানের আড়ত বানিয়ে ফেলে। বাঘের ডাকের নকল আওয়াজে গ্রামবাসীকে ভুলিয়ে রাতের অন্ধকারে যুবতী মেয়েদের পাচার করে এবং বাঘের প্রকোপের ভ্রান্ত ধারণা ছড়ায় গ্রামের সাধারণ মানুষগুলোর মধ্যে। গোপন ডেরায় সে বেআইনি ভাবে বাঘ পোষে, এবং নিজ কুকর্মের প্রমাণ লোপাটের জন্য প্রয়োজনে নিজের লোকেদেরই নৃশংস ভাবে সেই ক্ষুধার্ত বাঘের খাদ্যে পরিণত করে। স্বার্থসিদ্ধি হয়ে গেলে নিজের কর্মচারীকে খুন করতে বা হাসি মুখে ধারালো অস্ত্রে জিভ কেটে দিতে দুবার ভাবে না। এমনকি বাঘের চামড়ায় কালো রং করে ছাগলের চামড়া বলে চালান করতে গিয়ে ধরা পড়ায় বিনা অপরাধে জয়গোপাল গ্রেপ্তার হলে নিজের কুকর্মসকল ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় নিজের সন্তানকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতেও চন্দ্রভানু পিছপা হয় না। গ্রামের মেয়েদের বাধ্য করে একেবারে জলের দরে মীন বিক্রি করতে, পরিশ্রমের ন্যায্য পাওনা তথা দুবেলার গ্রাসাচ্ছাদন থেকে অসহায় গ্রামবাসীকে বঞ্চিত করে নিজে চড়া মুনাফা লোটে চন্দ্রভানু। এইসকল দুষ্কর্ম চলে লোকচক্ষুর আড়ালে, সুন্দরগড়বাসীর সামনে সে নিজেকে পরম হিতৈষী বলে প্রমাণ করতে সর্বদা তৎপর। সমাজে নিজের জনদরদী ভাবমূর্তি বজায় রাখতেই বনমহোৎসবের অনুষ্ঠানে বনদপ্তরকে পাঁচ লাখ টাকা দান করে সে। চরিত্রটিকে যুগোপযোগী একমুখী করতে, বিরুদ্ধ শক্তি তরিতাকে আলোকউজ্জ্বল করতে সর্বোপরি দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে *ভূমিকন্যা* ধারাবাহিকের এ হেন সংযোজনে চাঁদকে চরম স্বার্থপর হিংস্র চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মনসামঙ্গলের চন্দ্রধর বণিক, নারী দেবতায় বিদ্বেষী এক অহংকারী পুরুষ। নিজের স্ত্রীর পূজাঘট পদলাঞ্ছিত করে ভেঙে সে নিজের বিকৃত পৌরুষের পরিচয় দেয়। সর্বস্বান্ত অবস্থায়ও সে নটীর কাছে যাবার ইচ্ছা পোষণ করে।[২৮] আবার ছদ্মবেশী মনসার রূপে মুগ্ধ হয়ে মহাজ্ঞান হারায়, যা তার চারিত্রিক স্খলনকেই তুলে ধরে। তবে পুরুষতার উগ্র অহংকার, চারিত্রিক স্খলনের পরিচয় থাকলেও মনসামঙ্গলে কোথাও তাকে অসদুপায় অবলম্বনকারী, দরিদ্র্য শ্রেণির নিপীড়ক, স্বার্থপর, মুনাফা লোভী হিসাবে গড়ে তোলা হয় নি। বরং জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে চাঁদকে দানশীল, পুণ্যবান চরিত্র রূপে গড়ে তোলা হয়েছে।[২৯]

মনসামঙ্গলের মনসা থেকে ভূমিকন্যার তরিতা - মনসামঙ্গলের মূল আখ্যান অনুযায়ী মনসা শিবের ঔরসজাত কন্যা, সে অযোনিসম্ভবা। দেবকন্যা হয়েও মনসার শৈশবে পাতালে প্রতিপালিত হওয়া, যৌবনে পিতৃ পরিচয় লাভ করে বিমাতার নিপীড়ন, বিবাহের প্রথম রাত্রি পোহাতেই স্বামীর পরিত্যাগ – অস্তিত্বের সঙ্কটে বিপর্যস্ত অবস্থায় নেত্রার পরামর্শে মর্তে পূজা লাভের জন্য সচেষ্ট হওয়ার কাহিনী প্রচলিত। ঘটনাক্রমে চাঁদের সামনে অনাবৃত হয় দেবী মনসার শরীর। ক্রুদ্ধ মনসার কোপে পড়ে তার মর্তে জন্ম হয়। সেই থেকেই চাঁদ মনসার বিবাদের সূত্রপাত। শৈব চাঁদ সদাগর মনসাকে দেবী হিসেবে মানতে নারাজ। ফলে একে একে চাঁদের সপ্তডিঙা নিমজ্জন, লক্ষ্মীন্দর সহ সাত পুত্রের জীবন হরণ এবং বেহুলার মধ্যস্ততায় চাঁদের বাম হাতে মনসা পূজা ও বিবাদের অবসান। *তরিতা পুরাণ* উপন্যাসে তরিতা প্রবল প্রতিপত্তিবান মহেশ্বরজির কন্যা হয়েও জন্মানো মাত্র সাগর দ্বীপের জঙ্গলে পরিত্যক্তা । ক্যানিং এর অনাথাশ্রমে কাটে তার শৈশব। বড় হয়ে আশ্রমে মুমূর্ষু সতী মায়ের মুখে সে পিতৃপরিচয় জানতে পারে। কিন্তু সাগর দ্বীপে তার পিতার আশ্রমে বিমাতার নিপীড়ন, লাঞ্ছনায় জর্জরিত হতে হয়, হারায় একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি। যে কোন প্রকারে ঘাড় থেকে নামানোর জন্য উগ্র বদমেজাজি এক অধ্যাপকের সঙ্গে তাকে বিয়ে দেওয়া হয়। দেবী মনসার মত তরিতার বিয়ের মেয়াদও একরাতের বেশি হয় না। এ অবধি মনসামঙ্গলের চেনা ছকেই কাহিনী এগোয়।

টেলি-ধারাবাহিকে উপন্যাসের কাহিনীর কিছু রদ বদল হয়। ধারাবাহিকে দেখানো হয় এক ঝঞ্ঝার রাতে বছর দুই এর এক শিশুকন্যা তার বাবা মহেশ্বরজির বাড়ির সামনে হাজির হয়, পেছনে শায়িত তার মায়ের মৃতদেহ। মহেশ্বরজির স্ত্রী উমা তার গলার ত্রিশূল আকৃতির লকেট দেখে তার পিতৃ পরিচয় আন্দাজ করতে পেরে তাকে সেই মুহূর্তে সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। আশ্রমে সতী মায়ের তত্ত্বাবধানে তরিতার বড় হয়ে ওঠা ও জরৎকারুর সঙ্গে বিয়ের অংশটি ধারাবাহিকে বাদ দেওয়া হয়েছ।

মঙ্গলকাব্যের দেবী মনসা একুশ শতকের উপন্যসে ও দূরদর্শনের ধারাবাহিকে সর্পবিশারদ। *তরিতা পুরাণে*র তরিতা আমেরিকার একটি টি.ভি. চ্যানেলের হয়ে কাজ করে মায়ামির সারপেন্টেরিয়ামে বিষধর সাপেদের সঙ্গে একশো দশ দিন কাটিয়ে সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়ে এবং এক মিলিয়ন ডলার উপার্জন করে। ধারাবাহিকে এ ঘটনা দেখানো হয়নি। ধারাবাহিকে আমরা দেখি ক্যানিং এর যে অনাথ আশ্রমে তরিতা শৈশবে আশ্রয় পেয়েছিল, সেখানকার মনসামন্দির থেকে পাঁচশো বছরের পুরনো হারিয়ে যাওয়া আশ্চর্য মণি বা স্নেক স্টোন পুনরুদ্ধারের জন্য সে কম্বোডিয়া যায়। সে মনে করে সম্ভবত পাথরটির কিছু রাসায়নিক গুনাগুণ ছিল যা সাপে কামড়ের বিষের ওপর প্রভাব ফেলত। সেখানে সাপ ভর্তি একটি গর্ত থেকে দুটি শিশুকে উদ্ধার করে সে। উপস্থিত সাংবাদিকরা তাকে দূরদর্শনের জন্য সাপ নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশ নিতে চান কিনা জানতে চাইলে তরিতা স্পষ্টত জানায় যে জীব জন্তুদের ব্যাবহার করে টাকা রোজগার তিনি পছন্দ করেন না। এই প্রসঙ্গে উপন্যাস থেকে ধারাবাহিকে তরিতার মানসিকতার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। জীবজগতের প্রতি সহৃদয়তার জন্য বিশাল অর্থ উপার্জনের হাতছানি উপেক্ষা করে সে উপন্যাসের তরিতার চেয়ে ধারাবাহিকে অনেক বেশি মানবিক হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের তরিতা সাপের কামড়ের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য এ. ভি. এস. তৈরির ল্যাবরেটরি তৈরিতে আত্মনিয়োগ করে। মনসা পূজা ও মেলা প্রচার এবং চাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই চলে সমান্তরাল ভাবে। দূরদর্শনের তরিতা চন্দ্রভানুর অত্যাচারের হাত থেকে সুন্দরগড় বাসীকে ও বন্যপ্রাণীদের রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করে। মঙ্গলকাব্যে চাঁদ মনসার সংঘাতের কারণ যেন তেন প্রকারে দেবীর আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ। উপন্যাসে তরিতা

লড়েছে চাঁদের নারী বিদ্বেষী উগ্র পুরুষকারের বিরুদ্ধে। ব্যাক্তিগত সংঘাতই এখানে মুখ্য। কারণ পিচখালি নদীতে স্নানের সময় মঙ্গল কাব্যের দেবীর মত তারও অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গ দেখেছিল চন্দ্রভানু। এই অপমানবোধ থেকেই শুরু হয় চন্দ্র ভানুর সাথে তরিতার বিরোধিতা। তরিতাকে অপহরনের জন্য লোক পাঠালে সে বিরোধের আগুন আরও তীব্র ভাবে জ্বলে ওঠে। অতঃপর কৌশলে চাঁদের নানা ব্যাবসার ক্ষতি করতে থাকে তরিতা। সেই সঙ্গে চলে ব্যাক্তিগত আক্রমণ। চাঁদের নাতিকে সাপে কামড়ানো, ছোট ছেলে জয়ব্রতের ডাকাতের হাতে আটক হওয়ার পেছনে ছিল তরিতার সক্রিয় ভূমিকা। একের পর এক ক্ষতির ধাক্কায় নাকাল চাঁদ অসুস্থ হয়ে পড়ে। মঙ্গলকাব্যের সর্বহারা চাঁদের সঙ্গে এখানে উপন্যাসের চন্দ্রভানুর মিল লক্ষ্যনীয়।

কিন্তু দূরদর্শনের তরিতার সঙ্গে চন্দ্রভানুর সঙ্ঘাতের প্রধান কারণ সুন্দরগড়ে চন্দ্রভানুর অনাচার, সামাজিক নিষ্পেষণ, শোসনের প্রেক্ষাপট। গ্রামের মানুষের অত্যন্ত পরিশ্রমে সংগ্রহ করার মীন প্রায় বিনা মূল্যে আদায় করত চাঁদ। তরিতা কৌশলে চাঁদের জায়গায় অন্য ব্যাবসায়ী এনে তাদের ন্যায্য দাম পাওয়ার পথ প্রস্তুত করে। বাঘের ডাকের নকল করে গ্রামের মানুষকে ভুল বুঝিয়ে মেয়েদের তুলে নিয়ে যেত চাঁদের লোক। রমরমিয়ে চলত নারী পাচারের ব্যাবসা। তরিতা এই কূট কৌশলের মিথ্যে আবরণ ছিন্ন করে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত করে সকলকে। নারীদের আত্মশক্তিতে বলিয়ান করে তুলতে অসম জেনেও প্রশিক্ষণহীন মেয়েদের নিয়েই কবাডির দল তৈরি করে। নানা ভাবে তাদের ট্রেনিং করিয়ে মাঠে নামায়। নিজ অস্তিত্বের সঙ্কটের আবর্তে মনসামঙ্গল কাব্যের দেবীর যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ ছিল সীমাবদ্ধ । আর নারী তথা সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কটের বিরুদ্ধে, তাদের সঙ্গে ঘটতে থাকা নিরন্তর অপশাসনের বিরুদ্ধে তরিতার লড়াই তার সাথে মঙ্গলকাব্যের মনসার চরিত্রের পার্থক্য সূচিত করে।

মনসামঙ্গল থেকে এগিয়ে এসে তরিতার প্রেম, বিবাহ প্রসঙ্গ - *তরিতাপুরাণে* অঙ্কুশ ঊষসীর যে উপকাহিনী সংযোজন করেছেন রূপকসাহা, ভূমিকন্যায় তা পরিবর্তিত হয়। ধারাবাহিকে তরিতার স্বামী জরৎকারু প্রসঙ্গ নেই, উপন্যাসের সর্পবিশারদ অঙ্কুশমিত্র এখানে ফরেস্ট রেঞ্জার। সুন্দরগড়বাসীর কল্যাণের জন্য তরিতার সব লড়াই এর পাশে থেকেছে সে প্রকৃত

বন্ধুর মত। টি. আর. পি.র খাতিরেই হোক, অথবা তরিতাকে আরও বেশি মানবিক করার জন্যই হোক, ভূমিকন্যায় অঙ্কুশ তরিতার প্রেম ও বিয়ের ঘটনা দেখানো হয়েছে। মনসামঙ্গলকাব্যে ও *তরিতাপুরাণ* উপন্যাসে স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত ছিল মনসা। দেবী হোক বা নারী এই অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা সর্বত্র সমান। বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণে* বা কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে জরৎকারু মনসাকে পরিত্যাগ করলে মনসার কাতর আর্তিতে রয়েছে স্বামী যেন তাকে ত্যাগ না করেন, সে অনুরোধসেই সঙ্গে আসন্ন জীবন একা কী করে কাটাবেন সে আশঙ্কায় বিলাপ। মহাভারত, দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও জরৎকারুর স্ত্রী ত্যাগের প্রসঙ্গ রয়েছে। রূপক সাহার *তরিতাপুরাণ* এর তরিতাও বিবাহ রাত্রেই স্বামীর রূঢ় আচরণ এবং স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার স্মৃতিচারণ করেছে। কিন্তু ভূমিকন্যার কাহিনী মনসার এই অপ্রাপ্তিকে পূর্ণতা দিয়েছেন, তরিতা অঙ্কুশের প্রেমের জয়ের মধ্যে দিয়ে। এ যুগের তরিতা শিক্ষাকে হাতিয়ার করে সমাজের শীর্ষে পৌঁছেছে, যা মঙ্গলকাব্যের দেবীত্বের প্রতীকী। আর তার এই অর্জন সে মানবকল্যাণে নিবেদন করেছে, যেখানে তার উত্তরণ। একই সঙ্গে তার মানব হৃদয় প্রেম বিবাহ, মানবতার সাধারণ চাহিদাগুলিকেও বরণ করেছে। দেবী মনসা যা পায়নি, মানবী তরিতা সে সব পেয়েছে। মনসার জীবনের অপূর্ণতা তরিতার জীবনে পূর্ণ হয়েছে। আজকের দিনে, অবহেলিত শৈশব (তরিতা পুরাণে অনাথ আশ্রম) থেকে উঠে এসে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা, সমাজ কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার পাশাপাশি সংসার সন্তান ভালবাসার আবর্তে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলা সেই শত সহস্র নারীর মধ্যে প্রতিদিন পূর্ণতা পাচ্ছে এই তরিতা।

চাঁদ মনসার বিবাহ, মনসামঙ্গলের প্রতীকী উপস্থাপনা - মনসামঙ্গলে আমরা পাই যে চাঁদ বণিকের মহাজ্ঞান হরণের জন্য মনসা নটীর বেশ ধরে ছলনায় কার্য সিদ্ধি করেছিলেন। ভূমিকন্যা ধারাবাহিকে দেখানো হয় তরিতার স্বামী অঙ্কুশকে চক্রান্ত করে জেলে পাঠায় চাঁদ। স্বামীকে বাঁচাতে চাঁদ তরিতাকে বিবাহের কুপ্রস্তাব দেয়। প্রাথমিক ভাবে তরিতা ক্ষিপ্ত হলেও পরবর্তীতে সে প্রস্তাব মেনে নেয়। মহেশ্বরজীর সহায়তায় তরিতা ছদ্ম-বিবাহে সম্মত হয়। চাঁদের বাড়িতে থেকে তার যাবতীয় কুকীর্তির প্রমাণ সংগ্রহ করে সে কৌশলে পুলিশের কাছে তা তুলে ধরে। তরিতার এ অভিযান অত্যন্ত দুরূহ ছিল। একদিকে

সমাজের চোখে দ্বিচারিণী হবার ধিক্কার অন্যদিকে চাঁদের লোলুপতার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো ... নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সে শেষ অবধি জয়ী হয়। মধ্যযুগে শত্রুকে দুর্বল করতে দেবী মনসাকে নটী হতে হয়েছিল আর এ যুগে দুঃসাহসী তরিতা ভণ্ড চাঁদের হাত থেকে সুন্দরগড়ের সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে ছদ্ম বিয়ের মত দুঃসাহসী কাজ করে।

অন্ধকারের প্রতীকী চাঁদের মৃত্যু - মনসামঙ্গলের আখ্যানের শেষে চাঁদ মনসার বিবাদের অবসান হয়। চাঁদ অনিচ্ছা স্বত্বেও মনসা পূজা করে দেবীর কৃপায় ফিরে পায় তার তার হারানো সন্তানদের, এবং সেইসাথে তার বাণিজ্য বোঝাই সপ্তডিঙাও। *তরিতাপুরাণে*ও একইভাবে চন্দ্রভানুর বাড়িতে আয়োজিত মনসাপূজার মাধ্যমে তার সাথে তরিতার বিবাদের অবসান হয়। কিন্তু ভূমিকন্যা ধারাবাহিকের শেষে স্বার্থপর, হিংস্র, পাশবিক, খুনি চন্দ্রভানু বিষাক্ত সাপের কামড়ে প্রাণ হারায়। যেহেতু দূরদর্শনের ধারাবাহিকে চন্দ্রভানুকে পৃথিবীর যাবতীয় অন্ধকারের প্রতীকরূপে তুলে ধরা হয়েছে, তাই আলোর প্রতীক তরিতার জয়ে অন্ধকারের অবসান- এভাবেই বিষয়টিকে পরিবেশন করা হয়।

সঙ্গীত ব্যবহারের বিশিষ্টতা - মধ্যযুগ পেরিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে আরও বেশ কিছু শতাব্দী। আজও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পাঁচালী পাঠ, রয়ানি, পালাগানে দেবী মনসার স্তুতির ধারা বজায় আছে। *তরিতাপুরাণে* উপন্যাসে হারাধন পালাকারের গাওয়া মনসা বন্দনা[৩০] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল[৩১] থেকে নেওয়া –

উরগো মনসা মাতা ত্রিজগতধাত্রী ধাতা যোগ-জাপ্য যোগীর নন্দিনী ।
উতপত্তি পাতালপুরী বিশ্বমাতা বিষহরি সূক্ষ্ম শুক্ল নির্মল ধরণী ।।
সর্বঘটে আছ তুমি ক্ষিতিক্ষেত্র দারুভূমি অচল অস্থির তরুলতা ।
মনসা মনের মাঝে সকল দেবতা পূজে মনসা মনের জানে কথা।।

উপন্যাসে কমলেশ চৌধুরীর বর্ণনায় পূর্ব বাংলার রয়ানি বিবরণ পাই -
মূল গায়েনের পরনে ধুতি, কোমরে বাঁধা গেরুয়া অথবা বাসন্তী রঙের উত্তরীয়। কপালে চন্দনের ফোঁটা, হাতে চামর। মঞ্চের চারপাশে ঘুরে ঘুরে তিনি গেয়ে যাচ্ছেন।তার দু'পাশে দু'জন শ্রীখোল বাদক। রঙিন গেঞ্জি আর ধুতি পরে খোলবাদ্যের দু'পাশে তারা

নাচছেন। আসরের এক পাশে একজন বাঁশি বাজাচ্ছেন। একজন হারমোনিয়াম ও একজন খঞ্জনী। এঁরাই দোহারের কাজটা করতেন।ধুয়া ধরতেন। কখনও কখনও মূল গায়েনের সঙ্গে সংলাপ আদান প্রদান করে আখ্যান বর্ণনায় বৈচিত্র আনতেন।[৩৩]

ভূমিকন্যা ধারাবাহিকে আদ্যন্ত আবহসঙ্গীতে দেবী মনসার নানা স্তুতি ব্যাবহার করা হয়েছে। চরিত্রের মুখে গীত হয়েছে মনসামঙ্গলের অংশ।ধারবাহিকের মুখ্য সঙ্গীতটিও মনসার স্তুতিমূলক –

আঁধার আলোর মাঝে কে আসে যায়রে
রক্ষাপ্রদায়িনী সঙ্কটহারিণী বিঘ্নবিনাশিনী হে
আলোকরূপিণী দুঃখনিবারনী তামসনাশিনী হে
ভূমিকন্যা ভূমিকন্যা ...

এছাড়া আবহসঙ্গীত রূপে ধারাবাহিকে সর্বাধিক যে মনসা স্তুতির ব্যাবহৃত হয়েছে, সেটি নিম্নরূপ –

পদ্মাসনা নাগমাতা শোভে হংসবাহিনী
হরে বিষ হরে ক্লেশ দেবী সুখদায়িনী
পাপ বিঘ্ন দুষ্ট নাশ সর্ব সিদ্ধিদায়িনী
সর্প দোষ কাল দোষ নাশে হংসবাহিনী
তুহি দেবী তুহি মাতা তুহি রক্ষাকারিণী
কাম যশ সুখ শান্তি সম্পদপ্রদায়িনী
জয়ম দেবী মনসা, জয়ম দেবী মনসা।।

প্রচলিত পাঁচালী বা মনসার পূজা পদ্ধতি বর্ণনায় যে চার পঙক্তির মনসার প্রণাম মন্ত্র পাওয়া যায়, ভূমিকন্যায় আবহ সঙ্গীত রূপে তার ব্যাবহার হয়েছে বিভিন্ন পর্বে –

ওঁ অযোনিসম্ভবে মাতর্মহেশ্বর সুতে শুভে।
পদ্মালয়ে নমস্তভ্যং রক্ষমাং বৃজিনার্ণাবৎ ।।
আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্থতা।

জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবী নমোস্তুতে।[৩৪]

ধারাবাহিকে দেখানো হয়েছে ক্যানিংএর অনাথ আশ্রমের মনসামন্দিরে তরিতা নেত্রা সহ আশ্রম কন্যারা মনসা পূজার সময় পাঠ করছে মনসামঙ্গল -

লখার দ্বিগুণ রূপে দেবীর কৃপায়

যায় বেহুলা সাবিত্রী মনসা তলায়

মনোমত বর পেয়ে জিয়াইল পতি

হাসিয়া আইল পতি সেবিকা সতী

নগর নিকটে আসি ঘটে চাপাকলা

হেনকালে প্রাণনাথে কহেন বেহুলা

**** *** *** *** *** *** ****

পূর্বকথা মনে ভালো হইল আমার

আছে কিনা আছে দেখ মেলানীর ভার

কোদালি করিয়া মাটি কাটিয়া কান্ডারী

নানা দ্রব্য তোলে বেহুলা সুন্দরী

**** *** *** *** *** *** ****

মনসা ভাসান গীত হইল সমাপন

হরি হরি বল সবে ভরিয়া বদন।[৩৫]

এছাড়া মহেশ্বরজির উপস্থিতিতে যে আবহ সঙ্গীতটি বার বার ব্যবহার হয়েছে –

হর গৌরী প্রাণনাথ ত্রাতা রূপে জগন্নাথ

এবার উদ্ধার কর শিব শিব শিব হে

এভাবেই ধারাবাহিকের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে মনসা বা শিবের স্তুতিমূলক সঙ্গীত। কখনও বা মনসামঙ্গল বা পাঁচালী থেকে প্রাপ্ত কথায় হয়েছে নতুন করে সুরের প্রয়োগ। একই সঙ্গে একালের প্রেক্ষিতে ধারাবাহিকে ব্যবহৃত হয়েছে কিশোরকুমারের জনপ্রিয় আধুনিক গান *সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমার* মত গান অঙ্কুশ তরিতার প্রেমের প্রেক্ষাপটে।

লোকবিশ্বাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব – ভূমিকন্যার তরিতা ওরফে মনসা সর্পবিশারদ। সে বার বার সুন্দরগড়ের মানুষের ভ্রান্ত কুসংস্কার দূর করতে সচেষ্ট হয়েছে। সুন্দরগড়ের একটি পুকুরকে চাঁদ তার চোরা কারবার চালাবার জন্য ব্যবহার করত। পুকুরের জলের নীচে পুঁতে রাখত বাক্স ভর্তি ড্রাগস। যাতে সাধারণ মানুষ এই পুকুরের জলের কাছে না আসে, এই জন্য জলের মধ্যে মৎস্যকন্যা থাকার গুজব ছড়ায় চাঁদ। সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাতে একজন পাহারাদার ও কয়েকজন ভণ্ড সাধুও বহাল করে। এই ভণ্ড সাধুর দল গ্রামের মানুষকে মৎস্যকন্যা ভর করেছে বলে বেঁধে নির্মম অত্যাচার চালায়। তরিতা মাতাল জগার সঙ্গে এ হেন আচরণ হতে দেখে তাকে ভণ্ড সাধুদের প্রহারে প্রায় অর্ধ মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে এবং গ্রামের মানুষকে ওই পুকুরটি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ঘোচাতে তৎপর হয়। সে গ্রামের অশিক্ষিত সাধারণ মানুষদের বুঝিয়ে তাদের সচেতন করে তোলে এবং নিজে পুকুরের জলে নেমে নিজের কথার সত্যতা প্রমাণ করে। শুধু এখানেই থেমে থাকে না তরিতা। চন্দ্রভানুর মন্দিরের পেছনের পুকুরের সম্পর্কে এই গুজব তার মনে যে প্রশ্ন চিহ্ন তোলে, তার প্রেক্ষিতেই সে রাতের অন্ধকারে গোপনে সেখানে উপস্থিত হয় এবং নদী পথে আসা বাক্স সুকৌশলে জলের তলায় লুকিয়ে ফেলতে দেখে। তরিতার উপস্থিতিতে পুলিশি সহায়তায় সেখান থেকে মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়।

ভূমিকন্যা ধারাবাহিকে গ্রামীণ জীবনে প্রচলিত নাগমণি সম্পর্কিত লোকবিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়। সর্পবিশারদ হয়েও তরিতার নাগমণি উদ্ধার ও সাপের কামড়ে আক্রান্তের চিকিৎসায় অ্যান্টি ভেনাম সিরামের সঙ্গে নাগমণির ব্যাবহার খাপছাড়া লাগে। যে তরিতা গ্রামের সাধারণ মানুষকে মুক্ত চিন্তার পথে চালিত করে, নির্ভীক সত্যানুসন্ধানী মন নিয়ে যে মাদক পাচারের মত অপরাধ দমনে সক্রিয় ভূমিকা নেয়, যে তরিতা অ্যান্টি ভেনাম সিরাম দিয়ে গ্রামের সাপে কাটা রোগীকে প্রাণে বাঁচায়, যে শেখায় সাপ তথা বন্যপ্রাণীরা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ তাদের ক্ষতি করলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে, সেই তরিতাই যখন মনসা মূর্তি বানাতে বিশেষ মাটির সন্ধানে দুর্গম মনসাদ্বীপে পাড়ি দেয়, তখন বিস্মিত হতে হয়। মনসা দ্বীপের অলৌকিক পরিবেশ, বিপর্যস্ত তরিতার ওপর মনসার কৃপা, ইত্যাদি ঘটনায় লোকসংস্কার তথা বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে ধারাবাহিকের বিনির্মাণে।

আবার মনসাদ্বীপ থেকে অচেতন তরিতার কলার ভেলায় ভেসে সুন্দর গড়ের নদীতীরে ফেরার ঘটনায় মনসামঙ্গলের বেহুলার অসাধ্য সাধনের অনুষঙ্গ দেখা যায়।

জলে জঙ্গলে পরিপূর্ণ বাংলাদেশে নানা উপলক্ষ্যে নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাইকগাছা, মাদারীপুর, হবিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে মনসা পূজা উপলক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে ভূমিকন্যা ধারাবাহিকে এই নৌকা বাইচের আয়োজন দেখানো হয়েছে, তবে এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। অঙ্কুশ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে, চাঁদ ষড়যন্ত্র করে অঙ্কুশকে মারতে চায়। যদিও তরিতা নিজের সাহসিকতা বিচক্ষণতায় অঙ্কুশকে এই বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করে। মঙ্গলকাব্যে যেখানে মনসা অস্তিত্ব রক্ষায় মরিয়া হয়ে ষড়যন্ত্র করে, আর চাঁদ নিজ পৌরুষ দিয়ে তার দৃঢ় ভাবে মোকাবিলা করে, ভূমিকন্যায় সেখানে বার বার চাঁদকে চক্রান্তে লিপ্ত হতে দেখা যায় আর তরিতা নিজ সাহসিকতা, দৃঢ়তা, শুভবুদ্ধি দিয়ে সেই চক্রান্তকে বিফল করে। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতাও মনসা পূজার সঙ্গে যুক্ত লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে ধারাবাহিকে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বহু বিস্তৃত মঙ্গলকাব্যের ধারায় সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছিল মনসামঙ্গল তার আকর্ষণীয় কাহিনীর জন্য। পরবর্তী কালে সাহিত্যে শিল্পে নানা ভাবে ও রূপে মনসামঙ্গলের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একুশ শতকের *তরিতা পুরাণ* সর্বপ্রথম মনসার মানবী রূপের প্রকাশ। অলৌকিকতা নয়, শিক্ষার আলোয় তার আত্মপ্রতিষ্ঠা, নারী তথা মানব কল্যাণে তার মহত্ব। আর *ভূমিকন্যার* তরিতা আরও একধাপ এগিয়ে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নেয়। পুঁজিবাদী ব্যাবসায়ী চন্দ্রভানুর নগ্নতা সে সমাজের সামনে তুলে ধরে। সাধারণ মানুষের বঞ্চনার অবসান ঘটানোর সঙ্কল্প নিয়ে সাম্যবাদ তথা সমানাধিকার অর্জনের লড়াইয়ে সে নিজেকে নিবেদন করে। মনসামঙ্গল – *তরিতা পুরাণ* - *ভূমিকন্যা* তিনটি ক্রমিক পর্যায়ে সমাজে নারীর অবস্থার বিবর্তন তথা ধারাবাহিক উত্তরণের সমুজ্জ্বল প্রকাশ।

মনসামঙ্গল বাংলার নিজস্ব সম্পদ হলেও এর করুণ রসাত্মক কাহিনি বাংলার সীমা ছাড়িয়ে জাতীয় স্তরে নিজ প্রভাব রেখেছে। তাইতো স্টার জলসার *বেহুলা* ধারাবাহিক হিন্দি,

তামিল, অসমীয়া সহ একাধিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। ২০১৯ - ২০২০তে জি গঙ্গা চ্যানেলে *দিব্য শক্তি* ধারাবাহিকে ভোজপুরি ভাষায় মনসামঙ্গলের কাহিনিকে তুলে ধরা হয়েছে। আবার সোনি টিভি তে দেখানো হিন্দি ধারাবাহিক *বিঘ্নহরতা গণেশ* (২০১৭-২০২১) এ মনসামঙ্গলের কাহিনি বিস্তৃত ভাবে রূপায়িত হয়েছে। যদিও গণেশ মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে মনসামঙ্গলের কাহিনির অন্যতম নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় গণেশকে রূপায়িত করা হয়েছে। শিববীর্যের যে অংশে কার্তিকের জন্ম, তারই আরেকটি অংশ কশ্যপের ধ্যান প্রার্থনার মানসী মূর্তিতে প্রবেশ করে মনসার আবির্ভাব হওয়ার ঘটনা অভিনব কৌশলে তুলে ধরা হয়েছে এই ধারাবাহিকে। এছাড়া মনসার দেবীত্ব প্রসঙ্গে শিবের ওপর দুই কন্যা অশোককুমারী ও জ্যোতির কাহিনি সংযোজিত হয়েছে। শিবের যন্ত্রণা লাঘব করতে বিষপান করে জগত কল্যানে মনসার ভূমিকা, আস্তিকের মধ্যস্থতায় জনমেজয় ও উত্তঙ্ক মুনির সর্পমেধ যজ্ঞের অবসান ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনির পাশাপাশি, চন্দ্রধর বণিক ও বেহুলা লক্ষিন্দরের কাহিনি সুচারুরূপে তুলে ধরা হয়েছে ধারাবাহিকে। ভক্তি যখন অহঙ্কারে, আত্মবিশ্বাস যখন উগ্রতায় পর্যবসিত হয়, তখন পতন নিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়। চন্দ্রধরের জীবনের ট্রাজেডিকে এই তত্ত্বের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে ধারাবাহিকে। আবার শত বিপর্যয়ের মধ্যেও অটুট ভক্তি, মানসিক দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার জোরে বেহুলা অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। ধারাবাহিকে মনসামঙ্গলের নেতার জায়গা নিয়েছে নাগমাতা কদ্রু। এছাড়া জ্যোতিষ শাস্ত্রী গজানন মহারাজ রূপে গনেশের আবির্ভাব কাহিনিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তথা নতুনত্ব এনেছে। মনসার দশভুজা রূপ এখানে দুর্গার সঙ্গে একাত্ম করেছে তাকে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য বাংলার সংস্কৃতিতে মনসা দুর্গার সম্মিলিত রূপের পূজার প্রচলন রয়েছে।

বাংলায় *বেহুলা, মনসা* ও *ভূমিকন্যা* তিনটি ধারাবাহিকে একেবারে স্বতন্ত্র তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মনসামঙ্গলকে তুলে ধরা হয়েছে। *বেহুলায়* মনসামঙ্গলের মূল কাহিনিকেই তুলে ধরা হয়েছে, যুক্ত হয়েছে আধুনিক ভাবনায় চরিত্রগুলির স্বতন্ত্র মনন। *মনসায়* নারী শক্তির উত্থান রূপে মনসার জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে মনসা দুর্গা একাকার হয়ে গেছে। আর *ভূমিকন্যায়* এ যুগের মনসার শিক্ষাকে হাতিয়ার করে অপ্রাপ্তি, বঞ্চনাকে জয় করা

এবং মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ, শ্রেণি শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতিনিধি হয়ে একেবারে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সিনেমার গতানুগতিকতা, পুচ্ছানুসারিতাকে ছাপিয়ে মনসামঙ্গল ধারাবাহিকের ক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিণত, শিল্পমন্ডিত, তথা সব শ্রেণির মানুষের কাছে মনোগ্রাহী হয়েছে।

তথ্যসূত্র

গ্রন্থ

১) দ্বিজ বংশীদাস, পদ্মাপুরাণ, অক্ষয় লাইব্রেরী, ২০১৮, পৃ ৬৭।

২) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত,লেখাপড়া, কলকাতা ৭৩, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৪৯।

৩) বিজয়গুপ্ত,পদ্মাপুরাণ, শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ২০০৯, পৃ ১০।

৪) বিজয়গুপ্ত,পদ্মাপুরাণ, শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ২০০৯, পৃ ৫৬।

৫) জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল,অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, পৃ ১৮।

৬) দ্বিজ বংশীদাস, পদ্মাপুরাণ, অক্ষয় লাইব্রেরী, ২০১৮, পৃ ৫১।

৭) বিজয়গুপ্ত,পদ্মাপুরাণ, সম্পাদনা শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,২০০৯,পৃ ৯৪।

৮) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, কলকাতা ৭৩, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ ৮২।

৯) জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল,অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৪।

১০) বিপ্রদাস পিপলাই, মনসাবিজয়, অধ্যাপক ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা সম্পাদিত, রাধাকৃষ্ণ প্রেস, জুলাই ২০১৬, পৃ৩৯।

১১) বেদব্যাস, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটির, পৃ ২১৪,২১৫,২১৬।

১২) বেদব্যাস, বেদব্যাস, দেবীভাগবতম, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, পৃ ৯৮০,৯৮২,৯৮৪।

১৩) কাশীরাম দাস, মহাভারত, পূর্ণচন্দ্র শীল কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩২ সাল,পৃ৩৬।

১৪) দ্বিজ বংশীদাস, পদ্মাপুরাণ, অক্ষয় লাইব্রেরি,১৪২৫ সন,পৃ ১৬-১৯।

১৫) বেদব্যাস, লিঙ্গপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন অনুবাদিত,পৃষ্ঠা ১১৭।

১৬) বেদব্যাস, শিবপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৯০।

১৭) বেদব্যাস, বামনপুরাণম, শ্রী মহেশচন্দ্র পাল সংকলিত প্রকাশিত, ১৯৫০, পৃষ্ঠা ১০৫,১১৫,৩৩৭-৩৪১,৪১৭।

১৮) কাশীরাম দাস, মহাভারত, প্রকাশক শ্রী পূর্ণচন্দ্র শীল, অক্ষয় প্রেস, ১৩৩২ সাল, পৃষ্ঠা ৩৩।

১৯) দ্বিজ বংশীদাস, পদ্মাপুরাণ, অক্ষয় লাইব্রেরী, ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৯।

২০) মহামুনি মার্কণ্ডেয়,কালিকাপুরাণ,শ্রী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদিত,শ্রী দয়ালচাঁদ বাবুই প্রকাশিত,কলকাতা, ১২৮১ বঙ্গাব্দ,পৃষ্ঠা ১১৫।

২১) কাশীরাম দাস, মহাভারত, প্রকাশক শ্রী পূর্ণচন্দ্র শীল, অক্ষয় প্রেস, ১৩৩২ সাল, পৃ ৩৭৩।

২২) ব্যাসদেব, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, শ্রী সুবোধকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, মাঘ ১৩৬৭, পৃষ্ঠা ১৫৬,১৬৪,১৬৫,১৬৭,১৭০।

২৩) বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, সম্পাদনা শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃ ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮।

২৪) পদ্মাপুরাণ,দ্বিজ বংশীদাস, অক্ষয় লাইব্রেরি,১৪২৫ সন,পৃ ৫৪।

২৫) বিপ্রদাস পিপলাই, মনসাবিজয়, মিহির চৌধুরী কামিল্যা সম্পাদিত, রাধাকৃষ্ণ প্রেস, জুলাই ২০১৬, পৃ ৩৬।

২৬) রূপক সাহা, তরিতা পুরাণ, দীপ প্রকাশন,২০১৭, পৃ.৯।

২৭) বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,২০০৯, পৃ.২৯২।

২৮) জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস, রত্নাবলী, ২০১০, পৃ. ৫৮।

২৯) রূপক সাহা, তরিতা পুরাণ, দীপ প্রকাশন,২০১৭, পৃ. ৯৯।

৩০) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, ১৩৮৪, পৃ. ১।

৩১) রূপক সাহা, তরিতা পুরাণ, দীপ প্রকাশন,২০১৭, পৃ. ১২৯।

৩২) পণ্ডিত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য, শ্রীশ্রীমনসা পূজা পদ্ধতি, বেনীমাধবশীল'সলাইব্রেরী, ২০১৮, পৃ. ৬২।

৩৪) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, ১৩৮৪, ২৮১।

গবেষণা পত্র

১) Bhaty Rupa, 2017,http://Indiafacts. Org, Astronomical Association Of Nataraja's Dance With Apasmara And Agastya।

ধারাবাহিক

১) hotstar, স্টারজলসা, ভূমিকন্যা

২) voot, কালার্স বাংলা, মনসা

৩) স্টার জলসা, বেহুলা

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

২৯/৩/২০২১ তারিখে কালার্স বাংলা চ্যানেলের মনসা ধারাবাহিকের গবেষক শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে নেওয়া সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ নিম্নরূপ -

প্রশ্ন ১) বাংলা চলচ্চিত্র বা টেলি ধারাবাহিকে মনসামঙ্গল ফিরে ফিরে আসার কারণ কী ?

উত্তর - সাপ ভারতীয় মনোরঞ্জনের জগতে প্রথমাবধি ভীষণ আগ্রহ ও আকর্ষণের বিষয়। ১৯৫৪ সালে নন্দলাল যশবন্তলাল পরিচালিত হিন্দি চলচ্চিত্র 'নাগিন' চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন প্রদীপকুমার এবং বৈজন্তীমালা। সেটিও ছিল সুপারহিট। কেবল বাংলা নয় রাজস্থান, বিহার তথা সর্বভারতীয় লোকসংস্কৃতিতে সাপ মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা রাখে। সাপকেন্দ্রিক গড়ে ওঠা আখ্যানগুলি বাংলার প্রাদেশিক তথা জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক জগতে চলমান ভীরু স্বার্থান্বেষীর ক্ষমতার যথেচ্ছ অপব্যবহারে এক চূড়ান্ত অবক্ষয়িত অবস্থা, এক গড্ডালিকা প্রবাহের প্রতীকী হয়ে ওঠে। সাপের মত একটি প্রায় অন্ধ অবলা প্রাণী আত্মরক্ষার জন্য দংশন করে এবং একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে মানবশরীরকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়

এই বিষয়টি যেমন সাধারণের অপার রহস্যের। ইন্দ্রজিতের তীরের প্রভাবে লক্ষণের মূর্ছিত হওয়া, বা আধুনিক প্রযুক্তির উন্নতিতে বায়ুসেনার অভিযান কি সাপের বিষ প্রয়োগের সঙ্গে তুলনীয় নয় ?... যেখানেই ক্ষমতাবানের চরিত্রে মানবিক দোষ ত্রুটি ধরা পড়ে সেখানেই তা নাটকীয়, প্রানবন্ত, এবং সমকালীন হয়ে ওঠে। এই সব কারণেই সর্প সংস্কৃতি ও মনসামঙ্গল বিনোদনের জগতে আজও প্রাসঙ্গিক।

প্রশ্ন ২) এই ধারাবাহিকে মনসামঙ্গলের বাইরে বিভিন্ন পৌরাণিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মনসাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, এর কারণ কী ?

প্রথমত মনসামঙ্গলের কবিরা সম্ভবত সংস্কৃত জানতেন এবং তাদের সামনে শিব পুরাণ বা পদ্মপুরাণের আদর্শ ছিল। সুতরাং এতদিন পর টেলিভিশন যদি পুরাণের নানা পাঠ মনসামঙ্গলের কাহিনির সাথে জুড়ে দেয়, তাতে দোষ কোথায়? তাছাড়া মঙ্গলকাব্যের কবিদের অনেক না বলা কথা চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুসারে এই ধারাবাহিকে বিস্তার পেয়েছে। যেমন চণ্ডীর মনসাকে অবিশ্বাসের কারণ কোথাও তার মনে এরকম ধারণা, যে মনসা অযোনিসম্ভবা নয়, শিবের ঔরসে কোন নারীর গর্ভে জন্মানো জারজ সন্তান সে। এ ছাড়াও মনসামঙ্গলের মত আখ্যানকাব্যের পরিধি ধারাবাহিকে তুলে ধরার বিষয়টিও রয়েছে। ইতিপূর্বে স্টার জলসা চ্যানেলে দেখানো বেহুলা ধারাবাহিকটির কথাও মনে রাখতে হবে, সেটি খুবই জনপ্রিয় ও সফল প্রযোজনা ছিল।

প্রশ্ন ৩) এই ধারাবাহিকের উপস্থাপনায় লোকসংস্কৃতির প্রভাব কতখানি ?

আমরা যারা গবেষক, মূল কাব্য পড়ে একটা broad story বানিয়ে দিই। এর পর আরও কয়েকটি ধাপে প্রস্তুতি থাকে। one liner প্রতি পর্বের চিত্রনাট্য আলাদা করে লেখেন। সংলাপ লেখক প্রত্যেক চরিত্রের সংলাপ সাজিয়ে script তৈরি করেন। পরিচালক কোন ব্রত বা কোন সামাজিক আচার রীতি প্রথা দেখানোর জন্য 'নোট' চাইলে সেই উপযোগী বিষয় পরিবেশন করতে হয়। তবে যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা যেমন রয়েছে, তেমনই দর্শক আকর্ষণের জন্য সমকালীন পোশাক খাবার ইত্যাদি যুক্ত হয় মঙ্গলকাব্যের দৃশ্যায়নে।

উপসংহার

বর্তমান গবেষণায় পশ্চিমবাংলার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মনসাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং নির্বাচিত ক্ষেত্রে তার প্রতিগ্রহণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার নিরিখে দেখা গেছে, ঘটে, সিজ গাছে, মাটির ঢিবিতে, প্রতিমায় যেভাবেই পূজা হোক না কেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মনসা পূজার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাপের উপদ্রব ও ক্ষয়ক্ষতির কাহিনি। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মাটির ঢিবিতে সরল অনাড়ম্বর মনসা পূজার বিপরীতে দেখা যায় ব্রাহ্মণের করা জাঁকজমকপূর্ণ মনসাপূজা, পূজা উপলক্ষে নানা উৎসব। মনসা আর দেবী দুর্গার মিলিত রূপের পূজা, কমলা আর বিমলা দুই বোনরূপে মনসার অবস্থান, আবার কেউটে প্রজাতির জীবিত সাপের পূজায় কালনাগিনীর মিথ, বেহুলা মাতার মন্দিরে ধুমধাম সহকারে বেহুলা পূজা, মেলা তথা বিচিত্র উৎসব। মনসা পূজায় উনুন ও রান্না সামগ্রীর পূজা, পূজা উপলক্ষে ভেলা ভাসানো উৎসব, অথবা জালাবিয়ায় অঙ্কুরোদ্গম ও ছদ্মবিয়ের অনুষ্ঠান পালন, নানা উদযাপনে অনুষ্ঠানে বহুবিধ লোকাচারে সমৃদ্ধ বাংলার মনসাসংস্কৃতির হদিশ পাওয়া যায়। কোথাও বলি নিষিদ্ধ, কোথাও একদিনে অন্ততঃ পঁচিশ হাজার বলির প্রথার প্রচলন দেখা যায়। কোথাও মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক সমন্বয়, কোথাও ধর্মীয় বিরোধিতা থেকে জাতিভেদের চরম প্রকাশ, এরকম বহুবৈচিত্র্য নিয়ে গ্রামবাংলার লোকমনন, সংস্কার, বিশ্বাস আচরণে মনসার গভীর ও ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

মনসামঙ্গল কেন্দ্রিক উপস্থাপনমূলক লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের অত্যন্ত জনপ্রিয়তার কারণেই দুই বাংলায় ছড়িয়ে আছে রয়ানীর দুটি পৃথক ধারা ও তার বৈচিত্র্যময় উদযাপন। একটি ধারায় মহিলাদের ঘরোয়া একমাস ব্যাপী পদ্মাপুরাণ পাঠ, অপর ধারায় মঞ্চে অভিনয় সহযোগে, বিভিন্ন বাজনার সঙ্গে পদ্মাপুরানের পাঠ গান ও কাহিনী বর্ণন। নয়ার পটশিল্পীদের মনসার পটের গানে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের প্রভাব স্পষ্টত চোখে পড়ে। মনসাযাত্রা বা মনসার পালাগান লোকাভিনয়,

লোকগান, লোকবিশ্বাস, লোকাচার ইত্যাদির সমন্বয়ে লোকসাহিত্যের এক বিস্তৃত ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। মনসাপালার কবিগান বা কবি ঝাঁপানে উঠে আসে দেহতত্ত্বের রূপক বিশ্লেষণ।

অভিকরণমূলক মার্জিত সংস্কৃতিতে মনসামঙ্গলের অভিনয়কেন্দ্রিক (নাটক, চলচ্চিত্র, টেলি-ধারাবাহিক) বিনির্মাণের বিশ্লেষণে দেখা যায়, মনসামঙ্গলের প্রেক্ষিতে রচিত নাটকগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তা দিয়েছে, সমাজের নগ্নতা, বৈষম্য, ভেদাভেদকে তুলে ধরেছে, কোথাও বা নাট্যকারের বিশেষ জীবনবোধের প্রকাশ মাধ্যম হয়েছে। এই ধারার নাটক যেমন একটি আরেকটিকে প্রভাবিত করেছে আবার মনসামঙ্গলের আখ্যানে নাট্যকারের সংযোজিত অভিনব কাহিনি পরবর্তীকালে একাধিক সিনেমায় জুড়ে গেছে। মনসাসংস্কৃতির অন্তর্গত চলচ্চিত্রের চলন দুটি স্বতন্ত্র ধারায়। একদিকে মঙ্গলকাব্যের কাহিনির বিনির্মাণ, অপরদিকে সামাজিক বা পারিবারিক কাহিনিতে দেবী মনসার মাহাত্ম্য উপস্থাপন। কাহিনীর সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবর্তন, উপস্থাপন রীতির বিশিষ্টতা যেমন প্রথম ধারার চলচ্চিত্রের অত্যন্ত জনপ্রিয়তার কারণ হয়েছে, তেমনি বিকৃত বিনির্মাণ অনাদৃত হয়েছে, আবার পুচ্ছানুসারিতার দোষও বেশ কিছু ক্ষেত্রে চোখে পড়ে। সর্বভারতীয় স্তরে সর্পসংস্কৃতিমূলক চলচ্চিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি মনসার মাহাত্ম্যমূলক বাংলা সিনেমাগুলোতেও একইভাবে ধরা দেয়। বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন নাগকন্যা কর্তৃক সাপের ছোবলে মৃত রাজপুত্রের প্রাণ ফেরানো, বীণ বাজানো, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই ইত্যাদি দ্বিতীয় ধারার চলচ্চিত্রের সাধারণ লক্ষণ। মনসামঙ্গলের কাহিনি অবলম্বনে দূরদর্শনের জন্য তৈরি ধারাবাহিকগুলির প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বতন্ত্র অবস্থানে জনপ্রিয় হয়েছে। জনপ্রিয়তার জন্যই মনসামঙ্গলের কাহিনি অবলম্বনে তৈরি ধারাবাহিক হিন্দি, তামিল, অসমিয়া সহ নানা ভাষায় দেখানো হয়েছে। আবার হিন্দি চ্যানেলের গণেশের আখ্যানে রূপায়িত হয়েছে মনসামঙ্গল। ধারাবাহিকে মনসা জুড়ে গেছে মনসামঙ্গল ব্যতিরেকে নানা পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে। আবার কোথাও অন্যান্য দেবদেবীর মাহাত্ম্যমূলক সিরিয়ালে দেখানো হয়েছে মনসামঙ্গল। তবে কাহিনিকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে একেবারে নতুন রূপে উপস্থাপন অপেক্ষা তুলনামূলক ভাবে পৌরাণিক আবহে মনসা, বেহুলার আখ্যান অনেক বেশি দর্শকদের মন জয় করেছে।

মনসাসংস্কৃতির ধারাগুলি পৃথক হলেও একটি অক্ষুণ্ণ মনসা চেতনায় যেন একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে আছে। বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহপূর্ব প্রেমের আখ্যান যুক্ত হয়েছে বাংলা নাটক, চলচ্চিত্র, পালাগান, ধারাবাহিক সর্বত্র। লোকমনোরঞ্জনই এর প্রধান কারণ। রয়ানী বা পালাগানের প্রভাবে চলচ্চিত্রও হয়েছে গীতিময়। জাহির রায়হান পরিচালিত *বেহুলা* দু ঘণ্টার একটি চলচ্চিত্র, যাতে রয়েছে তেরোটি গান। অমল দত্ত পরিচালিত *বেহুলা লখিন্দর* সিনেমায় দশটি গান রয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় মনসা পূজা উপলক্ষে ভেলা ভাসানো হচ্ছে। আর ভূমিকন্যায় সর্পবিশারদ হয়েও দুর্গম মনসাদ্বীপ থেকে মাটি এনে কলার ভেলার আশ্রয়ে প্রাণে বেঁচে ফিরেছে তরিতা। বিভিন্ন ধারাবাহিকে প্রদর্শিত চণ্ডী মনসার অভেদ বেশ কিছু স্থানিক পূজায় প্রচলিত। মনসামন্দিরে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পালন, আবার রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসবে, ধুমধাম করে মনসা পূজা, দশহরায় ভৈরব মনসার মালাবদল, লৌকিকতার উত্তরণে কালিবুড়ি আর মনসার অভেদ, ধর্ম সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পরিচায়ক। সব মিলিয়ে একুশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বগ্রাসী প্রভাবের মধ্যেও বাংলার লোকসংস্কৃতি ও মার্জিত সংস্কৃতি দুটি ক্ষেত্রেই মনসামঙ্গলের সুগভীর প্রভাব ও দৃঢ় অবস্থান প্রমাণিত হয়। এ গবেষণায় উত্তরবঙ্গের মনসাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নি। এক স্বতন্ত্র ধারার মনসাসংস্কৃতি রয়েছে উত্তরবঙ্গে যা বিশদ গবেষণার বিষয় বলে মনে করি।

গ্রন্থপঞ্জি

১) অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সওদাগরের নৌকা, সম্পাদনা কৌশিক রায়চৌধুরী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৪।

২) অঞ্জন সেন ও শেখ মকবুল ইসলাম, সর্প সংস্কৃতি ও মনসা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২।

৩) অশোক রায়প্রধান, উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে বিষহরি থেকে মনসা, সুচেতনা, ২০১৮।

৪) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, মুদ্রণ ২০০৮-২০০৯।

৫) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড প্রথম পর্ব, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, মুদ্রণ ২০০৬-২০০৭।

৬) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।

৭) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৫।

৮) উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, তিনটি উজ্জ্বল নাটক, ধানসিঁড়ি, ২০১৮।

৯) কাশীরাম দাস, মহাভারত, প্রকাশক পূর্ণচন্দ্র শীল, অক্ষয় শীল, ১৯২৫- ১৯২৬।

১০) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, অক্ষয় কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, ১৯৭৭।

১১) জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, রত্নাবলী, ২০১০।

১২) তারাশঙ্কর মুখার্জী, মনসামঙ্গল, Digital Library of India, ১৯৫৯।

১৩) দ্বিজ বংশীদাস, পদ্মাপুরাণ, অক্ষয় লাইব্রেরী, ২০১৮।

১৪) নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।

১৫) নির্মল দাস, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৫।

১৬) পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়, চাঁদ সদাগর(বেহুলা), পাল ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৩০।

১৭) বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

১৮) বিপ্রদাস পিপলাই, মনসাবিজয়, মিহির চৌধুরী কামিল্যা সম্পাদিত, মণ্ডল বুক হাউজ, ২০১৬।

১৯) বিপ্রদাস পিপলাই, মনসামঙ্গল,অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, রত্নাবলী, ২০০২।

২০) মন্মথ রায়, চাঁদ সদাগর, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯৩০।

২১) মহামুনি মার্কণ্ডেয়, কালিকাপুরাণ, শ্রী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদিত, শ্রী দয়ালচাঁদ বাবুই প্রকাশিত, কলকাতা, ১৮৭৪ - ১৮৭৫।

২২) মহর্ষি বেদব্যাস, গরুড়পুরাণ, পূর্বখণ্ড, শ্রী রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার অনুবাদিত, শ্রী গোপালচন্দ্র ঘোষ মুদ্রিত, ১৮৮২।

২৩) মহর্ষি বেদব্যাস, দেবীভাগবতম্, সম্পাদনাপঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, ২০১১।

২৪) মহর্ষি বেদব্যাস, বামনপুরাণম, শ্রী মহেশচন্দ্র পাল সংকলিত প্রকাশিত, ১৯৫০।

২৫) মহর্ষি বেদব্যাস, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রী সুবোধকুমার চক্রবর্তী, এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬০।

২৬) মহর্ষি বেদব্যাস, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, সম্পাদনা সুবোধচন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটীর, ২০১৮।

২৭) মহর্ষিবেদব্যাস, বৃহৎ শিব পুরাণ, কালি প্রসন্ন বিদ্যারত্ন অনুদিত, শ্রী গনেশ চন্দ্র ঘোষ প্রকাশিত, ১৮৪৭।

২৮) মহর্ষি বেদব্যাস, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, শ্রী সুবোধকুমার চক্রবর্তী, এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬১।

২৯) মহর্ষি বেদব্যাস, লিঙ্গপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন অনুবাদিত, ১৮৯০-১৮৯১।

৩০) মহর্ষি বেদব্যাস, স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন অনুদিত, কালীকৃষ্ণ মণ্ডল প্রকাশিত, শ্রী অমৃতলাল মান্না ফ্রেন্ড অ্যান্ড কোম্পানি মুদ্রিত, ১৮৭৯-১৮৮০।

৩১) রামেশ্বর ভট্টাচার্য, শিবায়ন, শ্রী যোগীলাল হালদার সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭।

৩২) রূপক সাহা, তরিতা পুরাণ, দীপ প্রকাশন, ২০১৮।

৩৩) শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য, শ্রীশ্রীমনসা পূজা পদ্ধতি, বেনীমাধবশীল'স লাইব্রেরী, ২০১৮।

৩৪) শেখর দেবরায় , মনসাকথা, নব চন্দনা প্রকাশনী, ২০১২।

৩৫) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০১।

৩৬) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০৩।

৩৭) হরনাথ বসু, বেহুলা, Digital Library of India, ২০১০।

সহায়ক পত্র পত্রিকা

১) ঐকিক পত্রিকা, মনসামঙ্গল কাব্যসংখ্যা, সম্পাদক মিঠুন দত্ত, ২০১৫।

২) কোরক সাহিত্য পত্রিকা, সম্পাদক তাপস ভৌমিক মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গলকাব্য চর্চা, ২০১৬।

৩) কৌলাল, সর্পদেবী মনসা, সম্পাদক স্বপনকুমার ঠাকুর, ২০১৯-২০২০।

৪) সুচেতনা, বিষহরী মনসা সংখ্যা, সম্পাদক গৌতম মণ্ডল, ২০১৭।

ইংরেজি গ্রন্থ

১) Pradyut Kumar Maity, Historical Studies In The Cult Of Goddess Manasa, Puthi Pustak, 2001 ।

ইংরেজি গবেষণা পত্র

১) BhatyRupa, 2017, http://Indiafacts. Org, Astronomical Association Of Nataraja's Dance With Apasmara And Agastya ।

পরিশিষ্ট

সর্বাধিক জনপ্রিয় ভাসান পালার নির্বাচিত অংশের হুবহু লেখ্যরূপ –

২৯ এ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে দক্ষিণ ২৪ পরগণার দঃ বারাসাতের কেল্লা গ্রামে অভিনীত মনসা যাত্রা 'মাতৃ পূজারী চাঁদ সওদাগর' এর ভাসান পালা অবলম্বনে লেখা -

উপস্থাপনায় আদি ত্রিধারা গীতি নাট্য সংস্থা

দলমালিক – খোকন সরদার (১২নং জালাবেড়িয়া, জয়নগর, দঃ ২৪ পরগণা)

চরিত্র পরিচিতি

বেহুলা	তাপসী নস্কর
লক্ষিন্দর	প্রবীর নস্কর
সনকা	একাদশী গায়েন
চাঁদ সদাগর	রাজু মণ্ডল
উত্তমা	উৎপল নস্কর
রামানন্দ	সত্য মণ্ডল
সায়বেনে	প্রবীর নস্কর
অমলা	একাদশী গায়েন
দ্বারিক	প্রবীর নস্কর
গদাই পাল	সত্য মণ্ডল
পাঁচি	উৎপল নস্কর
পাঁচির মা	একাদশী গায়েন
ব্যবসায়ী (১ নং)	সত্য মণ্ডল
ব্যবসায়ী (২নং)	দিব্যেন্দু সরদার
ঘুঘনিওয়ালা	সত্য মণ্ডল
ভক্ত	প্রবীর নস্কর
ব্যবসায়ী (৩ নং)	দিব্যেন্দু সরকার
ব্যবসায়ী (৪ নং)	সত্য মণ্ডল
শিব	সত্য মণ্ডল
মনসা	উৎপল নস্কর

১

[মঞ্চে তিন ধাপের কাঠের পাটাতনের উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে মনসা দেবী, আর নীচে ভক্ত তার পূজা করছেন।

দেবীর সামনে দেওয়া আছে পূজার নৈবেদ্য, জ্বলছে ধূপ, দীপ]

ভক্ত আজ আমি তোমার চরণে নৈবেদ্য দিয়েছি মাগো, আমি তোমার অধম সন্তান, জ্ঞানহীন নরাধম। আমি জানিনা সাধন, জানিনা ভজন, কি দিয়ে কোন মন্ত্রে তোমার পূজা করতে হয় জানিনা মা। আজ তোমার সন্তান এমন দরিয়ায় ডুবেছে মা, তুমি ছাড়া তাকে কেউ নেই তাকে উদ্ধার করার। তুমি তাকে উদ্ধার কর মা। নাও মা অধম এ সন্তানের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

গান আমি জানিনা তো ভজন, জানিনা সাধন
তাতে যদি দোষ হয় মা
অধম সন্তান ডাকে মাগো তাই
দেখা দাও ওগো মা
(আমরা তোমার অধম সন্তান
জানিনা মাগো সুরের সন্ধান) ২ বার
মা...মা...মা...
তুমি যা করাও তাই করি আমি
তাতে যদি দোষ হয় মা
কালিদাস মাগো মূর্খ ছিল
তোমার কৃপায় জ্ঞানী সে হল
তোমার জ্ঞানে জ্ঞানী হই আমি
তাতে যদি ভুল হয় মা

(একই সাথে ভক্তের কণ্ঠে আরও একটি গান এবং মঙ্গল কাব্যের বন্দনা অংশের মতই দেবী সরস্বতী, দুর্গা, কালি সযও মনসার স্তুতি)

(জাগো জাগো মনসা দেবী তুমি মা জগৎজননী)২ বার
(ডাকি মা তোমায়, দেখা দাও আমায়, এস মা এই আসনে)২ বার
জাগো জাগো মনসাদেবী ... ...
পড়েছি মা গো অকুল দরিয়ায়

রক্ষা কর মা তুমি

জাগো জাগো মনসাদেবী তুমি মা জগৎজননী

অয়ি মা জগৎজননী

(স্তব)

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা ।

শেতাম্ভরধরা নিত্যা শ্বেতাগন্ধানুলেপনা ।।

শেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা ।

শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালংকারভূষিতা ।।

বন্দিতা স্নিগ্ধগন্ধরর্ব্বৈর্চ্চিতা সুরদানবৈঃ ।

পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈ ঋষিভিঃ স্তূয়তে সদা ।।

স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীম্ ।

যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তে তে।।

ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্র কালী কপালিনী

দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তুতে

... ...

সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাংদেহি নমোহস্তুতে।।

ওঁ আস্তিকস্য মুনের্মাতা / ভগিনী বাসুকেস্তথা ।

জরৎকারু মুনেঃ পত্নী / মনসাদেবী নমোহস্তুতে ।।

... .

সর্ব মঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে

শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে।।

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশায় শক্তিভূতে সনাতনী ।

গুণাত্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোহস্তুতে ।।

শরণাগত দীনাত্মা পরিত্রাণ পরায়নে ।

সর্ব পাপ হরে দেবী নারায়ণী নমোহস্তুতে ।।

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।

... ...

রূপং দেহী জয়ং দেহী যশো দেহী দ্বিষো জহি ।।

... ...

[ধীরে ধীরে ঢাকের আওয়াজ থামে, মঞ্চ অন্ধকার হয়]

২

(স্থান – পাতাল)

কদ্রু আজ আমি কিবা বস্তু করিনু ভক্ষণ এই পাতাল মাঝারে। আমি যে আর সহ্য করতে পারছিনা। আমার কণ্ঠ সদা যায় জ্বলিয়া... আজ তুমি কোথায় প্রাণনাথ ? একটি বার তুমি এসে দেখা দিয়ে যাও প্রাণনাথ...

(কদ্রুর গান)

(আজ কিবা বস্তু করিলাম ভক্ষণ ওই পাতালমাঝারে গো) ২ বার

(কোথা আছ ও প্রাণনাথ আস ত্বরা করে গো) ২ বার

(কোথা আছ ও প্রাণনাথ আস ত্বরা করে গো) ২ বার

[গায়েন – একাদশী গাইন]

নেপথ্যে পুরুষ কণ্ঠ একি আজ আকাশে বাতাসে শোনা যায় ক্রন্দনের ধ্বনি !! পাতাল মাঝারে গিয়েছিল কদ্রু, একি হল বিপদ !!

কদ্রু (কেঁদে) প্রাণনাথ ...

নেপথ্যে পুরুষ কণ্ঠ আর কাল বিলম্ব না করে এই মুহূর্তে যাব পাতাল মাঝারে ।

(কশ্যপের প্রবেশ)

কদ্রু আজ কিবা বস্তু পান করিলাম এই পাতাল মাঝারে, না পারি উগলাইতে, না পারি হজম করিতে ।

কশ্যপ কি বলিলে ? কিবা বস্তু করিছ পান এই পাতাল মাঝারে, না পারিছ গিলিতে, না পারিছ উগলাইতে – এই মুহূর্তে ধ্যান যোগে দেখছি।

(মঞ্চের তিন ধাপের পাটাতনের উপরে কশ্যপ ধ্যানস্থ হলেন)

কদ্রু, কোন সাধারণ বস্তু কর নাই ভক্ষণ এই পাতাল মাঝারে ,তুমি পান করিয়াছ শিবরতি।

কদ্রু না ------আ-----আ------ওগো প্রাণনাথ, আমি পাতাল মাঝারে ভক্ষণ করিয়াছি শিবরতি ? বলতে পারো প্রাণনাথ, আমি কি এই জ্বালা থেকে পাবো না নিস্তার ?

কশ্যপ কেন বৃথা চিন্তা কর কদ্রু? কমণ্ডুলুর বারি দিয়ে তোমার গলায় হাত বুলিয়ে দেব, তোমার সকল জ্বালার অবসান হবে।

(কমণ্ডুলুর জল নিয়ে কদ্রুর কণ্ঠ স্পর্শ)

হইয়াছে কি সকল জ্বালার অবসান কদ্রু ?

কশ্যপ শিবরতি ব্যর্থ হবে না কদ্রু, তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে এক কন্যাসন্তান। তার নাম তুমি কী দেবে কদ্রু ?

কদ্রু প্রাণনাথ ...

কশ্যপ নাগমাতা মনসা

কদ্রু তুমি আমায় আশীর্বাদ করো আমী যেন সন্তানের মাতা হতে পারি।

(কশ্যপকে কদ্রুর প্রণাম, কশ্যপের প্রস্থান)

আজ যে আমার বড় আনন্দ , আমার পতি যে বলে গেছে আমি হব সন্তানের জননী।

(দেহের জ্বালায় ছটফট করতে করতে কদ্রুর গান)

একী হল, কী হল, কদ্রুর জঠরে

এক মাস গর্ভবতী কদ্রু এই পাতাল মাঝারে

এক মাস হল, দুই মাস হল,তিন চার মাসে পড়ে গো

(গানের মাঝে কদ্রুর সংলাপ- আমি যে আর সহ্য করতে পারছিনা)

পাঁচ মাস হল ছয় মাস হল মাগো, সাত মাসে পড়ে গো

সাত মাসে পড়ে কদ্রু, সাধভক্ষণ করে গো

আট মাস হল নয় মাস হল , দশ মাসে পড়ে গো

ধীরে ধীরে যায় গো কদ্রু সূতিকার ঘরে গো

[গায়েন – একাদশী গাইন]

কদ্রু ওমা , মা গো ...

(বাচ্চার কান্নার শব্দ)

কদ্রু অমন করে কেঁদোনা, কেন কাঁদছ, মায়ের কোলে দিনে দিনে বড় হও তুমি , সোনা মেয়ে আমার দুষ্টু মেয়ে আমার...

(কদ্রুর গান)

দিনে দিনে বাড়ে আমার মনসা কুমারী গো

দেখিতে দেখিতে মনসা কতই বড় হল রে

আর দেখিতে দেখিতে পদ্মার বারো পূর্ণ হয় গো

দিনে দিনে বাড়ে পদ্মা মায়ের কোলেতে গো...

[গায়েন – একাদশী গাইন]

(ভাসান পালার শুরুতে জন্ম পালার উপরোক্ত দুটি দৃশ্যের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করে মূল পর্বের ঘটনায় চলে যান পালার রূপকারগণ।)

৩

স্থান – চাঁদ বণিকের ভবন

সনকা আজ আমার সন্তানেরে তুমি সুখী রেখো ঠাকুর । আমি যে ছয় ছয় মানিক হারিয়ে আমি যে ওকে পেয়েছি। আমার মানিককে তুমি সুখে রেখ, আমার এই রাজ্য তুমি সুখে রেখো ঠাকুর। তাইতো, আজ আমার খোকা কোথায় ? তাইতো, কেন আমার খোকাকে আমি আমি দেখতে পারছিনা ? তাইতো একটি বার ডেকে দেখিনা আমার খোকা কোথায় ? খোকা...আ...আ...আ

নেপথ্যে পুরুষ কণ্ঠ মাগো তুমি আমায় ডাকছো মা ?

সনকা হ্যাঁ বাবা, আমি খেলা ছেড়ে এক্ষুনি তোমার কাছে আসছি।

(নেপথ্যে পুরুষ কণ্ঠে গান)

যতবার দেখি মাগো তোমায় আমি, সাধ মেটেনা তোমায় দেখে

সাধ মেটেনা কভু তোমায় দেখে

সবাই বলে ভগবান সুন্দর

হবেনা তো সুন্দর তোমার থেকে

(নেপথ্যের পুরুষের সংলাপ – আমি এক্ষুনি যাচ্ছি মা।

সনকা আমি তোমাকে ডাকছি বাবা...

নেপথ্যের পুরুষ আমি যাচ্ছি মা...আ...আ...আ...

সনকা খোকা... আ...আ...আ...)

(মঞ্চে লক্ষিন্দরের প্রবেশ এবং তার কণ্ঠে আবার গানে ফেরা)

ভয় পেলে ব্যাথা পেলে মুখে আসে মা

সুখেতে দুঃখেতে মুখে আসে মা

তোমার আঁচল তলে, স্বর্গেও সুখ মেলে

তার চেয়ে আনন্দ মা ডেকে

যতবার দেখি মাগো তোমায় আমি...

[গায়েন – প্রবীর নস্কর। ১৯৮৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা চলচ্চিত্র 'তুফান' এর জন্য লতা মঙ্গেসকর এর কণ্ঠে জনপ্রিয় এই গানটি সরাসরি মনসাযাত্রায় ব্যবহার করা হচ্ছে।]

সনকা আজ আমি তোমাকে কেন ডেকেছি জানো বাবা ?

লক্ষিন্দর কেন মা ?

সনকা আজ তোমার পিতা কথা দিয়েছেন, এক সপ্তাহের মধ্যে তোমায় বিবাহ করতে খোকা ।

লক্ষিন্দর এ তো আনন্দ সংবাদ মা, পিতা মাতার আদেশ পালন করা সব সন্তানের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু সেই আদেশ পালন করার আগে আমার মনে এক আশা আছে, তোমায় বলি মা ?

সনকা আমি যে তোমার মা খোকা, বল খোকা বল সন্তানের কীবা মনের আশা ?

লক্ষিন্দর বিবাহ করার আগে আমার মনে জাগিয়াছে আশা, আমি যাব মৌনব্রতে মা।

সনকা না...আ...আ...আ..... আমি যে মা খোকা, এই মা যে সন্তানের থেকে দূরে আর থাকতে পারবেনা খোকা।

লক্ষিন্দর কেন তুমি এমন করছ মা ? আমার মৌনব্রত শেষ হয়ে গেলে আমি আবার তোমার কোলে ফিরে আসব মা। আমায় বিদায় দাও মা, আমায় বিদায় দাও।

সনকা না খোকা না, আজ মা হয়ে আমি কেমন করে তোকে বিদায় দেব, বলতে পারিস খোকা? আমি যে ছয় ছয় মানিক হারিয়ে তোকে কোলে পেয়েছি, তুই যে আমার একমাত্র নয়নের মণি...আমি যে তোকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারবোনা খোকা !!

লক্ষিন্দর আমি বুঝেছি মা, আজ তুমি আমাকে মৌনব্রতে যাবার জন্য বিদায় দেবে না... বেশ মা আজ আমি এ গৃহ ত্যাগ করে চললাম মৌনব্রতে।

(সনকার গান)

লখাই ওরে বিদায় দিতে এখন আমি পারবনা রে

(গানের মাঝে লক্ষিন্দরের সংলাপ – তুমি আমায় বিদায় দেবে না মা ?)

(আরে এখন আমি পারবোনা রে বাপ, ওরে পারবোনা রে) ২

আরে, হর পূজে গঙ্গাজলে, তোরে বাঁধে কে শিকলে

(গানের মধ্যে সনকার সংলাপ – খোকা আমি তোকে বিদায় দিতে পারবোনা...)

আর তুই যাবি বাপ মৌনব্রতে অভাগিনীরে পাগল করে

একে একে সব গিয়েছে, তুই গেলে বাপ আসবিনা রে...

ওরে লখাই বিদায় দিতে এখন আমি পারবোনা রে...

[গায়েন – একাদশী গায়েন]

লক্ষিন্দর কেন তুমি এমন নয়নের জল ফেলছ মা, আমি তো বলেছি, মৌনব্রত শেষ হয়ে গেলে আবার আমি ফিরে আসব, আবার আমি তোমায় মা মা বলে ডাকব... বিদায় দাও মা আমি যাই।

সনকা অরে খোকা, আমি জানি এই হতভাগিনী মায়ের কোন কথা তুই শুনবিনা খোকা। তাই বলছি খোকা, আমি তোকে সাজিয়ে দেব ওই মৌনব্রতের জন্য, হাসিমুখে বিদায় দেব খোকা !!

লক্ষিন্দর তুমি আমাকে মৌনব্রতের জন্য সাজিয়ে দেবে মা ? এস মা এস।

সনকা খোকারে...

লক্ষিন্দর তাকিয়ে দেখ মা তাকিয়ে দেখ, আজ আমি মৌনব্রতের জন্য সেজেছি মা... হাসিমুখে আমায় বিদায় দাও মা আমি যাই মৌনব্রতে।

সনকা আজ আমি তোকে বিদায় দেব খোকা !! খোকা...আ...আ...আ...

(মাকে প্রণাম করে লক্ষিন্দরের গান)

জননী আমার তুমি, পৃথিবী আমার, তমার চরণ ছুঁয়ে বন্দনা গাই

হাজার বছর পরে যদি আমি আসি ফিরে, তোমার কোলেতে মাগো ঠাঁই যেন পাই

ওমা ... ওমা ... ওমা ...

দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরেছ, দেখিতে জগত আলো ভুলি কি করে

জীবনে চলার পথে সুখে দুখে দিনে রাতে, আমি যেন তোমাকেই ভুলে না যাই।।

ওমা ... ওমা ... ওমা ...

জননী আমার ... ...

[গায়েন – প্রবীর নস্কর, ২০০৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা চলচ্চিত্র 'মা আমার মা' থেকে গানটি নেওয়া হয়েছে।]

৪

(স্থান - নবগ্রাম)

১নং ব্যবসায়ী দোকানে যত বাকী রাকে সব টাকা আমি লিকে রেকিচি, হালকাতার সময় টাকা পেমেন করেনি, রায়তার মইদ্যে দেকা অইচে, টাকা চেইচি, মেইর্যে মাতা ফাইট্যে দিইচে... বাবা রে বাবা !!

(২ নং ব্যবসায়ীর প্রবেশ)

(নেপথ্যে 'হাড়িপ্পা' দুবার বলা হয় - এরকম শব্দের মাধ্যমে মঞ্চে কৌতুকের আবহ তৈরি হয়।)

১ নং ব্যবসায়ী তোর কী অয়েচে ? ওরম করে আসচিস ?

২ নং ব্যবসায়ী কী বলব দাদা ... ওই রাইতা দিয়ে আসচিলাম, দোকানে বাকী কইরেচে, টাকা চেয়িচি, যেই বলিচি, হাত মেইরে ভেঙ্গে দিইচে।

১ নং ব্যবসায়ী দোকানে বাকী করেচে, টাকা চেইচিস, হাত মেইর্যে ভেঙ্গে দিইচে ? তোর মত মানুষেরে পুঁতে মেরে দেয়নে, ভাগ্য ভালো।

২ নং কেন, কী হয়েচে ?

১ নং কী হয়েচে ? তোর গুনের কতা বলব ?

(দর্শকদের প্রতি)

কী বলব, ওর দোকান আচে, আমার দোকান আচে, দোকানে এয়াশো টাকা বাকী করে, দিএশো টাকা বসিয়ে রাকে , ওরে মাইরবে নাকি আমারে মাইরবে ?

২নং তা তুমি কত টাকা বসাও ?

১ নং তোমার মত ওরম ব্যওসা আমি করি নে। লোক ইওদি ইয়াশো টাকা বাকী করে আমি দুশো ছাড়া বসাই নে, হেঁ হেঁ আমি দুশো টাকা ছাড়া বসাই নে। যা ওইয়েচে ওইয়েচে, সমত্ত লোক মাইরবার জন্য রেডি হয়ে আসচে, আগে দোকানে বই তাপ্পর চিন্তা আবনা করা যাবে।

[দুই ব্যবসায়ীর কথোপকথনের মধ্যে নেপথ্যে লক্ষিন্দরের কথা শোনা যায়।]

নেপথ্যে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আজ আমি হাঁটতে হাঁটতে কোথায় এসে পৌঁছালাম ? অচেনা জায়গা, কিছু চিনতে পারছিনা, ক্ষুধা লেগেছে, কাছাকাছি কোথাও দোকানপাটও দেখছিনা। যে ঠিকানা খোঁজার জন্য পথে নেমেছি, সে ঠিকানাও খুঁজে পেলাম না... যেখানে থাক, সুখে থাক, শুধু তমার ঠিকানা খোঁজার জন্য আমি পথ হেঁটে চলেছি ...

(নেপথ্যে থেকেই লক্ষীন্দরের গাওয়া গান)

যখন সময় থমকে দাড়ায় , নিরাশার পাখি দু হাত বাড়ায়
খুঁজে নিয়ে মন, নির্জন কোন , কি আর করে তখন -
স্বপ্ন স্বপ্ন স্বপ্ন , স্বপ্ন দেখে মন

(লক্ষিন্দরের প্রবেশ)

যখন আমার গানের পাখি, শুধু আমাকেই দিয়ে ফাঁকি,
সোনার শিকলে ধরা দেয় গিয়ে , আমি শুন্যতা ঢাকি।
যখন এ ঘরে ফেরে না সে পাখি, নিস্ফল হয়ে শত ডাকাডাকি
খুঁজে নিয়ে মন, নির্জন কোন কি আর করে তখন
স্বপ্ন স্বপ্ন স্বপ্ন , স্বপ্ন দেখে মন

[সুবিখ্যাত গায়ক নচিকেতার কণ্ঠে গাওয়া এই আধুনিক গানটি পালাগানে গেয়েছেন প্রবীর নস্কর]

১নং ব্যবসায়ী আমরা মরচি আমাদের জ্বালায়, কে মাইক বাজালো চল তো দেকি -

লক্ষিন্দর এই গ্রামে নতুন এসেছি, তাই পথ ঘাট কিছু চিনিনা... সবাইকে আমার নমস্কার। ভাই বলতে পারবে এই গ্রামটার নাম কী ?

১ নং এই গেরামটার নাম হল নবগ্গেরাম ।

লক্ষিন্দর নবগ্রাম ! সুন্দর জায়গা, সুন্দর নাম, তা দাদা এখানে কোন দোকান দেখছি না যে

১ নং এই যে ছোট ছোট কুঁড়ে দেকতি পাচ্চেন, একানে আগে দকান ছেল, কিন্তু পয়সার অভাবে সব বন্দ হয়ে গেচে।

লক্ষিন্দর কী বললে ? পয়সার অভাবে বাজার বন্ধ হয়ে গেছে ? আচ্ছা দাদা, আমি যদি টাকা দিই বাজার আবার নতুন করে চালু করতে পারবে ?

১নং একটা বাজার চালু করতে কত টাকা লাগে জানো ?

লক্ষিন্দর আরে কত টাকা লাগবে বল না ?

১নং পনের ষোল লাখ।

লক্ষিন্দর ঠিক আছে আমি তোমাদের ষোল লাখ টাকাই দিয়ে দেব। তোমরা ঠিক করে নাও কে হাট কমিটির সভাপতি হবে, কে সেক্রেটারি হবে, কে কিসের দোকান দেবে।

১নং (২নং এর কাছে গিয়ে) ভাই তুমি হাট কমিটির সভাপতি হবে আর আমি সেক্রেটারি হব। তালে বল, তুমি কিসের দোকান দেবে ?

২নং (পায়চারি করতে করতে ভাবে) আমি ? কি দোকান দেব, কি দোকান দেব,আমি পা...আ...তু ...লে দেব (বলতে বলতে পড়ে যায়, আবার ওঠে)

১ নং (অবাক হয়ে) পা তুলে দিবি ?

২ নং পা তুলে দেব না, পাতি লেবুর দোকান দেব

১নং এমন ভাবে বইললি যেন পা তুলে দেব...(হেসে গড়িয়ে যায়)। তা তোর কত টাকা লাগবে ?

২নং পঞ্চাশ লাখ

১নং এক থাপ্পড় দেব, পাতি লেবুর দোকান দেবেন আর পঞ্চাশ লাক ?

২নং আচ্চা, তা পাঁচ হাজার টাকায় হয়ে যাবে।

১নং পঞ্চাশ লাক থেইকে পাঁচ হাজার ... (লক্ষিন্দরের প্রতি) তা বাবু, বহুদিন থেকে আমার একটা স্বপ্ন আচে বাবু, আমি একটা দোকান দেব...সেই দোকানের নাম হবে বাবু মনোহারি দোকান।

লক্ষিন্দর এক্কেবারে আমার মনের কথাটাই বলেছ ! ও দাদা তোমার ওই দোকানের সাথে আমার হাফ সেয়ার থাকবে...

১ নং না না ওই সেয়ারে কারবার আমরা করিনা, চল ভাই চল (২ নং এর প্রতি)

(দুজনের চলে যাওয়ার উদ্যোগ)

লক্ষিন্দর আরে দাঁড়াও, আমার কথাটা না শুনে তুমি চলে যাচ্ছ কেন ? শোন দাদা, টাকা দেব আমি, ব্যবসা করবে তুমি, লাভ হলে তোমার, লস হলে আমার। তাও হবেনা ?

১নং হ্যাঁ, তাতে আমি রাজি আছি।

লক্ষিন্দর বেশ, টাকা পয়সা দিয়ে দিচ্ছি, বাজার থেকে মাল আনিয়ে ব্যবসা চালু করে দাও।

(টাকার বান্ডিল দিলেন)

১নং বাবু, একটা কতা বলব ? যদি কিছু মনে না করেন...

লক্ষিন্দর ঠিক আছে, মনে করব কেন ?

১নং বাবু আপনি অনেক টাকাপয়সা আমাদের এই বাজারের জন্য খরচ করছেন, তা সবই তো হল, কিন্তু জানেন বাবু এই বাজারের মনের মত নাম হলনা... টাকা যখন দিয়েচেন, এই বাজারের মনের মত নামকরণ করবেন বাবু ?

লক্ষিন্দর ঠিক বলেছ, এই বাজার বন্ধ ছিল, আবার নতুন করে আমার টাকায় এই বাজার চালু হচ্ছে, তাই এই বাজারের নতুন করে একটা নাম দেওয়া দরকার। শোন দাদা, তোমরা বললে এই গ্রামের নাম নবগ্রাম, আমি এই গ্রামে নতুন মানুষ, আবার নতুন করে আমার টাকায় বাজার চালু হচ্ছে, তাই আজ থেকে এই বাজারের নাম দিলাম আমি নয়াবাজার।

(আলো নিভে যায়)

৫

(স্থান – নয়াবাজার)

১নং বড়বাজার থেকে মাল নিয়ে চলে এসেচি। আরে ভাই সব নামানো হয়ে গেচে ? আর কোন মাল নামানো বাকি নেই তো ?

২ নং সব হয়ে গেচে।

১ নং আর তাহলে কোন মাল বাকী নেই তো ?

২ নং না

১নং তাহলে হাঁকাহাঁকি শুরু করা যাক – এই পুতুল নেবে পুতুল ?

২ নং (হাতে বড় আকার দেখিয়ে) পাতিলেবু আচে পাতিলেবু ?

১ নং পাতিলেবু ইএতো বড় হয় ?

২ নং বড় করে বললে যদি লোক আসে, তাই ...

১নং এই দ্যাক তো, ওই বৌদি গুলো বাজারে না ঢুকে চলে যাচ্ছে না ? আরে ও বৌদি চলে যাচ্চ কেন ? অ্যাঁ? বলে নাকি নোংরা ... নতুন বাজার বসতে না বসতে নোংরা ? আচ্চা ঠিক আচে, আমরা দেকচি। আমরা সেক্রেটারি আচি, সভাপতি আচি, দেকচি।

(বাজারে আর একটু এগিয়ে দেখতে গিয়ে পা পিছলে পড়তে পড়তে বাঁচে)

ইএব্বাবা !! (অন্য কোন দোকানদারের উদ্দেশ্যে) আচ্চা দাদা, এটা কি ঠিক হল ? নতুন বাজার বসতে না বসতে পাতা কপি এনে হাজির করেচ। যত ইচ্ছা জল মারচ, বিক্রি অচ্চে না, পচে গোবর অচ্চে। যাই মাচ পট্টি থেকে ঘুরে আসি।

(পথে আবার পড়তে পড়তে বাঁচে, মাছ বাজারের দোকানদারের উদ্দেশ্যে বলে)

আরে এ কচি, বাবা ? একে বেচাকেনা অয় না, যতসব চিংড়ি মাছ এনে হাজির করেছে... বিক্রি হচ্চে না, জল মারচে, ইস কী দুরগন্দ ... (অন্য দোকানদারদের প্রতি) ওরে ভাই এখানে বেচা কেনা অবেনা, যা পচা গন্দ দোকানদাররা টিকতে পারচে না, তাতে খরিদ্দার রা টেকবে কী করে ? চল দোকান পাট তুলে সব বাড়ি চলে যাই।

(১নং আর ২নং ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ফেরার উদ্যোগ করে, এমন সময় লক্ষিন্দরের প্রবেশ)

লক্ষিন্দর কী ব্যাপার দাদা, এত সকাল সকাল দোকানপাট বন্ধ করে দিয়ে চলে যাচ্ছ, কারণটা কী ?

১ নং বাবু, যে বাজারে শোর ঢোকেনা, সেখানে মানুষ কী করে থাকে ?

লক্ষিন্দর বাজারে শূকর প্রবেশ করেনা, মানুষ প্রবেশ করে।

১নং বাবু, বাজার যা অপইষ্কার, পইষ্কার পইচ্চন্ন না কইরলে কোন খইদ্দার আসচে না।

লক্ষিন্দর বাজার অপরিষ্কার, কোন মানুষ প্রবেশ করছেনা ? শোন দাদা, তা ব্যবসা করবে তোমরা, তা নোংরা হলে দোকানদাররা মিলে পরিষ্কার করে নাও।

১নং অ্যাঁ ? কাকে বলচ ? আমরা একন বাবু ।

লক্ষিন্দর তোমরা বাবু হয়েছ ? তা কার টাকায় বাবু হয়েছ ?

১ নং তা যার টাকায়ই অই, একন আমরা বাবু।

লক্ষিন্দর তা বাবু, তোমরা বল, এই বাজার পরিস্কার করা যাবে কীভাবে?

১নং আমাদের একানে একটা কাজের মেয়ে আছে, তাকে ডাকলে অবশ্যই সে বাজার পরিষ্কার করে দেবে।

লক্ষিন্দর কী নাম তার ?

১নং তার নাম উত্তমা হাড়ি। উই উইধারে থাকে।

লক্ষিন্দর যে পরিষ্কার করবে, তার নাম যখন বলেছ, এবার তোমরা এস। বাজার পরিষ্কার হলে তখন দোকানদারি করবে।

১নং নমস্কার বাবু

লক্ষিন্দর নমস্কার ।

(দোকানদারেরা মঞ্চ থেকে চলে যায়)

লক্ষিন্দর দোকানদারেরা যে বলে গেল, এখানে উত্তমা নামে একটি মেয়ে থাকে, উত্তর দিক মুখ করে ডাকলে সে এসে বাজার পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে। দেকে দেখি, সে আসে কি আমার ডাকে ... বলি ও উত্তমা দিদি...ই...ই... বলি আছেন নাকি...ই...ই...ই... আমার সাথে দেখা করেন গো দেখা করেন।

(নেপথ্যে নারী কণ্ঠ শনা যায় ... যাই গো বাবু যাই ....)

লক্ষিন্দর বলি ত্বরা করে এস......

(নেপথ্যের নারী কণ্ঠে গান)

(উত্তমা হাড়িনী বলে ডাকে, ও বাবু গুণমণি)২ বার

উত্তমা হাড়িনী বলে ডাকে ...

(উত্তমা হাড়িনীর প্রবেশ)

ডাকলে ও কার গুণমণি গো, ডাকলে ও কার প্রাণসজনি,

বিরহ রজনী

নাম ধরে ডাকলে পরে, যদি যেতাম বাড়ি ঘরে

পাড়ার চোখে ধূল ধরে গো, দিবস হয়, হয় রজনী

[গায়েন – মুক্ত বৈদ্য]

উত্তমা কেন ডাকছ বাবু ?

লক্ষিন্দর শোন উত্তমা, দেখ, আমার এই বাজারে দিকে দিকে দুর্গন্ধ বার হচ্ছে, এই বাজার পরিষ্কার করতে তোমায় ডেকেছি উত্তমা।

উত্তমা এই বাজার আমি পরিষ্কার করে দেব, কিন্তু আমার মাইনে কড়ি কে দেবে বাবু ?

লক্ষিন্দর আমি দেব উত্তমা, তোমায় কত করে মাইনে দিতে হবে ?

উত্তমা তাহলে শোন বাবু, দিনে পাঁচশো, মাসে আড়াইশো ।

লক্ষিন্দর শোন, উত্তমা, আমি তোমাকে দিনে পাঁচশো টাকাই মাইনে দেব, কিন্তু তার আগে একটা কথা আছে **উত্তমা,** তোমাকে একটি নয়, দুটি কাজ করতে হবে।

উত্তমা এ বাবু, আমি একা দুটো বাজার পরিষ্কার করতে পারবোনা।

(গান)

(একা হাড়ির মেয়ে আমি দুই বাজারে না পারি) ২ বার

(দুই বাজার না পারি বাবু, এক বাজার পারি) ২ বার

চাঁপাই নগরে থাকি, মাইনে আমার স্বামীর ফাঁকি

অন্নবিনা শুকায় মরি যাইনা কারো সাথেই

[গায়েন মুক্ত বৈদ্য]

উত্তমা দেখ বাবু, একা হাড়ির মেয়ে আমি, তমার অই দুটি বাজার পরিস্কার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

লক্ষিন্দর আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি একা হাড়ির মেয়ে, দুটো বাজার পরিষ্কার করতে পারবেনা, তা বেশ উত্তমা, এখানে যদি লোক পাওয়া যায়, তাকে নাও। যা মাইনে নেবে আমি দিয়ে দেব উত্তমা।

উত্তমা তা বেশ সে যখন আসবে, তার মাইনে কড়িতা তুমি বলা কওয়া করে নিও বাবু।

লক্ষিন্দর আচ্ছা উত্তমা, আমি চায়ের দোকানে বসে আছি, তুমি তাকে ডেকে নাও, সে এলে তুমি আমায় ডেকো।

উত্তমা এস বাবু এস।

লক্ষিন্দর তাহলে আমি গেলাম উত্তমা...

উত্তমা এস বাবু এস।

(লক্ষিন্দরের প্রস্থান)

উত্তমা সে মাতাল আবার মদ খেয়ে কথায় পড়ে আছে, তার ঠিক আছে ? আজ আসুক, ওকে ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়িয়ে তবেই ছাড়বো। বলি ও রামানন্দ...ও...ও...

নেপথ্যে পুরুষ কণ্ঠ এই কি হয়েছে ?

উত্তমা তুই একবার এদিকে আয়, তর একদিন কি আমার পাঁচ ছয় দিন।

নেপথ্যে আমি এখন মালের ঠেকে পড়ে বোতল বোতল সুরা পান করছি।

উত্তমা ও মুখপোড়া তুই একবার এদিকে আয়, ঝাঁটার বাড়ি মেরে তোর সুরা আমি বার করছি।

নেপথ্যে এ, আমি বেশ করে খাবো, আচ্ছা যাই রে যাই ...

(নেপথ্যে পুরুষ কণ্ঠে গান)

(গান শোন কি ? মদের নেশায় পাগল হয়েছি

তোমার দেওয়া মুক্ত মালা গলে পরেছি) ২ বার

(উত্তমার স্বামী রামানন্দের প্রবেশ)

গান শোন কি ... ...

দুঃখ যত, আর্জি তত

আর্জি করে আদর তত

তোমায় আমি ভালবাসি

গান শোন কি ... ...

[গায়েন সত্য মণ্ডল]

(উত্তমা স্বামীকে ঝাঁটাপেটা করে)

উত্তমা মেরে তোকে শেষ করে দেব, সারাটা দিন কোথায় ঘুরিস বল ?

রামানন্দ আমি মালের ঠেকে বসে শুধু বোতল বোতল সুরা পান করছি।

উত্তমা সুরা তোরে গেলাব আমি...

(উত্তমা ও রামানন্দের গান)

(উত্তমা - সারাটা দিন কোথায় ঘুরিস রে

ও রামানন্দ রায়

রামানন্দ – ঝাঁটার বাড়ির মার খেয়ে মাজায় লেগেছে

হরিদাসী আমার বৌ) ২ বার

উত্তমা - ঝাঁটার বাড়ি মারব জোরে

থাকব না আর চলে যাব রে

রামানন্দ – পায়ে ধরি বলছি মাইরি যাইস নারে তুই

হরিদাসী আমার বৌ

[গায়েন ও সত্য মণ্ডল]

রামানন্দ কেন ডেকেছিস রে ?

উত্তমা কেন ডেকেছি শুনবি ? তাহলে শোন – এই নবগ্রামে নতুন বাজার বসেছে, আর সেই বাজার তোকে, আমাকে দুজনকে মিলে পরিষ্কার করতে হবে।

রামানন্দ এ, সে তো নয় করব, কিন্তু কোন শালা রুপেয়া দেবে ?

উত্তমা বাবু দেবে, বাবু।

রামানন্দ কে বাবু ? বাবু তো আমি

(লক্ষিন্দরের প্রবেশ)

উত্তমা এ, বাবু ভদ্র লোক ভদ্র ভাবে কথা বলবি।

রামানন্দ এ, আমি ভদ্র ভাষায় কথা বলব, যেন তোরে শেখাতি হবে... এ বাবু, ভালো আছিস ?

লক্ষিন্দর উত্তমা, এ তুমি কাকে এনেছ, এ তো মদের ঘোরে ঠিক মত কথা বলতে পারছেনা। এ কাজ করবে কী করে ?

উত্তমা বাবু, এই তো সেই রামানন্দ।

লক্ষিন্দর ও, তাহলে ঠিক আছে, রামানন্দ তোমাকে কেন ডাকছি জান ?

রামানন্দ কেন ?

লক্ষিন্দর শোন রামানন্দ, আমার এই বাজারে দিকে দিকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, লোকে এই বাজারে প্রবেশ করছেনা। তাই এই বাজার পরিষ্কার করতে তোমাকে তোমাকে ডেকেছি।

রামানন্দ কোন শালা রুপেয়া দেবে ?

লক্ষিন্দর রামানন্দ, আমি মাইনে দেব, বল, তোমায় কত করে মাইনে দিতে হবে ?

রামানন্দ তুই মাইনে দিবি ?

(উত্তমা ইশারায় বেশি টাকা চাইতে বলে)

এ বাবু, দিনে চার টাকা আর মাসে পাঁচশো করে দিবি। শুধু তাই না বাবু, শুধু তাই না, এ বাজারে কাম করাতে গেলে দুবেলা চোলাই আর পাঁচ বস্তা গাজা দিতে হবে।

লক্ষিন্দর রামানন্দ, মাইনে যা চেয়েছ ঠিক আছে, এত মদ গাঁজা দিয়ে তুমি কি করবে রামানন্দ ?

রামানন্দ এই কী বলব , এই গেলাসে খেয়ে আর নেশা হয় না তাই ভাবলাম অই গেলাসের মধ্যে ঢুকে ঢক ঢক ঢক ঢক করে ....

লক্ষিন্দর রামানন্দ, তোমার মদ খাওয়ার ধরনটাই আলাদা, তা এত গাঁজা নিয়ে তুমি কী করবে রামানন্দ ?

রামানন্দ অই কলকে খেয়ে আর নেশা হচ্ছে না, তাই ভাবলাম ওই ওই গাঁজার বস্তা এক জায়গায় তাল করে ওই তালের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেব । আর নেশার ধোঁয়া পই পই করে ...

উত্তমা অরে হতচ্ছাড়া, এত মদ গাঁজা গিললে তোর টিবি হবে।

রামানন্দ ঘরে বসে বসে সিরাল দেখব।

উত্তমা অরে হতচ্ছাড়া, এ টিবি সে টিবি নয়।

রামানন্দ আমি বুঝতে পেরেছি কালার টিবি।

উত্তমা (রাগে ফিসিফিস করে বলে শিগগিরই যমের দূয়ারে যাবে।) এ টিবি হলে মানুষ মরে সাদা হয়ে যাবে। যা, টাকার কথা বলতে।

লক্ষিন্দর রামানন্দ, তুমি যা চেয়েছ, আমি সব দেব, তবে কাজ করার পর। বাজারে অনেক ধূলো পড়ে আছে, তোমরা যখন পরিষ্কার করবে, তখন লোকের গায়ে লাগতে পারে। তাই যখন পরিষ্কার করবে, আগে অল্প করে জল ছিটিয়ে নেবে। তার পর ঝাঁট দেবে। আমি চায়ের দোকানে বসে আছি। কাজ হয়ে গেলে আমি টাকা দিয়ে দেব। আসি উত্তমা।

উত্তমা এসো বাবু এসো।

[লক্ষিন্দরের প্রস্থান]

রামানন্দ (যেখানে লক্ষিন্দর দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে শুয়ে নমস্কার ক'রে বলে) বাবু তোমায় ফুলে ফুলে নমস্কার।

উত্তমা রামানন্দ, এই রামানন্দ, বাবু কখন হাওয়া হয়ে গেছে, বলে বাবু তোমায় ফুলে ফুলে নমস্কার...এই বাবু কী বলে গেছে ?

রামানন্দ বাবু বলেছে, জল ছিটিয়ে ধূলোর পোকা তাড়াতে।

উত্তমা হতচ্ছাড়া, ধূলোর মধ্যে পোকা হয় ? বাবু বলেছে জল ছিটিয়ে ধূলোগুলোকে মেরে দিতে।

রামানন্দ তালে আমি চলে যাচ্ছি রে ...

উত্তমা কোথায় ?

(রামানন্দের গান)

আসান সে পানি ভরতে ওই রাজার রাজদূয়ারে

ওই রাজার রাজদূয়ারে, ওই রাজার বাস দূয়ারে

পাড়ার লোকে জানতে পারলে, রাস্তায় ধরে মারবে রে !!

আসান সে পানি ভরতে... ...

[গায়েন সত্য মণ্ডল]

(মঞ্চে আলো নিভে যায়)

৬

(স্থান নয়াবাজার)

রামানন্দ বলছিলাম ছোট ছোট ভাই বোনেরা সবাই সরে যাও, কোমরের ঘুনসি কেটে গেছে...

(রামানন্দের গান)

(রাস্তা ছেড়ে তফাৎ হয়ে যা, পানি লাগবে গায়...) ২বার

ও তোরা (পানি লাগবে গায়) ৩ বার, ভিজে যাবি হায়

নামটি আমার নন্দ ঘটী, কাজ না হলে জ্বলবে না হাড়ি

সকল বাবুর কাম যে করি বেতন নাহি পাই।।

[গায়েন - সত্য মণ্ডল]

(উত্তমার প্রবেশ, ঢুকেই জলে পিছলে পড়ে)

উত্তমা ও বাবারে এমন করে জল ছিটিয়েছে, যে আমার কোমরে কটাস। রামানন্দ কোথায় ?

(রামানন্দকে পথের মাঝে পড়ে ঘুমাতে দেখে)

আমার কোমরে লাগিয়ে শান্তির ঘুম ঘুমচ্ছে। তোরে আজকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে শান্তির ঘুম ঘুমোবো।

(ঝাঁটা দিয়ে বেদম প্রহার)

রামানন্দ আ... আ... আ... (নিজের গায়ে পায়ে হাত বোলাতে বোলাতে উঠে বসে)

উত্তমা জল ছেটাতে বলেছে, আর তুই কাদা করেছিস ?

রামানন্দ আচ্ছা হরিদাসী , ছোটবেলা তোর মা কি কোমরে বিয়ারং সিস্টেম করে দেচে নাকি? তুই এত কোমর দোলাচ্ছিলি, আমি ভাবলাম বিয়ারিং সিস্টেম লাগেয়েচে ?

উত্তমা আমার মা কেমন বেয়ারিং লাগিয়েচে দেখবি ? দেখি কোমরটা ঘোরা ?

রামানন্দ আমার কোমর ? (কোমরটা ঘোরায়)

(উত্তমা রামানন্দকে ইশারায় কাছে ডেকে যার পর নাই জোরে তার কোমরে ঝাঁটা দিয়ে মারে, রামানন্দ চেঁচায়)

আ... আ...আ... এবাবা আমার পিছনে একটা ফোঁড়া ছিল, ফেটে গেছে।

উত্তমা আমি বুঝতে পারিনি।

রামানন্দ নে ঝাড়ু মার।

উত্তমা মারছি তাহলে

(উত্তমার গান)

আরে ঝাড়ুদারী, আগয়া ঝাড়ু মার

আরে অ্যায়সা বাজারে হাম দো ঝাড়ু মারি

কিয়া ঝাড়ুমারি গো বাবু কিয়া ঝাড়ুমারি

অ্যায়সা বাজারে হাম দো ঝাড়ু মারি

ঝাড়ু মারি , কিয়া ঝাড়ু মারি

[গায়েন – উৎপল নস্কর]

(নাচ গান করতে করতে দুজনে চারপাশ পরিষ্কার করতে থাকে)

উত্তমা কী হল রে ?

রামানন্দ দম লেগে গেছে।

উত্তমা পরে দম নিস, সব নোংরা আগে ফেলে দিয়ে আয়। ওই যে চাঁই টা বাকী আছে...

রামানন্দ ওই চাঁই না তুললে বাবু সব মাইনে কেটে নেবে।

উত্তমা সব কেটে নেবে।

রামানন্দ যাচ্চি, ওই চাঁই তুলতে যাচ্চি।

উত্তমা তাড়াতাড়ি যা, দেরি করবি না, সকাল হয়ে গেল...

রামানন্দ চাঁই কোই গেল ? (দর্শক আসন থেকে বছর চারেকের একটি বাচ্চাকে তুলে মাথায় বসিয়ে নিয়ে এসে ঝুড়িতে রাখে। হাতুড়ী দিয়ে সেটা ভাঙার অভিনয় করে)

উত্তমা দ্যাখ, আমি মেয়ে মানুষ, আমি যদি না তুলতে পারি, চাগাতে পারি, হাঁটু ভেঙে তুলে নিবি।

রামানন্দ এই, তার আগে আমি শক্তিটা বাইড়ে নি। আমি যেমন যেমন বলব, তেমন ভাবে শক্তিটা বাইড়ে নবি, তালে আর কোন অসুবিধা হবে না।

(দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে ভার তোলার প্রস্তুতি নিতে শেখায় রামানন্দ, উত্তমার হাত ধরে কাছাকাছি আসার চেষ্টা করলে স্বামীকে আবার ঝাঁটা দিয়ে মারে উত্তমা)

উত্তমা শেষ করে দেব একদম।

রামানন্দ আ ...আ...আ... (ব্যাথায় চেঁচায়)

উত্তমা তোল

রামানন্দ প্যান্ট গুটে নি

(দুজনে মিলে চাঁই রূপ ঝুড়িতে বসানো ছেলেটাকে তোলে রামানন্দের ঘাড়ে , বাজনার সঙ্গে নাচ করতে করতে রামানন্দ চাঁই রাখতে বেরিয়ে যায়, খালি হাতে আবার ঢোকে)

উত্তমা রামানন্দ...

রামানন্দ এই দ্যাখ, কনটাকের কাজ শেষ হয়ে গেছে, ঐ বাবুর কোন খবর নেই। মানে বাবুর ধান্দা আমি বুইতে পেরেছি... আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে টাকাটা ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু আমারে চেনেনা, কার টাকা ফাঁকি দেচে জানেনা। আমার নাম হচ্ছে রামানন্দ।

(লক্ষিন্দরের প্রবেশ, কিন্তু রামানন্দ লক্ষিন্দরকে না দেখে বলতে থাকে...)

পথে ঘাটে একবার যদি দেখা পাই বাবুরে কি করব জানিস ?

উত্তমা কি করবি ?

রামানন্দ ওই বাবুরে নাকে ঘুসি মেরে... (হঠাৎ লক্ষিন্দরকে দেখে থমকে দাঁড়ায়)

লক্ষিন্দর রামানন্দ, তোমাদের কাজ হয়ে গেছে ?

রামানন্দ হ্যাঁ বাবু।

লক্ষিন্দর দেখি, তোমরা কেমন কাজ করেছ, তারপর মাইনে দিয়ে দেব। সর্ব প্রথম সব্জি বাজারটা ঘুরে দেখি -

(চারদিক ঘুরে দ্যাখে)

বাঃ খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে। এবার মাছ বাজারটা দেখি -

(ঘুরে দ্যাখে)

তোমাদের কাজ খুব সুন্দর হয়েছে। বাজার খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে। এবার বাজার রম রম করে চলবে। রামানন্দ, তোমার কাজে খুশি হয়ে তোমাকে একমাসের মাইনে বেশি করে দিলাম রামানন্দ।

রামানন্দ বকশিস কেন নেব ? আমার যা বলা কওয়া তাই নেব।

লক্ষিন্দর তোমার যা কথা ছিল, তাই দিয়েও এক মাসের মাইনে বেশি করে দিয়েছি।

রামানন্দ মাইনে যা বলা কওয়া ছিল তাই দিয়েছ, আবার এক মাসের বেশি করে দিয়েছ ?

(লক্ষিন্দরকে পায় হাত দিয়ে প্রণাম)

তা বাবু, আমার ওই জিনিসগুলো ?

লক্ষিন্দর আমি যখন কথা দিয়েছি, জিনিস আমি এনেছি। ঐখানে বটবৃক্ষের গোড়ায় তোমার জিনিস রাখা আছে।

রামানন্দ এ বাবা, ফটকে তো খেয়ে নেবে... ... আমি আসচি।

লক্ষিন্দর এসো।

উত্তমা রামানন্দ, কত দিয়েছে রে ?

রামানন্দ অনেক টাকা দিয়েছে।

উত্তমা দেখি ?

(রামানন্দ উত্তমাকে টাকার গোছা দেয়, উত্তমা লুকিয়ে কিছু টাকা নিজের কাছে রেখে বাকীটা স্বামীর ফেরত দেয়)

রামানন্দ, বাবু খুব ভালো, যা বলেছেন, তার থেকে বেশি দিয়েছেন।

রামানন্দ এই হালকা মতন লাগছেনা ? আমার টাকার বান্ডিল যখন দিই, তখন তো মোটা মত লাগছিল, এখন হালকা লাগছে কেন ?

উত্তমা হতচ্ছাড়া গুণতে জানিসনা, তাই জন্যে।

রামানন্দ এই গুণতে জানিনা তো কি হয়েছে ? আমি দেখছি। আমার সেই লাল নোটটা কই ?

উত্তমা আমি কী জানি ?

রামানন্দ আমি চেক করব। তুই ক্যাশবাক্সে রাখিসনি তো ? আমি চেক করব তোকে।

(উত্তমা ব্লাউজের ভেতর থেকে টাকা বের করে দেয়)

রামানন্দ ক্যাশবাক্স থেকে বেরোচ্ছে, এই সেই লাল নোট। তুই বাবুর সঙ্গে বোঝাপড়া করে আয়।

উত্তমা বেরো আগে বেরো। (লক্ষিন্দরের কাছে গিয়ে)

বাবু আমার টাকা ?

লক্ষিন্দর তুমি কাজ করেছ, তোমার টাকা আমি দিয়ে দেব। কিন্তু তার আগে তোমার সাথে কিছু কথা আছে।

উত্তমা বল বাবু বল

লক্ষিন্দর শোনো, আমি যে কথা জিজ্ঞেস করব, তার ঠিক ঠিক উত্তর দেবে উত্তমা।

উত্তমা ঠিক আছে, বাবু বল।

লক্ষিন্দর আচ্ছা উত্তমা, এই রাজ্যে তুমি বাস কর, নিশ্চয় এই রাজ্যের রাজাকে চেনো ?

উত্তমা কেন চিনব না, আমরা সবাই চিনি।

লক্ষিন্দর তাহলে নিশ্চয় তাকে চেন ?

উত্তমা কাকে?

লক্ষিন্দর আরে বাবা ওই রাজার কন্যা বেহুলাকে।

উত্তমা ও বাবু, ওই বেহুলাকে কে না চেনে ? ওই বেহুলাকে আমরা প্রত্যেকে চিনি বাবু।

লক্ষিন্দর তুমি যদি ছলনা করে ঐ বেহুলাকে নয়াবাজারে নিয়ে আসতে পারো, তুমি যা চাইবে তা-ই দেব।

উত্তমা দ্যাখো বাবু, কাজ করেছি তুমি আমার পয়সা দেবে আমি চলে যাব। আমি তোমাকে অন্য কোন কাজ করে দিতে পারবোনা।

লক্ষিন্দর ভেবে দ্যাখো, আমার এই কাজটা করলে তুমি যা চাইবে, তাই দেব উত্তমা।

উত্তমা তাই নাকি, তাহলে আর সুবর্ণ সুযোগ ছাড়ি কেন ? হাঁড়ির মেয়ে, আর ঝাঁট দিয়ে খাব কেন ? ঠিক আছে বাবু, আমি তোমার কাজটা করে দিতে পারব, তার বিনিময়ে তুমি আমায় আকাশের চাঁদটা এনে দেবে ?

লক্ষিন্দর আকাশের চাঁদ কেউ কাউকে দিতে পারে না, আর আমিত্ত তোমায় দিতে পারবনা। তুমি অন্য কিছু চাইতে পার।

উত্তমা বাবু, আমি হাঁড়ির মেয়ে। হাট ঝাঁট দেওয়া আমার পক্ষে শোভা পায়, কিন্তু কোন রাজার মেয়েকে হাটে বাজারে আনা আমার অসম্ভব কাজ। তোমার ঐ মাইনে আমি রেখে দিয়ে হাঁড়ির মেয়ে চললাম বাবু।

লক্ষিন্দর শোন উত্তমা, তোমার এত বড় স্পর্ধা যে তুমি আমার কথা না শুনে চলে যাচ্ছ ? শোন উত্তমা, তুমি যদি আমার কথা না শোন, আমার কাজ না কর, তোমায় আমি কী করব জান উত্তমা ?

উত্তমা কী করবি ?

লক্ষিন্দর অদূরে ওই বটবৃক্ষের গায়ে আমি তোমাকে বেঁধে রাখব উত্তমা।

উত্তমা এ বাবু !!

(উত্তমার গান)

(আরে, এত জারিজুরি হে নাগর, এতই বাড়াবাড়ি) ২ বার

(বেহুলা সে ফুলের মালা, তাহে নাগর ভারী অবলা) ২ বার

তাহে নাগর দিনের বেলা, কেমনে আনব তারে ?

এত জারিজুরি হে নাগর... ... ...

[গায়েন – উৎপল নস্কর]

উত্তমা দ্যাখ বাবু, আমি তো তোমাকে বলছি, আমার পক্ষে এই কাজ করা অসম্ভব বাবু।

লক্ষিন্দর আমি তোমার কাছে হাত জোড় করে অনুরোধ করছি, তোমার কাছে করজোড়ে মিনতি করছি উত্তমা, আজ থেকে আমি তোমার ভাই। তা এই ভাই এর জন্যে এই কাজ তোমাকে করতে হবে, ঐ বেহুলাকে আনতে হবে নয়াবাজারে।

উত্তমা আজ যখন এই হাঁড়ির মেয়েকে হাটেবাজারে দাঁড়িয়ে এত সম্মান দিলি, আমাকে এত বড় জায়গায় দাঁড় করিয়েছিস বাবু, তোমার ওই বেহুলাকে এই নয়াবাজারে আমি আনব। কিন্তু তার আগে আমার কিছু জিনিস লাগবে বাবু।

লক্ষিন্দর বলো, তোমার কী লাগবে ?

উত্তমা তবে এখান থেকে উজানি নগর পর্যন্ত রাস্তার দুধারে করে দিতে হবে ফুলের বাগিচা, আর উপরে কাপড়ের কারদানি। তাহলে বেহুলাকে আনব নয়াবাজারে বাবু।

লক্ষিন্দর বেশ উত্তমা, তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

উত্তমা দাড়াও বাবু, আর একটা জিনিস লাগবে বাবু ।

লক্ষিন্দর বলো কী লাগবে ?

উত্তমা আর আমার চাই স্বর্ণের পুতুল।

লক্ষিন্দর আমি এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আসি তাহলে?

উত্তমা এসো বাবু এসো।

(আলো নিভল, পরের দৃশ্যে লক্ষিন্দর হাজির, হাতে স্বর্ণের পুতুল)

৭

স্থান – নয়াবাজার

লক্ষিন্দর উত্তমা, তাকিয়ে দেখো উত্তমা, তোমার কথা মত আমি এই নয়াবাজার থেকে উজানি নগর পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে ফুলের বাগিচা বসিয়ে দিয়েছি, উপরে কাপড়ের টাঙ্গাই করে দিয়েছি।

উত্তমা বাবু, এ যে খুব সুন্দর লাগছে। কিন্তু যে জিনিসটা দিয়ে আমি বেহুলার মন ভুলিয়ে আনব, সেই স্বর্ণের পুতুল কোথায় ?

(লক্ষিন্দর হাতের পুতুল উত্তমাকে দেয়)

লক্ষিন্দর এই নাও পুতুল।

উত্তমা বাবু, এ পুতুল যে অতি সুন্দর বাবু।

লক্ষিন্দর শোন উত্তমা, তুমি যদি বেহুলাকে এই নয়াবাজারে নিয়ে আসতে পারো, এই পুতুল তোমার ফেরত দিতে হবেনা। এ আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম।

উত্তমা বেশ বাবু, বেহুলাকে এই নয়াবাজারে আনার জন্য আমি তোমাকে কিছু কটু কথা কইতে পারি, তাতে তুমি কিছু মনে করোনা বাবু।

লক্ষিন্দর না আমি কিছু মনে করব না, কিন্তু উত্তমা তুমি আর এখানে অপেক্ষা করোনা, শীঘ্র যাও ওই বেহুলাকে আনতে।

(লক্ষিন্দরের প্রস্থান)

উত্তমা (দর্শকদের দিকে চেয়ে পুতুল বিক্রির জন্য হাঁকতে থাকে -)

ও দিদিরা সব অমন চুপ করে বসে আছ কেন ? কেউ যদি নিতে চাও তো এস এই সোনার পুতুল।

(উত্তমার গান)

ও তোরা কে নিবি গো আয়, আমার স্বর্ণের পুতুল, তোরা
কে নিবি গো আয়...
কে নিবি গো আয় তোরা, বেলা হয়ে যায় গো তোরা
এ পাড়া হৈতে হাড়ি ও পাড়াতে যায় গো তোরা
সায় বেনের দ্বারে দ্বারে কেমনে হাঁকি
ঘরে ছিল বেহুলা ধনি তায় কি শুনতে পায় গো তোরা,
কে নিবি গো আয়...

[গায়েন – উৎপল নস্কর]

(নেপথ্যে বেহুলার কণ্ঠ)

নেপথ্যে ও ...ও দিদি......ই, যা...আ...ই

(মঞ্চ থেকে উত্তমার প্রস্থান, পরের দৃশ্যে বেহুলার প্রবেশ)

৮

স্থান –উজানি নগর, সায় বেনের মহল

বেহুলা বলি ও দিদি দাঁড়িয়ে যাও, দ্যাখো কতদূর চলে গেছে, ওই যাচ্ছে... বলি ও দিদি, দাঁড়িয়ে যাও গো দাঁড়িয়ে যাও।

(আলো নেভে, দৃশ্যান্তর, উত্তমার প্রবেশ)

৯

স্থান – উজানি নগরের পথ

(উত্তমার আগের গান ধারাবাহিক ভাবে)

আমি নেব বলে তোরা ছুটে ছুটে আয় গো ত্বরা

আমার সোনার পুতুল তোরা কে নিবি গো আয় ...

[গায়েন – উৎপল নস্কর]

(পুনরায় নেপথ্যে শোনা যায় বেহুলার কণ্ঠস্বর)

নেপথ্যে বলি ও দিদি দাঁড়িয়ে যা ...আ...আ...ও।

উত্তমা আরে ধুর ! কখন থেকে বলে যাচ্ছে 'ও দিদি দাঁড়িয়ে যাও'... আরে আমি এখানে...এ...এ...এ।

(বেহুলার প্রবেশ, দুজনে দুজনকে খুঁজতে খুঁজতে পেছনে ধাক্কা লাগে)

বেহুলা দিদি, তুমি আমাকে ধাক্কা মারলে কেন ?

উত্তমা উড়ে এসে জুড়ে বসে বলে 'তুমি আমাকে ধাক্কা দিয়েছো কেন'। আমি তোকে ধাক্কা দিয়েছি, না তুই আমাকে ?

বেহুলা তুমি আমাকে ধাক্কা দিয়েছ।

উত্তমা বেশ, ঠিক আছে, দুজনে দুজনকে ধাক্কা মেরেছি, ঠিক আছে ? আচ্ছা বল, ডাকছিলে কেন ?

বেহুলা বলি ও দিদি, কে যেন ডাকছিল 'পুতুল নেবে পুতুল', সেকি তুমি দিদি ? আমি পুতুল কিনতে এসেছি।

উত্তমা তা পুতুল কিনবি দোকানে যা, আমার কাছে কী চাই ? আমার সংসারে খুব অভাব পড়েছে তো তাই চিৎকার করে বলছিলাম কে নেবে স্বর্ণের চুড়ি ...(হাতের দুখানা চুড়ি দেখায়)

বেহুলা বলি ও দিদি, তুমি দু'হাত তুলে দেখাও তো, দেখি।

(উত্তমা এক হাত তুলে দেখায়)

উত্তমা এই তো ?

বেহুলা দু'হাত।

উত্তমা (স্বগতোক্তি) আচ্ছা চালাক মেয়ে তো , আচ্ছা আমিও যদি মায়ের পেটের মেয়ে হই, আমিও দেখাতে পারি –

(উত্তমা পুতুলটি পেছনের দিকে দু পায়ের মধ্যে লুকায় আর দু হাত তুলে দেখায়। বাজনার সাথে সাথে নাচতে শুরু করে। নাচতে নাচতে পুতুলটি রাস্তায় পড়ে যায়। বেহুলা সেটিকে দেখতে পেয়ে তুলে নেয় এবং চুম্বন করে... উত্তমা বেহুলার হাত থেকে পুতুলটি নিয়ে তার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলে –)

বাবা, ছাল তুলে দিল রে

বেহুলা বলি ও দিদি , ওই পুতুলটা আমায় দেবে দিদি ?

উত্তমা বলি কোথাকার কে / বলে আমড়া ভাতে দাইল

বেহুলা বলি ও দিদি, আমায় ওই পুতুল দাওনা।

উত্তমা ওরে ওই পুতুলের থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর পুতুল পাওয়া যায়।

বেহুলা কোথায় দিদি ?

উত্তমা সে পুতুল খাওয়ালে খাবে, হাঁটালে হাঁটবে, গান করালেও করবে। এখান থেকে দু'মাইল রাস্তা পেরিয়ে নবগ্রাম নয়াবাজারে।

বেহুলা বেশ দিদি, আমি তোমার সঙ্গে যাব। চল দিদি চল।

(বেহুলা উত্তমার হাত ধরে টানে, উত্তমা থামায়)

উত্তমা হালকা হলে কী হবে ? ভাল খেয়া জানে। আমি তোমাকে নিয়ে যাব, আর তোমার মা আমায় আচ্ছা করে ধোলাই দিক।

বেহুলা তুমি কী বলছ ? জান দিদি, আমার মা না খুব ভালো। ও কিচ্ছু বলবে না।

উত্তমা তুমি যদি তোমার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে পার, তাহলে আমি তোমাকে নিয়ে যাব ওই নয়াবাজারে।

বেহুলা ও দিদি, মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে হবে ?

উত্তমা হ্যাঁ, মায়ের কাছ থেকে বিদায় আনতে হবে।

বেহুলা আচ্ছা ঠিক আছে দিদি, আমি ত্বরা করে যাব, ত্বরা করে আসব, আমাকে ফেলে যাবে না তো ?

উত্তমা না না –

বেহুলা ঠিক আছে, আসছি তাহলে।

১০

স্থান – উজানি নগর, সায় বেনের মহল

অমলা কত বেলা হয়ে গেল, আমার সে দুষ্ট মেয়ে কোথায় ? তাকে যে দেখতে পাচ্ছিনা, একটি বার ডেকে দেখিনা, আমার সে দুষ্ট কোথায় ? বেহুল...আ...আ...আ

বেহুলা মা...আ...আ...আ,

(ছুটতে ছুটতে বেহুলার প্রবেশ)

মা, আমি যাব।

অমলা কোথায় যাবি ?

বেহুলা পুতুল কিনতে মা, আমি যাব।

(বেহুলার গান)

যাব স্বর্ণের পুতুল কিনতে মা গো ঐ নয়াবাজারে

(গানের মধ্যে অমলার সংলাপ - না, আমি যেতে দেব না।)

ওই নয়াবাজারে যাব গো মা, পায়ে পড়ি তোমার

যাব স্বর্ণের পুতুল কিনতে মা গো ঐ নয়াবাজারে

[গায়েন – তাপসী নস্কর]

অমলা বেহুলা, তুমি হলে রাজার কন্যা, তোমার যা যা লাগবে বল, আমি তোমায় এনে দেব।

বেহুলা না মা না, আমি তোমার কোন কথা শুনব না, তুমি আমাকে বিদায় দেবে না তো ?

অমলা আমি তো বলছি, আমি তোমায় বিদায় দেব না।

বেহুলা বেশ মা, আমি তাহলে তোমাকে ছেড়ে সবাইকে ছেড়ে এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছি।

(অমলার গান)

ওই নয়াবাজারে যেওনা বেহুলা, ওই নয়াবাজারে...

তুমি আমার মা বেহুলা, আমি তোমার মাগো

কী কী পুতুল কিনবি বেহুলা, কিনে আমি দেব গো

আর চাঁদের বেটা দুর্লভ লখাই দেখলে তোমায় ছাড়বেনা !

[গায়েন – একাদশী গায়েন]

(বেহুলা হাতে পায়ে ধরে মায়ের কাছে অনুমতি চাইতে থাকে)

অমলা আমি তো বলছি বেহুলা, তোমার কী কী লাগবে বল, আমি তোমায় কিনে এনে দেব।

(বেহুলার গান)

বলি ও আমার জননী,

ওমা বিদায় দাও মা এখনি

নয়াবাজারে যাব মাগো

না শুনিব তোমারই

ও আমার জননী...

তারপরে মা খোঁপা বেঁধে দাও গো

মাথায় গোঁজা চিরুনি

অধিক বেলা হয়ে গেল মা

পাছে হারায় হারিণী

[গায়েন – একাদশী গায়েন]

(বেহুলা কাঁদতে থাকে)

অমলা বলি ও বেহুলা, শোন, হাড়িনী নীচু জাতির মেয়ে, আমি ওর সঙ্গে তোকে পাঠাব না।

বেহুলা আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

অমলা আমার বেহুলা আমার সঙ্গে কথা বলবে না, একটি বার ডেকে দেখি, বেহুলা মা... , আচ্ছা আজ আমি তোকে বিদায় দেব মা।

বেহুলা আমার সোনা মা, আমার লক্ষ্মী মা... (জড়িয়ে ধরে মাকে চুম্বন)

অমলা আচ্ছা শোন মা, বাঁ দিকে তাকিয়ে যাবে, বাঁ দিকে তাকিয়ে আসবে।

বেহুলা আচ্ছা মা, আমি আসি মা (মাকে প্রণাম)।

১১

স্থান – নবগ্রাম, নয়াবাজার

লক্ষিন্দর উত্তমা গেছে বেহুলাকে আনতে ঐ নয়াবাজারে। বেহুলা কখন তুমি আসবে এই নয়াবাজারে? তুমি তো জানোনা, তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি এই নয়াবাজার বসিয়েছি। আমি যেদিন তোমাকে একবার দেখেছি, সেদিন থেকে তুমি আমার মন জুড়ে রয়েছ। আজও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তোমার মিষ্টি হাসিমুখ, তোমার কাজল টানা চোখ... কখন আসবে এই নয়াবাজারে, আমি যে বিরহ আর সইতে পারছিনা।

(লক্ষিন্দরের গান)

যে আঁখিতে এত হাসি লুকানো
কুলে কুলে তার কেন আঁখি ধার
যে মনের আছে এত মাধুরী,
সে কেন রয়েছে সয়ে ব্যাথাভার
দ্বীপের শিখায় এত আলো যে
তবু কেন কাজলে সে কালো যে
একেলার ভালোলাগায় কি আসে
কেঁদে কেঁদে হতে চায় দু’জনার

সাগর কখনও চেয়ে দ্যাখেনা
বুকে তার কী রতন রয়েছে
কাঙালের মত তীরে তীরে সে
ফিরে ফিরে অবহেলা সয়েছে

প্রেম যদি ভরে এত সুধা গো
তবু কেন হৃদয়ের ক্ষুধা গো
যে মেঘের রয়েছে এত মমতা
কেন তার বিদ্যুতে এত হাহাকার।।

[গায়েন – প্রবীর নস্কর]

(কানু ঘোষের সুরে, শ্যামল গুপ্তের কথায় তালাত মাহমুদের কণ্ঠে গাওয়া জনপ্রিয় এই আধুনিক গানটি লোকযাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছ)

(আলো নেভে, দৃশ্যান্তর)

১২

(স্থান – নয়াবাজার)

৩ নং ব্যাবসায়ী বাবা বাজারে এত লোক, তা শোয়ার জায়গা পাব ? থাক বাবা, আমার কোন দরকার নেই, পুতুল বিক্রি করতে এসেচি, পুতুল বিক্রি করে চলে যাব। পুতুল আছে পুতুল...

(মাথায় হাড়ি নিয়ে ধুতি পরা, গলায় রুদ্রাক্ষ, মুখে বিড়ি, আর এক বৃদ্ধ ব্যাবসায়ীর প্রবেশ)

৪ নং ব্যাবসায়ী এই দ্যা, ককন এয়েচিস ? এই নে নামা নামা ...

(মাথার হাড়িটি আর এক দোকানদারের সাহায্যে নামায়)

৩ নং এ দাদু, এই হাড়িতে কী আচে ?

৪ নং হাড়িতে ঘুগনি আচে।

৩ নং তা এত গরম কেন ?

৪নং তা গরম হবেনা কি বরফ মেরে নিয়ে আসব ? তা বলচিলাম, ককন বেইরেচিস ?

৩ নং আমি ভোরের টেরেনে এইচি, হেঁ হেঁ...

৪ নং এই ঘরে যাবার জন্য হেইটে যাওয়া যায়, বলে কিনা টেরেনে এয়েচে !! আর আমি সারে চারটের টেকার টা ধরিচি (জিভ কাটে), তা আমাদের রাস্তা পচন্ড খারাপ, ভ্যান নিয়ে যেতে যেতে পাচ বার বেল পড়েচে... তা যা হয় হোক, দুঃখের কতা বলে কাজ নেই... তা ধূপ ধুনো দেওয়া হয়ে গেচে ?

৩ নং না একোনো দিই নি, খালি শুয়ে পরে আচি... হেঁ হেঁ।

৪ নং তা ব্যাবসা করার মন আচে ? বলে কিনা শুয়ে পরে আচে ... তা যা, ভালো করে ধূপ ধুনোটা দিয়ে আয়।

(৪ নং বিড়ি খায়)

এইটে হচ্চে আগরবাতি মঙ্গল ধূপ, এই ধূপ দিয়ে যদি মাকে একবার ডাকা যায়, তো মা কেমনে থাকতে পারবে ? ওঁ গন্দেশ্বরী মা আমার, একটি বার ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ কর মা... ...

(৪ নং ব্যাবসায়ীর গান)

নম নম নম নম গন্দেশ্বরী

ধূপ ধুনো দিয়ে পনাম করি

ওমা খরিদ্দার পাঠায়ে দে তারাতারি

সকাল সকাল বউনি করি

[গায়েন – সত্য মণ্ডল]

মা গন্দেশ্বরী মা...

(উত্তমার প্রবেশ)

৪ নং যদি বেচা কেনা ভালো হয় মা, তোকে রোজ পঞ্চাশ গেরাম বাতাসা দিয়ে, আমি জল খাব, বুড়ির দেব না।

উত্তমা ও বাবা গো, এই মেয়েরে নিয়ে আর পারিনা, সেই যে হাত ছাড়া দিয়ে গেল, আর দেখা নেই। আসুক আজকে, দেখি ওর একদিন কি আমার পাঁচ ছ' দিন।

(বেহুলার প্রবেশ)

বেহুলা ও দিদি, আমি আর হাঁটতে পারছিনা

উত্তমা আর হাঁটতেও হবেনা, এটাই হল সেই নবগ্রাম, নয়াবাজার।

বেহুলা দিদি, আমি পুতুল কিনব।

উত্তমা পুতুল কিনবি ? ওই যে মালা ঝোলানো, ওই দোকানে পুতুল আছে, যা।

বেহুলা তুমিও চল দিদি,

উত্তমা আমাকেও যেতে হবে, আচ্ছা চল।

বেহুলা (একটি দোকানের সামনে গিয়ে বলে) বলি ও দাদা ?

৩ নং (চেঁচিয়ে) আয়না মালা সুই...

বেহুলা ওরে বাবা, (লাফিয়ে উত্তমার হাত ধরে) বলি ও দিদি, ওই দোকানদার কী বাজে কথা বলছে...

উত্তমা কী বলছে ?

বেহুলা আমি বলতে পারব না।

উত্তমা বাজে কথা বলেছে, সরে দাঁড়া – (কোমরের কাপড় টাইট করে বেঁধে তেড়ে আসে ৩ নং এর দিকে) দেখি, হাঁড়ির মেয়ে আমি, ব্যবস্থা করে দেব। এই তুই আমাদের বেহুলাকে কী বলেছিস ?

৩ নং কী বলিচি ?

উত্তমা তুই বেহুলাকে কী বলেছিস ?

৩ নং আমি কি বলিচি ? দেকাচ্চি।

উত্তমা তাড়াতাড়ি দেখা।

৩ নং এটা আয়না, এটা মালা, এটা চিরানি, এটা সেলাই এর সুই।

উত্তমা ও ...ও ... সুই, কেন এটাকে সূচ বলা যায় না ? (বেহুলার প্রতি) ওরে হতভাগী ওর দোকানে যা আছে, তাই তো দেখাচ্ছে।

বেহুলা কী বলেছে ?

উত্তমা আরে ওর দোকানে আয়না মালা সুই সবরকম আছে, তাই তো ও বলছে আয়না মালা সুই...

বেহুলা বলি ও দিদি, আমি বুঝতে পারিনি।

উত্তমা তুমি কোনটা বুঝতে পার ? পুতুল আছে কি জিজ্ঞেস কর।

বেহুলা আচ্ছা, ঠিক আছে, (৩ নং এর কাছে যায়)

বলি ও দাদা, তোমার দোকানে পুতুল আছে কি বল ?

৩ নং আমি একটু কানে খাট আছি, একটু জোরে বলুন।

বেহুলা বলি ও দাদা, তোমার দোকানে স্বর্ণের পুতুল আছে ?

৩ নং তেঁতুল ? (তেঁতুল বের করে দেখায়)

উত্তমা কী কালা রে ...

৩ নং শালা বললে ?

উত্তমা (দর্শকদের প্রতি) তোমরাই বল, আমি শালা বলেছি ? আমি বলেছি কী কালা রে...

৩ নং আবার শালা বলে !!

উত্তমা (রেগে গিয়ে প্রায় মারতে যায় দোকানদারকে, চেঁচিয়ে বলে) পুতুল চেয়েছে, পুতুল।

(৩ নং একটা মুণ্ডুহীন পুতুল বের করে দেখায়)

৩ নং এই দ্যাখ, এটা হল কন্দকাটা –

বেহুলা বলি ও দিদি এর তো কন্ধকাটা, এটা আমার লাগবেনা।

(দোকানী কে ফেরত দেয়, দোকানী আর একটি পুতুল বের করে, বেহুলার সেটাও পছন্দ হয়না, সে পুতুলটিকে ছুঁড়ে ফেলে, ৩ নং আবার একটি বের করে দেখায়)

৩ নং তাহলে দেখ, এটা পছন্দ হয় কিনা ?

বেহুলা ও দিদি, এটা আমার পছন্দ। উম – মা (আনন্দে পুতুলকে চুমু খেতে থাকে)

উত্তমা চুমু খাওয়া আগে বন্ধ কর, আগে দাম দর দক্ষিণে জিজ্ঞেস কর।

বেহুলা আচ্ছা ঠিক আছে, বলি ও দাদা, এ পুতুলের দাম কত ?

৩ নং দাম কত আর বলব ? পাঁচ লাখ টাকা।

উত্তমা পাঁচ লাখ টাকা কোন দিন চোখে দেখেছ ?

৩ নং না চোখে দেখিনি, গুণে দেখেছি।

উত্তমা গুণে দেখেছ ? আচ্ছা ঠিক আছে, ওই পাঁচ লাখ টাকাই দেব, শুধু শূন্যগুলো বাদ দিয়ে দেব।

(৩ নং, ৪ নং ঘুগনি বিক্রেতার সঙ্গে ফিসফিস করে পরামর্শ করে)

৩ নং দাদু ও দাদু, আমার দোকানে খরিদ্দার এয়েচে, পুতুল কিনবে, দাম জিজ্ঞেস করেচে, আমি বলিচি পাঁচ লাখ টাকা। দেবে বলেচে।

৪ নং দেবে বলেচে ?

৩ নং হ্যাঁ। শুধু শূন্যগুলো বাদ দিয়ে।

৪ নং রবিবার করে ইসকুলে গেছিস না ?

৩ নং কেন ?

৪ নং পাঁচ টাকা দেবে ।

৩ নং পাঁচ টাকা ? আচ্ছা ঠিক আছে।

বেহুলা ও পুতুল, একবার কথা বলনা রে...

(বেহুলার গান)

স্বর্ণের পুতুল রে একবার কথা বলনা রে
আমার স্বর্ণের পুতুল রে, একবার কথা বলনা রে
তোকে নিয়ে যাব পুতুল মায়ের কাছে রে
কথা বলনা ওরে পুতুল, একবার হাসো রে
কথা বলনা ওরে পুতুল ...

[গায়েন – তাপসী নস্কর]

(কথা না বলায় বেহুলা পুতুলটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়)

উত্তমা (৩ নং কে পুতুল ফেরত দেয়) এই নাও, তোমার পুতুল রেখে দাও ।

৪ নং সকালবেলা কার মুখ দেখে উঠেছিস ? কোন খরিদ্দার আসছেনা...আরে এই তো চাই ঘুগনি আছে ঘুগনি...ই...ই ...ও বৌদি, দাদার সাথে গণ্ডগোল ? মনের মিল হচ্ছে না ? এক প্লেট খেয়ে যাও, কারেন্টের মত কাজ করবে। ম্যাজিকের মত কাজ করবে চলে এস...

বেহুলা বলি ও দিদি, আমি খাব (ঘুগনির দোকানের দিকে দেখায়)।

উত্তমা (ঘুগনিওয়ালাকে ডাকে) ও দাদু, দাদু...উ...

৪ নং (অন্য কোন বৃদ্ধের প্রতি) ও দাদু, তোমার নাতনী তোমায় ডাকছে।

উত্তমা (৪ নং এর প্রতি) ও দাদু, শুনতে পাচ্ছ না ? কানে কালা নাকি ?

(পেছন থেকে এসে ৪ নং অর্থাৎ ঘুগনিওয়ালাকে ঘুষি মারে, মার খেয়ে উঠে দাঁড়ান বৃদ্ধ)

৪ নং কে আমারে দাদু বলচে ? না হয় মাথার চুল পড়ে টাক হয়ে গেচে, না হয় দাঁত পড়ে গ্যাচে, আমি দাদু ? মনটা তো কচি আচে। হেঁ হেঁ।

(কে ডাকল, পেছনে ফিরে খোঁজে ঘুগনিওয়ালা)

যার মনে আছে চুগনি / সে খাবে আমার ঘুগনি।

উত্তমা ও দাদু, দাদু গো... , বলি তোমার দোকানে ঘুগনি আছে তো ?

৪ নং আচে, কত করে প্লেট জানো ?

উত্তমা কত করে ?

৪ নং আট আনা প্লেট ।

বেহুলা বলি ও দাদা, আমি তোমাকে পঞ্চাশ পয়সাই দেব।

৪ নং না, আমার বুড়ি মানা করে দেচে। আমার ঘরে তিনটে মুরগি আচে, তা মুরগির ডিম বেচে বুড়ি আমায় পুঁজি করে দেচে। বুড়ি বলে দেচে, আট আনার কমে কাউকে দেবে না।

বেহুলা বলি ও দাদা, আট আনা যা পঞ্চাশ পয়সা তাই।

৪নং কী ? এবাবা, আট আনা যা পঞ্চাশ পয়সা তাই ? মিত্যে কতা বলচে। আট আনা আর পঞ্চাশ পয়সা যদি এক হয়, তুমি যা আমি তাই।

উত্তমা কী করে ? আমাদের বেহুলা হল নারী, আর তুমি হলে পুরুষ – তা তুমি আর ও এক কী করে হয় ?

৪ নং তাহলে আট আনা আর পঞ্চাশ পয়সা এক কি করে হয় ?

উত্তমা ঠিক আছে, ঐ আট আনা করেই দেব, দু প্লেট ডাও।

৪ নং আট আনা করেই দেবে, তা দু প্লেটের দাম কত হয় জানো ? (নিজেই হাত গুণে হিসেব করে) আট আনা, আট আনা, দুখানা আট আনা – পঞ্চাশ পয়সা ।

উত্তমা এ কী মূর্খের বাটখারা। কোন দিন ইস্কুল যাও নি ?

৪ নং না –

উত্তমা ঠিক আছে, দু প্লেট দাও।

৪ নং যা, পেলেট রেকে চলে এয়েচি, একটা পেলেট আচে, হবে ?

বেহুলা বলি ও দাদা, একটা প্লেটেই দাও।

উত্তমা বলি ও দাদা, তাড়াতাড়ি দাও, অনেক দূরে যাব।

(ঘুগনিওয়ালা একটা থালা সাজিয়ে নেয়, বেহুলা নেয়)

উত্তমা তা শুধু মুড়ি খাব, সস কই ?

৪ নং সস দোব ? তা দিচ্চি।

উত্তমা আর না থাক, তেতো হয়ে যাবে।

বেহুলা চামচ কই ?

৪ নং অ্যাঁ, চামচ দোব ? দিচ্চি-

(ব্যাগ থেকে কুডুল বের করে বেহুলাকে দিতে যায়, বেহুলা আর উত্তমা সরে যায়)

৪ নং ও শালা, এই মাত্র ঝেড়ে দিচ্ছিলাম ... চিন্তা করতে পেরেচ ? আমার একটা মাত্তর ছেলে, চামচ দিতে বলেচি, কুডুল দে দেচে। এই মাত্র ঝেড়ে দিচ্ছিলাম।

উত্তমা তাড়াতাড়ি দাও।

৪ নং বলচিলাম কি , একটা ছোট হাতা আচে, হবে ?

উত্তমা হ্যাঁ, তাই দাও।

(৪ নং একটা বড় হাতা বের করে দেয়)

এই যে দাদা, ছোট চামচ নেই ?

৪ নং ভালোয় ভালোয় বাড়িতে ফেলে রেখে চলে এয়েচি।

উত্তমা এই এত্ত বড় হাতা, আমাদের বেহুলার মুখের মধ্যে ঢুকবে ?

৪ নং কেন ? কি হয়েচে ঢুকবে না কেন ?

উত্তমা কি করে ঢুকবে এত্ত বড় ?

৪ নং আমি দেখিয়ে দিতে পারি , কি করে ঢোকে ...

উত্তমা দেখাও দেখি তা)

(৪ নং হাতাটা নিজের মুখে পুরে দেখায়, মুখ থেকে বের করে বেহুলাকে দিতে যায়, সে ছিটকে ফেলে দেয় হাতাটা)

উত্তমা হাত দিয়ে খা –

বেহুলা বলি ও দিদি, আমি তোমাকে খাইয়ে দি ?

উত্তমা ভালো করে মাখা।

৪ নং বলি ও বোন, মশলা দেব ?

বেহুলা থাকলে দাও।

উত্তমা থাক থাক আর না, তেতো করে দেবে।

(লক্ষিন্দরের প্রবেশ)

উত্তমা এই বেহুলা, ভালো করে মাখা।

(লক্ষিন্দর পেছন দিয়ে বেহুলার মাথায় ছাতা ধরে, উত্তমা ইশারা করে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়)

বেহুলা বলি ও দাদা, ঝোল দাও, ঝোল কই ?

৪ নং তা বলবে তো ? দিচ্চি। (ঝোল দেয়) আচ্ছা খালি ঝোল নেচ্ছ, তা বুডগুলোকে নে কি আমি বসে থাকব?

বেহুলা আচ্ছা ঠিক আছে, দাও বুড দাও।

(বুড দিতে গিয়ে বেহুলার পেছনে দাঁড়ানো লক্ষিন্দরকে দেখে অবাক হয়ে যায়)

৪ নং (৩ নং কে) এই শালা, বাজারে ভূমিকম্প লেগেচে, চল পালাই।

৩ নং পুতুল বেচতে এইচি, পুতুল না বেচেই চলে যাব ? আর বেচাকেনা হবেনি ?

(বলতে বলতে ৩ নং ও উত্তমার জায়গায় লক্ষিন্দরকে দেখে অবাক হয়ে যায়)

৪ নং এ তোর কী হল ?

বেহুলা বলি ও দাদা, তোমার কী হয়েছে গো ?

৪ নং বলি ও বোন তুমি কার গালে দিচ্চ ?

বেহুলা কেন জানো না ? আমি দিদির গালে দিচ্ছি।

৪ নং (মুখ চেপে হাসে এবং বলে) ওটা তোমার দিদি ? এবাবা, বলে দিদি ...

বেহুলা আমার দিদিকে আমি দিচ্ছি –

৪ নং আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমার দিদি, তা তুমি চোখ বন্ধ করে যদি তোমার দিদির গালে চুমু খেতে পারো, তাহলে বুঝব তোমার দিদি...

বেহুলা আচ্ছা, আমি চুমু খাব।

বেহুলা (চোখ বুজে লক্ষিন্দরের হাত ধরে) ও দিদি, তুমি কোন কথা কইছ না কেন দিদি?

(লক্ষিন্দর কে দেখে অবাক হয়ে ছিটকে চলে যায়, উত্তমা ঢোকে, দৌড়োদৌড়িতে উত্তমা ৪ নং এর

গায়ের ওপর পড়ে যায়, ব্যাথা পেয়ে তারস্বরে কাঁদতে থাকেন ঘুগনিওয়ালা, ওদিকে বেহুলাকে খুঁজে না পেয়ে উত্তমাও কাঁদতে থাকে)

উত্তমা আমার বেহুলা, কোথায় গেল গো ? তোর মাকে আমি কি বলব ?

(বেহুলা ছুটে মঞ্চে ঢোকে)

৪ নং কী কথা বলব, খুব কষ্ট হচ্ছে...

উত্তমা কী কথা ?

৪ নং আমার ঘুগনির হাড়িটা ?

(হঠাৎই ঘুগনির হাড়িটা পেয়ে গিয়ে খুব আনন্দিত হন)

(ভুল করে খোলা ঘুগনির হাড়ি উল্টো করে কোলে নিয়ে বসে, উত্তমা আর বেহুলার দিকে তাকিয়ে আনন্দ ব্যক্ত করে)

ভাবা যায় ? ঘুগনির হাড়িটা পেয়ে গেচি, নাহলে বুড়ি আমায় আস্ত রাখত না। ভাবা যায় ! পেয়ে গেচি ঘুগনির হাঁড়িটা !!

উত্তমা বলি ও দাদা, তোমার ঘুগনির হাড়িটা খুব সুন্দর। যেভাবে ধরে আছ, আর একবার দেখো, খুব সুন্দর।

৪ নং আর দেকতে হবেনা, ঘুগনির হাড়ি আমি বর্তমান দেকেচি। দেব ঘুগনি দেব ? তোমার ঘুগনি লাগবে কি ?

(কোলের দিকে তাকিয়ে উল্টো অবস্থায় ঘুগনির হাড়িটা দেখে চেঁচিয়ে ওঠে)

এ বাবা !! সব পড়ে গেচে... আমি নষ্ট হয়ে গিচি !!!

উত্তমা (বেহুলার প্রতি) তুই কোথায় যাস বল তো ?

বেহুলা তুমি কোথায় গেছিলে বলো ?

উত্তমা আমি তো পান খেতে গিয়েছিলাম।

বেহুলা বলি ও দিদি, জানো দিদি, ওই বিদেশি না আমায় এমনি করে জড়িয়ে ধরেছে। জড়িয়ে ধরে আমার হাতে ঘুগনি মুড়ি খেয়েছে। আর কী করেছে, জানো দিদি ?

উত্তমা কী করেছে ?

বেহুলা আমার মাথায় ছাতা ধরেছে।

উত্তমা হাঁড়ির বোনের সাথে এত বড় ? যা মনে হয় তাই ? দাঁড়া – তোর একদিন কি আমার পাঁচ ছয় দিন। ঝাঁটা কোথায় গেল ? (৩ নং কে ঝাঁটা দিয়ে মারে) কেন এরকম করেছিস বল ?

বেহুলা বলি ও দিদি, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ? আমি এর কথা বলিনি, আমি বলেছি ওই বিদেশীকে...

উত্তমা ওই ঘুগনিওয়ালা ? এই দাদু, তবেরে... আমি ছাড়বোনা কিন্তু।

(৩ নং উত্তমার হাত থেকে ৪ নং কে বাঁচায়)

৩ নং দাদুকে ছাড়ো, মরে যাবে।

বেহুলা বলি ও দিদি , আমি ঐ বিদেশীকে... বলেছি (লক্ষিন্দরকে দেখায়) ।

(লক্ষিন্দরের কাছে গিয়ে উত্তমা পরিকল্পনা মাফিক কাজ যে ঠিক পথে এগোচ্ছে , তা হাত আর চোখের ইশারায় বোঝায়)

উত্তমা বলি, এই যে বাবু... কী মনে করেছ টা কী ?

লক্ষিন্দর কেন ? আমি কী করেছি ?

উত্তমা কী করেছি মানে ? আমাদের বেহুলাকে টেনে ধরেছ কেন ? মাথায় কেন ছাতি ধরেছ ?

লক্ষিন্দর এই কথা ? তা রোদে দাঁড়িয়ে ঘুগনি খাচ্ছিলেন, আমার দেখে দয়া হল, তাই মাথায় ছাতা ধরেছি.....

দিয়েছে, তাই ঘুগনি খেয়েছি , তাতে অপরাধের কী হয়েছে ?

উত্তমা আচ্ছা মেনে নিলাম, একবার ভুল হয়ে গেছে, দ্বিতীয়বার আর আমাদের ছুঁইবে না।

লক্ষিন্দর কেন ?

বেহুলা দিদি, আমরা কুলের সতী।

৪ নং বাব্বা, যা নাচ দিচ্ছিল, তোমরা কুলের সতী নয়, তোমরা কী জানো ?

বেহুলা কী বল ?

৪ নং তোমরা হচ্চে কুলটা (ফিসফিস করে বলে ছুটে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়)।

উত্তমা (লক্ষিন্দরকে) দেখ বাবু, আমরা কুলের সতী হই আর যাই হই একবার যখন বলেছি, আমাদের ছুঁইবেনা তো ছুঁইবেনা।

লক্ষিন্দর কেন, এই বাজার আমার, এই বাজারে আমি যা খুশি তাই করতে পারি। প্রথমে তো মাথায় ছাতা ধরেছি, ঘুগনি খেয়েছি, এবার ছুঁয়ে দেব, একবার নয়, একশো বার নয়, হাজার বার ছুঁয়ে দেব।

(বেহুলার গান)

ছিঃ ছিঃ ছুঁয়োনা কী কর বিদেশী নাগর , আমরা কুলের সতী

বল যে দোকানে যাই, পিছু পিছু যায়, এই কি পুরুষের রীতি

হবে জানাজানি, উত্তমা হাড়িনী, ফাঁসালো কুলের নারী

মা যে বারণ করেছিল, মায়ের কথা না শুনে, এ বেহুলা ঠকে গেল।

[গায়েন – তাপসী নস্কর]

উত্তমা যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর ? আমি যখন এতই বাজে, খারাপ, তোর জাত কুল মান মেরেছি, তুই তোর পথ দ্যাখ, আর আমি আমার পথে যাচ্ছি।

(উত্তমা বেরিয়ে যায়)

বেহুলা দিদি চলে গেছে, আমিও চলে যাচ্ছি...

(বেহুলা চলে যেতে চায়, লক্ষিন্দর থামায়)

লক্ষিন্দর বেহুলা গো, শোন, সোনার মেয়ে গো যেওনা গো, একটি বার দাঁড়াও... আমি যে তোমার জন্য এই নয়াবাজার বসিয়েছি, অনেক কথা বলা বাকী... অনেক কথা বলা বাকী ... দাঁড়াও একবার তুমি...

(লক্ষিন্দরের গান)

শোন গো, সোনার মেয়ে শোন গো

(মোর মনের কথাটি বলি)২ বার

তুমি যে আমার মনের কাননে, রজনীগন্ধা কলি

মনের কথা কী বলি ...

শোন গো সোনার মেয়ে শোন গো

তুমি নতুন চাঁদের লেখা

মোর আকাশে দিলে যে দেখা

হৃদয় সাগর হেরিয়া হেরিয়া হেরিয়া তোমায়,

উঠে তাই চঞ্চলি...

মনের কথা কী বলি ?

শোন গো সোনার মেয়ে শোন গো...

মনে হয় যেন তোমারে শুধু খুঁজেছি জনমভরে

ওগো নিরুপমা তুমি এলে তাই, মানসী মূর্তি ধরে

মোর সকল গানের বাণী ,সে যে তুমি, শুধু তুমি...

জানি তুমি যে আমার প্রেমের দেউলে নব ফুল মঞ্জরী

[গায়েন – প্রবীর নস্কর]

(প্রণব রায়ের কথা আর কমল দাশগুপ্তের সুরে তালাক মাহমুদের কণ্ঠে জনপ্রিয় এই বাংলা আধুনিক গানটি মনসাযাত্রায় ব্যবহৃত হয় আদি ত্রিধারা গীতিনাট্য সংস্থায়)

(উত্তমার প্রবেশ)

উত্তমা সেই যে হাত ঝটকা মেরে আমি আমার মত চলে গেলাম... সে কখনও বাইরে ঘাটে বেরোয় নি, সে পথ ভুলে কোথায় গেল, তার ঠিক নেই।

(হঠাৎ বেহুলা ও লক্ষিন্দরকে দেখতে পায়, তারা দুজনে একে অপরের চোখে চোখ রেখে একাত্ম যেন ...দুজনের সামনে গিয়ে হাত নাড়ে, কিন্তু তাদের সম্বিত ফেরেনা... শেষে বেহুলাকে ধরে নাড়িয়ে দেয়...)

উত্তমা ওরে হতভাগী, বন্ধ কর, সবাই দেখছে যে...

(বেহুলার গান)

(যতনে রেখেছি ভরে, ভালবাসার ভাত কাপড়ে

কত দিন যায় শুধু বলে দে...)২ বার

কত সাধ জেগেছিল, আমার এ হৃদয়ে

ভালবাসার প্রদীপ হয়ে জ্বলেছে

কত দিন যায় শুধু বলে দে...

[গায়েন- তাপসী নস্কর]

বেহুলা বলি ও দিদি, আমি না...

উত্তমা কী বল ?

বেহুলা আমি ঐ বিদেশিকে মনে প্রাণে ভালোবেসে ফেলেছি।

উত্তমা বলে কিনা সতী ? হাটে বাজারে প্রেম করে বেড়াচ্ছে ,বলে কিনা সতি...

বেহুলা বলি ও দিদি, তুমি গিয়ে বলবে আমাদের বাড়ি যাবে কিনা ?

উত্তমা তা ভালোটা কে বেসেছে ?

বেহুলা আমি।

উত্তমা তা তুমি যাও, আমি যাব কেন? আমি যদি যাই আমার জন্য যাব, তোমার জন্য কেন যাব ?

বেহুলা বলছি ও দিদি, আমার যে খুব লজ্জা করছে !

উত্তমা আহা! লজ্জাবতী লতা/ কারো সাথে কয়না কথা।

(বেহুলার মাথার ওড়না ভাল করে টেনে দিয়ে বলে -)

এটা ধর, এটা ভালো করে গায়ে টেনে দিয়ে চলে যাবি।

বেহুলা ও দিদি, আমার যে খুব ভয় করছে।

উত্তমা আরে যা না, আমি পেছনে আছি।

বেহুলা ঠিক আছে, যাই দিদি।

(লক্ষ্মীন্দরের কাছে গিয়ে)

বলি ও বিদেশী আমাদের বাড়ি যাবে ?

লক্ষিন্দর কেন ?

বেহুলা আমি না তোমাকে খুব ভালোবাসে ফেলেছি।

লক্ষিন্দর কতটা ভালবেসে ফেলেছ ?

বেহুলা অনেক, অনেক ভালোবেসে ফেলেছি।

লক্ষিন্দর তোমাদের মত মেয়েদের ভালোবাসা আমি বিশ্বাস করিনা। আজ আমাকে ভালোলেগেছে, কাল অন্য কাউকে ভালো লাগবে, ভালোবেসে ফেলবে, আমাকে ত্যাগ করে তার কাছে চলে যাবে। যাও আমি তোমাদের বিশ্বাস করিনা। এক্ষুনি আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।

(বেহুলার গান)

তুমি ছাড়া আমার জীবনের আলো নিভে যাবে

কত না স্বপন, কত না স্মৃতি, অন্ধকারে ডুবে যাবে

তুমি ছাড়া মোর ...

বুক ভরা আশা নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি

তোমায় ভালোবেসে কত না ছবি মনে এঁকেছি

খোদার লিখন এ শুভ লগন, অন্ধকারে ঢেকে যাবে

তুমি ছাড়া মোর ...

[গায়েন – তাপসী নস্কর]

বেহুলা ও বিদেশী একটিবার কথা বলনা ...

(বেহুলা লক্ষিন্দরের কথোপকথনের সময় উত্তমা মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, এবার সে প্রবেশ করে)

উত্তমা (বেহুলার প্রতি) কী বলেছে, যাবে ?

বেহুলা বলি ও দিদি, আমায় কী বলেছে জানো ?

উত্তমা কী বলেছে ?

বেহুলা বলেছে ও আমাকে ভালোবাসেনা, আমি যেন এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাই।

উত্তমা এত বড় কথা, হাঁড়ির মেয়ে আমি , আর আমার বোন হয়ে তুই কাঁদবিনা। (কোমরের গামছাখুলে এক দিক নিজে ধরে আর এক দিক বেহুলাকে ধরতে দেয়) পাক দে, ভালো করে পাক দে, ওকে বেঁধে নিয়ে তবে আমি যাব।

লক্ষিন্দর ওখানে কী হচ্ছে উত্তমা ?

উত্তমা কেন দেখছনা এখানে একটা রশি পাক দিচ্ছি।

লক্ষিন্দর কেন ?

উত্তমা এখানে একজন দোষী আছে, তাকে বেঁধে নিয়ে যাব তাই।

লক্ষিন্দর সেই দোষী বুঝি আমি ?

উত্তমা হ্যাঁ, তাই।

লক্ষিন্দর শোন উত্তমা, যদি কেউ নিজে যেতে না চায়, তাহলে তাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া যায়না। জোর করে কারো ভালবাসা পাওয়া যায়না। তাই বলছি, সময় হয়ে গেছে, এক্ষুনি বাজার বন্ধ হয়ে যাবে, তুমি বাড়ি চলে যাও, আমি বাড়ি যাব, আমাকে পথ ছেড়ে দাও।

উত্তমা যেমন করে পারো এখান থেকে বিদায় নিয়ে দেখাও।

লক্ষিন্দর বেশ দেখি কেমন করে আটকাও, এই আমি চললাম। এক...

উত্তমা যদি বলে এক, তাহলে বলব, আমাদের দুজনার দিকে দ্যাখ।

লক্ষিন্দর দুই...

উত্তমা যদি বলে দুই, তোমার মত পুরুষকে আমরা গাঁটে বেঁধে থুই।

লক্ষিন্দর তিন...

উত্তমা যদি বলে তিন, তোমার মত পুরুষের সামনে নাচি তাক ধিনা ধিন।

লক্ষিন্দর এই আমি চললাম, মসকরা ভালো লাগেনা। এক, দুই তিন...

(বেহুলা ছুটে গিয়ে তাকে থামায়, বেহুলার গান)

তুমি শুধু আমার এ জীবন

যেও নাক রেখে ওগো বন্ধু

প্রথম যেদিন দেখি তোমায়

বাড়িয়েছি এ আমার মন তো

তুমি ছাড়া কে আছে আমার

মনের গোপন কথা, জানা বোঝার

দুলায় দুজনে এক মনে মনে কত স্মৃতি কত স্বপন

তুমি শুধু আমার এ জীবন...

[গায়েন – তাপসী নস্কর]

লক্ষিন্দর আমি যাব তোমাদের বাড়ি, তুমি যখন আমাকে ভালোবেসেছ, নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু তার আগে আমার কিছু কথা আছে। তোমরা কোকিল পাখি কখনও দেখেছ ?

উত্তমা ও বেহুলা, তুই কখনো কোকিল পাখি দেখেছিস ?

বেহুলা না দিদি, আমি দেখিনি।

লক্ষিন্দর ঐ দ্যাখো, ঐ কদমগাছের ডালে কোকিল কেমন ডাকছে দ্যাখো।

(বেহুলা ও উত্তমা যখন পাখি দেখতে ব্যাস্ত, তখন লক্ষিন্দর তাদের ফাঁকি দিয়ে সেখান থেকে চলে যায়, লক্ষিন্দরের প্রস্থান)

উত্তমা বলি ও বেহুলা, দ্যাখ তোর কোকিল ক্যামন পালিয়েছে।

(বেহুলার গান)

ভালোবেসে মন দিয়ে ফেলেছি তোমায়

আমি বুঝিনি এত জ্বালা ভালবাসায়

আমি, পাব এত দুঃখ ব্যাথা তো পাছে, ভাবিনি তো আগে

সারাজীবন কেঁদে মরি মনের অনুরাগে

বারে বারে তোমার কাছে এ মন শুধু ধায়

ভালোবেসে মন দিয়ে ফেলেছি তোমায়...

উত্তমা এই কান্না বন্ধ কর, কান্না বন্ধ কর। ওই বিদেশী ছাড়া তুই যাবি না তাই তো ? তবে দাঁড়া, আমি গিয়ে দেখি ওই বিদেশী বাবু কতদূর গিয়েছে... যেখানে পাব, কোমরে দড়ি দিয়ে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে আসব। যদি না ফিরে আসি, বুঝবি ওই বিদেশী বাবুও গেছে, আমিও গেছি। দাঁড়া দেখি কতদূর গেল...

(উত্তমার মঞ্চ থেকে প্রস্থান, পুনরায় প্রবেশ)

উত্তমা এই বেহুলা, আমি তোর বিদেশীবাবুকে কোথাও পাইনি, আজকে চল। কালকে খুঁজে দেব।

(লক্ষিন্দরের প্রবেশ, বেহুলা আর উত্তমা চলে যাবার সময় সে সামনে এসে দাঁড়ায়)

উত্তমা বন্ধ কর তোরা, লোক হাসানো বন্ধ কর।

বেহুলা ও দিদি, তুমি যে বললে বিদেশী আসেনি, তাহলে এটা কে ?

উত্তমা এটাই ?

বেহুলা হ্যাঁ, এটাই।

উত্তমা তবে দাঁড়া, তোর এই বিদেশী বাবুর সঙ্গে কিছু কথা বলে নি।

(লক্ষিন্দরের কাছে গিয়ে)

উত্তমা বলি ও বাবু, তুমি যেরম ভাবে বলেছিলে, আমি সেরম ভাবে কাজ করে দিয়েছি। এবার তুমি বেহুলার সঙ্গে যা কথা বলার বলে ওকে আমার হাতে তুলে দেবে। আমি বাড়ি নিয়ে চলে যাব।

লক্ষিন্দর তুমি মিষ্টির দোকানে গিয়ে মিষ্টি খাও, আমি পয়সা দিয়ে দেব। আমি বেহুলার সঙ্গে কথা বলে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব, তুমি ওকে বাড়ি নিয়ে চলে যাবে।

উত্তমা ও বাবু, মিষ্টির দোকানের পয়সা তুমি দিয়ে দেবে ?

লক্ষিন্দর হ্যাঁ, আমি দেব।

উত্তমা যদি গাঁটের পয়সায় খেতাম দু'তিনটের ওপারে যেত কিনা যেত। যখন তুমি পয়সা দেবে, অল্প করে গামলা খানেক খাব। বেহুলা, ছোট্ট করে গল্প করে চলে আসবি। আসি গো...

লক্ষিন্দর একি বেহুলা, তুমি আমার থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছ, কেন ? তুমি হয়ত জানোনা আমি তোমাকে পাওয়ার জন্য এই নয়াবাজার বসিয়েছি। আমি যে তোমাকে ভীষণ ভীষণ ভালোবাসি।

(লক্ষিন্দরের গান)

কত ভালো বাসি যে তোমায়, সে কথা তুমি জানোনা
না গো, সে কথা তুমি বোঝনা ...
কী করে বোঝাই তোমাকে, আমি আমারই মনেরই বেদনা
তুমি চিরদিন শুধু ভুল বুঝে গেলে গো
আমি কাজ ভুলে যাই আঁখি জল ফেলে গো
হাহুতাশে কাঁদে দিন, রজনী প্রভাত হয় না
কত ভালো বাসি যে তোমায় ...
গানে গানে শুনে রাখো বলি তোমাকে , চাঁদেরও কলঙ্ক আছে জেনো
তবু আমার এ ভালবাসাতে, এতটুকু মলিনতা নেই
আর কত দিন বল এ বিরহ সইব
সাথী হারা পাখি হয়ে নীড়ে বসে রইব
কহিব মনেরই কথা, গাঁথিব গো দু'জনা
কত ভালো বাসি গো তোমায়, সে কথা তুমি বোঝনা
কী করে বোঝাই তোমাকে, আমারই মনের বেদনা.....

[গায়েন – প্রবীর নস্কর]

লক্ষিন্দর বন্ধু তুমি কথা বলবেনা, তা হলে এ মুহূর্তে আমি এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি ।

বেহুলা বন্ধু ...উ...উ আমি যে তোমাকে খুব ভালবাসি বন্ধু, আমি যে তোমাকে ছাড়া বাঁচবনা বন্ধু। আমাকে ছেড়ে যেওনা বন্ধু।

লক্ষিন্দর আমি তোমায় ছেড়ে যাব না, আমি কেবল তোমার মন পরীক্ষা করছিলাম যে তুমি আমাকে ভালোবাসো কিনা। সে পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। আমি তোমাকে খুব

ভালোবাসি বন্ধু। এই নয়াবাজারে তাই তো উপস্থিত হয়েছি। আজ আমার মনের কথা আমি তোমাকে বলব, তোমার মনের কথা আমাকে বলবে। চল বন্ধু ঐ বটবৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে বসি। জানো, আজ তোমাকে কাছে পেয়ে আমার মন আনন্দে ভরে গেছে, তাই এই মুহূর্তে আমার কি ইচ্ছে করছে জানো ? ... দ্যাখো, কত সুন্দর আকাশ, আজ আমরা মনের কথা বলতে বলতে ঐ আকাশেই তাকিয়ে থাকব বন্ধু।

(লক্ষিন্দরের গান)

আকাশের চন্দ্র তারা, বাতাশের ইশারায়,
আমি যে তোমার মাঝে হারিয়ে গেলাম
তোমার স্নেহ মায়ায় আমি ধন্য হলাম
জীবনে এমন সুধা পাইনি কারো কাছে
প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রেম আছে
আমি যে তোমার প্রেমে হারিয়ে গেলাম
তোমার স্নেহ মায়ায় আমি ধন্য হলাম

[গায়েন প্রবীর নস্কর]

(নয়াবাজার পর্ব শেষ হলে কাহিনি এগিয়ে যাবে মনসামঙ্গল কাব্যের মূল কাঠামো অনুসারে, চেনা ছাঁচে। তাই এই অংশের বিস্তৃত উল্লেখ করছিনা, কেবল কাহিনি সূত্র উত্থাপন করছি, সেই সঙ্গে পালার জন্য তৈরি লোকগান। এর পর ভাসান পালার মৌলিক সংযোজন গদাই পাল আর পাচির বিয়ের প্রসঙ্গ আবার স্ববিস্তারে বিবরিত হবে।)

১৩

স্থান – চম্পক নগর, চাঁদ বনিকের রাজমহল

ইতিপূর্বে ছয় পুত্র হারিয়ে সন্ত্রস্ত সনকা লক্ষন্দরকে মনসার হাত থেকে বাঁচাতে সাতালী পর্বতে লোহার বাসর ঘর বানাবার পরামর্শ দেয় চাঁদ সদাগরকে। চাঁদ রাজি হয়ে বিশ্বকর্মাকে ডেকে উক্ত কাজের নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে এও নির্দেশ দেন, বাসরে সকল দেবদেবীর নাম খোদিত করলেও চ্যাংমুড়ি কানি মনসার নাম যেন খোদিত না হয়।

১৪

স্থান – সাঁতালী পর্বত

বিশ্বকর্মা নিজপুত্র বিয়াল্লিশ কর্মার সঙ্গে বাসর নির্মাণে রত। পূর্বেই উল্লিখিত বিয়াল্লিশ কর্মা চরিত্রটি পালাকারদের নিজস্ব সংযোজন। এই দৃশ্যে বিবাহের জন্য তার ব্যাকুলতা উপস্থাপিত।

(বিশ্বকর্মা ও বিয়াল্লিশ কর্মার গান)

(আজ বাসর গড়ে বাসর গড়ে বিশ্বকর্মা দ্যাখো গো) ২ বার

আর লৌহ দিয়ে বাসর গড়ে বিশ্বকর্মা দ্যাখো গো

আর লৌহ কেটে বাসর গড়ে বিয়াল্লিশ কর্মা দ্যাখো গো

আর নানান দিকে মূর্তি গড়ে বাসরের গায়ে গো

আর মনসা নাম না লিখিবে বাসরের গায়ে গো

বাসর গড়া সাঙ্গ করে বিশ্বকর্মা দ্যাখো গো

[গায়েন – প্রবীর নস্কর]

১৫

স্থান – চাঁদ সদাগরের ভবন

লোহার বাসর নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। বিশ্বকর্মা কাজ শেষ করে চাঁদকে খবর দিতে এলে চাঁদ খুশি হন। তাদের গৃহে ফেরার সময় উত্তর পথে বাবলা গাছে প্রেতনী থাকায় সেই পথ বাদ দিয়ে অন্য পথে নির্দেশ দেন।

১৬

স্থান - চম্পক নগরীর পথ

মনসা বিশ্বকর্মাকে পুনরায় সাতালী পর্বতে লোহার বাসর ঘরে গিয়ে ঈশান কোণে ছিদ্র করার নির্দেশ দেন। বিশ্বকর্মা বরদানের প্রলভনে রাজি না হলে তাকে পুত্র হত্যার হুমকি দেন। বাধ্য হয়ে বিশ্বকর্মা সম্মত হয়। অবশেষে চাঁদের কাছে মিথ্যে বলে চাবি নিয়ে সে পুনরায় সাতালী পর্বতে যাওয়ার উদ্যোগ করে।

(বিশ্বকর্মার গান)

ভালো ভালো হাতুড় বাটালী আমরা ফেলে এসেছি গো

আমরা সত্য কথা বলছি মহারাজ, মিথ্যে বলছি না গো

আমরা ফেলে এসেছি মহারাজ, নিতে এলাম তাই গো

আমরা, ভালো ভালো হাতুড় বাটালী আমরা ফেলে এসেছি গো

[গায়েন – প্রবীর নস্কর]

মনসার নির্দেশ মত কাজ করে বিশ্বকর্মা। মনসা তাকে আশীর্বাদ করে পৃথিবীতে দেবীর পূজা প্রচার হলে বিশ্বকর্মার পূজাও প্রচারিত হবে। কিন্তু তার পুত্র টাকা অথবা বৌ চাইলে মনসা দিতে অপ্রস্তুত হন। বিয়াল্লিশ কর্মা দেবীর ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেবার হুমকি দিলে মনসা তাদের বাকরুদ্ধ হবার অভিশাপ দেন, সেই সঙ্গে বলে যান যে কোন সতী নারীর গৌরব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের শাপমোচন হবে।

১৭

স্থান – প্রথমে চাঁদের ভবন, পরে সাতালী পর্বত

সনকা দুই দাসীকে সঙ্গে নিয়ে বাসর দেখতে যান।

(সনকার গান)

বাসর দেখতে যায় সনকা সাতালী পর্বতে গো

বাসর দেখতে যায় সনকা...

উপনীত হয় সনকা, বাসর মাঝারে গো

চতুর্দিকে ঘোরে সনকা বাসর মাঝারে গো

ঈশান কোণেতে গিয়ে লৌহের কলাই পেল গো

লৌহের কলাই সনকা আঁচলে বাঁধিল গো

বাসর দেখা সাঙ্গ করে চলে সবে মিলে গো...

[গায়েন – একাদশী গায়েন]

১৮

স্থান – চাঁদ বনিকের ভবন

সনকা ভবনে ফিরে বাসর ঘরের সৌন্দর্যের কথা চাঁদকে বলেন। সনকার পরামর্শ মত চাঁদ ঘটক দ্বিজবরকে লৌহের কলাই দেন এই শর্তে, যে সতী মায়ের সতী কন্যা ওই কলাই রান্না করতে পারবে, তার সঙ্গেই চাঁদ তার পুত্র লক্ষিন্দরের বিবাহ দেবে।

১৯

স্থান - পথ

(ঘটক দ্বিজবরের গান)

ঘটক চলে ঘটক চলে কন্যারই সন্ধানে গো

পূর্ব দিকে যায়রে ঘটক কন্যারই সন্ধানে গো

পূর্ব দিকে গিয়ে ঘটক, কন্যা নাহি পায় গো
পশ্চিম দিকে যায়রে ঘটক কন্যারই সন্ধানে গো
পশ্চিম দিকে গিয়ে ঘটক, কন্যা নাহি পায় গো
দক্ষিণ দিকে যায়রে ঘটক কন্যারই সন্ধানে গো
দক্ষিণ দিকে গিয়ে ঘটক, কন্যা নাহি পায় গো
উত্তর দিকে যায়রে ঘটক কন্যারই সন্ধানে গো
উত্তর দিকে গিয়ে ঘটক, কন্যা দেখতে পায় গো

[গায়েন – সত্য মণ্ডল]

২০

স্থান – উজানি নগর, সায় বেনের ভবন

ঘটক দ্বিজবর সায় বেনের মহলে লক্ষিন্দরের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলে প্রথমে বেহুলার মাতা অমলা সেই প্রস্তাব নাকচ করেন। যে পরিবারের ছয়টি সন্তানের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়েছে, সেই বাড়িতে কন্যাকে বিবাহ দিতে স্বাভাবিক কারণেই আপত্তি করেন তিনি।

(অমলার গান)

চাঁদের সঙ্গে বিবাদ করে বিষহরী গো
দেবনা দেবনা বিয়ে বেহুলা সুন্দরী গো
কে শুনেছে কোন কালে পান্তা খেয়ে পুত্র মরে
ছয় বধূ আড়ি পরে পরমাসুন্দরী গো
দেবনা দেবনা বিয়ে বেহুলা সুন্দরী গয়...

[গায়েন – একাদশী গায়েন]

বিয়ের প্রস্তাবে অস্বীকৃত হবার কারণ স্বরূপ কন্যার ওজনের সোনা চাওয়া হয় ঘটক দ্বিজবরের কাছে। দেবী মনসা স্বয়ং দ্বিজবরের সামনে উপস্থিত হয়ে তাকে সোনা দেন। দ্বিতীয়বার পরিমাপ করার সময় বেহুলা এক ভরি কম হয় সোনার ওজনের থেকে। শর্তপূরণ করতে পারায় সায় বেনে বাধ্য হয় বিবাহ প্রস্তাব গ্রহণ করতে। চাঁদের নির্দেশ মত বেহুলার সতীত্বের পরীক্ষা করতে তাকে দেওয়া হয় লোহার কলাই। মেয়ের জীবনের আসন্ন দুর্যোগের ছবি যেন ভেসে ওঠে অমলার মানসচক্ষে।

(অমলার গান)

ও তোর কী হল ও বেহুলা কী বা বিপদ হবে

ও তুই এক ভরি কম হলি আমার মাথা খেয়ে

ও তুই এক ভরি কম, তাই দিতে হল কেউটে খেকোর ঘরে

ও তোর কী হল কী হল..

[গায়েন – একাদশী গায়েন]

সায় বেনে আক্ষেপ করে বলেন, মেয়ে যদি সতীত্বের পরীক্ষায় কৃতকার্য না হতে পারে, তাহলে সে যেন পিতার হাতে বিষ তুলে দেয়। স্নান শুদ্ধ হয়ে বেহুলা রন্ধনে বসবে, তাই মায়ের কাছে লোহার কলাই দিয়ে সে সরোবরে স্নান করতে যায় ।

(বেহুলার গান)

(সরোবরে স্নান করিতে যাই

আমার কলাই রইল তোমার ঠাঁই

সরোবরে যাই গো আমি, সরোবরে যাই গো) ২বার

[গায়েন – তাপসী নস্কর]

২১

স্থান – পদ্ম সরোবর

(বেহুলার গান)

ও নীল যমুনা, ভাসিয়ে দিলাম,

আমার যত হাসিকান্না

দেনা বলে, দেনা বলে, ঠিকানা

কোথায় গেলে পাব আমার ঠিকানা

যারে ভালবাসি, তারে পাব না

আমার যত হাসি কান্না

[গায়েন – তাপসী নস্কর]

পদ্ম সরোবরে স্নানের সময় ঘাটে বসা ছদ্মবেশী মনসার গায়ে ছিটে আসে বেহুলার পায়ের জল।

(মনসার গান)

ও তুই কেন এলি সরোবরে বেহুলা সুন্দরী

ও তোর পায়ের জল মোর গায়ে লাগালি, আমি বিষহরী

ও তুই কেন এলি সরোবরে বেহুলা সুন্দরী

ও এই অভিশাপ দিলাম তোরে

ও তুই বাসরে হারাবি পতি হবি কড়ে রাড়ি

ও তুই ভাসবি জলে মরা পতি কোলে

ও তুই ছয় মাস ছয় দিন ভেসে যাবি মাঝ দরিয়ার জলে

ও তুই প্রাণপতি প্রাণনাথ পাবি সুরপুরে

ও তুই কেন এলি... ...

[গায়েন - উৎপল নস্কর]

(এই গানটি প্রায় অভিন্ন ভাবেই শোনা যায় মেদিনীপুরের নয়ার পটের গানে। মনসার পট দেখিয়ে পটকারেরা যে গান করেন তার একটি অংশ প্রায় হুবহু মিলে যায় মনসা পালায় ব্যবহৃত এই গানটির সঙ্গে)

মনসা বেহুলাকে স্বরূপে দেখা দেন। গানের মাধ্যমে দেন আত্ম পরিচয় –

(মনসার গান)

(শোন বলি ও পাষাণী

আমি হলাম শিব নন্দিনী

আস্তিক জননী)২ বার

(পত্র পুষ্প কানন বনে

জনম হইল আমার পদ্মের ওপর

এতই অহঙ্কার) ২ বার

বেহুলা মনসাকে জানায় চম্পক নগর থেকে আসা ঘটক দ্বিজবরের আনা লোহার কলাই রান্না করে তাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হবে। এই কারণেই সে পদ্ম সরোবরে স্নান করতে এসেছিল। মা মনসার কাছে সে বিনীত প্রার্থনা করে তিনি যেন তাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার উপায় বলে দেন। লৌহ কলাই রান্নার জন্য মনসা বেহুলাকে নির্দেশ দেন কাঁচা হাড়ি, কাঁচা সরা, আর আড়াই হেলা উলুর বেনা ব্যবহার করতে। মনসার আশীর্বাদেই পর পর তিনবার জলে ডুব দিয়ে বেহুলা জলের তলা থেকে পায় সুবর্ণ শাখা, সুবর্ণ সিঁদুর, এবং সুবর্ণ সাঁড়াশি যা তাকে জীবন যুদ্ধে জিততে সাহায্য করবে।

২২

স্থান - সায় বেণের ভবন

চিন্তিত অমলার কাছে ফিরে আসে সরোবর স্নাতা বেহুলা।

(বেহুলার গান)

ওমা বলব কী আর, তোর বেহুলার কপাল পুড়েছে

তোর বেহুলার কপাল পুড়েছে, তোর বেহুলার কপাল ভেঙেছে

বাসরে হারাব পতি আমায় বলেছে

[গায়েন – তাপসী নস্কর]

মনসার নির্দেশ অনুযায়ী কাঁচা হাড়ি, কাঁচা সরা, আড়াই হেলা উলুর বেনা সংগ্রহ করতে গদাই পালের বাড়িতে পাঠানো হয় দ্বারিককে।

(কুম্ভকার গদাই পালের ব্যক্তিগত জীবন মনসা যাত্রার পালাকারদের নিজস্ব সংযোজন, এই অভিনব অংশটির মঞ্চে উপস্থাপিত রূপটি স্ববিস্তারে তুলে ধরা হল)

২৩

স্থান – গদাই পালের বাসা

(ছেঁড়া ধুতি আর গামছা পরা গদাই মাটিতে বসে কাঁদছে। গদাই এর মুখের সামনের পাটির একটা দাঁত ভাঙা, একটা দাঁত কালো, নাকে সর্বদা সর্দি ঝরছে, সব মিলিয়ে একেবারে কিম্ভূত কিমাকার)

গদাই ওরে মা, তুই কোথায় গেলি রে....

(নেপথ্যে শোনা যায় পুরুষ কণ্ঠ)

নেপথ্যে গদাই পাল বাড়িতে আছ ?

গদাই এই কোন শালা রে ?

নেপথ্যে ওরে বাবা আমি তোর খুড়ো দ্বারিক ।

গদাই খুড়ো কী হয়েছে ?

দ্বারিক ওরে বাবা বাড়ি আছ কী ?

(দ্বারিকের প্রবেশ)

গদাই ওরে মা, তুই কোথায় চলে গেলি রে ?

দ্বারিক কী হয়েছে ?

গদাই ও খুড়ো, আমার মা... (বলেই কাঁদতে শুরু করে)

দ্বারিক তোর মা মারা গেছে ? না তোর মা মারা গেলে, তোর গলায় ধড়া থাকত, তাহলে কী তোর শাশুড়ি মা মারা গেছে ?

গদাই ও খুড়ো ঐ ধারে পড়েছে গো ...

দ্বারিক তা হ্যাঁ রে বাবা, তাহলে কি তোর শালি মারা গেছে ?

গদাই ঐ আলি আলি গেছে গো ...

দ্বারিক তাহলে কি তোর বৌ মারা গেছে ?

গদাই বৌ মারা গেছে... ও মা, ও মা...

(পাগলের মত দাপাদাপি করতে করতে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়)

দ্বারিক নানা নানা, এর হাতে ঠেলা দিলে হবেনা, এর হাতে কামড় মারতে হবে।

(বলেই দ্বারিক গদাইএর হাতে কামড় বসায় , গদাই উঠে বসে)

গদাই ও বাপ বাপ তুই আমায় ছেড়ে কোথায় গেলি ?

দ্বারিক এক চাপড়ে তোমায় সোজা করে দেব। ওঠ দাঁড়া, কী হয়েছে বল।

গদাই বলব, তালে শোনো।

(গদাই পালের গান)

(আমার অতি সাধের বিয়ে
জমি বন্দক দিয়ে
তিন দিনেরই জ্বরে
বউটি গেছে মরে)২ বার
বউ এর হাতে ছিল চুরি
ভোজ দিত মুড়ি
বৌ এর সে মুড়ি খাওয়া হলনা
বৌ এর পায়ে ছিল মল
ধুয়ে খেতাম জল
বৌএর পা ধুয়ে জল খাওয়া তো হল না
[গায়েন – সত্য মণ্ডল]

গদাই ও খুড়ো সে সব কথা শুনলে চোখে জল ধরে রাখতে পারবা না...

দ্বারিক কাঁদছিস কেন রে, আমি তোকে বিয়ে দেব।

গদাই ও খুড়ো, খুব জোর বিয়ে পেয়েছে, আর যে সহ্য হয়না।

দ্বারিক কিন্তু তমার একটা কাজ করতে হবে।

গদাই কি কাজ ?

দ্বারিক তোমায় কাঁচা হাড়ি, কাঁচা সরা আর আড়াই হেলা উলুর বেনা দিতে হবে।

গদাই ঠিক আছে, বে'র পর সব দিয়ে দেব। ও খুড়ো আর সহ্য হচ্ছে না, খুব জোরে বে পাচ্ছে...

দ্বারিক তুই ওই বাঁশবাগানে থাকবি ।

গদাই বাঁশবাগানে ?

দ্বারিক তুই বাঁশবাগানে থাকবি, আমি তোর বিয়ের কথা বলে তোকে ডাকব।

গদাই ও খুড়ো আসছি তালে, আসচি খুড়ো ...

(আলো নিভে যায় / দৃশ্যান্তর)

২৪

স্থান - দ্বারিকের দিদির কুটির

দ্বারিকের দিদি ওমা দেখ না, দেখতে দেখতে আমার পাচি কত বড় হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও কোন পাত্রের সন্ধান পেলাম না। আর আমার ভাই আসবে খাবে আর গাদা গাদা টাকা নিয়ে চলে যাবে, কোন কাজে লাগেনা...

(দ্বারিকের প্রবেশ)

দ্বারিক ও দিদি, দিদি, দ্যাখো আমি একটা সুখবর নিয়ে এসেছি।

দ্বারিকের দিদি আবার কীসের সুখবর ?

দ্বারিক আমাদের পাচির জন্য একটা ভালো পাত্রের সন্ধান করে এনেছি।

দ্বারিকের দিদি ও ভাই, তুমি আমার কত্ত ভালো ভাই।

দ্বারিক তা সে পাচি কোথায় ?

দ্বারিকের দিদি আর পাচি কোথায়, পাচি তো দি রাত গোবর কুড়চ্ছে।

দ্বারিক গোবর কুড়চ্ছে ? তা পাচিকে ডাক।

দ্বারিকের দিদি তা ভাই, পাচি যদি গোবর না কুড়ায়, ঐ ঘুঁটে না বিক্রি করলে আমরা খাব কী ?

দ্বারিক ঠিক আছে, পাচিকে ডাক।

দ্বারিকের দিদি ঠিক আছে, তুমি একটা ছেলে এনেছ, আগে তাকে নিয়ে এস, তারপর পাচিকে ডাকব।

দ্বারিক ডাকব, আচ্ছা ঠিক আছে, বাবা গদাই...

নেপথ্যে পুরুষ কণ্ঠ শোনা যায়

নেপথ্যে যাই...

দ্বারিক আয় বাবা আয় তাড়াতাড়ি আয়

(উল্টো পাঞ্জাবী পরে বরবেশে গদাইএর প্রবেশ)

গদাই ও খুড়ো, এ আমি কোথায় এয়েচি ?

দ্বারিক তোর শ্বশুরবাড়ি।

গদাই আবার মিথ্যে কথা বলিস, এটা আমার শ্বশুরবাড়ি না আমার বৌ এর বাপেরবাড়ি।

দ্বারিক আচ্ছা বাবা তাই...

(গদাই বিড়ি ধরাতে গেলে দ্বারিক ছুটে গিয়ে একটা চড় মেরে তার কাছ থেকে বিড়ি কেড়ে নেয়)

গদাই কী হয়েছে ?

(গদাই আবার বিড়িটা টেনে নেয়)

দ্বারিক একটা থাপ্পড় দেব, ফ্যাল আগে ফ্যাল। এটা তোর শ্বশুরবাড়ি, এখানে বিড়ি খেতে আছে ?

গদাই বিড়ির দাম পঞ্চাশ পয়সা, দিতে পারো ?

দ্বারিক হ্যাঁ, দিয়ে দেব।

গদাই যদি না দাও, আমার নাম গদাই...

দ্বারিক বাবা গদাই, তুমি উল্টো জামা পরে এসেছ কেন ?

গদাই জানো খুড়ো, তিন তিনটে বিয়ে করেছি, সব আমায় ছেড়ে চলে গেছে, তাই আমি উল্টো পাঞ্জাবী পরে এসেছি, বিয়ে করতে।

দ্বারিক সত্যি বাবা, তা তোমার বুদ্ধি আছে। তা বাবা, তোমার গলায় ওটা কী ?

গদাই এ জগত বিখ্যাত ফাঁস , (নিজের গলার মালার দিকে দেখায়) এ ফাঁস একবার যে পরেছে, সে মরেছে।

দ্বারিক তা সত্যি বাবা, তোমার সঙ্গে আমি পারিনে বাবা, তা ঠিক আছে বাবা, তুমি বোস।

গদাই তা এই খানে বসব ? (ধুতি তুলে প্রায় উলঙ্গ হয়ে বসে)

দ্বারিক নতুন জামাই, তা বসার আক্কেলটা দেখ। তুই কি আমার মান সম্মান খাবি ?

গদাই কেন কী হয়েছে ?

দ্বারিক ভালো করে বস, ভালো করে বস।

(গদাই মিথ্যে ধুতি ধরে টানাটানি করে, কোন ফল হয় না)

গদাই ভালো করে বসব ? ঠিক আছে।

দ্বারিকের দিদি তা ভাই এই হল জামাই ?

দ্বারিক হ্যাঁ, এই ছেলে।

দ্বারিকের দিদি তা ঠিক আছে, এত সুন্দর দেখতে ! আমার পাচিকে বিয়ে দেব। তার আগে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করে নিই।

দ্বারিক বাবা গদাই, এ তোমাদের ডাইরেক্ট বিয়ে হচ্ছে। তা তোমার শ্বাশুড়ি মা তোমাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করবে, ঠিক ঠাক উত্তর দেবে।

গদাই বলে ফ্যালো।

দ্বারিক দিদি যা, জিজ্ঞেস কর।

দ্বারিকের দিদি আচ্ছা, ঠিক আছে আমি জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা বাবা বলতো তোমার নাম কী ?

গদাই আমার নাম ? সে তো অনেক বড়।

দ্বারিকের দিদি ঠিক আছে বল।

দ্বারিক নাম জিজ্ঞেস করেছে নাম বলবি, তার আবার এত বড় কী ?

গদাই ঈশ্বর ছিরি বিচ্ছিরি গদাই চন্দ্র পাল।

দ্বারিকের দিদি ও ভগবান, এ আবার কী নাম ! আচ্ছা বাবা, বলতো তোমার বাবার নাম কী ?

গদাই আমার বাবার নাম একটুখানি, বলব ?

দ্বারিক বল।

গদাই তা বাবা তো পাঁচ বছর আগে মারা গেছে। তা মারা গেলে ছিরিমতী হয় না কুমারী হয় ?

দ্বারিক তোমায় একখানা চাপড় দেব। স্কুলে একদিনও গেছিলে ? মরে গেলে ঈশ্বর হয় ঈশ্বর।

গদাই অ্যাঁ তুই ইস্কুলে গিছিলি ?

দ্বারিক তুই গিছিলি ?

গদাই হ্যাঁ, বারবার করে গেছিলাম।

দ্বারিক (দিদিকে) বল তুই।

গদাই ছিরিমতী কুমারী পাঁচুগোপাল হালদার।

দ্বারিকের দিদি ও ভাই জামাই হল পাল, তা বাবা কেন হালদার ?

দ্বারিক এইটা আমার মাথায় আসেনি। জিজ্ঞাসা কর তো দেখি ঠিক করে।

দ্বারিকের দিদি আচ্ছা বাবা বলতো, তুমি যদি পাল হলে তোমার বাবা কি করে হালদার হল ?

গদাই বুইতে পারলেন না ? বাবার সাথে গণ্ডগোল হয়ে গেছল,তাই বাবা আমাদের আলাদা করে দেছে।তা আলাদা যখন করে দেছে, কী হবে বাবার টাইটেল রেখে ? তাই সোজা চলে গেছি কোর্টে। কোর্টে যায়ে আমি পঞ্চাশ টাকা ঘুষ দে টাইটেল আলাদা করে নিছি। তাই বাবা হালদার আছে আমি সোজা পালে চলে গেছি।

দ্বারিক তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে।

দ্বারিকের দিদি আচ্ছা বাবা, তোমার আজকে বিয়ে, তা ঐ দাওয়ায় বসে কুমড়ো কাটা হয়, তা কুমড়ো বানানটা বল।

গদাই কুমড়ো ? দা এর এ মুড়ো আর ও মুড়ো কুমড়ো ।

দ্বারিক বলছি না ও সব পাশ।

দ্বারিকের দিদি পাশ ? তা দাবা বানানটা বল।

গদাই দাবা ? তোর বাবা আমার বাবা দাবা।

দ্বারিকের দিদি আর একটা প্রশ্ন করব। ঐ ভাবো সব্জি কাটলাম চুবড়ি করে, ধুইতে হবে তো ? তা চুবড়ি বানানটা বল।

গদাই চুবড়ি ? তোর মা বুড়ি, আমার মা বুড়ি, চুবড়ি।

দ্বারিকের দিদি ঠিক আছে বাবা, এই জামাই আমার পাচির সাথে বিয়ে দেব। ঠিক আছে ভাই, আমার পাচিকে আমি ডাকছি। বলি ও মা পাচি, তোর মামা এসেছে, ত্বরা করে আয় মা.....

(ঘুঁটের ঝুড়ি হাতে পাচির প্রবেশ)

দ্বারিকের দিদি বলি ও মা কতদিন পরে তোমার মামা এসেছে, তোমার মামা তোমাকে ডাকছে।

পাচি (গদাইকে দেখিয়ে বলে) ওই গালপেঁচা আবার কি করতে এসেছে ?

দ্বারিকের দিদি ওরম বলতে নেই বাবা।

দ্বারিক আমি কী বলছি শোন।

পাচি কী ?

দ্বারিক আমি কেন ডাকতিচি জানিস মা ?

পাচি কেন ?

দ্বারিক তাকিয়ে দেখ, তোর জন্য ভালো ছেলে এনেছি, বিয়ে দেব বলে।

পাচি একটা কথা বলব মামা ?

দ্বারিক কী ?

পাচি আমার না বিয়ে করতি ভাল্লাগে না ।

দ্বারিক কেন মা ?

পাচি তুই যে ছেলে এনেছিস, পারিস যদি আমার মার সাথে বিয়ে দিয়ে দে।

দ্বারিক তোর মার একবার বিয়ে হয়েছে, আর কী হয় ? তুমি বড় হয়েছ, তোমাকে বিয়ে করতে হবে।

দ্বারিকের দিদি আমি বলি কি শোন মা, তুই অনেক বড় হয়েছিস মা, আমি একা, তোর মামা একটা পাত্র এনেছে, তুই অমত হোস না মা, স্বীকার হয়ে যা।

পাচি ও বুঝতে পেরেচি, পছন্দ হলে আমার, পছন্দ না হলে আমার মার।

দ্বারিক তাহলে তুই বিয়ে করবি তো ?

পাচি হ্যাঁ।

দ্বারিক ও দিদি, পাচি রাজি হয়ে গেছে, তুমি রান্নার জোগাড় কর, আমি বিয়ে দিয়ে দেই।

দ্বারিকের দিদি ঠাকুর মশাই সেজে তুমি ওদের বিয়ে দিয়ে দাও।

দ্বারিক বাবা গদাই, তোমাদের বিয়ে হবে, মালা বদল হবে।

পাচি এ মামা, তাড়াতাড়ি দে না, ভাল্লাগেনা।

দ্বারিক আমি যা বলব তাই করবে, আমি কিন্তু ঠাকুর মশাই।

গদাই ঠিক আছে, তুমি আমার গরুজন, তুমি যা বলবে তাই।

দ্বারিক বল নমঃ

গদাই বল নমঃ

দ্বারিক বল টা বাদ দাও, মন্ত্রটা বল।

গদাই বলটা বাদ দাও, মন্ত্রটা বল।

দ্বারিক এ ছেলে আমার মাথাটা খেয়ে নেবে দেখছি।

গদাই এ ছেলে আমার মাথাটা খেয়ে নেবে দেখছি।

দ্বারিক গদাই, ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি ? বিয়ে হচ্ছে, ইয়ার্কি নয়।

গদাই গদাই, ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি ? বিয়ে হচ্ছে ইয়ার্কি নয়।

দ্বারিক আমি কিন্তু রেগে যাচ্ছি গদাই।

(দ্বারিক গদাইএর কান মোলে, গদাইও দ্বারিকের কান মোলে। দ্বারিক গদাই এর গালে থাপ্পড় মারে,

গদাইও দ্বারিকের গালে থাপ্পড় মারে)

দ্বারিক হারামজাদা, তুই আমায় মারলি ?

গদাই হারামজাদা, তুই আমায় মারলি ?

দ্বারিক ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি।

(গদাই পায়ে প'ড়ে আটকায়)

পাচি এ মামা, তাড়াতাড়ি দে না ভাল্লাগে না ।

দ্বারিক হ্যাঁ হ্যাঁ মা...

দ্বারিক মধুকূল্য গোত্রস্য ...

গদাই মধুকূল্য গোত্রস্য...

দ্বারিক মা পাচি তোমার গোত্র কী ?

পাচি বুলবুলে ।

দ্বারিক আচ্ছা বুলবুলে গোত্রস্য...

গদাই আমি বলব ?

দ্বারিক তোমার বলা হয়ে গেছে, আমি বলতিছি...গদাই আর পাচির শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হল। বল আজ থেকে পাচির ভাত কাপড়ের দায়িত্ব আমার।

গদাই এ ... আমি বিয়ে করতিচি, আর তুই ভাত কাপড়ের দায়িত্ব নিবি ?

(দ্বারিককে মারতে যায়)

দ্বারিক আচ্ছা বাবা, আমি তো বিয়েটা দিচ্ছি...

গদাই আজ থেকে পাচির ভাত কাপড়ের দায়িত্ব নিচ্ছি আমি।

দ্বারিক বলি ও দিদি...ই...

(দ্বারিকের দিদির প্রবেশ)

দ্বারিকের দিদি বলি ও ভাই, বিয়ে হয়ে গেছে ?

দ্বারিক হ্যাঁ, বিয়ে যখন হয়ে গেছে, তুমি কায়দা করে ওদের বিদায় করে দাও।

(গদাই এর কাছে গিয়ে)

গদাই, বিয়ে যখন হয়ে গেছে আমি একটা গাড়ি বুক করে নিয়ে আসি, সেই গাড়ি করে তুমি ভোঁ ...ও করে চলে যাবে।

গদাই ঠিক আছে, তুমি লড়ি নিয়ে আসবে।

দ্বারিক অ্যাঁ ?

গদাই হ্যাঁ, লড়ি করে বৌ নে যাব।

(দ্বারিক চলে যায়)

গদাই এ শ্বাশুড়ি, তাত্তাড়ি বিদায় করে দে।

দ্বারিকের দিদি আজকে তোমাদের যাওয়া হবেনা। তোমরা আজকের দিনটা থাকো, কাল শুক্রবার, কাল আর রাখবনা, তোমাদের পাঠিয়ে দেব।

গদাই ঝপ করে বিদায় করে দে।

দ্বারিকের দিদি না আমি আজকে তোমাদের যেতে দেব না।

গদাই যদি না বিদায় দিস, আমি জোর করে চলে যাব।

(দ্বারিকের দিদির আর গদাই এর গান)

(জামাই বুঝো না সুঝো
আমার বাড়িতে পুজো
কোন পরানে পাঠাই মেয়েকে
দেখবে না পূজো) ২বার
(আজকের দিন থাকো জামাই
শুক্রবার আর রাখব না
অত চালাকি চলবে না) ২ বার
জামাই বুঝো না সুঝো ...

[গায়েন – একাদশী গায়েন আর সত্য মন্ডল]

গদাই এ শ্বাশুড়ি, তুমি বিদায় দেবেনা ? যদি বিদায় না দাও , তোমার মেয়েকে জোর করে নে চলে যাচ্ছি।

(পাচির মা আর পাচির গান)

ও পাচি পাচি রে...

যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি রে ...

(আলো নিভল, দৃশ্যান্তর)

২৫

স্থান – গদাই পালের কুটীর

গদাই পাচি, এটাই আমার বাড়ি।

পাচি এটাই বাড়ি ?

গদাই আমি চাক ধরব, তুমি চাকে জল দেবে, যখন মানা করব, দেবে না।

পাচি ঠিক আছে।

গদাই তালে শুরু করছি।

(পাচি আর গদাই এর গান)

(জল ঢালরে ওরে গদাই, মৌচাকের গোড়ায়

মৌচাকের গোড়ায় রে পাচি, মৌচাকের গোড়ায়) ২ বার

[গায়েন – উৎপল নস্কর আর সত্য মণ্ডল]

গদাই এ পাচি, তুই বাড়িতে থাক, আমি কাঁচা হাড়ি, কাঁচা সরা, আর আড়াই হেলা উলুর বেনা রাজদরবারে রেখে আসছি।

পাচি ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি।

গদাই আসি রে...

(গদাই পাচির বিয়ের পর্ব শেষ হলে কাহিনি আবার মনসামঙ্গলের চেনা খাতেই এগিয়েছে, তাই পরবর্তী অংশের কেবল আর সংলাপ ধরে বিস্তারিত আলোচনা করছি না, কাহিনি সূত্র আর পালাকারদের রচিত গান গুলিই কেবল তুলে ধরছি)

২৬

স্থান - বেহুলার পিত্রালয়

(অমলার উপস্থিতিতে বেহুলার লোহার কলাই রন্ধন)

(বেহুলার গান)

জয় মা মনসা বলে বেনার মুখে দিলাম আগুন

মা মনসার বরে যদি জ্বলে সে দ্বিগুন

ও তুই মন সাধে আমার মা মনসার পায়

অন্তর্যামী মা মনসা সরার ওপর বসে

সরা খুলে দেখি কলাই রন্ধন হয়ে গেছে

ও তুই মন সাধে আমার মা মনসার পায়

কলাই রন্ধন করব আমি অত কিসের দায়

ও তুই মন সাধে আমার মা মনসার পায়।

২৭

স্থান- চম্পক নগর, চাঁদ বনিকের ভবন

চাঁদ আর সায় বেনের পরামর্শে লক্ষিন্দর আর বেহুলার বিবাহের দিন স্থির হয়... বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহ পূর্ব আশীর্বাদ অনুষ্ঠান। বেহুলা লক্ষিন্দরের প্রতিরূপে ছোট দুটি ছেলেমেয়েকে সাজিয়ে মঞ্চে তুলে আশীর্বাদ পর্ব চলে বেশ কিছুক্ষণ। গানে গানে দর্শকদের মঞ্চে ডেকে নেওয়া হয় অনুষ্ঠানে সামিল হতে, দর্শকেরা উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি করেন।

(আশীর্বাদের গান)

আশীর্বাদী হবে আমার বেহুলা লক্ষিন্দর গো

কোথায় আছ, নায়েকবাবু আশীর্বাদী করো না গো

কোথায় আছ বেহুলার মাতা, আশীর্বাদী করো না গো

কোথায় আছ লখাইয়ের পিতা, আশীর্বাদী করো না গো

আরে আশীর্বাদী না করিলে বিয়ে তো হবেনা গো

আরে দেরী হয়ে যায় মাগ, ত্বরা করে এস গো

আরে আশীর্বাদী না করিলে বিয়ে তো হবেনা গো

কোথায় আছ, নায়েকবাবু আশীর্বাদী করো না গো

আশীর্বাদী করে দেখ সায় বেনে গো

আশীর্বাদী করে বাবু মান রাখো গো

কোথায় আছ, নায়েকবাবু আশীর্বাদী করো না গো

আরে আশীর্বাদী না করিলে বিয়ে তো হবেনা গো

নিজ সন্তান মনে করে মা আশীর্বাদী কর গো

[গায়েন – একাদশী গায়েন]

বলি ও লখাইএর মা, তুমি শুনতে কি পাওনা ?
আশীর্বাদী করে ওদের মান রাখোনা
আরে লখাইএর পিতা ত্বরায় এস না
আশীর্বাদী করে ওদের মান রাখোনা
আরে লখাইএর মাতা ত্বরায় এস না
আশীর্বাদী করে ওদের মান রাখোনা
বলি বসে কেন ও মায়েরা ত্বরায় এস না
আশীর্বাদী করে ওদের মান রাখোনা
(ঠাকুরমারা ভাবছে বসে যাব কিনা যাব
দুটি টাকা থাকলে হাতে পান কিনে খাব) ২বার
(বৌদিরা ভাবছে বসে যাব কিনা যাব
দুটি টাকা থাকলে হাতে কড়াই কিনে খাব) ২বার
(কোথায় আছ নায়েকবাবু ত্বরায় এস না
আশীর্বাদী করে ওদের মান রাখোনা)২ বার
আশীর্বাদী হবে আমার বেহুলা আর লখাইএর গো
বলি ও লখাইএর মা, তুমি শুনতে কি পাওনা ?
আশীর্বাদী করে ওদের মান রাখোনা
কোথায় আছ নায়েকমাতা ত্বরায় এস না
আশীর্বাদী করে ওদের মান রাখোনা
[গায়েন – উৎপল নস্কর]
একবার ভেবে দেখ মন পাখি
জন্মভূমি মায়ের কাছে দেনা আছিস নাকি ?
(এস এস ও মায়েরা, আশীর্বাদী হবে
আশীর্বাদী করে সবাই মান রেখে যাবে)২ বার
কোথায় আছ বেহুলার পিতা এস ত্বরা করে
আশীর্বাদী করে সবাই মান রেখে যাবে
কোথায় আছ লখাইএর পিতা এস ত্বরা করে

আশীর্বাদী করে সবাই মান রেখে যাবে

(শঙ্খ বাজাও ও মায়েরা ধর উলুধ্বনি

আশীর্বাদী হবে আজি বেহুলা সুন্দরীর) ২ বার

এস এস ও মায়েরা আশীর্বাদী পাশে

আশীর্বাদী করে সবাই মান রেখে যাবে

আশীর্বাদী সাঙ্গ হল ধর উলুধ্বনি

করো উলুধ্বনি মায়েরা দাও না শঙ্খধ্বনি

শঙ্খ বাজাও ও মায়েরা দাও না উলুধ্বনি

আশীর্বাদী সাঙ্গ হল বেহুলা লখাইএর।

[গায়েন – উৎপল নস্কর]

২৮

স্থান – সায় বেনের ভবন

বরবেশে মঞ্চে (কয়েকটি ছোট ছেলের কোলে) চতুর্দোলায় লক্ষিন্দরের প্রতিরূপ ছোট ছেলেটিকে হাজির করা হয়। দর্শকদের উলু শঙ্খধ্বনিতে পালাগান যেন উৎসবের আনন্দে ভরিয়ে তোলে চারদিক। গানে গানে বর বরণ, মালাবদল, সাত পাক ঘোরা, হস্তবন্ধন এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয় বিবাহ পর্ব।

(বর বরণের গান)

বর এল বারিতে, চতুর্দোলায় ছাড়িতে, বাজারে সানাই

শাঁখ বাজায়ে উলু দিয়ে বরণ করিতে যাই

মোরা, বরণ করিতে যাই

চন্দনেরই ফোঁটা দিলাম হলদি দিলাম গালে

বেহুলা যায় জল ভরিতে ভরা নদীর কুলে

সতী নারীর পতি ছাড়া আর যে গতি নাই

শাঁখ বাজায়ে উলু দিয়ে বরণ করিতে যাই

বিয়ে সাদির এই তো কথা চক্ষে কেন জল

নারী জাতির এই তো রীতি দুঃখ কিসের বল ?

কর্তা যাবে শ্বশুরবাড়ি, বিয়ের কাল যায়

শাঁখ বাজায়ে উলু দিয়ে বরণ করিতে যাই

মোরা বরণ করিতে যাই

[গায়েন – একাদশী গায়েন]

(পঞ্চ এয়ো মঞ্চে ডেকে লক্ষিন্দর বেহুলার বরণ পর্ব- সঙ্গে গান)

চল যাই, সাতাশী ফেলিতে যাই

(সাতাশী ফেলিতে গেলে) ২ বার

পঞ্চ এয়ো চাই

(সাতাশী ফেলিতে গেলে) ২ বার

জলের হাড়ি চাই

(সাতাশী ফেলিতে গেলে) ২ বার

বরণ ডালা চাই

(সাতাশী ফেলিতে গেলে) ২ বার

মঙ্গল হাড়ি চাই

[গায়েন – উৎপল নস্কর]

[মালাবদলের সময় আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে জনপ্রিয় " মালাবদল হবে আজ রাতে" গানটি এই পালায় গান গায়েন উৎপল নস্কর]

(হস্ত বন্ধন খোলার আহ্বান জানিয়ে পুরোহিতের গান)

(হস্ত বন্ধন হবে দেখ দ্বিজ পুরোহিত গো) ২ বার

কোথায় আছ লখাইএর পিতা

কোথায় আছ লখাইএর মাতা

হস্ত বন্ধন হল গো

কোথায় আছ বেহুলারএর পিতা

কোথায় আছ বেহুলার মাতা

হস্ত বন্ধন হল গো

হস্ত বন্ধন না খুলিলে বিয়ে তো হবেনা গো

(কোথায় আছ নায়েকবাবু) ২ বার

একশো টাকা দিবে গো

একশো টাকা না দিলে গো, বন্ধন খুলবে না গো

কোথায় আছ বন্ধু বান্ধব, হস্ত বন্ধন খোলো গো

তোমরা কুড়ি টাকা দিলে বামনী ঘরে আছে গো

একশো টাকা না দিলে বন্ধন খুলিবে না গো

[গায়েন – সত্য মণ্ডল]

শুভদৃষ্টি, সাত পাকে ঘোরা, দর্শকদের শঙ্খ উলুধ্বনি, অরুন্ধতি নক্ষত্র দেখানো... বিবাহ পর্ব সম্পন্ন।

২৯

স্থান - চাঁদের ভবন

(সদ্য বিবাহিত বেহুলা লক্ষিন্দরের বরণ – বরণের গান)

বরণ কূলা খানি তোল গো, ও তোল বকুল ফুলের মালা

ভগবতী বরণ করে গো, লখার বামেতে বেহুলা

আর কাল ছিলিস রে ওরে ও পাণ পাতা ওই না পানের বরজে

আজ কেন রে ওরে ও পান পাতা, এলি বেহুলা লখাই বরণে

আর কাল ছিলিস রে ওরে ও জলঘটি ঐ না নায়েকের ভবনে

আজ কেন রে ওরে ও জলঘটি এলি বেহুলা লখাই বরণে

আর হারিজা ফুল বরণ করে গো, করে বকুল ফুলের মালা

ভগবতী বরণ করে গো, লখার বামেতে বেহুলা

আর কাল ছিলিস রে ওরে ও বরণডালা ঐ না নায়েকের ভবনে

আজ কেন যে এলি ও বরণ ডালা ওই না বেহুলা লখাই বরণে

আর তৈলপ্রদীপ বরণ করে গো, লখার বামেতে বেহুলা

কাল যাবিরে ওরে ও তৈল প্রদীপ, ওই না নায়েকের ভবনে

আর বরণ করা সাঙ্গ হল গো, ওগো দাও না শঙ্খের ধ্বনি

দাও না একসাথে দাও না মায়েরা গো, ঐ না দাও না উলুর ধ্বনি

[গায়েন – একাদশী গায়েন]

৩০

স্থান – চম্পক নগর

চাঁদ পুত্র ও পুত্রবধূকে সাতালি পর্বতে লোহার বাসর ঘরে পাঠায় –

(বাসর ঘরে বেহুলার গান)

সিঁথিতে সিঁদুর, দুহাতে শাখা পরে

পাহারা দিয়ে আছি বাসর ঘরে ওগো বাসর ঘরে

ওগো পুরে নিয়ে বুক ভরা সৌরভ, আমার চলার পথে তুমি বড় বন্ধু,

তুমি মোর জীবনেরই গৌরব

(তুমি আমি আমি তুমি) ২বার,

মিলব বাসর ঘরে আজকে রাতে, ওগো বাসর ঘরে

সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে ... ...

[গায়েন – তাপসী নস্কর]

(লক্ষিন্দরের গান)

খোপার ওই গোলাপ দিয়ে মনটা কেন এত কাছে আনলে

পারবে কি বাসতে ভালো আমাকে জানলে, আমাকে তেমন করে জানলে

যেখানে শুধু আলো, যেখানে শুধু ভালো, আমি যে মন্দ করি সবই তা,

লেখ না আমায় নিয়ে কবিতা

স্বপ্নের হাতটি ধরে নাই বা আমায় টানলে, আমাকে তেমন করে জানলে

এখানে জীবন আমার, ফুল নেই শুধুই কাঁটার, স্বর্গের দেবী তুমি এসো না

মাটিতে কোমল চরণ রেখ না

ক্ষতি কি তোমার বল এই অনুরোধ মানলে

পারবে কি বাসতে ভালো আমাকে জানলে, আমাকে তেমন করে জানলে...

[মূল গানটি ১৯৮৫ তে মুক্তিপ্রাপ্ত তরুণ মজুমদার নির্দেশিত বাংলা সিনেমা ভালোবাসা ভালোবাসা'র জন্য পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে শিবাজি চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গাওয়া। মনসা যাত্রার জন্য গানটি গেয়েছেন গায়েন প্রবীর নস্কর]

বাসরে বেহুলা লক্ষিন্দরের পাশা খেলা এবং বেহুলা জিতলে লক্ষিন্দর তাকে শাঁখা সিঁদুর শাড়ি কিনে দেবে, এমন প্রতিশ্রুতি...

(পাশা খেলার গান)

আজি এস বেহুলা পাশাখেলি, লোহার বাসরে গো

চালো চালো ও প্রাণনাথ পাশার গুটি চালো গো

চালব পাশা হেলে দুলে দেব তোমার পাশে গো

ছল করোনা ও প্রাণনাথ, পাশার গুটি চালো গো

আর সোনা বলে চালছি পাশা গুটি পাশার ধর গো

আর চালছি চালছি ও প্রাণনাথ, হালুম করে ধর গো

আর বাঘের মত ধরব পাশা, পাশার গুটি চালো গো

আর চালছি চালছি ও প্রাণনাথ, হালুম করে ধর গো

আর ছল করোনা ও বেহুলা, সোজা ভাবে চালো গো

(লক্ষিন্দর দু'বার হারার পর নতুন করে আবার খেলা, গানের সুরে বদল, লয় – দ্রুত)

আরে চালো চালো ও বেহুলা পাশার গুটি চালো গো

চালছি চালছি ও প্রাণনাথ পাশার গুটি চালছি গো

সোজা করে চালো পাশা ধরব বাঘের মত গো

চালছি চালছি ও প্রাণনাথ, পাশার গুটি ধর গো

সোজা করে চালো পাশা , আমি ধরব গো

ধর ধর ও প্রাণনাথ পাশার গুটি ধর গো

কী যেন কী হয়ে গেল বাসর মাঝারে গো

প্রভাতকালে কিনে দেবে শাঁখা সিঁদুর শাড়ি গো

প্রভাত হলে এনে দেব, শাঁখা সিঁদুর শাড়ি গো

পাশা খেলা সাঙ্গ হল লোহার বাসর ঘরে গো ...

[গায়েন – প্রবীর নস্কর আর তাপসী নস্কর]

৩১

স্থান – পাতালপুরি এবং বাসর ঘর

নেতা আর বেহুলার ষড়যন্ত্র... লোহার বাসরঘরে বঙ্করাজ বন্দী...কাল নাগিনীকে প্রচণ্ড প্রহার করে মনসা রাজি করায় লক্ষিন্দরকে দংশন করার জন্য... কালনাগিনীর সুধাদন্ত তুলে সেখানে কালকূট বিষ দেয় মনসা... লক্ষিন্দরকে দংশন... বেহুলার বিলাপ...

(কালনাগিনীকে সাতালি পর্বতে পাঠানোর সময় মনসার গান)

আজি কোথায় আছ কালনাগিনী এস ত্বরা করে গো

বড় বিপদে পড়ে কালি তাই ডাকি তোমারে গো
আমি তোমার সঙ্গে, সঙ্গে লয়ে কালি গো
আমি তোমার সঙ্গে লয়ে কালি গো, চাঁদরে করিব শ্মশান
(কালনাগিনীর গান)
পারব না পারবনা খেতে লখাইরে ওই জীবন ধরে
সনকার ওই জীবনমনি সনকার ওই নয়নের মণি
ও তোর গো কী হয়ে গেল, ব্যাথা দিস মা সনকার প্রাণে
প্রভাতকালে কাঁদবে সনকা হাপুত আর লখাই বলে
(মনসা আর কালনাগিনীর গান)
তাই তো মনসা কানি , লোকে বলে তোরে ভালো রে
আমার দুখের কথা তুই তো সবই জানিস রে
কী দুঃখ হয়েছে জননী তাই আমাদের বল গো
বুঝাই তোকে ও কালিনী, চাঁদ কী করেছে
চাঁদ তোকে কী করেছে, তাই আমাদের বল গো
বিনা অপরাধে কালিনী মাথায় মারে হেতাল যে
বিনা অপরাধে জননী নাই বা খেলাম লখারে
কাঁটা তুলতে ও কালিনী কাঁটাই তো লাগে রে
দংশন আমি করতে পারি আমার একটি কথা গো
বলো বলো ও কালিনী কিবা তোমার কথা গো
বাঁচাইয়া দেবে জননী তাই আমারে বলো গো
পূজা যদি দেয় গো চাঁদ বাঁচাইয়া দেবো রে
দংশন আমি করব মাগো, আশীর্বাদ কর গো
[গায়েন উৎপল নস্কর ও সত্য মণ্ডল]

দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনে উঠে আসা সুধার স্পর্শে কালনাগিনী যে সুধাদন্তের অধিকার পেয়েছিল, জোর করে তা তুলে নেয় মনসা এবং সেখানে ঢালে কালকূট বিষ। কারণ সুধাদন্তের কামড়ে লক্ষিন্দর অমর হয়ে যেত।

(কালনাগিনীর লখাই কে দংশন করার সময়, মনসার নেপথ্যে গান)

ও কালি যায়, যায় গো, সাতালি পর্বতে কালি যায়

ধীরে ধীরে যায় কালিনী গো, সাতালি পর্বতে গো

কালির নিঃশ্বাসে হেমতাল উড়িয়া পলায় গো

সূতার সঞ্চার হয়ে কালিনি বাসরেতে যায় গো

এমন সময় বেহুলার কেশ এলাইয়া যায় গো

বেহুলা লখাই রূপ দেখিয়া কান্দে ও কালিনী গো

[গায়েন – উৎপল নস্কর]

(বাসরঘরে কালিনীর গান)

কালিনীর নয়ন জলে মাগো, বুক ভেসে যায়

কোনখানে দংশাইব মাগো, বলে দাও আমায়

মাথায় যদি দংশন করি মাগো, বিয়ের টোপর তায়

গলায় যদি দংশন করি মাগো বিয়ের মালা তায়

কালিনীর নয়ন জলে মাগো, বুক ভেসে যায়

হাতে যদি দংশন করি মাগো, বিয়ের আংটি তায়

গায়ে যদি দংশন করি মাগো বিয়ের হলুদ তায়

কালিনীর নয়ন জলে মাগো, বুক ভেসে যায়

কোমরে যদি দংশন করি মাগো, বিয়ের ঘুনসি তায়

গায়ে যদি দংশন করি মাগো বিয়ের হলুদ তায়

কালিনীর নয়ন জলে মাগো, বুক ভেসে যায়

কোনখানে দংশাইব মাগো, বলে দাও আমায়

[গায়েন – সত্য মণ্ডল]

কালিনীর মাথায় ঘুমন্ত লক্ষিন্দরের পা লাগায় সে তাকে পায়ে দংশন করে।

(বিষের কামড়ে জর্জরিত লখাই এর গান)

যে মালা শুখায়, যে খেলা ফুরায়, নেই তার কোন দাম

তাইতো তোমার খেলাঘর থেকে বিদায় নিয়ে গেলাম

বিদায় নিয়ে গেলাম

শ্রাবণের কোন সাঁঝে, যদি ব্যাথার বাঁশিটি বাজে
তুমি একবার শুধু মনে মনে ডেকো ভুলে যাওয়া মোর নাম
বিদায় দিয়ে এলাম
তোমার আকাশে পূর্ণিমা চাঁদ ঝলমল যত তারা
তারই এক কোনে বহুদূরে আমি রয়েছি তন্দ্রাহারা
ঝলমল যত তারা
তোমার ফাগুনবেলা জানি, আনে শুধু অবহেলা
তাই কি হবে বলনা হিসাব মিলায়ে পাইনি, কী যে পেলাম
বিদায় দিয়ে গেলাম...

[শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে জনপ্রিয় এই গানটি মনসা যাত্রায় গেয়েছেন গায়েন প্রবীর নস্কর]

(লক্ষিন্দরের মৃত্যু, স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে বেহুলার গান)

সর্পাঘাত রে, পতির কেন হল, সর্পাঘাত রে...
কেন হল ঐ নিঠুর বিধি, কেন হল সর্পাঘাত
পতি চলে গেল রে
সর্পাঘাত রে...
সিঁথির সিঁদুর সিঁথে রইল বিধি,
হাতের শাঁখা হাতে রইল বিধি,
কেন হল সর্পাঘাত রে...

[গায়েন – তাপসী নস্কর]

(সনকা ও বেহুলার গান)

একবার দূয়ার খুলে দে, আজ ও বেহুলা
কেমন আছে লখাই আমার অন্তরে ডাক দিল যে
(কেমনে দ্বার খুলব আমি নিয়ে যেতে মা এসেছে) ২ বার
ও আমার স্বামী গেছে মরে মা, সুখের সাধ তো মিটেছে
সাতটি পুতের মা যে আমি, হলাম পথের পাগলিনী
সাতটি পুতের মা যে আমি হলাম পথের কাঙালিনী
কেমন আছে লখাই আমার অন্তরে ডাক দিল যে

দ্বার খুলে দে দ্বার খুলে দে ও বেহুলা রাণী

[গায়েন - একাদশী গাইন ও তাপসী নস্কর]

(প্রভাতে পুত্র ও পুত্রবধূকে গৃহে নিয়ে যেতে এসে মৃত লক্ষিন্দরকে দেখে সনকার গান)

কী দিয়ে জুড়াব কী দিয়ে জুড়াব আমার প্রাণ

আমি শুইয়াছিলাম খাট পালঙ্কে

কী দেখিলাম আমি স্বপ্নের ঘোরে গো

সুখের নিশি হল অবসান

কী দিয়ে জুড়াব কী দিয়ে জুড়াব আমার প্রাণ

[গায়েন – একাদশী গাইন]

৩২

স্থান - চম্পক নগর

(স্বামীর সঙ্গে কলার ভেলায় ভেসে যাবার অনুমতি চেয়ে বেহুলার গান)

শ্বশুর ধরি চরণ তব, দাওনা মান্দাস গড়ে

দাও না গড়ে ভেসে যাব কালদরিয়ার জলে

আমি মান্দাস নিয়ে ভেসে যাব কালদরিয়ার জলে

শ্বশুর ধরি চরণ তব, ...

[গায়েন – তাপসী নস্কর]

(চাঁদের অগ্নিপরীক্ষার সামনে দৃঢ়চেতা বেহুলার গান)

পারি যেন জয়ী হতে এই যুদ্ধে আমি

কোথা আছ মা মনসা, আশীষ কর তুমি

মা আমার মা, ওগো মা, আমার মা...

সদ্য সদ্য ফুলের বাসর, লক্ষ লক্ষ হীরের ধার

কোথায় আছ মা মনসা অভাগিনীর কর পার

মা আমার মা, ওগো মা, আমার মা...

[গায়েন – তাপসী নস্কর]

৩৩

স্থান - গাঙুড়

কোন কোন দল নিকটস্থ জলাশয়ে কাঠের ডিঙ্গি বানিয়ে তার ওপর বেহুলা লক্ষিন্দরের জলে ভাসান দেখান, দর্শক ভিড় করে দেখতে আসেন সেই জলাশয়কাছে। তবে এরকম প্রদর্শন খুবই কম দেখা যায়। সাধারণত মঞ্চে দাঁড়িয়ে বেহুলা স্বামীর প্রতিরূপ কোন বস্তু হাতে নিয়ে ভেসে যাবার অভিনয় করেন।

(লক্ষিন্দর সহ বেহুলার ভাসানের সময় নেপথ্যে গান)

বেহুলা ভাসিল রে ঐ না দুখের সাগরে
আর দুকুলের ওগো কাণ্ডারি, তোমরা হরি হরি বল
আর ভাসিতে ভাসিতে বেহুলা গো, ঐ না গেল চাপাতলা
চাপাতলায় গিয়ে বেহুলা গো ঐ না পাতাল মধ্যে ধরে
আর চাপাতলাতে ঐ না চলে কলস ভরে
ভেসে ভেসে চলে বেহুলা গো, ঐ না কানা গদার ঘাটে
আর নদী ঘাটে কানা গদা গো ওই না ফিরে ফিরে ডাকে
... ...

[গায়েন – একাদশী গাইন]

(নদী ঘাটে গদা ও বেহুলার গান)

গদা ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম রে জলে
সুন্দরী তোরে ধরব বলে
ও সুন্দরী দাও না ধরা
মেটাই মনের বাসনা

বেহুলা হায় রে গদা এ কী করলি ?
জাত কুল মান সব খোয়ালি
আর আসবি না কানা গদা
বাড়ি ফিরে যা

গদা কতদূরে যাবে ধনি
পতা সেখানের করব আমি
ধরা দাও না ও সুন্দরী
মেটাই মনের বাসনা

বেহুলা হায় রে গদা এ কী করলি ?

জাত কুল মান সব খোয়ালি

আর আসবি না কানা গদা

বাড়ি ফিরে যা

গদা তোকে যদি না পাই

তবু মান্দাস ধরা চাই

ধরা দাও না ও সুন্দরী

মেটাই মনের বাসনা

[গায়েন – সত্য মণ্ডল আর তাপসী নস্কর]

(বেহুলার অভিশাপে পাষাণ হয় গদা, বেহুলা এগিয়ে চলে,নেপথ্যে গান)

আরে কানা গদা ছেড়ে বেহুলা ভাসে কত জোরে

ভেসে ভেসে যায় বেহুলা অপার জলেতে গো, নদীর জলেতে

আর ভাসিতে ভাসিতে বেহুলা গেল বোয়াল ঘাটে

ওদিক হইতে বোয়াল মাছ লাফিয়ে উঠিল গো মান্দাস উপরে

আর বোয়াল মাছের পুছটি ধরে চালে কত জোরে

ভেসে ভেসে চলে বেহুলা অথই পুরের পথে গো, অথই পুরের পথে

আর লক্ষিন্দরের দৃষ্টিধারা কোথায় ভেসে যাবে

মা মনসা অন্তর্যামী, অন্তরে জানিল গো, অন্তরে জানিল

আর বেহুলা ঐ সহজ দেখ মান্দাস ভর্তি করে

মাসিমা মাসিমা বলে পা জড়িয়ে ধরে গো, পা জড়িয়ে ধরে

[গায়েন – একাদশী গাইন]

৩৪

স্থান - নেতা ধোপানীর ঘাট

(নেতা ধপানির ঘাটে বেহুলা আর নেতার বসন কাচার গান)

(আরে বসন কাচে বসন কাচে নেত আর বেহুলা গো) ২ বার

আর নেত ধোপানী বসন কাচে খারে আর জলে

বেহুলা দেখ বসন কাচে ঐ না গঙ্গার জলে গো ঐ না গঙ্গার জলে

আর নেতা ধোপানী বসন কাচে কাঁচুড়্যার ফুল গো

বেহুলার কাচা বসন সূর্য সমতুল গো সূর্য সমতুল

[গায়েন – একাদশী গাইন]

৩৫

স্থান - দেবলোক

(নেতার সাহায্যে দেবসভায় পৌছায় বেহুলা, মহাদেবের সামনে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে বেহুলার গান)

দ্রিম তানা নানা নানা দ্রিম তানা নানা নানা দ্রিম তানা নানা নানা না

জাগো মহাদেব নটরাজ জাগো ত্বরা

(ও কত প্রাণ দয়াময় তুমি তো ফিরালে

তবে কেন বল তুমি আমাকে কাঁদালে)২ বার

যাকে ভালোবাসি তাকে নিওনা গো কেড়ে

রেখোনা গো আমায় তুমি অভাগিনী করে

দাও দাও ফিরিয়ে সিঁথির সিঁদুর

(ও কত প্রাণ দয়াময় তুমি তো ফিরালে

তবে কেন বল তুমি আমাকে কাঁদালে)২ বার

একটি মেয়ের কাছে সিঁদুরের সম্মান

সব থেকে বড় নাকি তুমি কি রেখ মান

তার জীবনে স্বামীই ভগবান

[গায়েন – তাপসী নস্কর]

(মনসার কাছে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে বেহুলার গান)

জয় মাগো বিষহরী মাগো মনসা

তোমাকে মিনতি করি ধরি তোমার পা

চাঁদবেনের কুলবধূ সায়বেনের ঝি

তোমার সেবিকা মাগো মনসা দাসী

লোহার বাসর ঘরে কোন শাপে স্বামী মরে

দাও বলে দাও মাগো দাও বলে দাও মাগো দাও বলে তা

জয় মাগো বিষহরী জয় মনসা

তোমাকে মিনতি করি ধরি তোমার পা

[গায়েন – তাপসী নস্কর]

বেহুলা, চাঁদের হাতে মনসার পূজার প্রতিশ্রুতি দিলে দেবী লক্ষিন্দরের প্রাণ ফেরাতে সম্মত হন।

(বিষ ঝাড়ার গান)

ও বিষ আয় রে আয়

লক্ষিন্দরের দেহের বিষ মা মনসা ঝাড়ায়

ও বিষ আয় রে আয়

আরে হাড়ে হাড়ে জোড়া লাগে মা মনসার দায়

ও বিষ আয় রে আয়

লক্ষিন্দরের দেহের বিষ মা মনসা ঝাড়ায়

আর মস্তকের ঐ বিষ নামিয়া গলকণ্ঠে যায়

ও বিষ আয় রে আয়

লক্ষিন্দরের দেহের বিষ মা মনসা ঝাড়ায়

ওরে লখার বুকের বিষ নামিয়া হাঁটুতে যায়

আর বিষহরীর আজ্ঞায় ও বিষ উড়িয়া পালায়

ও বিষ আয় রে আয়

লক্ষিন্দরের দেহের বিষ মা মনসা ঝাড়ায়

আরে মা মনসার বরে লখাই জীবন ফিরে পায়

জীবন পেয়ে লখাই তখন বেহুলা বেহুলা কয়

[গায়েন – উৎপল নস্কর]

গ্রামে গঞ্জে ওঝা বা বৈদ্য কর্তৃক বিষ ঝাড়ার সময় মেয়েদের মাথার চুল খুলে রাখার যে প্রথা রয়েছে, সেই প্রথা অনুযায়ী মনসা যাত্রায়ও লক্ষিন্দরের বিষ তোলার সময় দলের পক্ষ থেকে উপস্থিত নারীদের চুল খুলে রাখার অনুরোধ করা হয় । এই ভাবে লোক প্রথা কার্যকর হয় অভিনয় শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে।

স্বর্গপুর থেকে মর্ত্যে চাঁপাতলার ঘাট পর্যন্ত মনসা নিজে ডিঙা বেয়ে পার করে দেয় বেহুলা লক্ষিন্দরকে।

৩৬

নদীপথ

(মনসার ডিঙা বাওয়ার গান)

ডিঙ্গা বাও রে

উজান কাণ্ডারি ডিঙা সুজন বেগে বাও

ডিঙা ... ...

আরে দেবপুর ছেড়ে চলে ডিঙা চলে নেতর ঘাটে

ডিঙা ... ...

আরে একে একে মুক্ত করে পাষাণ বেহুলা

ডিঙা ... ...

আরে কানা গদা মুক্ত করে চলে চাঁপাতলা

[গায়েন – উৎপল নস্কর]

বেহুলা লক্ষিন্দর প্রথমে যোগিনী আর যোগী বেশে বেহুলার পিত্রালয়ে যায়, তার পর চাঁদের কাছে ফিরে তার মনসা পূজায় সম্মতি আদায় করে। চাঁদের মনসা পূজা – মঞ্চে মনসা ঘট প্রতিষ্ঠা করে নতুন শাড়ি, ফল সহ পূজার যাবতীয় উপকরণাদি দিয়ে পূজা সম্পন্ন করা হয়।

৩৭

চম্পক নগর

(পূজার গান)

অনেক আশায় তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালাই আমি প্রদীপ জ্বালাই

প্রদীপ জ্বালাই আমি প্রদীপ জ্বালাই

মা গো আমার ও ... কর করুণা, দাও গো দেখা

অনেক আশায় তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালাই আমি প্রদীপ জ্বালাই

প্রদীপ জ্বালাই আমি প্রদীপ জ্বালাই

[গায়েন – প্রবীর নস্কর]

চিত্রসূচী

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক কাজের প্রামাণ্য কিছু ছবি ও ম্যাপ নিম্নরূপ-

১। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ক্যানিং থানার অন্তর্গত বুধোখালি গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা [প্রসঙ্গ ভেলা ভাসানো উৎসব / প্রথম অধ্যায়]।

২। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত দক্ষিণ রায়পুর গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা [প্রসঙ্গ ভেলা ভাসানো উৎসব / প্রথম অধ্যায়]।

৩) হাওড়া জেলার উদয় নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত মানশ্রী গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা [প্রসঙ্গ ঈশানকুমারী পূজা অন্নকূট/প্রথম অধ্যায়]

৪। হাওড়া জেলার বাগনান থানার সামতা গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা, সিজ মনসার সর্বজনীন পূজা, মনসা পুকুর ইত্যাদি। [প্রসঙ্গ সামতা গ্রামের মনসা পূজা / প্রথম অধ্যায়]।

৫। সাগর ব্লকের মনসা দ্বীপের মনসা পূজা উপলক্ষে গঙ্গাসাগরে ঘট উত্তোলন পর্ব [সাগর দ্বীপের মনসা পূজা/ প্রথম অধ্যায়]।

৬। হাওড়া জেলার ওয়াদিপুর গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা [ওয়াদিপুরের দুর্গা ও মনসার সম্মিলিত পূজা/ প্রথম অধ্যায়]।

৭। বর্ধমান জেলার কালনা থানার নারকেলডাঙায় জগতগৌরী মন্দিরে ক্ষেত্রসমীক্ষা [দুর্গা, মনসা ও জগদ্ধাত্রীর মিলিত পূজা/ প্রথম অধ্যায়]।

৮। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের মুসারু ও ছোটপোষলায় সমীক্ষা [প্রসঙ্গ ঝাঁকলাই পূজা/প্রথম অধ্যায়]।

৯। বর্ধমানের কালনা থানার নেপাকুলি গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা [প্রসঙ্গ কমলা বিমলা পূজা /প্রথম অধ্যায়]।

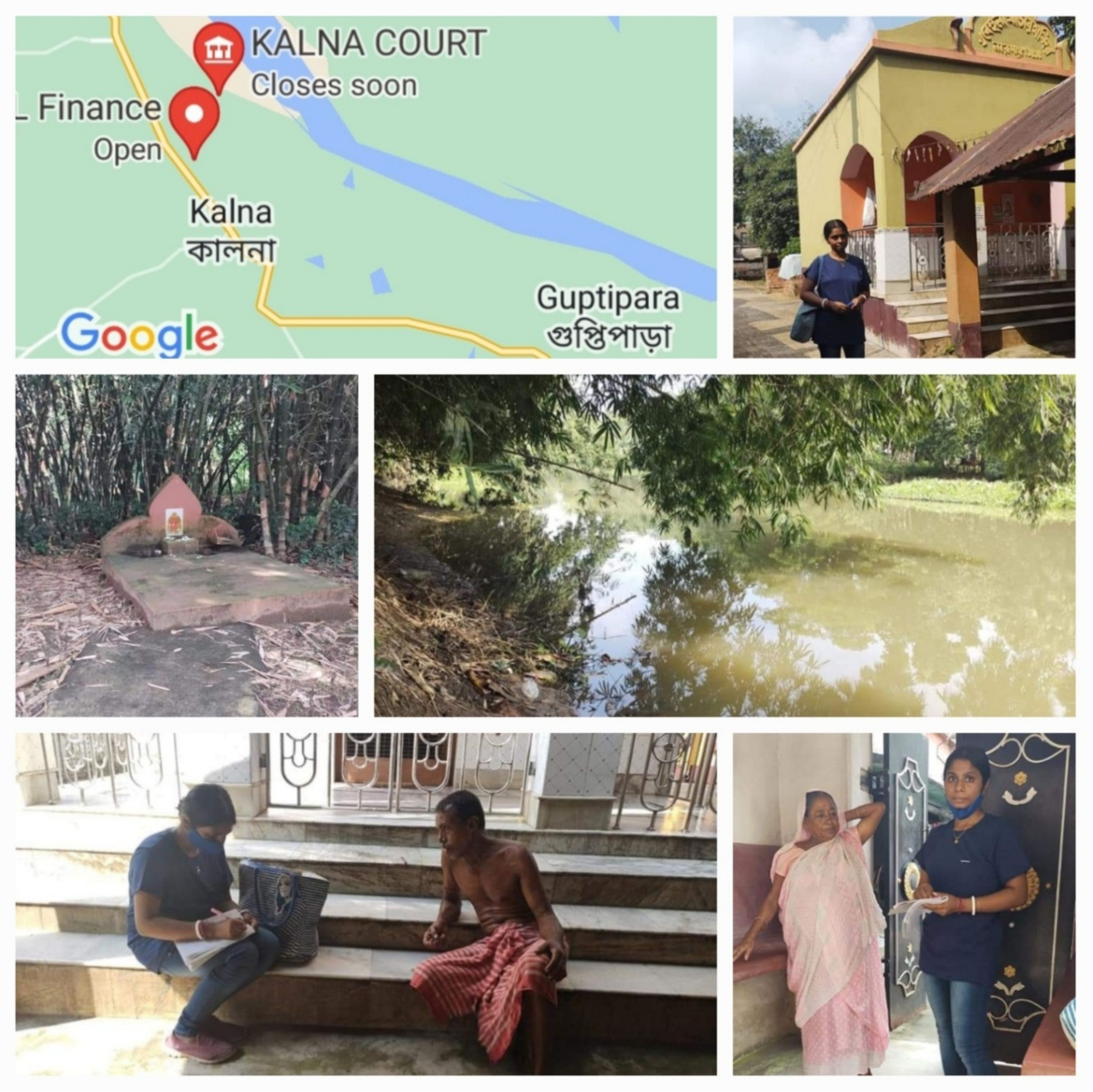

১০। বর্ধমানের কালনা থানার উদয়পুর গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা [প্রসঙ্গ বেহুলা পূজা/প্রথম অধ্যায়]।

১১। বাঁকুড়া জেলার অযোধ্যা গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা [প্রসঙ্গ দশহরা পরব/প্রথম অধ্যায়]।

১২। বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের রামসাগর গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা [প্রসঙ্গ বাঁকুড়ার মনসা সংস্কৃতি/প্রথম অধ্যায়]।

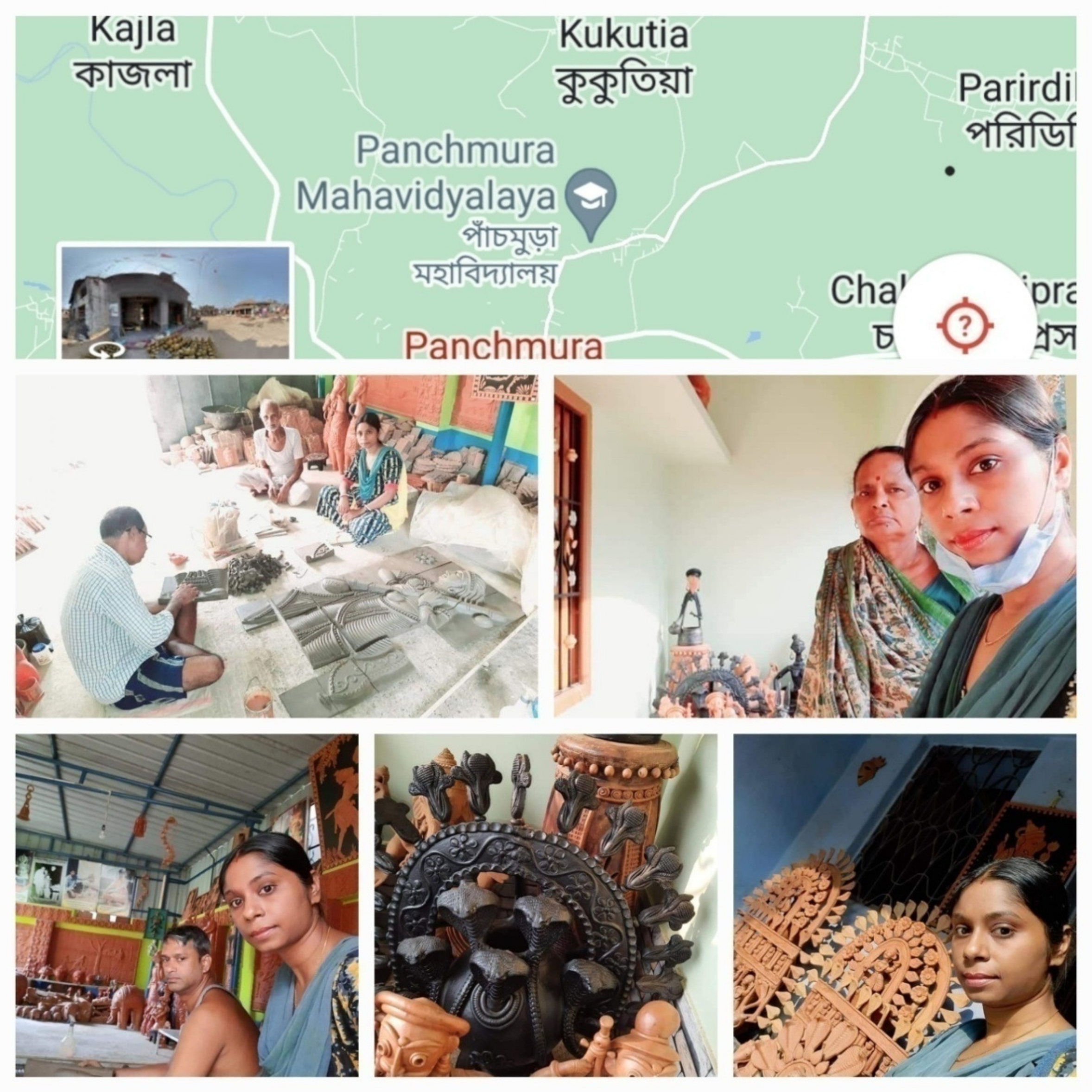

১৩। বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা থানার পাঁচমুড়া গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা [প্রসঙ্গ বাঁকুড়ার মনসা সংস্কৃতি/প্রথম অধ্যায়]।

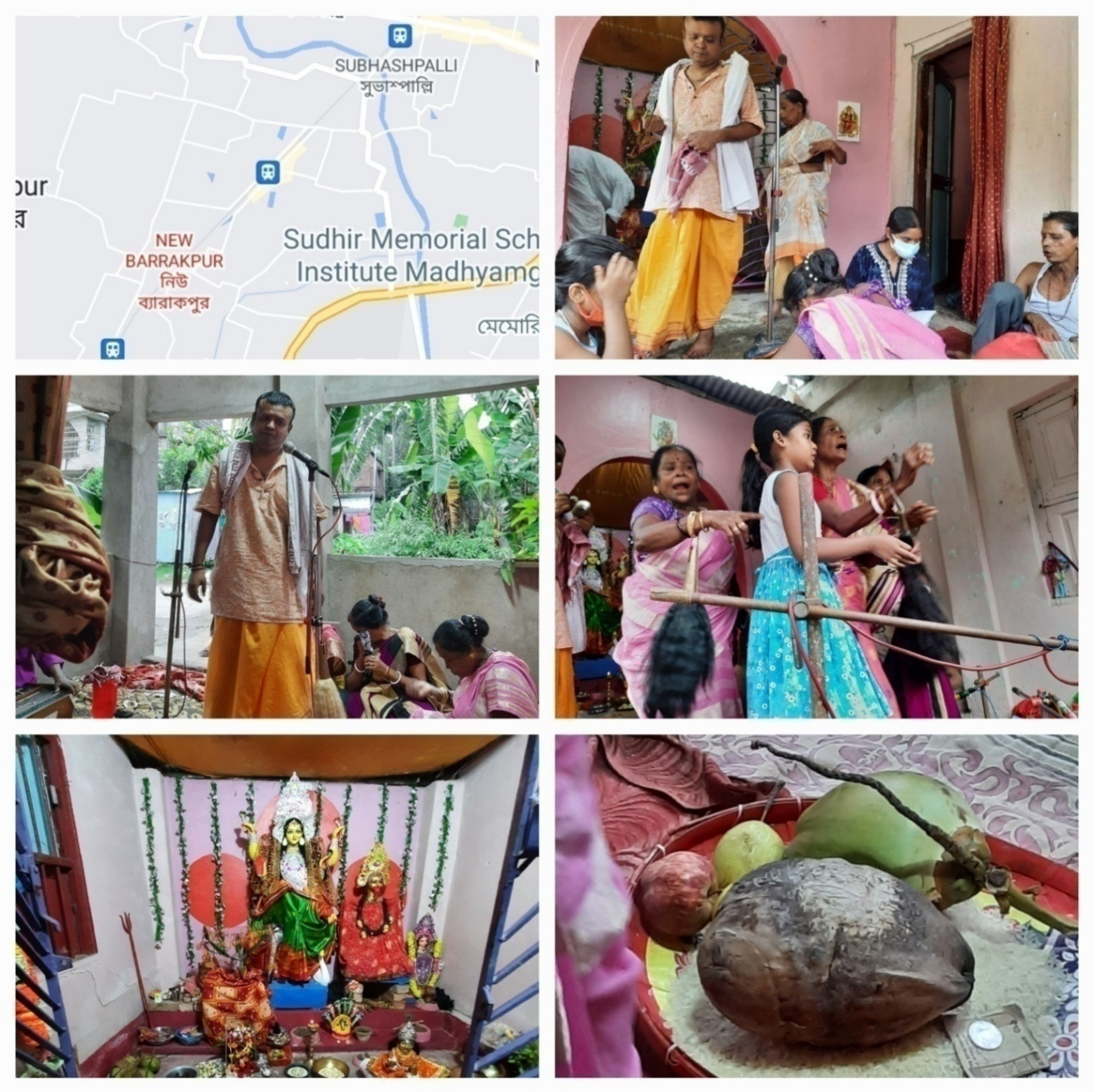

১৪। উত্তর চব্বিশ পরগণার নিউ ব্যারাকপুরে সমীক্ষা [প্রসঙ্গ মঞ্চে রয়ানি গান/দ্বিতীয় অধ্যায়]।

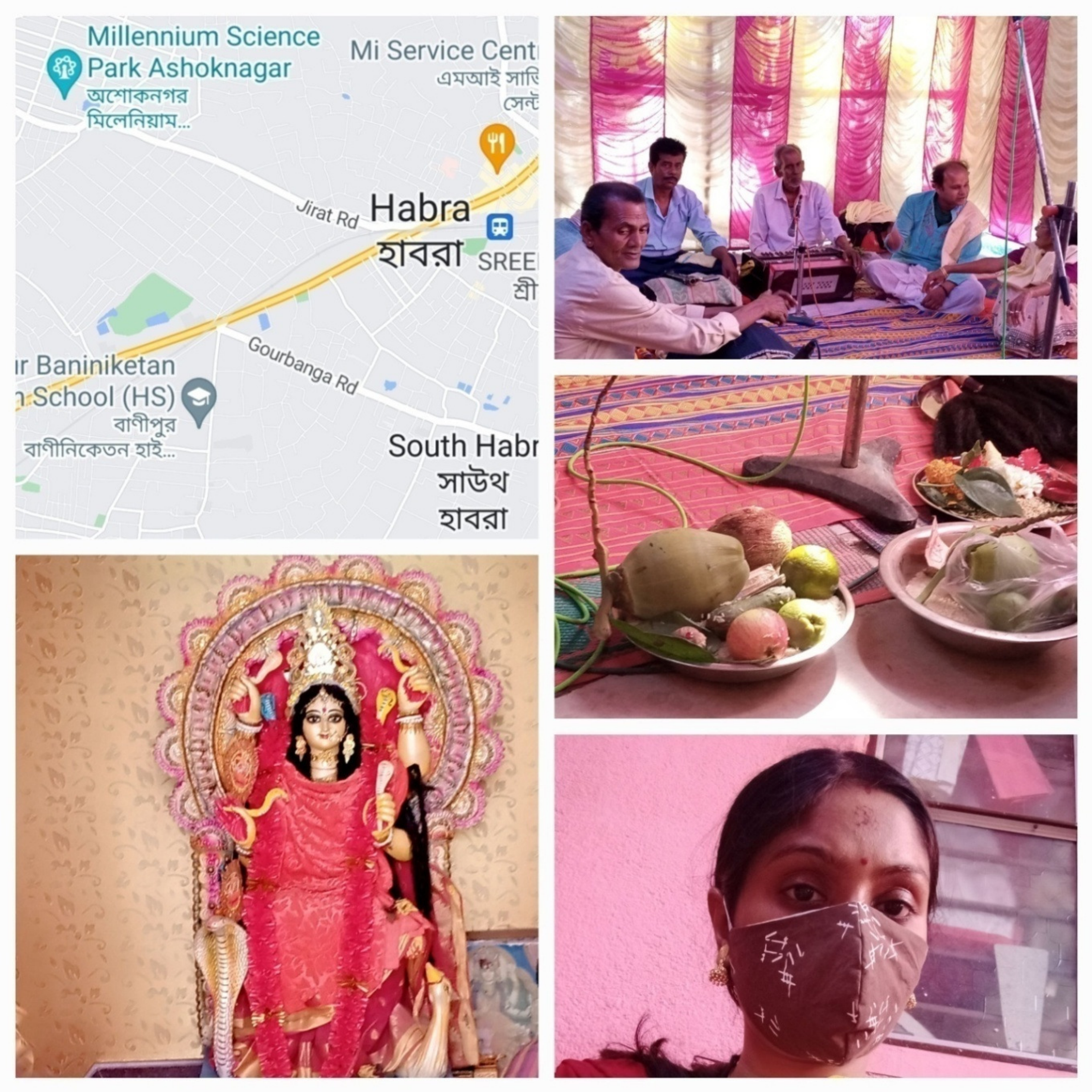

১৫। উত্তর চব্বিশ পরগণার হাবড়ার বাণীপুরে ক্ষেত্রসমীক্ষা [প্রসঙ্গ মঞ্চে রয়ানি গান/দ্বিতীয় অধ্যায়]।

১৬। পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা থানার অন্তর্গত নয়া গ্রামে সমীক্ষা [প্রসঙ্গ মনসার পট/ দ্বিতীয় অধ্যায়]।

১৭।বাঁকুড়া জেলার ভরতপুর গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা [প্রসঙ্গ মনসার পট / দ্বিতীয় অধ্যায়]।

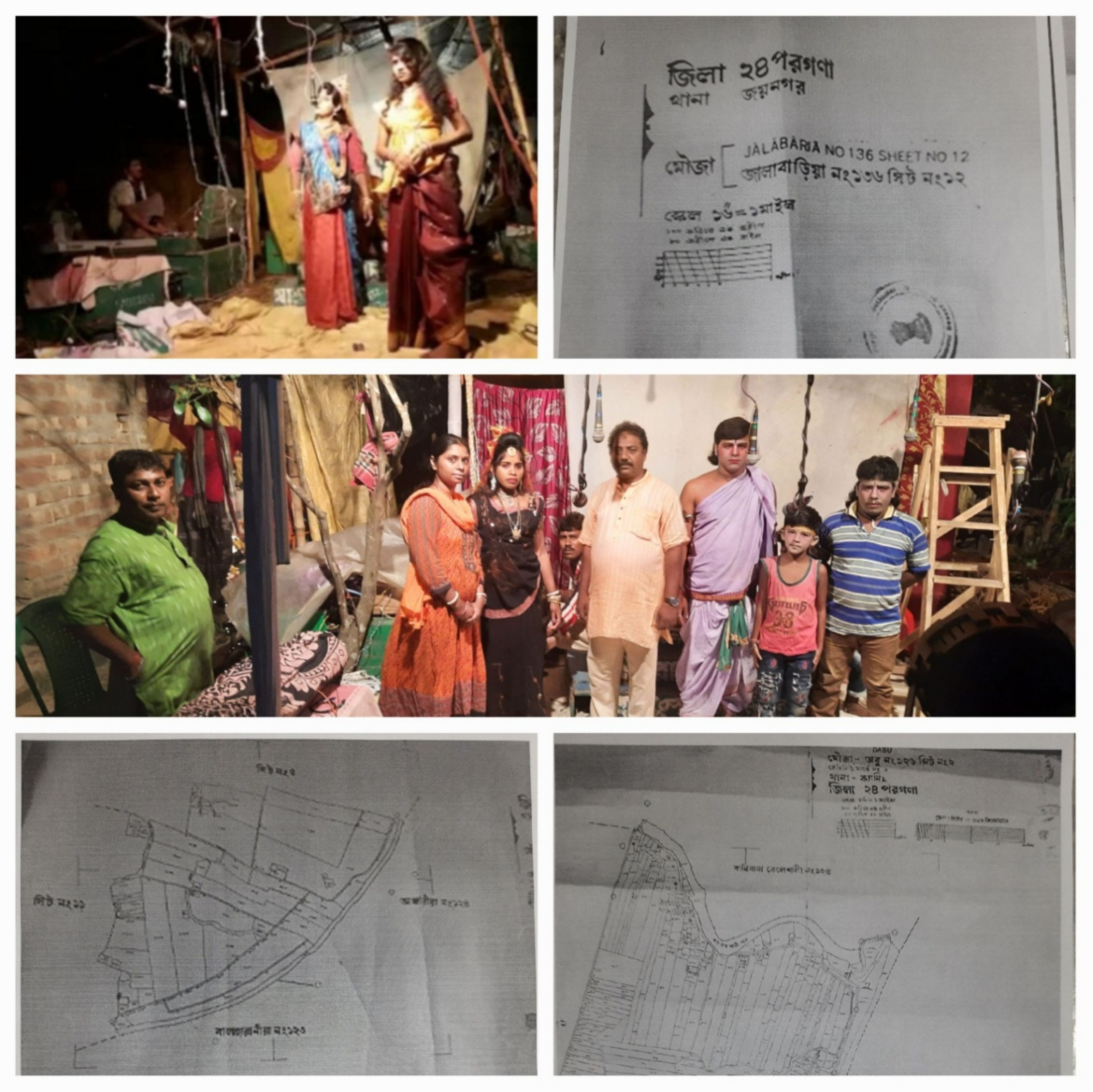

১৮। দঃ চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ বারাসাতের কেল্লা গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা [জয়নগর থানার জালাবেড়িয়ার আদি ত্রিধারা গীতিনাট্য সংস্থার মনসার পালাগান / দ্বিতীয় অধ্যায়]।

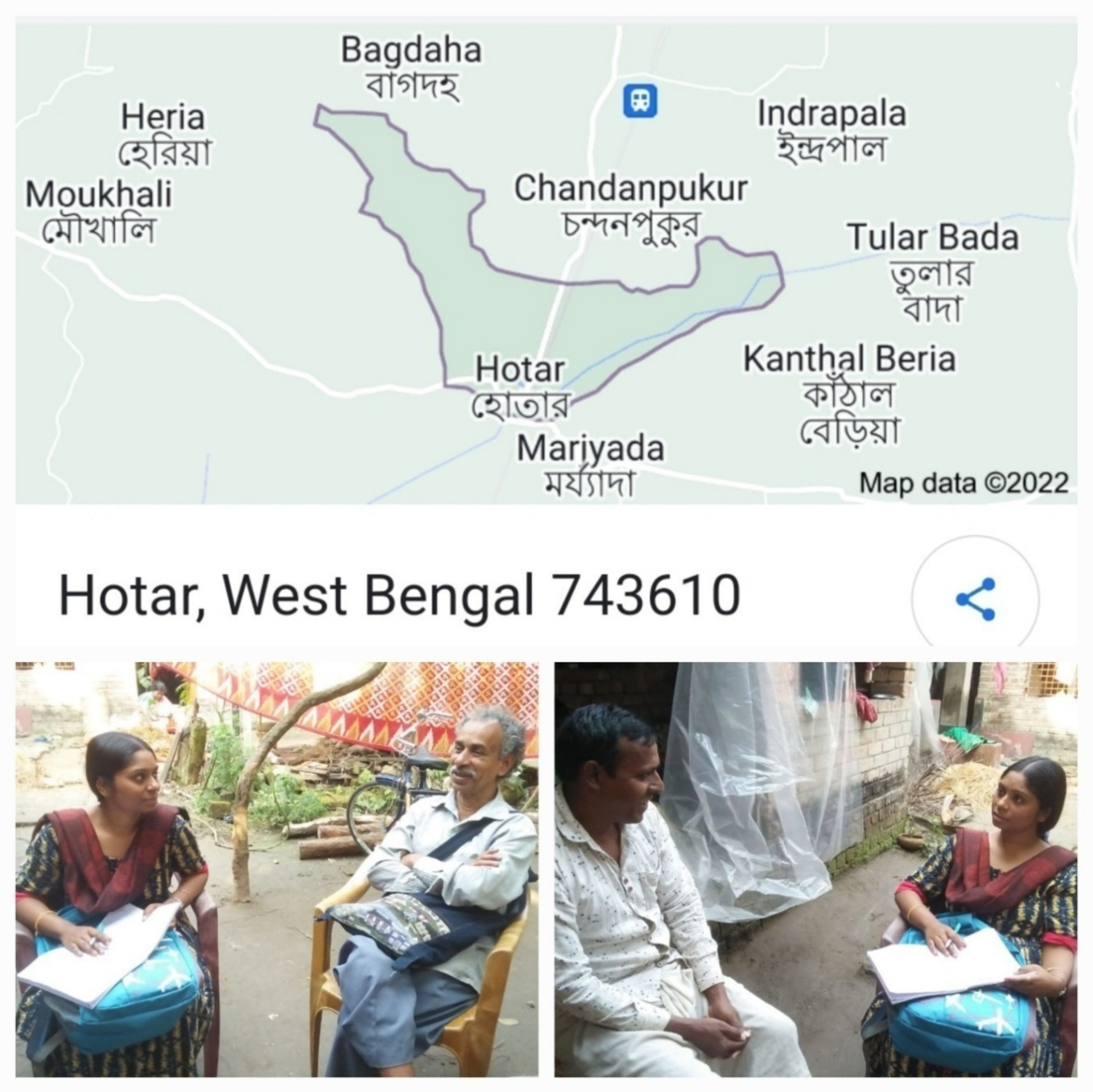

১৯। দঃ চব্বিশ পরগণার হোটোর ও বারুইপুর থানার কাঁঠালবেড়িয়ায় ক্ষেত্রসমীক্ষা [প্রসঙ্গ মনসার পালাগান/পালাগান সংগ্রাহক পরিমল চক্রবর্তী ও মনসা শীতলা ও বনবিবির পাঁচালিকার রাধাপদ রায়ের সাক্ষাৎকার/দ্বিতীয় অধ্যায়]।

২০। নদিয়া জেলার ফুলিয়ার কৃষিপল্লির লোকশিল্পী শান্তিলতা বিশ্বাসের সাক্ষাৎকার [মনসাপালা কেন্দ্রিক কবিগান/দ্বিতীয় অধ্যায়]।